

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 681.

May, 1920.

“কন্যার্থে বঁচা পালনীয়া শিশুস্বামীমতিমতঃ ।”

কঙ্কাক্ষেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে ।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত ।

৫৭ বর্ষ ।	বৈশাখ, ১৩২৭ । মে, ১৯২০ ।	১২শ কল ।
৬৮১ সংখ্যা ।		১ম ভাগ ।

প্রাণের প্রাণ ।

অফুরন্ত অব্যাহত প্রাণের ভাণ্ডার
পৃথ্বী ; হেথা আসি নাই মরিবার তরে ;
জাগিব অসীম সত্যো ; পূর্ণ করি প্রাণ
নেব এ অনন্ত অমৃত উৎস ; যে শান্তি
যে আনন্দধারা বয় উদার আকাশে
মত্ত বিস্তল দখিন বাতাসে, পানীয়
গানে ;—

যে প্রাণের তরঙ্গে হিলোলিত
আলোকিত হরে জাগিছে সবুজ পাতা,
নব কিশলয় ফুল ফল ; জাগে তারা
জলন্ত অগ্নিরে মণ্ডিত করি নীলাকাশ,
জাগে রবি শশি—সেই প্রাণ, সেই গান,
সেই শান্তি—উদার আনন্দ অপরিমাণ,
সৌন্দর্য্য অপরিমীম—নিঃশেষে করি পান
এ মৃত্যুর তীরে অমৃত কিনিবে প্রাণ ॥

ত্রিনিব্বলচন্দ্র বড়াল ।

‘সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা’।

* বৈ জ্যৈষ্ঠা আশ্বিনী জ্যৈষ্ঠা আশ্বিনী
 আঃ বু শ ম শ ম শু
 শেঃ ৩১ ৩১ ৩২ ৩১ ৩১ ৩১
 শু সো শু সো বু র
 A. M. J. Jy. Aug. S.
 14 15 15 17 17 17
 আঃ বু শ ম শু র বু
 শেঃ ৩০ ৩১ ৩০ ৩১ ৩১ ৩০
 শু সো বু শ ম শু

বু শ ম শ ম শু
 বু র বু র বু শ
 শু সো বু সো বু র
 শ শু শু ম শু সো
 র বু শ বু শ ম
 সো বু র বু র বু
 ম শু সো শু সো বু

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩২৭ সাল।
 ফসলী ১৩২৭-৩৮।
 হিজরী ১৩৩৭-৩৮।
 গীটাব্দ ১৯২০-২১।
 শকাব্দ ১৮৮২।
 সংবৎ ১৯৭৭-৭৮।
 মণী ১১৮২-৮৩।
 ব্রাহ্মসংবৎ ৯১-৯২।

১ ১ ৮ ১১ ২০ ২৯
 ২ ২ ১৬ ২১ ৩০
 ৩ ১০ ১৭ ২৪ ৩১
 ৪ ১১ ১৮ ২২ ৩২
 ৫ ১২ ১৯ ২৩
 ৬ ১৩ ২০ ২৭
 ৭ ১৪ ২১ ২৮

কা অ পৌ মা ফা চৈ

আঃ সো ম বু শু র সো
 শেঃ ২৯ ৩০ ২৯ ৩০ ২৯ ৩১
 সো বু বু শ র বু
 O. N. D. Ja. Feb. Mar
 18 16 16 14 13 14
 আঃ শু সো বু শ ম ম
 শেঃ ৩১ ৩০ ৩১ ৩১ ২৪ ৩১
 র ম শু সো সো বু

সো ম বু শু র সো
 ম বু শু শ সো ম
 বু বু শ র ম বু
 বু শু র সো বু র
 শু শ সো ম বু শু
 শ র ম বু শু শ
 র সো বু বু শ র

বৈ জ্যৈষ্ঠা আশ্বিনী জ্যৈষ্ঠা আশ্বিনী
 শুঃ ১৬ ১৪ ১৩ ১০ ৯ ৭
 পূঃ ২০ ১৮ ১৭ ১৪ ১৩ ১২
 কৃঃ ২০ ২১ ২৮ ২৫ ২৩ ২২
 অঃ ৫ ৪ ২৩ ২৯ ২৭ ২৬
 আঃ—আরম্ভ। শেঃ—শেষ।

শুঃ—শুক্ল একাদশী, পূঃ—পূর্ণিমা
 কৃঃ—কৃষ্ণ একাদশী, অঃ—অমাবস্তা
 ১০. ১৬ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার ও
 ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার শুক্ল একাদশী,
 ২০শে বৈশাখ সোমবার ও ১৮ই
 জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার পূর্ণিমা।

২২শ ও ৩১শে বৈশাখ, বৃহস্পতি
 ও শুক্রবার এবং ২৯শে জ্যৈষ্ঠ
 শনিবার কৃষ্ণ একাদশী, ৫ই বৈশাখ
 রবিবার ও ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার
 অমাবস্তা ইত্যাদি।

* বৈ—বৈশাখ, বুধবার আরম্ভ ও ৩১শে শুক্রবার শেষ।

১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।
 † A এপ্রেল, আরম্ভ বৃহস্পতি-
 বার, শেষ ৩০শে শুক্রবার।
 ‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ,
 ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৫ই জুন
 ১লা আষাঢ় ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ বুধবার, ২রা
 বৃহস্পতিবার ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ
 শনিবার, ২রা রবিবার ইত্যাদি
 বৈশাখ বুধবার, ১৮, ১২,
 জ্যৈষ্ঠ শনিবার ২২, ২৯
 এক এক দিকে ৬টী করিয়া
 দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

কা অ পৌ মা ফা চৈ

শুঃ ৬ ৭ ৬ ৭ ৬ ৭
 পূঃ ১০ ১১ ১০ ১০ ১০ ১০
 কৃঃ ২০ ২১ ২০ ২১ ২১ ২২
 অঃ ২৪ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ২৬

১০. ৬ই কার্তিক শনিবার ও
 ৭ই অগ্রহায়ণ সোমবার শুক্ল
 একাদশী। ১০ই কার্তিক বুধবার ও
 ১১ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার পূর্ণিমা।
 ২০শে কার্তিক শনিবার ও ২১শে
 অগ্রহায়ণ সোমবার কৃষ্ণ একাদশী।
 ২৪শে কার্তিক বুধবার ও ২৫শে
 অগ্রহায়ণ শুক্রবার অমাবস্তা
 ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম শুভের তারিখের
 সহিত বাম বা দক্ষিণ শুভের মাস
 বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার ও
 তিথি ঠিক হইবে।

নব বর্ষের গান ।

ভৈরবী—একতাল। । *

ସମ ସାଧନାର ସ୍ତ୍ରୀ,

প্লাবি' মেদিনী সাগর অম্বর,

এস ওগো বাণী,

স্বরগ-সঙ্গীতে অমিয়-নিখার

এস-গো! নত বরষে !

ঢাল অবিরল,

ରୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର-ଦୁଆର ଗମ

কোটি শতদল

খুলিবে তোমার পরশে ।

ফুটিবে মানস-সরসে :

চরণ-নখর-আলোকে নাশি'

নব নব ভাব, নূতন ভাষা,

চির-সঞ্চিত তিমিররাশি,

অঞ্চলে বাঁধি আন গো আশা,

মম—অবস প্রাণে

তব--স্নেহ নিরমল

বীণার তানে

करुणा शीतल

জাগাও বিপুল হরষে ।

যেন--তাপিত ভূতলে বরষে ॥

রচনা—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ভট্টাচার্য। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী খোহিনী সেনগুপ্ত।

आहारी ।

II ২ ৩ . ১
 সা সা মা । দা দা পা । পা পা -। পগা দা পা I
 ম য সা ধ না র রা গো . এস ও গো

I মা -া জা । সা ঋা -া । সখা জমা জখা । সা -া -া I
বা • নী এ স • গো• নব বর ঘে • •

I. ^২সা -^৩ সা । ^৩গা দা গা । ^১সা জা -^১। ^১জা জা -^১ I
ক . ক ম নি র ছ ধা র য য .

* গীত-রচয়িতা এই গানটিতে “বসন্তবাহার” হর এবং “তেওরা” তাল দিয়াছেন। আমি গানটিকে “ভৈরবী” হরে ও “একতাল” তালে গাহিয়াও আনন্দাভূতব করিয়া থাকি। সঙ্গীতপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা “মম সান্নাধ্য নানী”কে একবারটি আমার হরে এবং তালেও আবাহন করিবেন কি? শ্রীমোহিনী সেনগুপ্ত।

১' ৩ . ১
I সা খা সা । খা জা মা । মা জা সা । -া -া -া II
খু লি বে তো মা র প র শে . . .

অন্তরা।

২ ৩ . ১
II দা দা দা । দা গা গা । গা সা সা । সা -া সা I
চ র গ ন খ র আ লো কে না . শি

১' ৩ . ১
I জা জা খা । সা সা -া । গা সজা খা । সাঃ সঃ খাসা I
চি র স ফি ত . তি মি. র রা শি মম

২' ৩ . ১
I সা সা সা । খা -া সা । গা গা দা । দা -া গা I
অ ব শ খা . শে বী গা র তা . নে

২' ৩ . ১
I জা মা -জা । খাসা খা মা । জা খা সা । -া -া -া II
জা গা ও বি. পু ল হ র বে . . .

সকারী ও আভোগ।

২' ৩ . ১
II সা -া গা । দা দা গা । সা জা জা । জা মা জা I
সা . বি' মে দি নী সা গ র অ ঘ র

I সা খা সা । সা খা মা । জা মা জা । খা সা সা I
খ র গ স কী তে অ মি য় নি ঝ র

.২' ৩ . ১ ১
I সা দা দা । পা দা পা । পা গা দা । পা মা মা I
টা ল অ বি র ল কো টি শ ত দ ল

২' ৩ . ১
I জা জা জা । জা মা মা । জা খা সা । -া -া -া I
ক টি বে মা ন স স র সে . . .

১
 | দা গা দা । দা - গা । গা সা সা । সা সা - ।
 অ ঙ্গ লে বা • ধি আ ন গো আ শা

২ ৩
 I জা জা জা । জা ঋ - সা । গা সা জা । ঋ: স: ঋসা ।
 ন ব ন ব ভা ব ন ত ন তা যা তব

২ ৩
 I সর্ষা সা সা । সা ঋ সা । গা গা গা । পা পা -পপা ।
 স্রো হ নি র ম ল ক রু গা শী ত লঘেন

২ ৩
 I মা পা মা । জা মা জমা । জা ঋ সা । - - - II II
 তা পি ত ভূ ত লে• ব র যে • • •

সমা ।

কনক আয়ুধে কাটি তিমিরের রেখা
 ধীরে ধীরে স্বধামুখি, তুমি দিলে দেখা!
 অমন মধুর হাসি—স্বরগের আলোরাশি
 আলো করি দশদিক্ উজ্জলে সংসার;
 মধুময় ধরাতল, আলোময় সর্বস্থল;—

নিখিল ভরিয়া জাগে মধুর ঝঙ্কার!
 এস দেবি, এস কাছে; কহিবার কি বা আছে
 এস শুধু হইজনে মিলি মনে মনে;
 জগৎ জাগিয়া থাক্ অথবা ভাঙিয়া যাক্,
 দেখিব না, মিশি শুধু র'ব হইজনে।
 ত্রী মা—।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য ।

বিধাতা মানব-প্রকৃতিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি একভাগ অশন, বশন, শয়ন, সন্তান-পালন প্রভৃতিতে বিধিপূর্বক নিয়োগ করিয়া মানবকে স্থায়ী হইবার ইঙ্গিত জানাইতেছেন; আর একভাগে তিনি সহস্যকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য সাধন করিতে করিতে দেবলোকের উপযুক্ত

হইয়া দেবতাদিগের আয় শাস্ত আনন্দ উপভোগ করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এ অধিকার কেবল তাঁহার মানব-সন্তানগণকেই তিনি প্রদান করিয়াছেন।

প্রথমতঃ জ্ঞান।—অনেকের ধারণা যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরাই জ্ঞানলাভ করিবেন, আমরা জানেন কি জ্ঞান, কি বুঝি!—আমাদের দ্বারা

জ্ঞানের সাধন অসম্ভব। 'জ্ঞান'-মানে জানা। এ জগতে জানার কি অন্ত আছে? জ্ঞানীর সম্মুখেও যেমন জ্ঞানের অনন্ত সমুদ্র, মুখের সম্মুখেও তেমনি জ্ঞানের অনন্ত সমুদ্র! ইহার সীমা নাই, পার নাই;—অপার, অনন্ত অন্তলম্পর্শ! জ্ঞানিগণ অনেক অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া (আমরা) মূর্খেরা কি হতাশ হইয়া বসিয়া থাকিব! কিছু জানার জন্ত যত্ন করিব না, সাধন করিব না! চেষ্টা করিব না! যদি বড় পিপীলিকারা খাণ্ডের বড় বড় টুকরা লইয়া ঘাইতেছে দেখিয়া ছোট পিপীলিকারা মনে করে, 'আমরা আর কত টুকু লইতে পারিব?' এবং এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে ত ছোট পিপীলিকাদের আর শীতকালের জন্ত আহার-সংগ্রহ করা হয় না। তেমনি যদি জ্ঞানিগণ অনেক তথ্য-সংগ্রহ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা মূর্খেরা জ্ঞান-অর্জনে হতাশ হইয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদেরও দেবলোকের পাথের কিছুই সংগ্রহ করা হইবে না। অনেকে প্রাকৃতিক জ্ঞানের অনন্তত্ব অস্বীকার করিয়া প্রাকৃতিক জ্ঞান-অর্জনে নিরন্তর হইয়া থাকেন। আবার কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তিও ব্রহ্মজ্ঞানের অনন্তত্ব অস্বীকার করিয়া এখনও বলেন এবং পূর্বেও বলিয়া গিয়াছেন, "কেন মিছে মাথা বকান, কেন একাবর্তক? যাকে জানবার কোন উপায় নাই, তাকে জানতে কেন বুঝা চেষ্টা করা!" এই ভাব হইতে অজ্ঞেয়বাদের সৃষ্টি। অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞেয় বস্তু নহেন, তিনি অজ্ঞেয়, তাকে কোন প্রকারে জানা যায় না।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম-এই তিনের সাধনেরই সরল ও বক্র দুই বিভিন্ন পথ আছে। একজন ঋষি ব্রহ্মজ্ঞানের সরল পথ অবলম্বন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "তাকে জানি যে এমনও নহে, না জানি যে এমনও নহে।" এই ঋষিবাক্য অবলম্বন করিয়া আমরা যেন ব্রহ্ম-জ্ঞানের সরল পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকি; তাকে জানিবার উপায় নাই বলিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া যেন বসিয়া না থাকি।

দ্বিতীয়ত: ভক্তি।—এই ভক্তিও অনন্ত। ইহারও বিশালতা ও দূরবর্গাহতা, এবং অন্তলম্পর্শতা আমাদের ত্রাস সাধারণ সাধক-গণের অস্বভাবের বিষয় নয়! এই ভক্তি-সাধনের সরল ও বক্র পথ আছে। যাহারা ভক্তির বক্র পথ অবলম্বন করেন, তাঁহারা কখনও গম্য স্থানে উপনীত হইতে পারেন কি না সন্দেহ। জীবনের সমস্ত দিবস বক্র পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহারা জীবনের সফলতা দিশাহারা হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া নিরাশ-হৃদয়ে রোদন করিতে থাকেন। এই বক্র পথের পথিক যাহারা, তাঁহারা কেবলই নিজ জীবনের ও জীবমাত্রেরই জীবনের সুখ দুঃখ লইয়া ভগবন্তক্তির হেতু অধেষণ করেন। তাঁহারা অহেতুকী ভক্তি কি, তাহা কখনই অস্বভাব করেন নাই। আর যাহারা ভক্তির সরল পথ অবলম্বন করেন, তাঁহারা অহেতুকী ভক্তির অমৃত সেক আত্মাকে স্পীতল করেন। পূর্বকালের কয়েকজন মহাত্মা অহেতুকী ভক্তির অমৃত-রসে সঞ্চারিত ও বিগলিত হইয়া যে সকল মহাবাক্য বলিয়া গিয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।—

“আমার নিজ ইচ্ছা নাহি কিছু,

• তব ইচ্ছা হউক পূরণ।”

“ইহ পর ইষ্ট তরে,

না ভাকি বিভু তোমাংরে।”

“স্বর্গেবা নরকে থাকি,

তোমাতেই ভক্তি রাখি।”

“ওগো যেন প্রভু তোমার চরণ পাই,

ঐশ্বর্য সম্পদ, সম্মান গৌরব—

কিছুই প্রার্থনা নাই।”

“হউক জনম মম অমর লোকেতে,

কিংবা মম জন্ম হোক কৌটের ঘোনিকে,

তুষ্টি, রুষ্টি, সুখ, দুঃখ নাহি মম তাতে

যদি মম থাকিতে পাই তোমার প্রেমোতে।”

এই সকল পরম বিস্ময়জনক, স্তম্ভুর, জিতাপহারী, মুক্তিপ্রদ বাক্যগুলি অচেতুক-ভগবন্তক্তির জলন্ত, জীবন্ত নিদর্শন। আমরাও যেন এইরূপ আচেতুক-ভক্তির সরল পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারি। বক্রপথে নানা বিষ, নানা অন্তরাগ।

তৃতীয়তঃ কর্ম—কর্ম-সম্বন্ধেও মানব-গণ বক্র ও সরল দুই বিভিন্ন পথের পথিক। ষাঁহাবা বক্র পথের পথিক, তাঁহারা কর্মের অনন্তত্ব ও কর্মের ফলাফল, এবং কর্মের লাভ-ক্ষতি মীমাংসা করিয়া করিয়া, ও কর্মজনিত সুফল-লাভে বারংবার মগ্নিত হইয়া, ক্রমে কর্মত্যাগী অথবা সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন।

‘কর্ম’ মানে ‘সেবা’; কর্ম সেবারই নামা-স্তরমাত্র। আমরা যে কর্মই করি না কেন, তাহা হয় মাতাপিতার, না হয় স্বামি-সন্তানের, অথবা তাহা স্বীয়, সন্তানের, প্রভুর, দরিদ্রের, কিংবা স্বদেশের সেবা বাতীত আর কিছুই

নহে। এই সেবাতে অবহেলা করাও বা, আর কতবা কর্মে অবহেলা করাও তাহাই। গীতায় ক্রীষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, “আমার কোন অভাব নাই, তবুও আমি সততই কর্ম করি।” ভগবান্ নিদিপ্ত হইয়াও প্রকৃতির সহিত সংলিপ্ত ও ওতপ্রোত থাকিয়া সতত কর্ম করিতেছেন। এই প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি। বিজ্ঞানও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌরজগৎ একই অজ্ঞাত মহাশক্তির ক্রিয়া বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মি ভিন্ন নহে, তেমনি ভগবান্ ও ভগবানের শক্তি বা প্রকৃতি ভিন্ন নহে। একথা গীতা প্রোভূতি অনেক শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। আমারও ইহা যথার্থ বলিয়াই মনে হয়। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূর্য্যের রশ্মি কত ক্রিয়াই সমাধা করিতেছে!—মহাসাগর ও সমস্ত জলাশয় হইতে বাষ্প উত্তোলন করিয়া মেঘের সৃষ্টি করিতেছে, তাহার দ্বারা পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে, উদ্ভিদ-জগতে ও প্রাণিজগতে নানা বিচিত্র বর্ণের সৃষ্টি করিতেছে! এক কথায়, এই সূর্য্য রশ্মি ওড়, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের প্রাণ হইয়া সর্ব্বদা কর্ম করিতেছে। কিন্তু এই সূর্য্য-রশ্মি কি সূর্য্য হইতে ভিন্ন? কখনই নহে। তেমনি ভগবানের শক্তি বা প্রকৃতি কর্ম করিতেছে বলিলেই ভগবান্ কর্ম করিতেছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়! ষাঁহার কোন অভাব নাই, সেই ভগবান্‌ই যখন সতত কর্ম করিতেছেন, তখন কর্মময়ই জগৎ, কর্মই জগতের নিয়ম, কর্মই জগতের লীলা। কর্ম না করিলে মানবের শারীরিক—মানসিক ও

আধ্যাত্মিক মঙ্গল নাই। জ্ঞান, ভক্তি ও কৰ্ম্মের সামঞ্জস্য-সাধনই মানব-জন্মের সফলতা।

আমরা যেন চিরজীবন জ্ঞানের অর্থাৎ জ্ঞানিবার জন্ত ব্যস্ত হই,—জ্ঞানার অস্ত্র নাই জ্ঞানিবা, এবং জ্ঞানিগণ অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন যেখানে যেন নিরাশ না হই। অনন্ত জ্ঞানজ্যোতির অসীম প্রসার ও ভয়াবহ প্রখরতা নিরীক্ষণ করিয়া আমরা ভীত না হইয়া, অনন্ত জ্ঞানজ্যোতির প্রাপ্ত হইয়া যিনি অধিষ্ঠিত, ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া যেন তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতে পারি। আবার ভক্তিও অনন্ত! পূর্বেই বলিয়াছি, অহেতুকী ভক্তিতে বিগলিত হইয়া কত মহাত্মা কত মহাবাক্য বিনিদ্রা গিয়াছেন। আমরা যেন ভক্তির সরল পথে তাঁহাদেরই অনুগমন করি। তাঁহারা অহেতুকী ভক্তির অসীম ও অতুলসম্পদ সমুদ্রে স্নাত হইয়া কতই না অবাক্ত আনন্দপ্রসাদ, কতই না পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন! আমরা সহস্র সহস্র বিপদ ও শোক-দুঃখ ভগবান্ হইতে প্রাপ্ত হইলেও তাহার কোন গৃঢ় কারণ আছে জানিবা যেন অহেতুকী ভগবদ্ভক্তি হইতে কখনও বিচলিত না হই। পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজন, বা মহাত্ম্যগণের দ্বারা যদি তাঁহাদের অজ্ঞাতে, অলক্ষিতে, বা ঘটনাক্রমে আমরা সংস্র প্রকারে কষ্ট পাই, তবুও যেন, তাঁহারা ইহলোকেই থাকুন, আর পরলোকেই থাকুন, তাঁহাদিগকে অহেতুকী ভক্তি প্রদান করিতে আমরা কখনও বিরত না হই। তাঁরণের কৰ্ম্ম। আমাদের দেশের বহু পূর্বতন

পূজাপাদ আরণ্যক ঋষিগণ, সন্ন্যাসিনীগণ ও মহাত্ম্যগণ প্রভৃতি আমাদের পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভাজন হইলেও তাঁহারা জ্ঞান, ভক্তি ও কৰ্ম্মের সামঞ্জস্য জীবনে দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহারা সাংসারিক-কৰ্ম্ম-ত্যাগী হইয়া পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রাণে দারুণ বেদনা প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু আবার আমাদের এই দেশেরই পূর্বতন পূজাপাদ গৃহস্থ ঋষিগণ ও ভ্রোগদী, কুস্তী, গাঙ্গারী, উভয়ভারতী, যৈত্রেয়ী প্রভৃতি অধ্যানারীগণ, এবং আধুনিক কালের মহাত্মা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ প্রভৃতি পরলোকগত মহাত্ম্যগণ, দেবী অঘোর-কামিনী, কমলকামিনী, রাণী স্বর্ণময়ী কৃষ্ণ, ভাবিনী প্রভৃতি পরলোকগতা মহীয়সী রমণীগণ জীবনে জ্ঞান, ভক্তি ও কৰ্ম্মের সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

গীতাকার যথার্থই বলিয়াছেন যে, কৰ্ম্মই বন্ধন ও মুক্তির কারণ। আসক্তি-পরবশ হইয়া ও ফলের আশা করিয়া যে কৰ্ম্ম করা হয়, তাহাই বন্ধনের কারণ; এবং যাহা আসক্তি বা মোহ-শূন্য হইয়া—সকল কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম পরব্রহ্মের আদেশ জানিয়া-পরব্রহ্মেতেই সমর্পণ করা হয়, তাহাই মুক্তির কারণ হয়। আমরাও যেন গীতার উপদেশ মত সকল কৰ্ম্ম ব্রহ্মের আদেশ জানিয়া, আসক্তিশূন্য হইয়া সকল কৰ্ম্ম তাঁহাকেই সমর্পণ করি। যদি জগতে আমাদেরই কৰ্ম্মের প্রশংসা না থাকে, যদি আমাদেরই কৰ্ম্ম সকলে নগণ্য বলিয়া মনে করেন, যদি আমরা কৰ্ম্ম করিয়াও এ পৃথিবীতে কাহারও চিন্তা আকর্ষণ করিতে না পারি,

তাহা হইলেও আমরা যেন কৰ্ম পরিত্যাগ না করি।

জ্ঞান, ভক্তি ও কৰ্মের কথা, যাহা আলোচিত হইল, তাহার মধ্যে ভক্তির কথায় অনেক বলিতে পারেন, ‘মানব-হৃদয়ের প্রেম, দয়া, মেহ প্রভৃতি সমস্ত সদ্বৃত্তির কথা না বলিয়া কেবল ভক্তির কথাই বলা হইল কেন? এ সমস্ত হৃদয়বৃত্তিগুলিও ত মনুষ্য-চিন্তকে উন্নতির পথে লইয়া যায়!’—তাহার কারণ এই যে, যেমন সমকালীন পুণ্য-কোরকগুলির মধ্যে সূর্য্যভিমুখী কোরকটা অগ্রে প্রস্তুতি হইলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত-

গুলি প্রস্তুতি হয়, তেমনি এক অহেতুকী ভগবদ্ভক্তির বিকাশেই হৃদয়ের সমস্ত সদ্বৃত্তিই ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

সকল মানবেরই জীবনে জ্ঞান, ভক্তি ও কৰ্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কর্তব্য। এই তিনের সামঞ্জস্য-রক্ষাই মানব-জীবনের সফলতা, সার্থকতা ও সারবত্তা। জ্ঞান, ভক্তি ও কৰ্মের যিনি জন্মদাতা, তিনি আমাদের জীবনে এই তিনের সামঞ্জস্য-রক্ষার সহায় হউন, ইহাই তাঁহার কাছে আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীবসন্তকুমারী বহু।

জপজী।

নানকের মহা আরতি।

রাগ ধনত্ৰী—

মহলা ১

অর্থাৎ প্রথম গুরু নানকের উক্তি।—

গগন ভৈ খালু, রবি চন্দ্র দীপক বনৈ,

তারিকা মণ্ডল জনক মোতি।

ধূপ মলয়ানিলো, পবন চউর করে,

সগল বনরায় ফুলন্ত জ্যোতি।

কৈসি আরতি হোই, ভবখণ্ডনা তেরি আরতি
অনহতা শব্দ বাজন্ত ভেরি। ১

গগনরূপ খালে রবি চন্দ্র দীপস্বরূপ হইয়াছে,
এবং তাহাতে তারকারাজি মতির স্থায়

শোভা পাইতেছে।

মলয়-পবন ধূপস্বরূপ হইয়াছে এবং পবন
চামর-বাঞ্জন করিতেছে।

সমস্ত পৃথিবীর ফুটন্ত ফুলরাজি তাঁহার মহিমা

ব্যক্ত করিতেছে।

হে ভবখণ্ডন, তোমার একি মহানু আরতি

হইতেছে!

অনাহত শব্দ ভেরির স্থায় যোগি-হৃদয়ে
বাজিতেছে!

রহাউ

ছেদ

সহস্র তব নয়ন, নন নয়ন হহি তেহিকৈ,

সহস্র মুরতি ননা এক তোহি।

সহস্র পদ বিমল, নন এক পদ,

গন্ধ-বিম্ব, সহস্র তব গন্ধ ইব চলত.মোহি। ২

তোমার সহস্র নয়ন, কিন্তু একটীও তোমার
নয়ন নাই।

সহস্র তোমার মূর্তি, কিন্তু তোমার

কোন মূর্তি নাই!

তোমার সহস্র বিমল পদ, কিন্তু একটাও
তোমার পদ নাই ।

তোমার গন্ধ নাই, কিন্তু তোমারই গন্ধে সমস্ত
জগৎ আমোদিত করিতেছে ।

সত্ত মতি জ্যোতি ৫৫ শোই,
তিসদৈ চানন সত্তমহি চানন হোই ।

গুরু সাক্ষী জ্যোতি পরগট হোই ।

যো তিস্ত ভাবে নু আরতি হোই ॥ ৩

সকল জ্যোতির মধ্যে তোমারই জ্যোতি ।

তোমারই সৌন্দর্য্যে সকল সৌন্দর্য্য ।

গুরুরূপা হইলে সেই জ্যোতির প্রকাশ হয় ।

তিনি যাহাকে রূপা করেন, সেই তাহার

আরতি করিতে পারে । ৩

হরিচরণ-কমল-মকরন্দ লোভিত মনে

অনদিন মোহিয়তি গিয়াস ।

রূপা-জল দেহি নানক সারিংগকৌ

হোই যাতে তেঁরৈ নায বাস ॥ ৪

হরিচরণ-কমল-মকরন্দ-লোভে আমার মন
অনুদিন পিপাসিত ।

হে প্রভু, নানক-মৃগকে রূপাজল প্রদান কর,

যাহাতে তোমার নামেরই মধ্যে আমার চির-

বাস হয় ॥ ৪

ওঁ সত্যনাম কর্তাপুরুষ নির্ভয়
নির্ভয়ের অকালমুর্তি অবোনিমৈভং
গুরু প্রসাদি জপু ।

গুরু নানক প্রথমেরই মস্তোচ্চারণ করিলেন ।

গাংগ্রী যেমন ব্রাহ্মণ-সাধারণের মন্ত্র, সেইরূপ

নানক-পন্থীদের ইহা সাধারণ মন্ত্র । ইহা

ব্যতীত গুরুদত্ত অন্য মন্ত্র সাধক পাইতে

পারেন, কিন্তু ইহা গুরুনানকদত্ত সর্বসাধা-

রণের মন্ত্র । মাছুষ যে-সকল বাক্য সধক

করিয়া ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারে, এই মন্ত্রে

তাহা সম্যক্ প্রকারে আছে । এই মন্ত্র

এরূপ অসাম্প্রদায়িক যে, সকল ধর্ম্মের সহিতই

ইহার ঐক্য রহিয়াছে । কাহারও মতের

সহিত অনৈক্যবশতঃ ইহার অনুদার হইবার

সম্ভাবনা নাই ।

[ওঁ কার—ব্রহ্মের সকল নামের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ নাম । অ, উ, ম-সংযোগে ওঁ কার

শব্দ হইয়াছে ; এই শব্দের অর্থ সৃষ্টিস্থিতি-

প্রলয়-কর্তা ।

“সর্বৈ বেদা যৎপদমামনস্তি, তপাংসি

সর্গাণি চ যমদন্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যাকরন্তি, তন্তে পদং

সংগ্রহেণ ব্রবীম্যামিত্যোতং ।

এতদ্বোবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরম্ ।

এতদ্বোবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি

তস্ত তং ॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্ ।

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥”

—কঠোপনিষৎ ।

অর্থাৎ, সমুদায় বেদ যে পূজনীয়কে

কীৰ্ত্তন করে, সমুদায় তপস্তা যাহাকে ব্যক্ত

করে, যাহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া

ব্রহ্মজ্ঞানার্থিগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন,

তাহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি—তিনি

এই ওঁ কার ।

এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ,

এই অক্ষরকে জ্ঞাত হইয়া যে যাহা ইচ্ছা

করে, তাহা তাহার হয় ।

ব্রহ্ম-প্রাপ্তির জগ্ন এই অবলম্বন শ্রেষ্ঠ,

এই অবলম্বন উচ্চত্তর ; এই অবলম্বনকে

জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন ॥

সত্যনাম—সত্যস্বরূপ ।

কর্তাপুরুষ—সৃষ্টিকর্তা ।

নির্ভয়—ভয়রহিত । তাঁহারই ভয়ে সকলে ভীত ; তিনি সকলের উচ্চ ; কাহা হইতেও তিনি ভীত নহেন ।

“ভয়ান্দ্ৰাগ্নিস্তপতি ভয়ান্তপতি সূর্য্যঃ ।

ভয়ান্দ্ৰিশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥”

কঠোপনিষৎ

ইহার ভয়ে অগ্নি জলিতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য উতাপ দিতেছে, এবং ইহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং মৃত্যু এই পাঁচটা ধাবিত হইতেছে, অর্থাৎ আপন আপন কার্য্য-সম্পাদন করিতেছে ।

নির্ভৈর—বৈররহিত ! কাহারও সহিত তাঁহার শত্রুতা নাই ।

অকালমূর্ত্তি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে যিনি একরূপই থাকেন ।

অযোনিসৈভৎ—জন্মরহিত । যিনি অর্থে কারণ ;—ঐহার উৎপত্তি কোনও কারণ-সাপেক্ষ নহে ; যিনি নিত্য ও অপ্ৰকাশ ।]

অর্থ—“তিনি ওঁকার-পদবাচ্য ; তিনি সত্যস্বরূপ, সৃষ্টিকর্তা ; তিনি ভয়রহিত, বৈররহিত ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে তিনি একরূপই থাকেন ; তিনি জন্মরহিত ।

গুরুপ্রসাদি—সেই পরমাত্মাকে কিরূপে জানা যায় ? উত্তর—গুরু-কৃপায় তাঁহাকে জানা যায় ।

উপনিষদেও বলিতেছেন—

“উত্তীষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাগ্নিবোধত ।”

—হে জীবগণ, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে উত্থান কর, জাগ্রৎ হও, উৎকৃষ্ট আচার্য্যগণের নিকট যাইয়া পরমাত্মাকে জ্ঞাত হও ।

প্রশ্ন—গুরু কৃপা করিয়া কিরূপ উপদেশ দেন ? উত্তর—জপু—অর্থাৎ, সেই সর্বশক্তি-মান পরমেশ্বরের নাম প্রত্যেক স্বাসে স্বাসে জপ কর ।

স্বাসে স্বাসে নাম জপ করিতে পারিলে, কোন সময়ই তাঁহার স্মরণ ব্যতীত বৃথা যায় না । এইরূপ নিরন্তর ভগবদ্ভাবনায় রত থাকিয়া সাধক সিদ্ধ হন ।

প্রশ্ন—যে পরমেশ্বরের নাম জপ করিবার উপদেশ হইল, তাঁহার স্বরূপ কি ?

উত্তর।—আদি সচু, যুগাদি সচু, হৈ ভি সচু । নানক হোসিতি সচু ॥

[আদি সচু—জগতের উৎপত্তির পূর্বে যিনি ছিলেন, তিনি সত্য, অর্থাৎ সজ্জপ পরমেশ্বর । যুগাদি সচু—আবার যখন যুগ আরম্ভ হইল, অর্থাৎ সৃষ্টির আরম্ভ হইল তখন ও তিনি সজ্জপে বর্তমান । হৈভিসচু—যিনি এই সৃষ্টি পালন করিতেছেন, সেই সজ্জপ তিনিই । নানক হোসি ভিসচু—নানক বলিতেছেন, আবার যখন পরমেশ্বর এই সৃষ্টির সংহার করিবেন, তখনও তিনি সজ্জপে বর্তমান থাকিবেন ।]

অর্থ—“সৃষ্টির পূর্বে সেই সত্য-স্বরূপ বিদ্যমান ছিলেন, যুগান্তেও তিনি বিদ্যমান ছিলেন ; এবং বর্তমানেও তিনি বিদ্যমান আছেন । নানক বলিতেছেন, ভবিষ্যতেও তিনি চিরবিদ্যমান থাকিবেন ।”

১

শোচি শোচ ন হোবই যে শোচি লখবার ।

চুপৈ চুপ্য ন হোবই যে লায় রহা লিবতার ।

ভুখা ভুখ ন উত্তরি যে বন্যা পুরিয়া ভার ।
সঙ্গে স্যানপা লখ হোই ত ইক ন চলৈ নাল ।
কিব সচ্যারা হোইটৈ কিব কুড়ে তুটৈ পাল ।
হকম রজাই চলনা নানক লিখিয়া নালি ।

অর্থ—লক্ষ্যবান শরীরকে নির্মূল অর্থাৎ
খোঁজ করিলেও পরমেশ্বরকে লাভ করা যায়
না, মনকে লাগাইয়া মোন হইয়া বসিয়া
থাকিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না । সমস্ত
পৃথিবীর ভোগ্য বস্তুর তার মস্তকে বহন
করিলেও বিষয়-তৃষ্ণা মিটে না । সহস্র চতুরতা
করিলেও, একটাও সঙ্গে যাইবে না ।

কি প্রকারে তবে সত্যকে লাভ করিব ?
কি প্রকারে মিথ্যার বাঁধ পার হইব ? নানক
বলিতেছেন,—সেই পরমেশ্বরের আদেশ
মানিয়া চল, তাঁহাকে প্রীতি কর, তাহা হইলে
তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে ।

[শুচ-ধাতুর অর্থ নির্মূল করা । স্যানাদি-
ঘারা শরীরকে যতই কেন নির্মূল করা হউন
না, তাহাতে মনের মলা দূর হয় না । মনের
মলা দূর না হইলে ভগবানকে লাভ করা
যায় না । চূপ্ শব্দের অর্থ মোন বা স্থির ।
চূপ্যে চূপা ন হোবই—মোন হইয়া
থাকিলেই মন স্থির হয় না । লিব-অর্থে দৃষ্টি ।
লিবভার—অর্থে একদৃষ্টি ! বক বা
বিড়ালের দ্বারা মোন ও একদৃষ্টিতে থাকিলেই
যে তাহাতে মনঃস্থির হইবে, এমন নহে ।
মনের চঞ্চলতা দূর হইলেই, তাহাকে যথার্থ
মোন অবস্থা বলে । পুরিয়া—অর্থে সন্ত-
পুরী । পুরিয়া ভার—সন্তপূরীর ভোগ্যবস্তু ।
ভুখিয়া—বাহার বাসনারূপ ক্ষুধা রহিয়াছে ।
ভুখ ন উত্তরি—ভোগ-বাসনার নিবৃত্তি হয়
না । যে—যাচঞ । বন্যা—বামিয়া রাখে,

অর্থ্য প্রাপ্ত হয় । স্যানপা—চতুরতা । সহস—
অসংখ্য (সহস্র) ; লখ হোই—সহস্র যদি
লক্ষ হইয়া যায় । লখ—অর্থে লক্ষ । তাঁ—
তাহার ; সেই চতুরতার । ইক ন চলৈ
নাল—যত্নাকালে একটাও সঙ্গে যাইবে না ।
কিব—কি প্রকারে ; সচ্যারা—সত্য ।
হোইটৈ—প্রাপ্ত হইব । কুড়ে—মিথ্যা ।
পাল—বাঁধ । তুটৈ—উত্তীর্ণ হইব ।

হুকুম—আদেশ । পরমেশ্বরের আদেশ
স্মৃতি ও শ্রুতিতে নিবদ্ধ । সেই আদেশ বা
গুরুবাক্য মানিয়া চলিতে হইবে ।

রজাই—প্রীতি করা । চলনা—চলিতে
হইবে ।

নানক লিখিয়া নালি—নানক বলিতেছেন,
পরমেশ্বর মানুষের জন্মকালেই লিখিয়া
দিয়াছেন, এই শরীরের চিন্তা করিও না ।
নালি—সঙ্গে ; অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে ।]

গুরু-বাক্যাভ্যাসী স্বাসে স্বাসে ভগবানের
নাম প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করিতে পারিলে,
মিথ্যার বাঁধ কাটিয়া যায়, সত্য লাভ হয় ।
নতুবা অজ্ঞ কোন উপাধ-ঘারা বিষয়বাসনা
দূর হয় না ; পরমেশ্বরকে লাভ করাও
যায় না ।

২

হক্‌মী হোবন অকার, হকম ন কহিয়া বাই ।
হক্‌মী হোবন জীর, হকম মিলে বাড়িয়াই ॥
হক্‌মী উত্তম নীচ, হক্‌মী লিখ ছুঃখ সুখ
পাইয়ছি ।
ইক্‌না হক্‌মী বখসিস, ইক্‌ হক্‌মী সনা ভবাই
অহি ।
হক্‌মে অন্ধর সভকো, বাহর হক্‌ম ন কোই
নানক হক্‌মে যে বুঝে, ত হউ-মে কহৈ ন
কোই ॥

[হুক্মী হোবন অকার—অকার অর্থে সৃষ্টি। তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়। হুকুম অর্থে ইচ্ছা। ইচ্ছাই সেই ভগবানের মায়ী।

“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীরাশ্রয় কিকমুমিবৎ। স ঐক্যত লোকানুসৃজা। সেইমালোকানুসৃজৎ ॥”

হুকুম ন কহিয়া যাই—সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছারূপিনী মায়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না।

এক দিবস অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যমুনা-তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—‘হে ভগবন্! আপনার মায়ী একবার আমাকে দেখান। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন! তুমি জলে ডুব দাও, তাহা হইলেই মায়ী দেখিতে পাইবে। অর্জুন জলে ডুবিরামাত্র দেখিলেন, তিনি পাতালে চলিয়া গিয়াছেন। সেখানকার রাজার মৃত্যু হওয়াতে সকলে তাঁহাকে রাজা করিল। সেখানে তাঁহার রাণী হইল। তিনি রাণীর সহিত বহুকাল আনন্দ উপভোগ করিলেন। তৎপরে রাণীর মৃত্যু হইল। রাণীর মৃত্যুতে শোকে কাতর হইয়া অর্জুন রাণীর সহিত সহমরণে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সহমরণের পূর্বে স্নান করা বিধি, ইহা জানিয়া অর্জুন স্নান করিতে ডুব দিলেন। ডুব হইতে উঠিরামাত্র তিনি দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তখন তাঁহার মায়ী দূর হইয়া গেল। অর্জুন সেই একমুহূর্ত্তমাত্র সময় ডুব দিয়া মায়ী-প্রভাবে শত বৎসরের ঘটনা-সকল ভোগ করিলেন। এইরূপ ভগবানের মায়ার প্রভাব। তাই নানক বলিতেছেন, তাঁহার মায়ার ব্যাখ্যা করা যায় না।

হুক্মী হোবন জীম—তাঁহারই ইচ্ছায় জীবের উৎপত্তি।

হুক্মী মিলৈ বড়িয়াই—বড়িয়াই অর্থে ঘণা। তাঁহারাই ইচ্ছায় মানুষ বশোভাভ করে।

হুক্মী উত্তম নীচ—তাঁহারই ইচ্ছায় কেহ বা উত্তম কেহ বা নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

হুক্মী লিখ দুঃখ সুখ পাইয়ছি—তাঁহারই ইচ্ছায় মানুষের কপালে লেখা হয় এবং সেই অনুসারে মানুষ দুঃখ বা সুখ পায়।

ইকনা হুক্মী বখসিস—ইকনা অর্থাৎ কাহাকেও। হুক্মী—তাঁহার ইচ্ছায়। বখসিস—পুরস্কার। অর্থাৎ কাহাকেও সাংসারিক সুখ দেন। পুরস্কার অর্থে—প্রাক্তন, বা পূর্ন-কর্মের ফল।

ইক হুক্মী সদা ভবাইয়ছি—ইক অর্থাৎ কাহাকেও। হুক্মী, তাঁহার ইচ্ছায়। সদা—সতত। ভবাইয়ছি—সংসারে আসা যাওয়া করিতে হইতেছে।

হুকুম অনর সভকোই—সকল মানুষই তাঁহার ইচ্ছায় অধীন।

“ন প্রাণেন পণেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন।

ইতরেন তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতো ॥”

বাহর হুকুম ন কোই—তাঁহার ইচ্ছা কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

নানক হুকুম যে বুঝে—নানক বলিতেছেন যে, সাধক বুঝিয়াছে যে সকলই ভগবদ্-ইচ্ছায় হইয়া থাকে, মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না।

ত হউমে কই ন কোই—হউ—অহংকার। সে আর অহংকারের কোন কথা

বলে না। অর্থাৎ তাহার আর “আমি করিতেছি”—এই জ্ঞান থাকে না। সে জানে, বাহ্য কিছু হইতেছে, সকলই ভগবদ্ভিচ্ছায় হইতেছে। “আমি”, “আমার” ইত্যাকার জ্ঞানই “অহঙ্কার।”]

অর্থ—ভগবানেরই ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়। তাঁহার সেই ইচ্ছাক্রপণী মায়ায় স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁহারই ইচ্ছায় জীবের উৎপত্তি, তাঁহারই ইচ্ছায় মানুষ মহত্ত্ব লাভ করে। তাঁহারই ইচ্ছায় কেহ বা উত্তম কেহ বা নীচ-ধোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারই ইচ্ছায় মানুষের কপালের লেখা হয়, এবং সেই অনুসারে মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কেহ বা তাঁহার ইচ্ছায় সাংসারিক সুখ লাভ করে, আবার কেহ বা তাঁহার বিধানে সংসারে আসা যাওয়া করিতে থাকে। সকল মানুষই তাঁহার ইচ্ছায় অধীন। তাঁহার বিধান কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। নানক বলিতেছেন যে, সাধক বুঝিয়াছে যে সকলই ভগবদ্ভিচ্ছায় হইয়া থাকে, মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না; সে আর ‘আমি করিতেছি’ বলিয়া অহঙ্কারের কথা কিছু বলেন না।

গাঠে কো তান, হো বৈ য়ি সৈ তান ।

গাঠে কো দাত, জাটনে নিশান ॥

গাঠে কো গুণ বড়াইয়া চার ।

গাঠে কো বিদ্যা বিষম বিচার ॥

গাঠে কো সাক কঠের তন খেহ ।

গাঠে কো জীয় লৈ কিয় দেহ ॥

গাঠে কো জাটপ দিলৈ দূর ।

গাঠে কো বে খৈ হাদরা হুহর ॥

কখন কখন আঠে তোটি ।

কথি কথি কথি কোটি কোটি কোটি ॥

দেদা দে লৈদে খকি পাহি ।

যুগ যুগান্তর খাহি খাহি ।

হুকমি হুকম চলায়ে রাহ ।

নানক বিগসৈ বে পর বাহ ॥৩॥

গাঠে কো তান।—প্রশ্ন—কে তাঁহার মহিমা বিস্তার করিয়া গাহিতে পারে? কো—কে। তান—বিস্তার করিয়া গান করা। গাঠে—গান করিতে পারে। হো বৈ য়ি সৈ তান—উত্তর—(এখানে ‘তান’ অর্থে বিশাল বুদ্ধি) যে পুরুষের বিশাল বুদ্ধি, সেই তাঁহার শক্তির মহিমা বিস্তার করিয়া গাহিতে পারে। য়িসৈ—বাহার। হোবৈ—হয়। ভগবানের মহিমা গান নারদ প্রহ্লাদ প্রভৃতি করিয়াছিলেন।

গাঠে কো—আর কে তাঁহার গান করিতে পারে? দাত জাটনে নিশান—যে সেই পরমেশ্বরের ‘দাত’ অর্থাৎ ‘দানের’ চিহ্ন পাইয়াছে;। জোপদী ও কুস্তী যখনই বিপদে পড়িয়াছেন, স্মৃতিশ্রুতিতে ভগবানের স্মরণ লইয়াছেন, ভগবান তখনই উপস্থিত হইয়া অভয়দান করিয়াছেন। যে জীবনে এই দান ধরিতে পারিয়াছে, সেই তাঁহার মহিমা গান করিতে পারে। গাঠে কো গুণ বড়াইয়া—সেই পরমেশ্বরের গুণ এবং বশ কে গান করিতে পারে?

চার—উত্তর হইল,—চারি বেদ তাঁহার গুণগান করিতেছে।

গাঠে কো বিদ্যা—সেই পরমেশ্বরের তত্ত্ব কে বর্ণনা করিতে পারে? বিদ্যা অর্থে তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপ।

বিষয় বিচার—উত্তর—সেই পরমেশ্বরের স্বরূপের বিচার করা অত্যন্ত ‘বিষম’ অর্থাৎ কঠিন। যথা—“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।” উপনিষৎ।

গাঠৈ ক্লো সাজ কঠৈ তন খেহ—যে পরমেশ্বর এই শরীরকে সাজাইয়া সৃষ্টি করেন, আবার ইহাকে ভাঙ্গে পরিণত করেন, তাঁহার গুণ কে গান করিতে পারে?

তন—শরীর; সাজ—সাজাইয়া; কঠৈ—করেন; খেহ—ভাঙে।

গাঠৈ কো জীৱ লৈ ফির দেহ—যে পরমেশ্বর জীবনকে লইয়া আবার ফিরাইয়া দেন, সেই পরমেশ্বরের গুণ কে গান করিতে পারে? লৈ—লইয়া; ফির দেহ—ফিরাইয়া দেন।

গাঠৈ কো জাটৈ—সেই পরমেশ্বরের গুণ কে গান করিতে পারে; আর, কে তাঁহার জপ করিতে পারে? দিগৈ দূর—যে তাঁহাকে দূরে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদিতে দেখে।

গাঠৈ কো—আর কে তাঁহার গান করে? বৈধৈ হাদরা হাদুর—যে নিষ্কাম ভক্ত তাঁহাকে “হাদরা হাদুর” অর্থাৎ সর্বস্থানে দেখিতে পায়। “হাদরা হাদুর” অর্থে ‘হৃদয়-মধ্যে’ও বলা যাইতে পারে।

কথ না কথি ন আটৈ তোট—“তোট অর্থে অন্ত”। তাঁহার কথা বেদ, পুরাণ প্রভৃতি এবং ভক্তগণ কত বলিতেছেন কিন্তু তাঁহার কথার অন্ত নাই।

কথি কথি কথি কোটি কোটি কোটি—কোটি কোটি বার তাঁহার কথা বলিলেও তাহার শেষ হয় না। অসংখ্য ঋষি মুনি তাঁহার গান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কথার অন্ত নাই।

দে দাদে লৈ দে থক পাহি—তাঁহার দান অনবরত দিতেছেন; লৈ দে—মাহুষ লইতেছে; থক পাহি—লইতে লইতে ক্লান্ত হইতেছে।

যুগ যুগান্তর থাহি থাহি—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া, অর্থাৎ কত কত জন্মে ভগবানের দত্ত অন্ন মাহুষ ভোজন করিতেছে। এক দিনের জন্ত আমরা ভাবিয়া আকুল হই, কি প্রকারে অন্ন-সংস্থান হইবে; কিন্তু অসংখ্য জীবের জন্মে জন্মে সেই পরমেশ্বরই আহার যোগাইতেছেন।

হুক্মী হুক্ম চলায় রাহ—হুক্মী অর্থাৎ ঈশ্বর হুক্মে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, সেই পরমেশ্বরের হুক্ম—আজ্ঞা; চলায়—চলাইতেছে; রাহ—রাস্তা; অর্থাৎ তাঁহারই আদেশে জীব নিজ নিজ পথে চলিতেছে।

নানক বিগটৈ যে পরবাহ—নানক বলিতেছেন, সেই পরমেশ্বর বিগটৈ—প্রসন্ন হইয়া রহিয়াছেন; বে পরবাহ—কারণ-সাপেক্ষ নহে। অর্থাৎ সেই পরমাত্মা আনন্দময় পুরুষ; কিন্তু তাঁহার আনন্দ কোন কারণ হইতে উৎপন্ন নহে। যথা,

“আনন্দাঙ্কোব খরিমানি ভূতানি জায়ন্তে,

ইত্যাদি। উপনিষৎ]

অর্থ :—সেই তাঁহার মহিমা বিস্তার করিয়া গাহিতে পারে, যে পুরুষের বিশাল বুদ্ধি আছে। তাঁহার দয়ার মহিমা সেই গান করিতে পারে, যে তাঁহার দানের চিত্র বুঝিতে পারিয়াছে। চারি বেদ তাঁহার গুণ এবং যশোগান করিতেছে! কেহ বা কঠিন ব্রহ্ম-বিদ্যার বিচার করিয়া গাহিতেছে। কেহ বা গাহিতেছে, ভগবান্ এই শরীরকে সৃষ্টি

করেন আবার ইহাকে ভ্রমে পরিণত করেন।
কেহ বা গাহিতেছে, ভগবান্ মৃতকে আবার
বাঁচাইতেছেন। কেহ বা গাহিতেছে, ভগবান্
বৈকুণ্ঠে আছেন; তাঁহার নাম জপ করিতে
হয়। কেহ বা গাহিতেছে, তিনি হৃদয়ের
মধ্যে দর্শন দিতেছেন। তাঁহার কথা বলিয়া
শেষ হয় না, যদি কোটি কোটি বারও বলা
যায়। তিনি দিতেছেন, মানুষ লইতেছে;
তিনি এত দিতেছেন যে মানুষ গ্রহণ করিতে
করিতে পরিশ্রান্ত হইতেছে; যুগযুগান্তর
ধরিয়া অর্থাৎ কত কত জন্ম মানুষ তাঁহার দত্ত
অন্ন খাইতেছে; যাহার আদেশে ব্রহ্মাণ্ড
চলিতেছে, তাঁহারই আদেশে জীব নিজ নিজ
পথে যাইতেছে। নানক বলিতেছেন, সেই
পরমাত্মা আনন্দময়, কিন্তু তাঁহার আনন্দ
কারণ-সাপেক্ষ নহে।

৪

সাতা সাহিব, সাতা নাউ, ভাঘা ভাউ অপার।
আখহি মগহি বেহি দেহি, দাতি করে দাতার ॥
ফের কি অগ্গে রাখিয়ে ষি়ু দিশে দরবার ?
মুহো কি বোলন বোলিঠৈ, যি তু শুনি ধরে
প্যার ?

অমৃত বেলা সচ নাউ, বড্যাই বিচার।

করমি আটৈ কপড়া নদরি মোখ-দুয়ার।

নানক, এবে জানিঠৈ সত আপে সচয়ার ॥৩॥

সাতা—সরূপ; সাহিব—প্রভু; সাতা—
সত্য; নাউ—তাঁহার নাম; ভাঘা—কত
কত ভাষায়; ভাউ—প্রেম দেখাইতেছে;
অপার—কত প্রকারে। আখহি—কতপ্রকার
নামে তাঁহাকে ডাকিতেছে; মগহি দেহি দেহি
—কত কত লোক “নাও, দাও” বলিয়া
তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছে। দাতি করে

দাতার—সেই মহান্ দাতা, দান করিতেছেন।
ফের—ডেঁট অর্থাৎ পূজা; অগ্গে—তাঁহার
সম্মুখে; কি রাখিয়ে—কি রাখিব? যি তু—
যাহাতে; দরবার—তাঁহার স্থান; দিশে—
দর্শন পথে আসে। আর যদি দর্শন পাই, তবে
সেই প্রভুর সম্মুখে কি বলিব? মুহো—মুখে;
কি বোলন—কি প্রকার স্তুতিবাণী, বোলিঠৈ
বলা উচিত; যি তু—যাহা; শুনি—ভগবান্
শুনিয়া; করে প্যার—কৃপা-দৃষ্টি করেন। শেষে
প্রশ্নের উত্তর হইল—অমৃত বেলা—ব্রহ্ম-
মূর্ত্তে উঠিয়া; স চ নাউ—সেই সত্যনাম
অর্থাৎ গুরুদত্ত মন্ত্র জপ কর। বড্যাই বিচার—
এবং সেই মহান্ ভাবের আলোচনা কর।

করমি—বহুজন্মের কর্মফল; আটৈ কপড়া
—কপড়া—“দেহ”; অর্থাৎ মনুষ্য-দেহ
পাইয়াছে; নদরি—এখন তাঁহার কৃপাদৃষ্টি
লাভ করিয়া; মোখ-দুয়ার—মোক্শের দ্বারে
অগ্রসর হও। নানক—নানক বলিতেছেন;
এবে জানিঠৈ—হে মানব, এখন জানিতে
শিক্ষা কর; সত আপে সচয়ার—সকল
কার্য্যই আপনি সেই পরমেশ্বর করাইতেছেন,
মানুষের কোনও সাধার্ম্য নাই।]

অর্থ:—তিনি সত্যস্বরূপ, তাঁহার নাম
সত্য; তাঁহার ভাষায় অপার প্রেম। মানুষ
কত প্রকার নামে তাঁহাকে ডাকিতেছে, কত
প্রার্থনা করিতেছে, আর সেই মহান্ দাতা দান
করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে কি পূজা
রাখিব, যাহাতে তাঁহার দর্শনপথে আসে?
মুখে তাঁহার কি প্রকার স্তুতিবাণী বলিব,
যাহাতে প্রভু কৃপাদৃষ্টি করেন? হে সাধক!
ব্রহ্মমূর্ত্তে সেই গুরুদত্ত নাম জপ কর, আর
তাঁহার মহিমার বিচার কর। বহু জন্মের

কৰ্মফলে এই দেহ পাইয়াছ, এখন তাঁহার
কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া মোক্ষ-দ্বারে অগ্রসর
হও। নানক বলিতেছেন, এখন জানিতে
শিক্ষা কর, সকল কার্যাই ভগবান্ করাইতে-
ছেন, মানুষের কোনই হাত নাই।

• ৫

থাপিয়া ন যাই, কিতা ন হোই।
আপে আপি নিরঞ্জন সোই ॥
যিন সেবিয়া তিন পাইয়া মান।
নানক গাবিঠৈ গুণী নিধান।
গাবিঠৈ শুনিঠৈ মন রাখিঠৈ ভাউ।
দুঃখ পরহর সূখ বরলৈ যাই।
গুরুমুখ নাদং গুরুমুখ বেদং।
গুরুমুখ রহিয়া সমাই ॥
গুরু ঈশ্বর গুরু গোরখ বরমা।
গুরু পার্বেতী মাই ॥
যে হৌ জানা, আখা নাহি।
কহ না কখন ন যাই।
গুরু হক দেহি বুঝাই।
সভন জীয়া কা ইক দাতা।
সো মৈ বিসরি ন যাই ॥

[থাপিয়া = স্থাপন ; ন যাই = করা যায়
না। তাঁহাকে কেহ স্থাপন করিতে পারে না,
অর্থাৎ তিনি কাহারও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহেন।
কিতা—সৃষ্ট; ন হোই—হন্ না; অর্থাৎ
তিনি কাহারও দ্বারা সৃষ্ট নহেন। আপে আপ
—আপনিই আপনার মহিমাতে অবস্থিত।
নিরঞ্জন—অজ্ঞান অর্থে মলা বা অজ্ঞান;
অজ্ঞানরূপ-মলা-রহিত যিনি, তিনি নিরঞ্জন
পুরুষ। যথা—

“ন তস্ত কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে, নচেন্দিভা
নৈব চ তস্ত লিঙ্গম্।”

তাঁহার কোন স্বামী নাই, কেহ তাঁহার
প্রেমক নহে, তাঁহার কোন চিহ্ন বা শরীর
নাই। ‘নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং
নিরঞ্জনম্।’—তিনি নিরবয়ব, ক্রিয়ারহিত,
শাস্তরূপ, উৎপত্তি-নাশ-রহিত, এবং অবিদ্যা-
রূপ-মলরহিত।

যিন সেব্যা—যে ব্যক্তি তাঁহার উপাসনা
করিয়াছে; তিন পায়া মান—সেই সম্মান
পাইয়াছে। নানক—নানক বলিতেছেন।
গাবিঠৈ—গুণগান করা কর্তব্য; শুনিঠৈ—
শ্রবণ করা কর্তব্য; মন রাখিঠৈ ভাউ—ভাউ
অর্থাৎ ভাব বা প্রেম, মনে রক্ষা করা কর্তব্য।
ভগবানের প্রতি প্রেম রাখিলে কি হয়, তাহাই
বলিতেছেন। দুঃখ—ত্রিভাপ অর্থাৎ আধ্যা-
ত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ;
পরহর—পরিহার করিয়া, এড়াইয়া; সূখ—
শাস্তিমুখ; বর—অন্তঃকরণরূপঘরে; লৈয়াই
—উপস্থিত হয়।

প্রশ্ন—সেই ভগবৎ-প্রেম কিপ্রকারে লাভ
হয়?

উত্তর—গুরুর উপদেশ মানিয়া চলিলেই
ভগবৎপ্রেম লাভ হয়। গুরুমুখ—গুরুবাক্য;
নাদং—ওঁকার-শব্দ; বেদং—গুরুবাক্যই
বেদ; রহা সমাই—সমাধি; গুরু ঈশ্বর—
গুরুই শিব; গোরখ—বিষ্ণু (গো অর্থাৎ
পৃথিবীকে যিনি পালন করেন); মাই—মাতা;
অথবা মা—লক্ষ্মী; ই—সরস্বতী। যে হৌ
জানা আখা—যত কিছু নাম জানি আছে,
সকলই তাঁহাতে সাজে। নাহি কহ না—তথাপি
তাঁহার বিষয় বলা যায় না। গুরা—হে গুরু;
ইক দেহি বুঝাই—সকলই যে এক পরমেশ্বর,
এই জ্ঞান দাও। সভনা জীয়াকা ইক দাতা

—সকল জীবের প্রতিপালক এক তিনিই ;
সো মৈ বিসরি ন যাই—তঁাহাকে আমি যেন
ক্ষণমাত্র ভুলিয়া না থাকি।

অর্থ:—“সেই ভগবান্ কাহারও দ্বারা
প্রতিষ্ঠিত নহেন; তিনি কাহারও দ্বারা সৃষ্ট
নহেন। সেই নিম্নলি দেবতা আপনিই
আপনার মহিমাতে অবস্থিত। যে সাধক
তঁাহার উপাসনা করে, সেই সম্মানিত হয়।
নানক বলিতেছেন, সেই গুণনিধান পুরুষের
গান করা কর্তব্য, তঁাহার কীৰ্ত্তন করা কর্তব্য ;
তঁাহার গুণগান শ্রবণ করা কর্তব্য ; তঁাহার
প্রতি প্রেম রাখা কর্তব্য ; তঁাহার প্রতি প্রেম
করিলে ত্রিভাপ দূর হয়, অন্তঃকরণে শান্তি
বিবাজ করে। গুরুদত্ত মন্তাই বাণী, তাহাই
বেদ, তাহাই সমাধি ; গুরুই শিব, গুরুই
বিষ্ণু, গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই পার্শ্বতী, গুরুই লক্ষী,
গুরুই সরস্বতী। যত কিছু নাম জানা আছে,
সকলই তাহাতে সাজে, তথাপি তঁাহার বিষয়
বলা শেষ হয় না ; কারণ, তিনি অব্যক্ত
পুরুষ। হে গুরো, সফল হই যে এক, এই জ্ঞান
দাও ; সকল জীবের যে এক প্রতিপালক,
তঁাহাকে যেন ক্ষণমাত্র ভুলিয়া না থাকি।”

৬

তীর্থ নাবা, যে তিস ভাবী, বিন ভানে কি
নাই করি।
যেতি সিরটি উপাই বেখা, বিন্ কর্মা কি
মিলৈ, লই।
মতি বিচি রত্ন জবাহর মাণিক, যে ইক গুরুকি
শিখ গুনি।
গুরা ইক দেহি বুঝাই,
সভনা জীয়াকা ইক দাতা, সো মৈ বিসরি ন
যাই ॥

[তীর্থ নাবা—তাহাই প্রকৃত তীর্থ-জ্ঞান ;
যে তিস ভাবী—যদি তঁাহাকে প্রীতি করি।
বিন ভানে—যদি তঁাহাকে প্রীতি করিতে না
পারি ; কি নাই করি—তীর্থজ্ঞান করিয়া তবে
কি ফল ? যেতি সিরটি উপাই বেখা—যত
সৃষ্ট বস্তু দেখিতেছি ; বিন্ কর্মা কি মিলৈ—
কৰ্মফল বিনা কি তাহার সহিত সংযোগ হয় ?
লৈ—তবে আমি তাহা পুনঃপ্রাপ্তির জন্ত কেন
কৰ্মফল আবার সঞ্চয় করিব ? মতি বিচি—
জীবের বুদ্ধিরূপ প্রকোষ্ঠে ; রত্ন জবাহর
মাণিক—কত রত্ন জমাহির মাণিক দৃষ্ট হয়।
যে ইক গুরু কি শিখ গুনি—যদি এক গুরুর
উপদেশ গুনিয়া সাধক চলে। গুরা ইক দেহি
বুঝাই—হে গুরো, সেই এক অখণ্ড জ্ঞান
প্রদান কর। সভনা জীয়াকা ইক দাতা, সো
মৈ বিসরি ন যাই—সকল জীবের যিনি এক
প্রতিপালক, তঁাহাকে যেন ক্ষণমাত্র ভুলিয়া
না থাকি।]

অর্থ:—“যদি ভগবানের উপর প্রীতি
করিতে পারি, তাহাই প্রকৃত তীর্থজ্ঞান ;
তঁাহাকে প্রীতি করিতে না পারিলে তীর্থজ্ঞানে
কি ফল ? যত সৃষ্ট বস্তু দেখিতেছি, কৰ্মফল
বিনা কি তাহার সহিত সংযোগ হয় ? তবে
আমি তাহার পুনঃপ্রাপ্তির জন্ত কেন কৰ্মফল
আবার সঞ্চয় করিব ? এই জন্ম-মধ্যে কত
রত্ন, জমাহির, মাণিক দেখিতে পাওয়া যায়,
যদি সাধক গুরুর উপদেশ মানিয়া চলে। হে
গুরো, সেই এক অখণ্ড জ্ঞান প্রদান কর।
সকল জীবের যে এক প্রতিপালক, তঁাহাকে
যেন আমি ক্ষণমাত্র ভুলিয়া না থাকি।”

(ক্রমশঃ)

ত্রিজ্ঞানেজ্জমোহন দত্ত।

কাংড়া-পথে ।

এই আমার হাতে খড়ি, ইহার পূর্বে আমি কখনও কিছু লিখি নাই। ভগবান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কত সূক্ষ্মর করিয়া আশ্চর্য্য বিচিত্র নয়নমুগ্ধকর কারুকার্য্য-দ্বারা চিত্রিত করিয়া তাঁহার শিল্প দক্ষতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়া, সে বিষয়ে অল্প কিছু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠিকাভগিনীগণ এই লেখায় যে ক্রটি লক্ষিত হইবে, তাহা দয়া করিয়া মার্জনা করিবেন।

এবার ঐশ্বরের ছুটিতে লাহোর হইতে কিছু দূরে অবস্থিত কাংড়া-নামক পাহাড়ে বেড়াইতে যাইব ঠিক করিলাম। “শুভশ্রু শীঘ্রঃ,” এই বাক্যের অহুসরণ করিয়া চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই আমরা কাংড়া-যাইবার অগ্র প্রস্তুত হইলাম।

মঙ্গলবার রাত্রি ৯টার ট্রেণে যাত্রা করিলাম; সঙ্গে সামান্য কিছু জিনিষ-পত্র ও একটি পাহাড়ী চাকর। ট্রেণে উঠিয়া দেখি আমাদের পার্শ্বের কামরায় একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী ও তিনটা ছেলেমেয়ে লইয়া উঠিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহারা এখন পাঠানকোটে যাইতেছেন এবং তথা হইতে কুল্লুর নিকটবর্তী মণ্ডিনাশক কক্ষস্থানে যাইবেন। ভগবানের রূপায় বেশ সঙ্গী জুটিল।

বাটা হইতে সে রাত্রির আহার সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছিলাম, সেজন্ত ট্রেন ছাড়িলে শয্যা বিছাইয়া শয়ন করিলাম। ট্রেন ভোর চারিটার সময় পাঠানকোট-নামক ষ্টেশনে

আমাদিগকে পৌছাইয়া দিল। তখনও আকাশ অন্ধকার। প্রভাতের আলোক দেখা দিতে বিলম্ব আছে দেখিয়া ‘ওয়েটিং রুম’ গিয়া বসিলাম। সকাল হইবামাত্র অথবানের অস্থেধণে বাহির হইলাম, কিন্তু সে-দিন একখানিও গাড়ী পাওয়া যাইল না, এবং পাওয়া যাইবেও না, জানিলাম।

অনেক গুরা সৈন্ত অসুস্থতা-বশতঃ ডাল-হাউসী (Dalhousie) পক্ষিতে যাইতেছে, সে-জন্ত টম্‌টমও পাওয়া গেল না। গুরাসৈন্তেরা যে টম্‌টমে গিয়াছে, সেই টম্‌টম ফিরিয়া আসিলে তবে আমরা যাইতে পাইব। অগত্যা শেষকালে বাধ্য হইয়া সেখানকার ধরমশালায় আশ্রয় লইতে হইল। ধরমশালাটিও ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। অনন্তোপায় হইয়া পদব্রজেই চলিলাম; সঙ্গে কুলিরা জিনিষ পত্র লইয়া চলিল। টম্‌টম বা অগ্র গাড়ী না পাওয়ায় চারিদিন পাঠানকোটে ধরমশালায় থাকিতে হইল।

পাঠানকোটে যে চারিদিন ছিলাম, আমাদের বেশ আনন্দে দিন কাটিয়াছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই পাঞ্জাবী সঙ্গীদের লইয়া সকলে একত্র হইয়া বেড়াইতে যাইতাম, এবং সকলে এক সঙ্গেই প্রায় এক মাইল দূরে স্নান করিতে যািতাম। বিদেশে এহঁ বিদেশী বন্ধুদের পাইয়া দিনগুলি বেশ সুখেই কাটিয়া যাইল। পাঞ্জাবী সঙ্গিগণ ঐকদিন পূর্বে চলিয়া গেলেন। তৎপরেদিন সন্ধ্যাবেলায় দুইটি টম্‌টম পাইলাম এবং তাগতে আরোহণ করিয়া আমরা কাংড়া-অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

টম্‌টমগুলি অতিপুরাকালের; গদিগুলি জীর্ণ, তালি দেওয়া; গাড়ীর চারি কোণে চারিটি সৰু বাঁশের খুঁটি বাঁধিয়া তাহার উপর একখণ্ড পুরাতন oilcloth (অয়েল ক্লথ) দিয়া গাড়ীর মস্তকের আচ্ছাদন করা হইয়াছে। ঘোড়া-গুলিরও অবস্থা সেইরূপ; তাহারা যেন স্বয়ং অশ্বিনী-নন্দন! একটি গাড়ীতে দুই জনের বেশী লোক ধরে না। একটিতে চাকর ও মালপত্র বোঝাই করিয়া, আর একটিতে আপনি উঠিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া রওনা হইলাম।

পাঠানকোট হইতে কাংড়া ৫৬ মাইল দূর। মাঝে মাঝে ১২।১৪ মাইল অন্তর একটি করিয়া ‘পাড়াও’ অর্থাৎ চটি আছে। উপরের পাহাড় হইতে দরিদ্র ও ভদ্রলোকদিগের সৰ্ব্বদা যাওয়া আসার সুবিধার ও আরামের নিমিত্ত পরিকার, পরিচ্ছন্ন দুই একটি করিয়া দ্বিতল বাড়ী ও তাহার নিকট দুই একটি খাবারের দোকান ও জলপানের জন্য একটি করিয়া কূপ আছে। ইহারই নাম পাড়াও।

পাঠানকোট হইতে ১৭ মাইল দূরে “সুরপুর” নামক একটি বড় পাড়াও বা চটি আছে। পাঠানকোট হইতে “সুরপুর” পর্য্যন্ত সমতল ক্ষেত্র; তৎপরে “সুরপুর” হইতে কাংড়া যাইতে হইলে ক্রমশঃ পাহাড়ে উঠিতে হয়। সুরপুরে একটি পুরাতন কেল্লা আছে, কিন্তু সেটা সমস্তই ভয়প্রায়। আমরা সন্ধ্যার সময় “সুরপুর” পৌছিলাম। সঙ্গে রাজির খাবার প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলাম। টম্‌টম হইতে নামিয়া একটি পোড়ো ঘরে বসিয়া আহার সমাপ্ত করিয়া পুনরায় টম্‌টমে উঠিয়া বসিলাম। অশ্চালক ঘোড়ার মুখ ধরিয়া গাড়ী টানিয়া

লইয়া চলিল; কারণ, এখানকার চড়াই অত্যন্ত সঙ্কটজনক।

কিছুদূর যাইতে না যাইতে আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা দিল, আমরা প্রথমে সে দিকে বড় লক্ষ্য করিলাম না। ঝাড়ী চলিতেই লাগিল। ক্রমশঃ মেঘে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হঠাৎ পশ্চিমাংশে ঘনদূতাকৃতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একখণ্ড মেঘ উদ্ভিত হইল; তাহা দেখিয়া প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আকাশ ক্রমশঃ ঘনঘটার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কাইতে লাগিল; পথে জনমানবের চিহ্ন নাই, সাড়া-নাই, শব্দ নাই; আকাশ ঘোর অন্ধকার! আর শন শন শব্দে ঝড় বহিতেছে! কেবল আমাদের দুইখানি গাড়ী সেই প্রলয়কাণ্ডের মধ্য দিয়া চলিয়াছে।

অস্বপ্ন যলিত হইলেই নীচে খাদে পড়িবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী।—শকট-চালক বেগতিক দেখিয়া আমাদের এক সখামাত্র চটিতে নামাইয়া দিল। চটিতে নামিয়া দেখি, জনকয়েক লোক নিদ্রা যাইতেছে। তাহাদের জাগাইয়া অতিকটে দুইখানি খাটিয়া জোঁগাড় করিয়া শয়ন করিলাম। আকাশ হইতে প্রবলবেগে বারিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। অতিকটে সে রাজির অবসান হইল। প্রভাতে আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইল, এমন কি শেষে রোদও উঠিল।

পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া আমরা চলিলাম; তখন প্রকৃতিদেবী কি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছেন! ছোট ছোট ঝাক্‌ড়া ঝাক্‌ড়া গাছগুলির পাতা হইতে টোপে টোপে বৃষ্টির জল করিয়া পড়িতেছে, পাহাড়ের গা বহিয়া

নানাহান হইতে বরণার গ্রাম নালা বাহির হইয়া ছ-শবে জল নীচের দিকে বহিয়া যাইতেছে! আকাশ পরিষ্কার দেখিয়া নানা রং-বেরংয়ের পাখীর দল আনন্দের সঙ্গে কলরব করিতেছে! এই দৃশ্য কি চমৎকার! পাহাড়ের থাকিতে থাকিতে, আমরা এই পাহাড় প্রদেশের আর একটা বৈচিত্র্য দেখিয়াছি।—কোথাও কিছু নাই, দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যাইল, চারিদিক অন্ধকার করিয়া তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল; দশ-পনের মিনিট পরেই সব পরিষ্কার; আর প্রলয়ের চিহ্নমাত্র নাই! এই বৃষ্টি, এই রোদ্র! আমাদের বাঙ্গালদেশে এমনতর দেখা যায় না।

বেলা প্রায় ১০টার সময় “কোটলা”-নামক একটা বড় পাড়াগুতে পৌঁছলাম। সেখানে দুই এবং অল্প কিছু জলযোগ করিয়া পুনরায় গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। অল্প দূর যাইয়া একটা বৃহৎ সেতু পার হইতে হইল, সেতুর নিম্নে চাহিয়া দেখি, একটা প্রকাণ্ড কায়ানদী আঁকা-বাঁকা দেহে অতিদ্রুত গতিতে ভীষণ শব্দ করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছে। নদীটা দেখিয়া আমার এই সঙ্গীতটা মনে পড়িল—

“নির্মলসলিলে বহিছ সদা

তটসালিনি স্নন্দরি যখনে!”

গানটা গাহিতে গাহিতে চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, আমাদের গাড়ীর অগ্রে অনেকগুলি গাড়ী যাইতেছে। অপ্রশস্ত পথ বলিয়া গাড়ীগুলির এক লাইনে চলা অসম্ভব; এজন্য গাড়ীগুলি ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। বৃক্ষলতাপূর্ণ পার্বণময় পথে

চলিতে চলিতে উর্দ্ধশানে চাহিয়া দেখি, অগ্র-গামী অশ্বগণ ক্রমেই খর্বকায় ধারণ করিয়াছে; ঠিক যেন মনে হইতেছিল, ছেলেখেলার পুতলিকার গাড়ী চলিয়াছে!

অশ্বগণ কোথাও সমতলভূমি পাইলে সানন্দে ছুটিয়া চলে, চড়াইয়ের স্থানে বা অসম-তল ভূমিতে বেগ মন্দীভূত করে। এইরূপে চারি পাঁচ ঘণ্টা চলিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমরা সাপুর-নামক আর একটা পাড়াগুতে পৌঁছলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া একটা দেশী হোটেলে বসিয়া গরম গরম রুটি, ভাল ও একটা তরকারী দিয়া খুব তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিলাম এবং অদূরে একটা ক্ষুদ্র বরণা হইতে জল আনাইয়া পান করিয়া আবার গাড়ীতে আরোহণ করিলাম।

সাপুর হইতে কাংড়া ১২ মাইল। এখান হইতে কাংড়া যাইবার পথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতিমনোহর! আমরা যে সময় যাইতেছিলাম, তখন ঠিক গরম পড়ে নাই; বসন্ত কালের হাওয়া তখনও আছে। পথে দুই পার্শ্বে আশ্রুবৃক্ষ; বৃক্ষসকলের ফলগুলিতে তখন পক হইবার জন্ম রং ধরিয়াছে; সেই পকফল-সংবলিত বৃক্ষশাখায় নানাপ্রকার বিচিত্রবর্ণের বিহঙ্গগণ স্রমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত করিতেছে। কোথাও বা পাপিয়া তাহার পিউ পিউ স্বরে পথিকের মন হরণ করিতেছে, কোথাও বা বুলবুল তাহার স্বভাবমধুর স্বরে সেই পথ মুখরিত করিতেছে! এই দৃশ্য দেখিয়া গাহিতে ইচ্ছা হইল—

“জয় ভবকারণ জগতজীবন জগদীশ জন-
তারণ হে!

সবারি জৈশ্বর, তুমি পরাংপর, তব ভাব কে
বুঝিবে হে?

বিশ্বদমগণ মোহিয়ে ভুবন, কাননে তব যশ
গায় হে !”

ইচ্ছা হইতেছিল, যত প্রিয়জনকে আনিয়া
একবার এ দৃশ্য দেখাই। এ সৌন্দর্য্য একা
দেখিয়া তৃপ্তি নাই। এই অপক্লপ দিব্য সৌন্দর্য্য
উপভোগ করিতে করিতে আমাদের গাড়ী
প্রায় সন্ধ্যার সময় বাংড়ায় আসিয়া পৌঁছিল।

এখানে আসিয়া দেখি একপার্শ্বে অভভেদী
স্বমেক-পর্য্যন্ত এবং তাহারই নীচে কিছু দূরে
বিস্তৃত বিশাল সমতলক্ষেত্র ! কি অপূর্ব্ব স্বন্দর
মহান্ গভীর দৃশ্য ! বিশ্বব্যবিস্ফারিত নেত্রে এই
দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া-
ছিলাম, এমন সময় শকট-চালক গাড়ী হইতে
আমাদিগকে নামিয়া যাইতে বলিল।

(ক্রমশঃ)

লীনার শিক্ষা

(১)

বৈকালের সাড়ে পাঁচটার ট্রেন আসিতে
তখনও কিছু দেয়ী ছিল। বেহারের ছোট
সহর ‘শ—’ ষ্টেশনের কাছে গাছ-পালার
ছায়ায় ঢাকা, একটা নিভৃত ছোট বাগানের
মাঝে, লোহার বেষ্টিতে ঠেস্ দিয়া দুইটি
সুন্দরী যুবতী বসিয়াছিল। দুইজনেরই বেশ-
ভূষা ইউরোপীয়-মহিলাজনোচিত। চেহারায়
দুইজনের ভিতর পার্থক্যটা কিছু বেশী ;—
মিশনারী মেম মিস্ পার্সন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে, চোখ,
চুল এবং গায়ের রং এ খাটি বিলাতী ;—কিন্তু
ফিরিলী-কন্ডা লীনা আকৃতিগত ক্ষণতায়,
আর চোখ চুলের রং এ, যোল আনা না
হইলেও দু’ আনা রকমের দেশী বটে। লীনার
মাথায় রঙিন-পালক-দেওয়া বাহারে টুপি ;—
পার্সনের স্কেক্‌ডানো-হাঁটা চুল ঢাকিয়া
প্রকাণ্ড সোলা হ্যাট মাথার উপর বিরাজমান।

পার্সনের হাতে একটা লাল রং’এর মলাট
দেওয়া চটি-বই ছিল ; লীনা পড়িতেছিল
ইংরেজি খবরের কাগজ। পার্সন নিঃশব্দে
পড়িতেছিলেন, লীনা খবরের কাগজ পড়িতে

পড়িতে মাঝে মাঝে দুই একটা ‘রসাল’ ছুজুগ,
দুই-চারিটা ‘বাঁঝালো’ সম্পাদকীয়-মন্তব্য
পার্সনকে শুনাইয়া সুমিষ্ট কোতুকে
হাসিতেছিল। পার্সনও নিজের পাঠ্য হইতে
মুখ তুলিয়া, ক্ষণিকের জন্ত হাদিয়া লইতে-
ছিলেন,—সম্পাদকের কোন কোন বিষয়ের
বাঁঝালো মন্তব্যের উপর তিনিও মুহূর্ত্তাবে
‘সারালো’ টিপ্সনী বর্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু
অতি অল্প ভাষায় ! আবার তখনই নিজের
পাঠ্যের দিকে মন দিতেছিলেন।

হঠাৎ লীনা মিনিট-দশেকের জন্ত থামিয়া,
জরুর কোতূহলে দুই কলম লেখা এক টানে
পড়িয়া, ব্যগ্রভাবে বলিল, “রাখুন রাখুন
পার্সন, আপনার Comprehensive His-
tory of the Religion of the Hindus”
রাখুন। ওটা নেহাৎ পুরোনো অতীতের মৃত-
কঙ্কাল ! বর্ত্তমান যুগের সজীব ধর্ম্মের সংবাদ
নেন, কেরোসিন তেলে উপযুগ্যপরি কি চমৎ-
কার ধর্ম্মসাধন-যজ্ঞ চলছে, পড়ুন ; সদ্যঃ সদ্যঃ
সাক্ষাৎ সত্যধর্ম্ম-জ্ঞান উপলব্ধি হয়ে যাবে !”

পার্সন নিজের বই বন্ধ করিয়া কোলের উপর ফেলিলেন; লীনার মুখ-পানে চাহিয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন, “চটাবার মতলবে আছেন না? কিন্তু নিশ্চয়! আমার রাগরোষে বর্তমান যুগের কেরোসিনে আত্মহত্যাকারিণী তর্কশীলবল্বিনীদের বা তাদের ঐ অপূর্ণ হৃদয় ধর্মপ্রবৃত্তি-উত্তেজক পৃষ্ঠপোষকদের স্বধর্মপালনে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হবে না, সেটা নিশ্চয় জানবেন! বর্তমান যুগের প্রচলিত হিন্দুধর্ম—বিশেষ করে, বাংলাদেশের হিন্দুধর্মের খবরটা নেওয়া, আমার পক্ষে আপাততঃ কিছুমাত্র সুবিধাজনক নয়; ওর চেয়ে পুরাতন যুগের ভারতবর্ষীয় হিন্দুধর্মের সন্ধান নেওয়া ঢের নিরাপদ, ঢের শিক্ষাপ্রদ! ছিঁড়ে ফেলুন মিসেস পিকক্, খবরের কাগজখানা ছিঁড়ে ফেলুন, আপদ চুকে যাক!”—পার্সনের মুখ বিরক্তি-গস্তীর হইয়া উঠিল।

লীনা অপ্রস্তুত ভাবে একটু চূপ করিয়া থাকিয়া সংযতস্বরে বলিল, “না পার্সন,—আমাদের অনধিকার-চর্চার অধিকার-নীমা একটু বাড়িয়ে নিতে চাই; চূপ করে থাকা আর চলছে না,—নারী, সকল দেশেরই সমান নারী,—”

বাধা দিয়া পার্সন বলিলেন, “ভুল, মিসেস পিকক্, ভুল আপনার ঐখানেই; প্রচণ্ড জবরদস্তীর উপর যে দেশের নারীদের সকল শক্তিকে দাবিয়ে রেখে,—অন্ধভাবে পরনির্ভর-শীল করে গড়ে তোলা হয়েছে, পায়ে হৌচট, মাথায় ঠোঁকর খেতে দেখতে, অন্ধকারে পথ চলাই যাদের জীবন যাত্রার প্রধান অবলম্বন, তারা যখন একমাত্র আশ্রয়দাতাদের কাছে পর্যন্ত নির্ভরভাবে উৎপীড়ন লাভ করিতে

থাকে, আর এদেশের চিরচিরিত প্রথা-মতে পারিপার্শ্বিক জনসাধারণ যখন সহায়ত-লেশ-বর্জিত-চিত্তে—

কৌতুক দর্শন করে

দাঁড়ায় পৌড়িতে ঘিরে

গোপনে ক্রান্ত করে ব্যঙ্গ বরিষণ—

তখন অতি-বড় দৈর্ঘ্যশীল পণ্ডিতেরই দৈর্ঘ্য লোপ হয়ে যায়,—তা এই এদেশের শিক্ষা-দীক্ষাহীন জড়বুদ্ধি নারীদের সহিষ্ণুতা! মিসেস পিকক্, প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও যখন এই রকম অল্পশিক্ষিত মানুষদের যথেষ্টাচার-পীড়িত অসভ্য বর্বরতার যুগ এসেছিল, তখন ‘silence is the best ornament of a woman’ (মৌনতাই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, নীতিকে মেয়েরা শোভার খাতিরে আর মাথায় করে রাখতে পারেন নি,—পুরুষদের অত্যাচারে উন্মত্ত অস্থির হয়ে, সংসার-জীবন ছেড়ে মঠে গিয়ে সন্ন্যাসিনী-জীবন গ্রহণ শুরু করে দিয়েছিল। তাঁদের পুণ্যের ফল আজ আমরা পবিত্র শাস্তির সঙ্গে ভোগ করছি, অন্ততঃ আমি তো একজন বটেই!—” কথাটা শেষ করিয়াই পার্সন প্রসন্ন হাস্তোজ্জ্বল নয়নে লীনার দিকে চাহিয়া সবিনয়ে বলিলেন “কিছু মনে করবেন না, মিসেস পিকক্, পিকক্ দম্পতীর আদর্শ-শ্রেমপূর্ণ দাম্পত্য-জীবন অবশ্য আমি খুবই প্রীতির চক্ষে দেখি, এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাদের জীবন যেন চিরদিনই এইরকম সুখময় থাকে।”

সুখের গর্বে লীনার পাণ্ডুর ত্বান মুখ উৎফুল্ল হৃদয় হইয়া উঠিল; পার্সনের শুভ কামনার উত্তরে ভক্ততাস্থক ধন্ববাদ

জানাইরা ক্ষুধিত উচ্চারণে হঠাৎ বন্ধ-প্রীতির দাবী-স্তরা আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল, “কত দিন আর এমন সজ্জীন জীবন যাপন করবেন, মিস্ পার্সন ? এবার একটা বিয়ে-খাঁ করে সংসার পেতে সুখী হন না, দেখে আমাদেরও সুখ হোক !—

পার্সন পরিহাস-বাজক সুরে বলিলেন, “বহুৎ আচ্ছা, আপনি একটা বর খুঁজুন !”

লীনা সলজ্জ হাস্তে অল্পযোগ করিয়া বলিল, “হ্যাঁ, আপনার সকল-তাতেই ঠাট্টা ! কিন্তু যদি কিছুদিন বাঁচি, তবে দেখব দেখব, কতদিন আপনার মত ঠিক থাকে তাও দেখব ! মহাজনের উক্তি জানেন তো ?— “শীতের বাতাস আর নারীর নন সর্কদা পরিবর্তনশীল !—”

হাসিয়া পার্সন বলিলেন, “মহাজনের জয় হোক ! হতাশ প্রণয়ী যুবকেরা মহাজনের ঐ উক্তিটার জন্ত যথেষ্ট ক্লেশ থাকবে ; আহা, ভাল মানুষ বেচারীদের বড় আশার কথা ! কিন্তু আমি ঐ মহাজনটিকে সম্মান দেখাতে রাজী থাকলে, তাঁর উক্তিটিকে কিন্তু আমি পছন্দ করতে পারছি না ! মাপ করুন মিসেস্ পিকক্ । ক্রসকট্টা ঐ পর্যন্ত থাক ; টেন্ আসবার সময় হয়েছে, চলুন টেনশনে যাওয়া যাক্ ।”

পার্সন বই হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; অগত্যা লীনা এবং উঠিলও পার্সনের সুখের দিকে চাহিয়া মুহু মুহু বিজ্রপের হাসি হাসিয়া বলিল, “কিন্তু যতই জারিজুরী করুন, ভালবাসার হাতে একদিন আপনাকে ধরা পড়তেই হবে—”

বাধা দিয়া প্রসন্ন হাস্তে পার্সন বলিলেন,

“ধরা পড়া ছেড়ে, থোস্ মেজাজে আত্মসমর্পণ পর্যন্ত করে দিয়েছি । মিসেস্ পিকক্, সে অস্ত্রে নিশ্চিত থাকুন !”

সবিস্ময়ে লীনা বলিল, “সে কি, এঁ্যা ! বলেন কি, মিস্ পার্সন !”

শান্ত সুরে পার্সন বলিলেন, “কেনও যে ভালবাসার আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে ফাদার ডামিয়ন কুঠরোগীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, সেই অপরূপ মহিমময় ভালবাসার পূজায় আত্ম-নিরোগ করা এতই কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, মিসেস্ পিকক্ ?”

লীনা স্তব্ধ ! এরূপ অভূত উত্তরের প্রত্যাশা সে মোটেই করে নাই ! কিন্তু উত্তর শুনিয়া এখন তাহার মনে পড়িল, পার্সনের নিকট হইতে ইহা ছাড়া অস্ত্র কিছু উত্তর প্রত্যাশা করাই তাহার মূঢ়তা !

লীনাকে স্তব্ধ নিরুত্তর দেখিয়া পার্সন একটু স্নেহের হাসি হাসিয়া লীনার কাঁধ চাপড়াইয়া অভিযন্ত শান্ত-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, “সুখাভিলাষটাই মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়, তার অপেক্ষাও উচ্চতর উদ্দেশ্য নুরনারীর জীবনে আছে । চলুন, ঐ গাড়ী আসবার ঘণ্টা বাজছে ।”

ঘাড় হেঁট করিয়া পার্সনের পাশে পাশে চলিতে চলিতে লীনা সন্তর্পণে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুহূর্ত্তে বলিল, “মিস্ পার্সন, আপনার মত মহৎ হৃদয়” যাদের, জীবনে মহৎ-উদ্দেশ্য-পোষণের যোগ্যতা শুধু তাদেরই আছে ; আপনার দিকে যখন ভাল করে চেয়ে দেখি, তখন আমার বড়ই আনন্দ বোধ হয় ।—“শেষ কথায় লীনার কণ্ঠের কাঁপিয়া উঠিল, নিঃশ্বাস জোরে পড়িতে আরম্ভ করিল ।

গমনরতা পাস'ন তৎক্ষণাৎ ফিগিরা দাঁড়াইয়া লীনার কাঁধ ধরিয়া মুহু কাঁকানি দিয়া অতিশয় স্নেহভরা ভৎসনার স্বরে বলিলেন, “হুঁ, টের পাচ্ছি,—heart'এর palpitation বাড়িয়ে ফেলছেন! কিন্তু ওটা এখন চলবে না, সংঘত হোন। মি: পিকক আপনাকে অসুস্থ দেখলে বড়ই

অসুখী হবেন, ওট বসবেন না। আপনার মাদুসীর খবর নেবার সময় আপনাকে আমি খুব সুস্থ স্বচ্ছন্দ দেখতে চাই। কথা বন্ধ করে ধীরে হাঁটুন; খুব ধীরে।”

ম্লান হাসো, ক্লান্ত স্বরে লীনা বলিল, “তাই যাচ্ছি, চলুন।” উভয়ে নীরবে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

জাহাজ ডুবি।

(উপন্যাস)

(১)

সুসজ্জিত বন্ধ; উজ্জল আলোকে আলোকিত। উদ্যানস্থ হাসনাহানা কুসুমের মুহু গন্ধ বাতায়ন-পথ দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। কৃষ্ণব্রয়োদশী তিথি; রজনী গভীর অন্ধকার। আকাশময় নক্ষত্রগুলা ছড়াইয়া পড়িয়া যথাক্রমে মিট মিট করিয়া তাহাদের আলোক বিতরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহাদের সেই আলোকে রজনীর গাঢ় অন্ধকারকে আরও গাঢ়তর করিতেছিল মাত্র! জোনাকিগুলা গাছ-পালায় ইতস্ততঃ চারিদিকে ঝিকি ঝিকি করিয়া জ্বলিতেছিল। মাঝে মাঝে এক একটা পেচক বিকট চিৎকার করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছিল। আজিমগঞ্জের জমিদার-বাটাতে নবীন জমিদার অক্ষয়কুমার একাকী স্বাক্ষরপাদচারণা করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি পুথের ধারে একটা বাতায়ন-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াই-

লেন। কিন্তু সেই ঘনাককারে বাহিরের কিছুই দৃষ্ট হইল না। কেবল দূরে ভাগী-রথীর অপর পারে একটা শব্দবাহ হইতেছিল, সেই চিতালোক মধ্যে মধ্যে ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, আবার ম্লান হইয়া পড়িতে-ছিল, ইহাই দেখা যাইতেছিল। অমর-কুমার কিছুক্ষণ অনগ্রমনে এই চিতাশ্মির দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার হৃদয় আজ গভীর চিন্তাময়। অন্ধকার রজনী, পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু অমরকুমারের হৃদয়-মধ্যে যেন আজ তদ-পেক্ষাও ঘোরতর অন্ধকাররাশি বিরাজ করিতেছিল। অমরকুমার চিন্তিত্বাক্তঃকরণে আবার কিছুক্ষণ কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাহার পরে কক্ষ-মধ্যস্থ একটা মর্শ্বর-প্রস্তরের টেবিলের নিকটে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন। ভিত্তি-গাত্র-স্থিত বড় ক্লক-বাড়িটার টং টং

করিয়া দশটা বাজিয়া গেল; অমরকুমার একবার অন্তমনস্কভাবে ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। টেবিলের উপরে ইংরাজী, বাংলা পুস্তক, আল বাম, ব্রুটং প্যাড ইত্যাদি সজ্জিত ছিল; গজদন্ত নিশ্চিত দোয়াত-দানে রূপার দোয়াত-কলম শোভা পাইতেছিল; আর একটি গজদন্তনিশ্চিত কক্কাকার্যাবিশিষ্ট স্বপ্নের অংক ক্ষুদ্র বাক্স সেই টেবিলের উপর স্থাপিত ছিল। অমরকুমার একবার বাক্স-

টাকে সম্মুখের দিকে টানিয়া আনিয়া আবার পরক্ষণেই সেটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিলেন। তাহার পর এ-বই সে-বই করিয়া একখানা হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া একটু দেখিয়া, আবার সেখানা রাখিয়া দিয়া শেষে রবিবারের একখানি 'রাজা ও রাণী' লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পাঠের পর তাহাও আর ভাল লাগিল না; পুস্তকখানি সরাইয়া রাখিয়া টেবিলের উপর দুই কলুইয়ের ভর দিয়া দুই হস্ত কপোল-দেশে সংস্থাপন করিয়া, আবার তিনি অনগ্রমণে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ কাহার কোমল করপল্লব-স্বারা তাহার চক্ষু-যুগল আবৃত হইল। অমরকুমারের মুখে স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। মুহূর্তের জ্ঞাত ঘেন তাহার হৃদয় কহিতে সকল চিন্তা দূর হইয়া গেল। অমরকুমার সম্মুখে দুই হস্তে পত্নীর হস্ত-হইখানি ধরিয়া সহাস্তে কবির সুরে বলিলেন—

“এলি কি পাখালি!

পড়েছে কি মনে?

হ'ল সারা—

যত ছিল গৃহ-কাল?

অমরকুমারের পত্নী অমরকুমারেরই শিক্ষিতা শিষ্যা; হটিবার পাত্রী নয়। সেও কবির সুরে বাকি উত্তরটুকু দিল—

তোমারি সে গৃহ নাথ!

তোমারি সে কাল!

তোমাতে যে ছেড়ে যাই

সে তোমারি প্রেমে!

অমরকুমার পত্নীকে সম্মুখের দিকে টানিয়া আনিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন;

তাহার পর দুই হস্তে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎ পরে সম্মুখে বলিলেন, “চিরদিন এমনি ভাল বাসতে পারবে ত, লতা? কোন দিন এর হ্রাস হবে না ত?”

আশালতা বলিল, “আমরা তো আর পুরুষমাতৃব নই যে, আমাদের ভালবাসা বাড়বে কমবে?”

ঈশ্বর হাসিয়া অমরকুমার বলিলেন, “তোমাদের কাছে পুরুষগুলোর ভালবাসার কোন মূল্য নেই, নয়? স মস্ত জীবনটা ঢেলে দিলেও নয়, কেমন?”

আশালতা পূর্ববৎ সুরে বলিল, “জীবন ঢালার বেগ কত! বউ না মরতে মরতেই আবার বিয়ের জন্তে অস্থির। কোন কোন মহাপুরুষ আবার একটা স্ত্রী থাকতে থাকতেই আবার একটা বিয়ে করে বসেন। এ ভাল-বাসার যে মূল্য কত, একটু ভেবে দেখলে তোমরাই বুঝতে পারবে।

অমরকুমার বলিলেন, “তা’ বশেছ মিথ্যা নয়! পুরুষ-জাতটা সত্যিই ‘বড়’ আর্পণ। যত নিগ্রহ এই মেয়েদের! ‘আহা, বড় কষ্ট! নয়?’”

আশালতাও হাসিয়া বলিল, “নিশ্চয়!”

হুই একগাছি কেশ বাতাসে উড়িতে উড়িতে আশালতার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল, অমরকুমার সমস্তে সেগুলি সরাইতে সরাইতে বলিলেন, “সে-কথা যাক, তোমার ভালবাসা আমি চিরদিন এমনি ভাবে পাব ত? কখনও এর হাস হব না ত? এই মনে কর, হঠাৎ আমি যদি খুব গরিব হয়ে পড়ি, আমার যদি ঘর-বাড়ী, বিষয় আশ্রয়, টাকা কড়ি, কিছুই না থাকে, সব যায়,— আমি হঠাৎ যদি কোন কারণে নিরাশ্রয় পথের ভিখারী হয়ে পড়ি, তা হ’লে তখনও আমাকে এই রকম ভাল বাসতে পারবে ত?”

মুখ ফিরাইয়া আশালতা বলিল, “অমন অলক্ষণে কথা মুখে এ’ন না!”

অমরকুমার বলিলেন, “না, না, এই কথার কথা বলছি! যদিই হয়! হতে পারে না কি? এ-সংসারের সমস্তই ত’ভোজ-বাজী। অবস্থার বিপর্যয় কিছু বেশী আশ্চর্যের কথা নয়! মনে কর, হঠাৎ যদি কোন কারণে আমার সব যায়,—তখন? তখন আমাকে গরিব বলে ঘৃণা করবে না ত? তখনও আমাকে এই রকম ভালবাসতে পারবে ত?”

এবার আশালতার মুখ গভীর হইয়া উঠিল। স্বামী এখন পরিহাস করেন নাই, ভবিষ্যতের কথা বলিতেছেন! এখন প্রকৃত উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। আশালতা স্বামীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “জবর করব না, তা যেন কখনও না হয়। কিন্তু ‘যদি’—কথা বলছ?—যদি—যদি, ভগবান্ সেরকম দুদিনে কখনও

ফেলেন, তবে আমি এখনও যেমন তোমার দাসী আছি, তখনও তোমার এমনি দাসী থাকুব। আমরা বান্ধাবীর মেরে, স্বামী ধনী হোন দরিদ্র হোন, স্বামী আমাদের ইষ্ট বেবত্বা, ইহপরকাল!”

অমরকুমার হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ-ভরে আশালতাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “গত! সত্যই আমি দীনহীন কান্দাল, সত্যই আমার কিছুই নেই! এসমস্ত বিষয়-সম্পত্তি যা দেখছ, তা সব পরের! যে ভুলে এতদিন কেটে গেছে, সে ভুল আমি যখন জানতে পেরেছি, তখন তোমারও জানা দরকার, তাই আজ তোমাকে এ কথা বলছি। এই দেখ তার প্রমাণ!” এই বলিয়া অমরকুমার সেই হস্তদস্ত-নির্মিত কারুকার্য-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বাকসূটি খুলিয়া একখানি চক্চকে বাঁধানো খাতা বাহির করিয়া আশালতার হাতে দিয়া বলিলেন, “এই খাতাখানা পড়ে দেখ, তা হ’লেই সব বুঝতে পারবে।”

আশালতা স্বামীর হস্ত হইতে কম্পিতকরে খাতাখানি গ্রহণ করিয়া টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া খাতাখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাতে লেখাছিল—“১২৯৭ সালে বেড়াইবার অভিপ্রায়ে আমি সঙ্গীক আমার বন্ধু জগদীশপ্রসাদের নিকটে নোয়াখালিতে গিয়াছিলাম। উক্ত বন্ধু তথাকার জজ-কোর্টের জটনৈক খাতনাশা উকিল। তিনি নোয়াখালিতে অনেক বিষয়-সম্পত্তি করিয়াছেন, খাতিরও দেখিলাম, তাহার মধ্যে জগদীশ আমার বাল্যবন্ধু। বরাবর আমার একসঙ্গে পড়িয়াছি। তাহার পর বড় হইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমরা দুই বন্ধুতে

বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি। বারংবার তাঁহার সনি-
কঙ্ক অজ্ঞবোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া
আমি আমার স্ত্রী নবদুর্গা, একমাত্র পুত্র
অমরকুমার এবং বিখ্যাত ভৃত্য শঙ্করকে সঙ্গে
লইয়া নোয়াখালি যাত্রা করিলাম। তখন
নোয়াখালিতে রেলপথ হয় নাই ; নোয়াখালি
যাত্রার পথ তখন অত্যন্ত দুর্গম ছিল। কখন
নোকা, কখনও সীমার, কখনও বা আবার
ট্রেন, এইরূপে দুই তিন দিন ধরিয়া ক্রমাধ্ব-
য় গঠা-নামা করিতে করিতে, তবে নোয়া-
খালিতে উপস্থিত হইতে পারা যাইত। আশ-
নিগকে দেখিয়া আমার বন্ধু ও বন্ধু-পত্নী
অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ; অতিশয় যত্নের
সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের
সেই অকৃত্রিম যত্ন দেখিয়া আমরাও অত্যন্ত
শ্রীত হইলাম। দিন-কতক বেশ মনের সুখে
কাটিল। বন্ধুর সঙ্গে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায়
নদীর ধারে বেড়াইতে যাইতাম। সন্ধ্যায়
পর 'টাউন্ হলে' বসিয়া দলজন ভদ্রলোকের
সঙ্গে গল্পগুজব করিতাম। কখনও কখনও বা
বাটীতে তাস, পাশা প্রভৃতি খেলাও চলিত।
আমি একজন বাংলা-দেশের জমিদার স্ত্রিয়া
সকলেই আমাকে বেশ খাতির যত্ন করিতেন।
অনেকে অনেক বিষয়ে চাঁদা দিবার জগ্ন
অজ্ঞবোধ করিলেন। বাধ্য হইয়া খাতির
পড়িয়া তাঁহাদের চাঁদার খাতায় সহি করিয়া
দিলাম। কিন্তু হায় ! কি অন্তঃকণেই
নোয়াখালিতে পলাপন করিয়াছিলাম !
নোয়াখালিতে গিয়া আমার ঘে এমন সন্ধান
হইবে; তাহা কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই।
ও ! এখনও সে বিষাদ-কাহিনী স্মৃতিপটে
উদিত হইলে, হৃৎপিণ্ডে হিম ভিন্ন হইয়া যায়।

সেদিন যে আমার বিনামধ্যে অশনি-
সম্পাত ঘটয়াছিল !

“শঙ্কর আমার পিতার আমলের পুরাতন
ভৃত্য। তাহার দেহে অশ্বরের ক্ষমতা ছিল।
মনে পড়ে, আমার বাল্যকালে শঙ্কর এবং
তাহার ভাই মনোহর, ত্রিশজন দস্যুকে হটাইয়া
দিয়া আমাদের রক্ষা করিয়াছিল। বৃদ্ধ হইয়া
মনোহর কার্যে অবশর গ্রহণ করিয়া দেশে
চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রভুভক্ত শঙ্কর আমা-
দের পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। আমা-
দের পরিজনের মত আমাদেরই গৃহে বাস
করিতেছিল। আমার পিতা মৃত্যুকালে
আদেশ করিয়া যান, “শঙ্কর যদি ইচ্ছাপূর্বক
তোমাদের ত্যাগ করিয়া না যায়, তবে কখনও
তাহাকে ত্যাগ করিও না। বৃদ্ধ অকর্মণ্য
বলিয়া কখনও তাহাকে অবহেলা করিও না।
সত্যোদর ভাইয়ের মত শঙ্করকে প্রতিপালন
করিও। শঙ্কর আমার বহু উপকারী, তাহার
ক্ষণ আমি সমস্ত জীবনে পরিশোধ করিতে
পারিলাম না। তুমি যেন কোন দিন তাহাকে
অবজ্ঞা বা অযত্ন করিও না। সে কার্যে অশক্ত
হইলে তাহাকে পরিশ্রম করিতে দিও না।”
পিতার এই শেষ আদেশ পালনের যথাসাধ্য
চেষ্টা করিতাম ; শঙ্করকে কোনও কার্যভার
দিই নাই। মাত্র সে আমার শিশু-পুত্রের
রক্ষণাবেক্ষণ-ভার স্বৈচ্ছায় নিজের স্বক্ষে গ্রহণ
করিয়াছিল। থোকা সমস্ত দিন শঙ্করের কাছে
থাকিত। শঙ্কর তাহাকে একদণ্ড চক্ষের অন্ত-
রাল করিতে পারিত না। বৃদ্ধ সারাদিন
থোকার সহিত খেলা করিত, তাহাকে দুই
বেলা খাওয়াইত, দুইবেলা বেড়াইতে লইয়া
যাইত এবং অবশর মত তাহাকে লাঠিখেলা

নিখাইত। এহেন শব্দর আমার নরনের মণির রক্ষক, তাই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু হায়! অচিরে আমার এ সুখশান্তি চিরদিনের মত দূর হইল। হায়, তগবন্। এমন কি পাপ করিয়াছি, যাহার জন্ত আমাকে এরত্ন দান করিয়া অপহরণ করিলে? নোয়াখালিতে আসিয়াও শব্দর প্রতিদিন আমার অমরকে লইয়া বেড়াইতে যাইত; নিত্য নূতন নূতন দৃশ্য দেখাইয়া বাটী ফিরিত। কোন দিন রাত্রি হইয়াও যাইত। কিন্তু কোন দিন ইহার জন্ত তাহাকে নিষেধ করি নাই। সে তাহার খেলার সাথী, বেড়াইবার সঙ্গী, গৃহে বন্ধু, সে পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য। তাই রাত্রি পর্য্যন্ত বেড়াইবার জন্ত কোন দিন বিরক্ত হই নাই বা নিষেধ করি নাই। একদিন, অহো! সে-কথা মনে হইলে এখন পর্য্যন্ত আমার হৃৎকম্প হয়, দেহের উষ্ণ শোণিত শীতল হইয়া যায়, হস্ত হইতে লেখনী খসিয়া পড়ে! সে হৃদয়-বিদারক ভীষণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া কোনও ফল নাই জানি, তথাপি কেন সে ইহা লিখিতেছি, তাহা—তাহা বলিতে পারি না! ইহা আমার বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ-বাক্যের ত্রায় অর্থহীন ভাষামাজ। আমার এ মর্ষভেদী বিষাদ-কাহিনী তো লোকসমাজে প্রকাশ করিবার নহে, তাই •কাগজে-কলমে লিখিয়া রাখিয়া হৃদয়ভার কক্ষিৎ লঘু করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। কেন যে একথা লোকসমাজে প্রকাশ করিতে আমি অসমর্থ, কেন যে নিদারুণ পুস্ত্রশোক অতিযত্নে হৃদয়ের গুপ্ততম প্রদেশে লুকাইয়া রাখিয়াছি, তাহা পরে লিখিতেছি।

“একদিন এই প্রকার বেড়াইতে গিয়া আমার প্রাণাধিক অমর, আমার প্রিয় পুত্র! অমর আর গৃহে প্রত্যাগত হইল না; শব্দরও না! সে-দিন অমাবস্তার রাত্রি। কার্তিক মাস; কালীপূজার দেওয়ালী। রাত্রি প্রায় আটটা বাজিয়া গেল তাহার। তবুও ফিরিল না। আমার স্ত্রী নবহর্গা অস্থির হইয়া পড়িলেন; উৎকণ্ঠিতচিত্তে বারংবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “হ্যাঁ গা এতটা রাত্ হয়ে গেল, আমরকে নিয়ে শব্দর কেন এখনও এল না?” আমি কিছু বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, “এত ভয় কিসের? সে ত আর একলা যায় নি, শব্দর রয়েছে সঙ্গে; তবে আর তোমায় ভাবনার কারণটা কি?”

“ক্রমে রাত্রি আরও অধিক হইল। নবহর্গা আমার আশ্বাস-বাক্যে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া জগদীশের “জৈনক ভৃত্যকে অমরের অচুসন্ধান করিবার জন্ত পাঠাইয়া দিল। ভৃত্য ডেপুটি-বাবুর বাসা, ডাক্তারবাবুর বাসা, অন্যান্য উকিলবাবু-দিগের বাস, টাউন হল, কাছারী প্রভৃতি যে সকল স্থানে শব্দরের অমরকে লইয়া বেড়াইবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সমস্ত স্থানই খুঁজিয়া আসিল; কিন্তু কোথাও তাহাদের দেখিতে পাইল না। শেষে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল। তখন আমরা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। জগদীশ তাহার দুই তিন জন লোককে আবার তাহাদের সন্ধানে পাঠাইয়া দিল। তাহারিও সমস্ত নহরময় খুঁজিয়াও কোথাও তাহাদের দেখিতে পাইল না। তখন জগদীশ বলিল, “না, আর চূপ

ক'রে বসে থাকলে চলছে না, এ তো ভাল কথা নয়! চল, আমরা হ'জনে যাই।”

“উড়ানিখানা গায়ে কেলিয়া ছড়ি হাতে করিয়া আমরা টুটকুনে বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমেই তৃতীয় ডেপুটি উপেন্দ্রকিশোর বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। তাঁহার সম্মতি আমার বেশ আলাপ হইয়াছিল। তিনি আমারই সমবয়স্ক এবং সমনামধারী। লোকটি বেশ সদালাপী, সদা প্রফুল্ল, গর্ব-বিরহিত। তিনি সমস্ত ঘটনা শুনিয়া খুব চিত্তবিত্ত হইলেন; বলিলেন “এ তো ভাল কথা নয়! আপনার ছেলের গায়ে কিছু গয়না আছে কি?” আমি বলিলাম, “বেশী কিছু নেই, তবে গলায় একছড়া হীরের হার আছে।” তিনি এ কথা শুনিয়া একেবারে চমকাইয়া উঠিলেন; বলিলেন, “তবেই ত বলেন ভাল! ঐ এক ছড়া হারের দামই বোধ হয়, দশ পনের হাজার টাকা হবে?” আমি বলিলাম, “বেশ। কিছুদিন পূর্বে পঁচিশ হাজার টাকাতো কিনে দিয়েছিলাম।” তীত কণ্ঠে উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, “দক্ষনাশ! গহনাই হ'ল ছেলেদের শরু! ঐ হার-ছড়াটার লোভে চাকর-বাটাই বা কোন রকম কিছু কবুলে?” জগদীশও অত্যন্ত তীতভাবে বলিলেন, “আশ্চর্য্য কি?” আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, “শরু খুব বিশ্বাসী চাকর, আমি নিম্নকে যেমন বিশ্বাস করি, তাকেও সেই রকম বিশ্বাস করে থাকি। শরু হ'তে আমার কোনও অনিষ্ট হ'বার সম্ভাবনা নেই। সে আমার ছেলেকে নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। তারই কোলে আমার ছেলে মাছ হ'য়েছে।” চিত্তিত

ভাবে উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, “তবে বুড়ো ছেলেটাকে নিয়ে গেল কোথায়? চলুন, দেখি একবার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে যাওয়া যাক, তিনি কি বলেন।”

“আমরা তিনজনে পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি খাস দিলাতী সাহেব। কিন্তু লোকটির কথাবার্তা শুনিয়া বেশ ভাল লোক বলিয়াই অনুমান হইল। তিনিও সমস্ত শুনিয়া ডেপুটি-বাবুর কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন মাত্র; বলিলেন, “বাবু, গহনাই ছেলেদের শরু। ছেলেদের গায়ে গহনা পরিয়ে সাজিয়ে বেড়াতে পাঠান, অতি অশ্রুয় কার্য্য। কত সময়ে এই গহনার জন্তই ছেলেচুরি এবং খুন হইয়া গিয়াছে!” তখন আমার আতঙ্কে সর্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল,—তবে কি আমার অমর নাই? হীরার হারের লোভে কেউ কি তাকে মেরে ফেলে? মনে মনে ভগবানকে ডাকিলাম, “হে তথবান! আমার অমরকে রক্ষা কোরো!” অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলাম, “তবে কি হবে?” সাহেব বলিলেন, “দেখি, কতদূর কি করতে পারা যায়।”

“তিনি সমস্ত ‘ইউনিফর্ম’ পরিয়া প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলেন। আমরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সাহেবের সঙ্গে সব-ইনস্পেক্টর যোগীন্দ্রবাবু এবং জন-কয়েক কনষ্টেবলও চলিল। তাহাদের সকলের হাতেই এক একটা লঠন ছিল। সেই অমাবস্তার ঘোর অন্ধকার নিশীথে লঠন লইয়া সমস্ত সহর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া, বন-জঙ্গল ঝোপ-ঝাপ, পথ-ঘাট দেখিতে দেখিতে আমরা শরু পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে

আমিরা উপস্থিত হইলাম। প্রান্তর-মধ্যে প্রকাণ্ড একটা দীঘি ছিল। আমরা সেই দীঘির নিকটবর্তী হইলাম। শহর উঠিল। শহর বৃত্তাক্ত কলেবরে পথের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল, সর্কাজ ধরু ধরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চক্ষুর সম্মুখ হইতে যেন সমস্ত আলোক নিভিয়া গেল। আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। শহরের দেহের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। তাহার সে দশা দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য আমার প্রাণাধিক পুঞ্জের কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। ডেপুটীবাবু ও ইনস্পেক্টারবাবু শহরকে নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন শহরের দেহে জীবনের কোন চিহ্নই নাই। হতভাগ্যের দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া তাহার জীবন-বিহঙ্গ বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। তাহার দেহের দুই তিন স্থানে গুলির আঘাতের চিহ্ন। একটা গুলি পৃষ্ঠদেশ দিয়া বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, তাহাতেই হতভাগ্যের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। তাহার চিরসঙ্গী লাঠি তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই! পুণ্ড্র-সাহেব পরামর্শ করিয়া গরুর গাড়ী আনিয়া লাশ চালান দিলেন। কিন্তু অমর! আমার অমর-কুমারের ত কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া গেল না। আমার অমর কোথায় গেল? তাহার তবে কি হইল? শহরের দেহ দেখিয়া সকলে অহুমান করিলেন, অমরের গলার হীরার হারের মতই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কোনও দস্যুগণ অমরের হীরার হার চুরি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, শহর তাহাকে

রক্ষা করিবার জন্যই আত্মবলিদান দিয়াছে। শহর বিদ্যমানে হার লইবার সুযোগ নাই পাইয়াই অবশেষে দস্যুরা গুলির আঘাতে শহরকে হত্যা করিয়াছে; তাহার পর অমরকেও হত্যা করিয়া হার লইয়া গিয়াছে। কিন্তু বহু অহুসন্ধান করিয়াও সে-স্থানে অমরকে হত্যা করিবার কোনও সন্ধান দেখিতে পাওয়া গেল না। নিকটবর্ত্তি বন-জঙ্গল তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হইল। পরে সেই রাতিতেই জেলে ডাকাইয়া দীঘিতে জাল ফেলিয়া দেখা হইল, অমরের দেহ জেলে পাওয়া যায় কি না। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও অমরের কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না। চারি-খার বেড়িয়া দীঘিতে বড় বড় জাল ফেলা হইল, অনেক বড় বড় মাছ ও কাছিম উঠিতে লাগিল, কিন্তু অমরের দেহ বা তাহার বস্ত্রাদি কিছুই পাওয়া গেল না। তখন সকলে বলিতে লাগিলেন, “অমরকে দস্যুরা এখানে হত্যা করে নাই। শহরকে হত্যা করিয়া আর তাহার এখানে অমরকে হত্যা করিতে সাহস করে নাই। ধরা পড়িবার ভয়ে পলাইয়াছে; অবশ্য হারের লোভে অমরকে লইয়াই পলাইয়াছে।” এখন তাহারা কোথায় পলাইল তাহাই অহুসন্ধান করিতে হইবে। দেখা গেল, দীঘির পাড়ে শ্রাম দুর্বাদলরাশি বহু-পদ-পিষ্ট হইয়া দলিত হইয়া গিয়াছে। বুঝিতে পারা গেল, দস্যুগণের সহিত অবশ্যই শহরের একটা ক্ষুদ্র রকমের যুদ্ধ হইয়াছিল। অমরকে রক্ষা করিবার জন্য অবশ্যই শহর প্রাণপণ করিয়াছিল; শেষে নিজের জীবন দান করিয়া বৃদ্ধ প্রভুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া

গিয়াছে। পুলিশ-সাহেব একখণ্ড কুত্র হীরক তথা হইতে কুড়াইয়া পাইলেন এবং আমার হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, “দেখুন দেখি বাবু, এই রকম হীরা আপনার ছেলের হারে ছিল কি না? আমি কম্পিট-হস্তে সাহেবেব নিকট হইতে হীরকখণ্ড লইয়া আলাব নিকটে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলাম, “হ্যাঁ, এই সেই হীরাই বটে।” রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, অমরের কোন সন্ধান না পাওয়াতে সকলেই গৃহভিত্তিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সবলেই সিদ্ধান্ত করিলেন,

অমরকে এখানে হত্যা করে নাহ। এখান হইতে তাহাকে লইয়া গিয়াছে। পরে তাহা-দের ইচ্ছামত এবং সুবিধা-মত, হয় ত, হত্যা করিয়াছে। সে সময় আমার মনের অবস্থা যে কি প্রকার হইয়াছিল, তাহা এখন আমি লিখিয়া প্রকাশ করিতে অসমর্থ। ডেপুটী বাবু ও জগদীশ ছই জনে আমার দুইটা হাত ধরিয়া একপ্রকার টানিতে টানিতে আমাকে জগদীশের বাটীতে লইয়া আসিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচাক্ষীলা মিত্র ।

নববর্ষের প্রার্থনা ।

(পিলু বারোয়ান্।)

মাকে মাঝে

কাজের মাঝে

ভুলবো যবে

ভুলবো যবে

জাগিয়ে তুমি

জাগিয়ে তুমি

ব্যথায় ;

ব্যথায় ;

হুঃখে হুঃখে

ভোগের মাঝে

অবসাদে

রইবো ডুবে,

জাগিয়ে তুমি

জাগিয়ে তুমি

ব্যথায় !

ব্যথায় !

সুখের দিলের

জাগিয়ে আমার

হাসির মাঝে

তোমার মাঝে,

যবে হুঃখ-বীণী

জাগিয়ে আমার

নাহি বাজে,—

তোমার কাজে ;

কাজে তোমার

সাজিও আমার

“পাছে পাছে—

বীবের সাজে—

জাগিয়ে তুমি

সাজিও তুমি

ব্যথায় !

ব্যথায় ॥

৮৭ বর্ষ

বামাবোঝনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাপ্রাণ উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্তৃক প্রবর্তিত।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭—জুন, ১৯২০।

সূচী

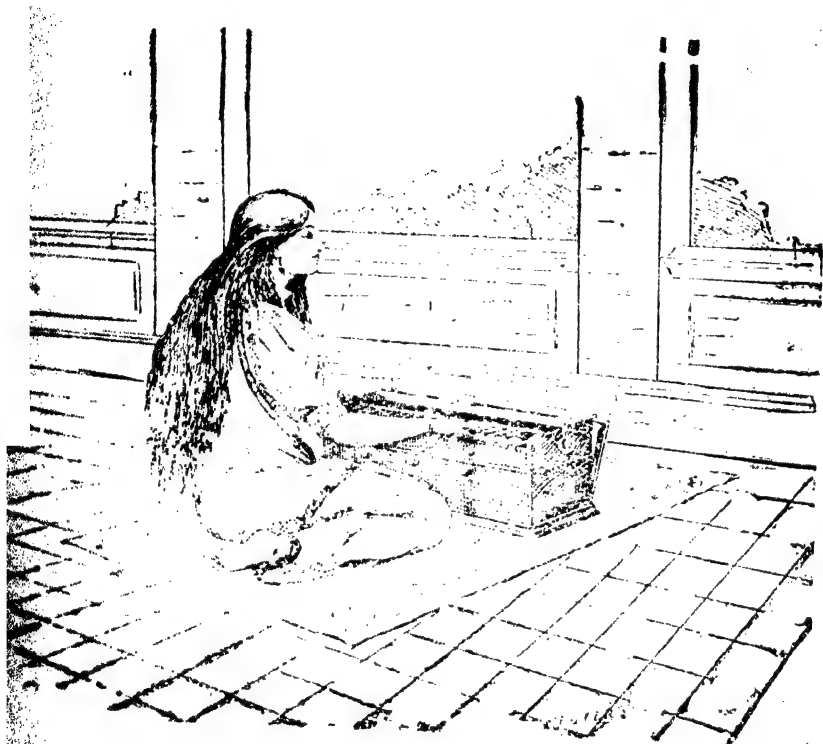
১। নিবেদন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৩
২। গানের সুরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৩৪
৩। জাহাজ ডুবি (উপহাস)	শ্রীমতী চাকশীলা মিত্র	৩৭
৪। নবোঢ়া (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৪৬
৫। কাংড়া-পথে	শ্রীমতী বিজয়ালা মিত্র	৪৬
৬। প্রেমময়ী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যাবতী	৪৯
৭। জপজী	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত বি-এল	৫০
৮। মুক্তা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫৫
৯। প্রসূতি ও সন্তান-মঙ্গল	...	৫৫
১০। বর্ষা (কবিতা)	শ্রীমতী অমিয়া চৌধুরী	৫৭
১১। জীবনের রঙ	শ্রীযুক্ত পদোদ্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ	৬৮
১২। বিবিধ সংবাদ	...	৬০
১৩। স্বরগের ঠিকানা (কবিতা)	স্বর্গীয় হেমচন্দ্র দত্ত	৬২
১৪। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল	...	৬৩

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫/-, অগ্রিম সাপ্তাহিক মূল্য ১/-

অত্যধিক সংখ্যার মূল্য ১০/- (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়াকিনের হারমোনিয়ম ।

বাজারে জিনিসের মত নয় ।



বাস্তব হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০০ ৫ ২৫০ টাকা ।

২ সেট রিড মূল্য ৩০০, ৪০০, ৪৫০, ৫০০ হইতে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত ।

ফোর্ডিং অবশ্যে—মূল্য ৩৬, ৫৫, ৭০, ৭৫, ৭২০ টাকা ।

বেহালা—মূল্য ৫০, ১০০, ১৫০, ৫ ২৫০ হইতে ৩০০ টাকা পর্যন্ত ।

সেতার—মূল্য ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০ ৫ ৩০০ টাকা ।

এসবাজ—মূল্য ১২০, ১৫০, ১৮০, ২০০ ৫ ২৫০ টাকা ।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয় ।

ডোয়াকিন এণ্ড সন,

৮১ নং কালহাট্টি ঘোষার, লালদীঘী, কলিকাতা ।

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 682.

June, 1920.

“কন্যাখ্যে ব দাস্তনীয়া মিস্ত্রীমাতৃগণতঃ ।”

কল্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে ।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত ।

৫৭ বর্ষ ।

৬৮২ সংখ্যা ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ । জুন, ১৯২০ ।

১২শ কল্প ।

১ম ভাগ ।

নিবেদন ।

তোমার চরণ-তলে

দয়াময় ! আরবার

আমি যে দাঁড়াতে চাই

মুছিয়া নয়ন-ধার ।

ভুলে তোমা মন-ভুলে গিধেছিহু দূরে চলে,

আপনা হারাতে হার, ধরণীর কোলাহলে !

শুধু ঘণা-অনাদরে

ভরে গেল সারা বুক,

জগৎ নিষ্ঠুর বড়,

চাহে না দীনের মুখ !

টুটিয়াছে ভুল আজি, চিনেছি ভুবনখানি,

আর ত সহে না, নাথ ! আর ত সরে না বাকী !

এইটুকু বল আজি

দাও মোরে ভগবান্ !

সব ছেড়ে সব ভুলে

তোমাতে জুড়াই আণ ।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

গানের স্বরলিপি ।

সিন্দু-বারোয়—তাল একতালা ।

সব দুখ মোর হবে শতদল

তুমি যদি রও কাছে !

জীবনের ভার কুণ্ডলের হার,

তুমি যদি রও কাছে !

আকাশের চাঁদ হাতে পাব আমি

তুমি যদি রও কাছে—

গোলাপের বন বুকে রবে মোর,

তুমি যদি রও কাছে !

মিটিবে গো তৃষা সুধা-সরোবরে

তুমি যদি রও কাছে—

ডুবিল অতল অমৃতের হ্রদে,

তুমি যদি রও কাছে !

পর্ণ-কুটারে রাজা হয়ে র'ব—

তুমি যদি রও কাছে ।

সরগ নামিবে এ ধরণীতলে,

তুমি যদি রও কাছে ॥

রচনা ও স্বর—শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াণ, বি-এল্। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ।

অস্থায়ী ।

২°
[গা সা রা] ৩ ° ১
II {গা সা সা। রা জা ।। রা জমা জা। রা সা ।} I
স ব ছ খ মোর • হ বে শ ত দল •

২° ৩ ° ১
I গা সা পা। ধা পধপা ।। মা -গা পমা। -া -া -া I
হু মি ব মি র • ও • কা • ছে • • •

I পা না না। সী সী ॥ সী পা ধা। -পা মা । I
জী ব নে র ভার • কু স্র মে র হার •

I মা পা ধা। পা পধপা ॥ মা -গা পমা। -া -া -া II
তু মি ব দি রও • কা • ছে • • •

অন্তর।

II {সপা পা পা। -া পা -া। পা পা পা। পা পা পা ।
আ • কা শে র টা দ হা তে পা ব আ মি

I পা পা পা। পা পধা ॥ না -া সী। -া -া -া II
তু মি ব দি রও • কা • ছে • • •

I না সী রা। ১ জী ১। রী সী জী। রী সী ১ I
গো লা পের • বন • বু কে র বে মোর •

I রী সী পা। ধা পা মা। পমা -না সী। -া -া -া I
তু মি ব দি র ও কা • • ছে • • •

I সা জী রা। -জী রজী ১। রা মা জী। রা সা ১ I
গো লা পের • বন • বু কে র বে মোর •

I সী সী পা। ধা পধা পা। মা -গা পমা। -া -া -া II
তু মি ব দি রও কা • • ছে • • •

সকারী।

II সা সী সী। সী সী ১। সী পা ধা। পা মমা ১ I
মি টি বে গো ত্বা • স্র ধা স রো বরে •

২' ৩ . ১
I মা গা গা। ধা পধপা ।। মা -গা পমা। -া -া -া I
তু মি য দি রও . কা . ছে . . .

২' ৩ . ১
I জা জা জা। রা জা ।। রা মা জা। রা মা সা I .
ডু বি ব অ তল . অ য় তে র হ দে .

২' ৩ . ১
I না না পা। পা না ।। না -া সা। -া -া -া II
তু মি য দি রও . কা . ছে . . .

আভোগ।

২' ৩ . ১
II সা -া পা। পা পা -া। পা পা পা। পা পা পপা I
প . ব কু টা . রে রা জা হ য়ে রব

২' ৩ . ১
I পা পা পা। পা পধা ।। না -া সা। -া -া -া I
তু মি য দি রও . কা . ছে . . .

২' ৩ . ১
I সা সা সা। রা রা জা। রমা জা রা। -া সা সা I
ব র গ না মি বে এখ র নী . ত লে

২' ৩ . ১
I রা সা গা। ধা পমা ।। পসা -না সা। -া -া -া I
তু মি য দি রও . কা . ছে . . .

২' ৩ . ১
I সা জা জা। রা জা জা। রমা জা রা। -া সা সা I
ব র গ না মি বে এখ র নী . ত লে

২' ৩ . ১
I সা সা গা। ধা পধপা ।। মা -গা পমা। -া -া -া II II
তু মি য দি রও . কা . ছে . . .

জাহাজ ভূমি।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমার স্ত্রী সকল কথা শুনিয়া মুচ্ছিতহইয়া পড়িলেন; কিছুতেই তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চার করিতে সমর্থ হইলাম না। জগদীশ ডাক্তার-সাহেবকে লইয়া আসিল। ডাক্তার-সাহেব সমস্ত দিন ধরিয়া নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তবে তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদনে সমর্থ হইলেন। ডাক্তার সাহেব বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু আমার বিপদ সম্পূর্ণ রূপে কাটিল না। আমার স্ত্রী চৈতন্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বত্বশক্তির বিলোপ হইয়া গেল; এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ-গ্রস্তা হইয়া গেলেন। নোয়াখালিতে আর এক মূর্ত্ত্ত তিষ্ঠান আমার পক্ষে দায় হইয়া উঠিল। শকরের হত্যাকারীর এবং অমরকুমারের পুলিশ-অহুসদ্বান চলিতে লাগিল। পুলিশসাহেব আমার এক্সাহার লিখিয়া লইয়া গেলেন। আমি সকল ভার জগদীশের উপর দিয়া পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেণ্টের অহুমতি লইয়া উন্নতা সহধর্ম্মীকে সঙ্গে করিয়া কৌদায় চড়িয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। জগদীশ ও তাঁহার পত্নী সাফ-নয়নে আমাদের বিদায় দিলেন। জগদীশের একজন অহুচর আমাদের সীমারে তুলিয়া দিবার জন্য আমাদের সহিত কৌদায় উঠিল।

“আসিয়াছিলাম চারি জন। দুইজনকে জন্মের মতন নোয়াখালিতে রাখিয়া ফিরিতেছি মাত্র দুই জন। তাহাও একজন আমার সংজ্ঞাহীন উন্মাদিনী। জানি না, কোন্ অশুভ-ক্ষণে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম।

কৌদায় উঠিয়া দুই পার্শ্বে পানিফলের পাতা দেবিতে দেবিতে চলিলাম। কৌদা এক একটা বৃহৎ খাউবক্ষ কুঁদিয়া নৌকার আকারে নিৰ্ম্মাণ করা হয়। তাহা দৈর্ঘ্যে বার চৌদ্দ হাত বা তদপেক্ষাও বড় হইয়া থাকে, কিন্তু প্রস্থে এক-জন মানুষ বসিতে পারে মাত্র। মাথার উপর নৌকার ছায়া ছাপর আছে। ইহার এক মুখ সরু, অপর মুখ অপেক্ষাকৃত কিছু চওড়া। এই যানকে এ-প্রদেশে ‘কৌদা’ বলিয়া থাকে। এই কৌদায় চাপিয়া ‘লাকসামে’ আসিয়া ট্রেনে উঠিলাম। উন্মাদিনী ভাষ্যাকে লইয়া অতিশয় সাবধানে সতর্কভাবে চলিলাম। আকাশে অল্প মেঘ দেখা দিল; গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। ট্রেনে একটা কামরা রিজার্ভ করা ছিল। তাহার চারিপার্শ্বেই সার্বী তুলিয়া-দিলাম, কেবল নিজে যেখানে বসিয়াছিলাম সেই দিকটা তুলিয়া রাখিলাম। দুই পার্শ্বে থাক্তের ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে নিজের দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে চলিলাম। যথাসময়ে পত্নীকে সাবধানে নামাইয়া মেঘনা-পদ্মা পার হইবার নিমিত্ত সীমারে উঠিলাম। বড় ভয় করিয়াছিলাম, কেমন করিয়া এ উন্মাদ-রোগগ্রস্তাকে লইয়া নামা উঠা করিব। কিন্তু একটা আমার সৌভাগ্য যে, প্রত্যেকবারই নামিতে উঠিতে তিনি কোনও বাধা দেন নাই; সহজ মানুষের ছায়া কৌদা হইতে ট্রেনে, ট্রেন হইতে সীমারে উঠিয়াছিলেন। এখন যাহা হউক, ভগবৎকৃপায় আর একবার

নামা উঠা করিয়া বাটা পৌছিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই। ভাবিনাম, বাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘো হইয়া গেল। জগদীশের লোকটী আমাদের ঈশ্বর তুলিয়া দিয়া বিদায় লইয়া ফিরিয়া গেল। আমি নবজর্গার হাত ধরিয়া প্রথম-শ্রেণীর একটা কামরায় প্রবেশ করিলাম। এতক্ষণ নবজর্গা নীরবে দীর্ঘভাবে আমার অনুসরণ করিতেছিলেন। এইবার কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জোর করিয়া আমার হাত হইতে হাতটা ছিনাইয়া লইয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, “কি আক্ষেপ তোমার! এত রাত পর্য্যন্ত ছেলটী ঘরে এল না, একটুও ভাবনা নেই? আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি তোমার কাণ্ড দেখে! দেখ না একবার অমর কোথায় গেল?”

“দেবী তখন দ্বিতীয় প্রহর। আমি কটে অশ্রু ও হৃদয়ের শোক দমন করিয়া বলিলাম, “বন্ধু যে অমরকে খুজতে গেছে, এখন এসে পড়ে এই! বন্ধু জগদীশের ছদ্মনক তৃত্যোর নাম। আমার কথা শুনিয়া আর কোন ঐকান্তিক না করিয়া বিরক্ত ভাবে মুখটা ভাঁজ করিয়া নবজর্গা শুইয়া পড়িলেন। পুঞ্জারা অভাগিনীর চক্ষে আজ তিন দিন নিদ্রা নাই; আহার নাই। আমি তাহার মাথার কাছে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলাম, কতক্ষণে বাড়ীতে পৌছাইব। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা মানব-বুদ্ধির অগোচর। আমি অল্পমনস্ক ভাবে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলাম; হঠাৎ একটা কলরব কর্ণে প্রবেশ করিতে আমার চিন্তাশ্রোত রুদ্ধ হইয়া পড়িল। ব্যাপার কি জানিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিলাম; দেখিগান নদীতে একটা ঘূর্ণি বাতাস উঠিয়া মেঘনার

মেঘবর্ণ প্রবল বারিরাশি সগর্বে ক্ষীত হইয়া যেন আকাশ স্পর্শ করিবার জন্য ছুটতেছে; জাহাজ তোলপাড় করিতেছে; চালক কিছুতেই তাহা স্থির রাখিতে সমর্থ হইতেছে না। কাপ্তেন-সাহেব নিজ কামরা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কম্পাস-দ্বারা চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সারেং, খালাসি, বয় প্রভৃতি সকলে “টর্গেডো” “টর্গেডো” বলিয়া ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে সমবরে চিৎকার করিয়া উঠিল। আরোহিণের মধ্যে সভয় চকিত আকুল আত্মনাম শ্রুত হইতে লাগিল। ঈশ্বর বুঝি জলমগ্ন হয়! সে জাহাজে অনেক ডজন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। পুঞ্জার বন্ধের পরে কেহ কার্য্যস্থলে যাইতেছিলেন, কেহ স্থানান্তরে যাইতেছিলেন, কেহ স্থানান্তরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, গৃহে ফিরিতে-ছিলেন; কেহ বা বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া ফিরিতেছিলেন। সকলেই ভীত ও সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। প্রাণের মায়া বড় মায়া। কেহ বিপদভঞ্জন মণ্ডুহৃদনকে ডাকিতে লাগিলেন, কেহ হরির লুট, পীরের সিঁদ্রি মানিতে লাগিলেন। আমি নীরব, নিস্পৃহ, নির্বিকার। আমার সংসারের একমাত্র বন্ধন ছিল অমর, সে যখন নাই, তখন এ জীবন থাকিলেই বা কি, আর যাইলেই বা কি! পতি-পত্নী একত্রে আছি, একত্রেই জীবলীলা সমাধা হইয়া বাইবে, ক্ষতি কি? মৃত্যু আর আমাদের অধিক অনিষ্ট কি করিতে পারিবে? “বাঁচি-য়াই বা আর আমাদের স্থখ কি? প্রবল বাতায় জাহাজের মানস ভাঙ্গিয়া গেল, তল-দেশ ভাঙ্গিয়া জাহাজে জল প্রবেশ করিতে লাগিল। জাহাজ মধ্যে জালিবোট বেশী ছিল

না। বাহা ছুই চারিখানা ছিল, তন্মধ্যে লোক তুলিয়া কাপ্তেন-সাহেব তাহা দিগকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দিতে লাগিলেন। উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া মেঘনা যেন রণোন্মত্তা পাগলিনী হইয়া গর্জন করিতে লাগিল। সে কি বিকট ভয়ের শব্দ! তেমন শব্দ আমি জীবনে কোন দিন শুনি নাই। আরোহীদের মধ্যে একটা কাতর ক্রন্দন ও হাহাকার-ধ্বনি সমুথিত হইল। স্বপ্ন জীবন রক্ষার জন্ত সকলেই ব্যস্ত, সকলেই কাতর! জালিবোটে অসম্ভব লোক জোর করিয়া উঠিয়া পড়িতে লাগিল। এত লোক জালিবোটে উঠিলে তাহাদের জীবন নিরাপদ না হইয়া বিপন্ন হইবারই অধিক আশঙ্কা বলিয়া কাপ্তেন-সাহেব আরোহীদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু এ আসন্ন মৃত্যুর সময় কে তাহা শুনিবে? মৃত্যুর করাল ছায়া বিভীষিকা-রূপে তাহাদের সম্মুখে তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছিল। কেমন করিয়া তাহারা স্থির হইয়া থাকিবে! আমি নবহুর্গার হাত ধরিয়া ডেকের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সৌভাগ্যের বিষয় নবহুর্গা কোন প্রকার গোলযোগ না করিয়া উদাস-নেত্রে সেই জনতার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আর অলক্ষণ মাত্র! জাহাজ জলমগ্ন হয় হয়! কোন কোন ব্যক্তি পীষারে বসিয়া মরা অপেক্ষা জলে ঝাঁপ দিয়া মরা ভাস বলিয়া মেঘনায় অগাধ বারিরাশির মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। আমি নবহুর্গার হাত ধরিয়া মৃত্যুর জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সেই বিশৃঙ্খল জনতার মধ্যে আমাকে ধীরে ধীরে প্রশান্ত-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কাপ্তেন সাহেব খুব সন্তুষ্ট হইলেন। আমার নিকটে

আসিয়া ইংরাজিতে বলিলেন, “দত্তবাদ, বাবু, আপনি যথার্থ বুদ্ধিমান! মানুষের মৃত্যু অনিবার্ণ; যে প্রকারে হউক, মৃত্যু তো একদিন অবশ্যই ঘটিবে। তার জন্ত মানুষের সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকা আবশ্যিক। মৃত্যুকে সম্মুখ দেখিয়া বুঝা কাগজকাটা চিংকার করিয়া লাভ কি?” আমিও ইংরাজীতে উত্তর করিলাম, “ঠিক কথা।” জাহাজ ক্রমশঃ নামিয়া যাইতে লাগিল, ডেকের উপরেও জল উঠিল। ছুই একজনের দেখাদেখি ক্রমে অনেকেই জলে লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। জাহাজ জলমগ্ন হইতে দেখিয়া চতুর্দিক হইতে ‘সাম্পেন’-ওয়ালারা ‘সাম্পেন’ লইয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ‘সাম্পেন’ অতিক্ষুদ্র পান্যদ্রব্যের আকার। প্রবল সমুদ্র-মধ্যেও তাহা নির্ভয়ে যাতায়াত করিতে পারে এবং জলমগ্ন ব্যক্তিদিগকে জলদেবতার হ্রাস রক্ষা করিয়া থাকে। যখন ডেকের উপর হাঁটু-প্রমাণ জল উঠিল, তখন আমিও আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। অপরাপরে মত আমিও নবহুর্গার হাতখানা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া উভয়ে জলে পড়িলাম। বাল্যকালে আমার খুব সঁতার কাটার অভ্যাস ছিল, সেই সাহসে আমি এমন অসম-সাহসের কাজ করিয়াছিলাম; মনে করিয়াছিলাম, কিছু দূর সঁতার কাটিয়া গিয়া একখানা সাম্পেন ধরিব, কিন্তু আমার ভ্রম! নিরীহ গদা-বক্ষে বা দীর্ঘ-পুষ্করিনীতে সঁতার দেওয়া আর প্রবল তরঙ্গদ্বারা পদ্ম-মেঘনায় সঁতার দেওয়াতে যে কত স্বর্ণ-মর্ত প্রভেদ, তাহা পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। তাহাতে আবার আমি একা নই! সাধ্য কি

যে সেই উত্তাল তরঙ্গের হস্ত অতিক্রম করিয়া দুইটা জীবন রক্ষা করি? সাম্প্রদায়িক ধর্মের বলিয়া যতই অগতির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া ততই আমাকে হঠাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ আমার হস্তপদ যেন শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল; ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লোপ পাইতে লাগিল। পরে কি হইল, তাহা আর আমার মনে নাই। যখন বেশ জ্ঞান লাভ করিলাম, তখন দেখিলাম আমি ও নবহর্গা একখানা সাম্প্রদেয় রহিয়াছি। মনে বড় আনন্দ হইল। ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। যে আমি কিছুক্ষণ পূর্বে একাগ্রচিত্তে মৃত্যুর কামনা করিতেছিলাম, এখন সেই আমিই মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি তাবিয়া যথার্থই বড় আনন্দিত হইতেছিলাম। মাহুষের জীবন অত্যন্ত লোভনীয়। মাহুষ সংসারের নিম্পেষণে নিম্পেষিত হইয়া সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দিবসে সহস্রবার মৃত্যু কামনা করে, কিন্তু মৃত্যু যখন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য সহস্র চেষ্টা করিয়া থাকে। সাম্প্রদায়িকতার আঁধার আঁধার চাঁদপূরের ঘাটে নামাইয়া দিল। সাম্প্রদায়িকতার সেদিন নিজ নিজ সাম্প্রদায়িকতায় অনেকেরই জীবনরক্ষা করিয়াছিল। আমরা চাঁদপূরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কিছু দূরে অপর একজন সাম্প্রদায়িক একটা ক্ষুদ্র বালককে তাহার নাম, ধর্ম, তাহার পিতার নাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতেছে, কিন্তু বালক কোন কথাই উত্তর-দানে সমর্থ হইতেছে না।

দূর হইতে আমি বুঝিতে পারিলাম, এ অপর কেহ নয়, এ আমারই হারানিধি। দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম। কিন্তু শিশু আমার বক্ষে আসিয়া শান্ত হইল না। তখন তাহাকে ধীরে ধীরে বক্ষ হইতে নামাইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতেই দেখিলাম, এ কি? এত আমার অমর নয়! ঠিক তাহারই মত দেখিতে পড়ে; কিন্তু শারীরিক গঠনে অনেক প্রভেদ রহিয়াছে। তাহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আশ্চর্য! অতি অদ্ভুত সৌন্দর্য। দুইটা মাহুষের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য কখনও দেখি নাই। এমন কি সমস্ত-ভাইয়ের মধ্যেও এরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় না। আমি মুহূর্তের জন্য তন্ত্রিত হইয়া রহিলাম। পরে আরও দেখিলাম, বালকটির পৃষ্ঠদেশে উকি দিয়া লেখা রহিয়াছে—“অমরকুমার বহু!” তখন আমার বিশ্বাসের সীমা রহিল না। ‘অমরকুমার বহু’!—এ যে আমারই পুত্রের নাম। যাহা হউক, প্রকৃতিস্থ হইয়া বুঝিলাম, আমার ছাত্র আর কোনও হতভাগ্য বা হতভাগিনী আজ মেঘনা-গর্ভে এ অমূল্য নিধি হারাইয়াছে। দুই শিশুর মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিয়া মনে মনে তৎক্ষণাৎ এক মতলব জাঁটলাম। স্বল্প বালকটিকে লইয়া নবহর্গার নিকটে গিয়া বলিলাম, “এই নাও, তোমার অমর এসেছে।” নবহর্গা সানন্দে বালকটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া বালকের মুখখানি ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, “আজ কোথায় বেড়াতে গেছলি বাবা? এত রাত্ হয়ে গেল, আমি ভেবে নদ্বিলুম!” বালক নবহর্গার বুকে মুখ

ভাঁজিয়া রহিল; কোন উত্তর করিল না। তাহার আয়ত চক্ষুঃর হইতে ছই বিন্দু অশ্রু কপোল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। এ দৃশ্য দেখিয়া আমারও ছই চক্ষু শুক রহিল না। আমি ছই হস্তে আমার চক্ষু-ছইটা মুছিয়া ফেলিলাম। নবহর্গার ধারণা এ যেন সেই কাল রাত্রি, আর অমর যেন অধিক রাত্রিতে গৃহে ফিরিয়া আসিল। সাম্পেন-ওয়ালারা দেখিয়া শুনিয়া মনে করিল ছেলেটি আমারই, তাই তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু ছেলেটি আপনীর?” আমার মুখ দিয়া চটু করিয়া বাহির হইল, ‘হ্যাঁ’। একজন হাত পাতিয়া বলিল, “বাবু বখশিস্?” অপর একজন রোষ-কশায়িতলোচনে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, “ছি-ছি। বখশিস্ চাইচিস্ কি বলে? দেখচিস্ না, বাবুও জলে ডুবে গেছেলেন!” নীচজাতীয় লোকের এবং-প্রকার মহত্ব দেখিয়া বাস্তবিক বড় আনন্দিত হইলাম। আমার হাতে কয়েকটা হীরকাজুহীয়া ছিল, তাহাই খুলিয়া আমি তাহার হাতে দিলাম। তাহারা সানন্দে আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। বালকটাকে লাভ করিয়া আমার জ্বর উন্নততা ক্রমশঃ কাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যায়িত এবং আনন্দিত হইলাম; কিন্তু দেখিলাম, তাহার পূর্ব্বস্থিতি ফিরিয়া আসে নাই। বালকটি যে তাহার গর্ভজাত নহে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সে ভুল ভান্দিয়া দিতে আমারও আর ইচ্ছা হইল না। আমি ভাবিতে লাগিলাম—‘ছেলেটি আমার, এই মিথ্যা কথা বলিলাম, প্রবঞ্চনা করিলাম; লোকে আমার নিন্দা করিবে, কক্কু। আমাকে

মিথ্যাবাদী প্রতারক বলিবে বলুক; আমি এ-রত্ন অপরকে দিতে পারিব না। আমার উন্মাদিনী পত্নীর বক্ষ হইতে যদি কেহ এ রত্ন কাড়িয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে অভাগিনীর মৃত্যু ঘটবে।’ বিধাতা আমার বুকের ধন কাড়িয়া লইয়াছেন, আমি অপরের বুকের ধন কাড়িয়া লইলাম। না, না, কাড়িয়া লই নাই; বিধাতা আমার পরীক্ষার নিমিত্ত এ-রত্ন আমার নিকটে প্রেরণ করিয়া-ছেন, কিন্তু আমি এমনি স্বার্থপর যে নিজের সুখের জন্য অন্যায়সে অপরের ধন নিজের বলিয়া দখল করিয়া লইলাম। বিধাতার পরীক্ষায় জয়লাভ করিতে সমর্থ হইলাম না, লোভ-সংবরণ করিতে পারিলাম না। হয় ত চেঁচা করিলে বালকটির পিতা-মাতার অনুসন্ধান পাওয়া যাইত, কিন্তু আমি তাহা করিলাম না। নিজের পত্নীর বুক তাহাকে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। নিজের সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছিলাম; পরের মুখ চাহিলাম না। আমি ঘোর স্বার্থপর নির্ধর যথাপাতকী। হে ভগবন! তোমার অধম সন্তানকে মার্জনা কর। বথাসময়ে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি নবহর্গা ও ছেলেটাকে লইয়া পুনরায় অস্ত্র ট্রেনে উঠিলাম। দেখিলাম, নবহর্গা ছেলেটিকে খাবার খাঙইয়া দিতে দিতে হাসিয়া হাসিয়া কি কথা বলিতেছেন। বালকটিও তাহার বাল-শুলভ সুকোমল মধুমাধা স্বরে তাহার কণার উত্তর প্রদান করিতেছিল। তাহা দেখিয়া আমার সমস্ত হৃদয় অনেক শীতল হইল। নিদারুণ পুত্রশোক যেন অনেক পরিমাণে লঘু হইল বলিয়া মনে হইল।

“তাহার পর কতদিন কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কহারাও নিকটে কোনওদিন এ রহস্য ভেদ করি নাই। বালকটিকে নিজ-পুত্রের মতমই জ্ঞান করিয়াছি, পুত্রের মতনই প্রতি-পালন করিতে লাগিয়াছি। তাহাকে পাইয়া বখাৰ্খই আমি পুত্র-শোক বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আর নবচূর্ণা ত জ্বলিত হই পালিলেন না যে, বালকটী তাহার গর্ভস্থাত নয়। কোন দিন আমি একথা বলিও নাই! বালকটিও জানিতে পারিল না যে, আমরা তাহার জনক জননী নই। বালকের সরল অন্তঃকরণ নিজের পিতামাতা ও অমরকুমার কথা সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে এ রহস্য জানি কেবল আমি। কিন্তু এ জীবনে এ রহস্য কাহারও নিকটে প্রকাশ করিতে পারিব না; পত্নী স্বর্গগতা হইয়াছেন, আমারও জীবনদীপ নির্বাণিত প্রায়; এ রহস্য সংসারে প্রকাশ হইবার আশঙ্কাও আর বড় একটা নাই।

কিন্তু কেন কি জানি, এখনও মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি কোন দিন আমার হস্ত-নিদি কিরে আসে, যদি সে বাঁচিয়া থাকে! হায়! তাহা হইলে সে যে দীন ভিখারীর মতন তাহার গৃহস্থার হইতে ফিরিয়া যাইবে! তাহার নির্ধূর পিতা যে তাহাকে তাহার সকল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। সে আসিলে তাহাকে কেহ চিনিতেও পারিবে না। যদি তাহার শৈশবের কথা মনে থাকে,—আমার মৃত্যুর পরে যদি সে কখনও আসিয়া আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া গৃহস্থারে দাঁড়ায়, তাহা হইলে সকলে তাহাকে চোর, ধূর্ত, প্রবঞ্চক বলিয়া ছব দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে, কিন্তু সে চোর নয়, চোর আমি; ধূর্ত প্রবঞ্চক সে

নয়, ধূর্ত প্রবঞ্চক শঠ আমি। তাহার পানে ছয়টা আঙ্গুল ছিল। চিহ্নের মধ্যে শুধু এই।

ক্রীউপেন্স কিশোর বহু,
জমিদার,
আজিমগঞ্জ।”

আশালতা খাতাখান টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল। অমরকুমার সঙ্গে সঙ্গে পত্নীকে বক্ষে ধারণ করিলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব; উভয়েরই হৃদয়-মধ্যে ঘোরতর বিপ্লব বহিয়া যাইতেছিল। উভয়ের চক্ষুই সজল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে সম্মুখে পত্নীর মুখ-খানি দুই হস্তে তুলিয়া ধরিয়া গদগদ-স্বরে অমর বুঝাইয়া বলিলেন, “পিতৃ-মাতৃহীন অজ্ঞাত-কুলশীল, দীন ভিখারী, একটা কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে আমি,—আর এই হতভাগা তোমার স্বামী! লতা, বল দেখি, একে পারবে কি প্রজ্ঞা কর্তে?”

আশালতা তাহার দক্ষিণ হস্তখানি স্বামীর মুখের উপর চাপা দিয়া কৃত্রিম কোপ-সহকারে বলিল, “কেবল ঐ কথা?”

(২)

উপরি উক্ত ঘটনার পরদিবস দিবা দ্বিতীয়প্রহরকালে একটা প্রশস্ত কক্ষ-মধ্যে আশালতা একাকী বসিয়াছিল। তাহার মনটা বড়ই অস্থির! অমরকুমার কি একটা কার্য বশতঃ বাটা হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিলেন। একাকী আশালতার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না; সব যেন ফাঁকা ফাঁকা শূন্য শূন্য বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। দাস-দাসী-পোরজন-মণ্ডিতা বৃহৎ পুরী যেন আজ তাহার পক্ষে খাঁ খাঁ

করিতেছিল। একদিন পূর্বে কত বস্তু কত আগ্রহে সে এই গৃহে গৃহিণী-পণা করিয়াছিল, আর একটা মাত্র কথা জ্ঞাত হইয়া একদিনের মধ্যেই যেন তাহার জীবনের সব পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। তাহার সে যত্ন সে আগ্রহ যেন কোথায় বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। পরিবর্তনশীল জগতের ইহাই কি নিয়ম? আজ কেবলই তাহার মনে হইতেছিল, ‘এ-সব কাহার? এ পরের গৃহ পরের সম্পত্তি, এ সকল স্পর্শ করিবার তাহার অধিকার নাই।’ স্পর্শ করিবার স্পৃহাও তাহার আর ছিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল,—এ প্রাণানতুল্য পুরী পরিত্যাগ করিয়া কোন নির্জন প্রদেশে সামান্য পর্ণকূটরে স্বামীর সহিত বাস করিতে পারিলে, ইহা অপেক্ষা সে সহস্রগুণ শাস্তি লাভ করিবে। জগতে একমাত্র স্বামীই যে তাহার আপনাত। স্বামী ভিন্ন এ পৃথিবীতে তাহার ত আর কেহ নাই, কিছু নাই। এ যে পরের গৃহ, পরের সম্পত্তি, পরের পরিজন! তবে কাজ কি এ সকলে? কাজ কি এ পরস্ব-উপভোগে? তাহার হাতে একখানা কাশীরাম দাসের মহাভারত ছিল। সে দময়ন্তীর উপাখ্যান পাঠ করিতেছিল; ভাবিতেছিল, নলরাজ্য দূতপণে রাজ্যসম্পত্তি সর্বস্ব হারাইয়া ভ্রাতাকে সকল দান করিয়া কেন চলিয়া গিয়াছিলেন, রাণী দময়ন্তীও ত তাহা দেখিয়া তাঁহার পরিষেয় বসন ভূষণ সব পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর অহুগামিনী হইয়াছিলেন। পরের গৃহে বাস করা, পরাম্ভ ভোজন করিয়া জীবনধারণ করা অপেক্ষা বনবাস সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। যে-ধনে কোনও

দাবি-দাওয়া নাই, যে সম্পত্তিতে আইন বা ধর্মতঃ কোনও অধিকারও নাই, বাহা পরের স্বৈচ্ছাকৃত দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে, এমন ওজন-করা কৃপার আকাঙ্ক্ষাকে আশালতা বড় হেয় জ্ঞান করে। তেমন কৃপার ভিখারিণী সে নয়। কিছুকণ মহাভারতখানা লইয়া পাঠ করিয়া, আর তাহা ভাল লাগিল না; মহাভারত রাখিয়া সে বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বাতায়নের নিম্নে বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান। এই উদ্যানটী অমরকুমারের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কত পুষ্পবৃক্ষ অমরকুমার ও আশালতা উভয়ে স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন; কাহার গাছে আগে ফুল কেটে তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা নিজের নিজের গাছটীকে কত যত্ন করিয়াছেন, স্বহস্তে জল ঢালিয়াছেন। সে এক অকৃত্রিম আনন্দের দিন গিয়াছে। সে-দিন আর কিরিবে না! উদ্যানটী বৃহৎ। উদ্যান-মধ্যে ছোট বড় দেশী বিলাতী, নানা-জাতীয় পুষ্প ও ক্রোটনের গাছ শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে সজ্জিত। প্রত্যেক বৃক্ষের তলদেশে শ্বেত-উপলখণ্ডদ্বারা বৃক্ষের নাম লেখা। মধ্যে মধ্যে মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিতা বেদী। সেই বেদীর উপরে স্থাপিত মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত নয়নারীর মূর্ত্তি! মূর্ত্তিগুলি কোনও স্তম্ভ ভাস্কর-শিল্পি দ্বারা নির্ম্মিত; হঠাৎ দেখিলে যেন জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। অতি সূক্ষ্ম! মনোমুগ্ধকর! কোনও মূর্ত্তির হস্তে ফুলের সাজি; একটা কৃত্রিম পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়নে উদ্যত। কোনও মূর্ত্তির হস্তে কৃত্রিম পুষ্পক; মূর্ত্তিটি একাগ্রমনে অধ্যয়নে রত। একটা নারী-মূর্ত্তির হস্তে একটা কৃত্রিম কাণাত্মা;

রমণী সহান্তে পাখীর গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন; তাহার পাদ-প্রান্তে দাঁড়াইয়া একটা ক্ষুদ্র উলঙ্গ শিশু;—শিশু একহস্তে রমণীর বসনাগ্রভাগ ধরিয়া, অপর হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া পক্ষি-শাবকটী গ্রহণের জন্য ব্যগ্রভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আবার কোম কোম নর-নারী মূর্তি নংজাহু হইয়া করজোড়ে উর্দ্ধ-মুখে ভগবানের ধ্যানে বিভোর। মেথিলে মনঃপ্রাণ স্বতঃই ভক্তি-রসে আদ্রুত হইয়া উঠে। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটা কৃত্রিম উৎস। কলটি টিপিয়া দিলে স্রোত-নির্মিত ব্যাঙ্গ-মুখ হইতে অজস্র বারি-ধারা নির্গত হইতে থাকে। মধ্যে মধ্যে মন্দির-প্রস্তরের বসিবার বেদী। বেদীর ধারে ক্ষুদ্র লতাকুঞ্জ। কুঞ্জের স্রামল ছায়ায় প্রথম গ্রীষ্মের সময়েও সমস্ত উদ্যানটী বেশ শিথল থাকে। উদ্যানতল নবশস্যাক্রমে আবৃত; ঠিক যেন প্রাকৃতিকরূপে উদ্যানের শোভা-বৃদ্ধি-হেতু হরিৎবর্ণের একখানা গালিচা বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন! উদ্যানের চতুর্দিক দৃঢ় প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত। প্রবেশদ্বারে দুই দ্বার্ষ্য কারুকার্য-বিশিষ্ট দুইটা স্তম্ভ। স্তম্ভের মস্তকে দুইটা সিংহ-মূর্তি বদন-ব্যানান করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত। স্তম্ভগাত্রে আলোক-লতার গাছ উঠিয়া স্তম্ভ-দুই টাকে যেন স্বর্ণ-বর্ষে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। আশালতা বাতায়ন-দ্বার্ষ্যে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া নির্নিমেঘ দৃষ্টিতে উদ্যানের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অতীত কালের কত কাহিনীই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িল, সেই যখন একাদশ-বর্ষবয়ঃক্রমকালে ঢেলীর কাপড়

পরিয়া মুকুট মাথায় দিয়া নববধূরূপে প্রথম এ গৃহে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন সে এ সমস্ত তাহার নিজের বলিয়াই ভাবিয়াছিল। নিজের বর-সংসার নিজের স্বত্ত্ব-শাস্ত্রী, আত্মীয়, বন্ধু, পরিজন, সমস্তই তাহার নিজের বলিয়াই সেই পর্য্যন্ত সে জানিত। আজ একদিনে এক কথায় এত দিনের সেই সমস্তই পর হইয়া গিয়াছে। একটা কথায় সে সকলের নিকট হইতে দূরে—অতিদূরে গিয়া পড়িয়াছে। সে দূরের পরিমাণ অনন্তগগনস্পর্শী! তাহার সীমা নাই সখ্যা নাই! এ কুলের ত সে কেহ নয়ই, তা ছাড়া সে যে কোথায় কোন্ গৃহের, কোন্ কুলের বধূ তাহারও স্থিরতা নাই। তাহার আরও মনে হইতে লাগিল, স্বত্ত্ব-শাস্ত্রীর অগাধ অপরিসীম স্নেহ! কি আশ্চর্য্য, পরের পুত্রকে পরের বস্ত্রকে মানুষ কি এমন অকৃত্রিম ভালবাসিতে পারে? এমন মনঃস্পর্শী প্রাণ-ঢালা ভালবাসা! এমন অপরিসীম স্নেহ, এত বহু! আশালতা নিজের পিতা মাতার কাছেও বোধ হয়, কোন দিন তাহা পায় নাই। এই স্নেহময় স্বত্ত্ব-শাস্ত্রী তাহার নিজের নয়! একথা ভাবিতেও আশালতার কষ্ট হইতে লাগিল। তাহার চক্ষু-দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। মনে মনে সে বলিয়া উঠিল, 'না না, তোমরা যেই হও—আপনার হও, পর হও—তোমরা এখন স্বর্গবাসী! বাবা, মা, মাগো! তোমরা আমার চির-আরাধ্য, নমস্যা পূজনীয়। আমি চিরদিন তোমাদের দেবতার মত শ্রদ্ধা করিব; মনে মনে চিরদিনই তোমাদের এইভাবে পূজা করিব। আমি তোমাদের কোন দিন পর ভাবিতে পারিব না।'

আশালতা বাতায়ন-পার্শ্ব হইতে সরিয়া আসিল। অমরকুমারের জ্ঞাত তাহার মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। কতক্ষণ অমরকুমার গৃহে কিরিয়া আসিবেন্ সেই প্রতীক্ষায় সে চট্ কট্ করিতে লাগিল। একাকী বসিয়া বসিয়া তাহার মনটা যেন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে সে পিয়ানোটো লইয়া বাজাইতে বসিল এবং পিয়ানোর সঙ্গে গাহিতে লাগিল—

স্থখে আমায় রাখবে কেন ?

রাখ তোমার কোলে,

যাক না গো স্থ জলে।

যাক না পায়ের তলার মাটি,

তুমি যখন ধুববে আঁটি

তুলে নিয়ে দোলাবে ঐ

বাহুর দোলার দোলে।

সেখানে ঘর বাঁধব আমি,

আসে আশুক বান,

তুমি যদি ভাগ্যও মোরে

চাই নে পরিভ্রাণ।

হার মেনেছি মিটেছে ভয়,

তোমার জয়তো আমারি জয়,

ধরা দেব তোমায় আমি

ধুব্বো যে তাই হলে।

ক্রমে স্বর পঞ্চমে মিশিল। গানের সহিত নিজের সত্তা মিশাইয়া দিয়া আশালতা উদগীর হইয়া গাহিতে লাগিল। এমন সময় অমরকুমার আশালতার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং আশালতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রেমপূর্ণ অনিমেষ-দৃষ্টিতে আশালতার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার মুখে স্বপ্নীয় হাসি, কদরে বিমল

আনন্দ! আশালতার চম্পককলিকাবৎ অঙ্গুলিগুলি কেমন পিয়ানোর তালে তালে নৃত্য করিতেছিল, কাল মেঘের মতন কুঞ্চিত কেশগুলি কেমন তাহার কপোল-দুইখানি আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। কতকগুলি কেশ পৃষ্ঠদেশ দিয়া শোফার উপর পতিত হইয়া কুণ্ডলীকৃত কৃষ্ণসর্পের মত দেখাইতেছিল। অমরকুমার তন্ময়চিত্তে বিভোর হইয়া প্রিয়তমার রূপরূপা পান করিতে লাগিলেন। আশালতা আপন মনে গাহিতেছিল। স্বামীর আগমন সে মোটেই জানিতে পারে নাই। আরও কতক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইত বলা যায় না, কিন্তু হঠাৎ অমরকুমারের নিষ্ঠুর কাশি বৈরিতা সাধন করিল। আশালতা ত্রস্তে কিরিয়া চাহিয়া প্রিয়তমকে দেখিবামাত্র লজ্জায় যত্নপর নাই সঙ্কচিত হইয়া পড়িল। তাহার সুন্দর মুখখানি একেবারে ঘোর হিন্দুরবর্ণ হইয়া উঠিল। অমরকুমার মুহূর্ত হাসিয়া আশালতার একখানা হাত ধরিয়া সম্মুখে বলিলেন, “আমার কাছে এত লজ্জা কেন, আশা? বেশ সুন্দর ত গাহিতেছিলে, আর একটু গাও না, শুনি!”

আশালতা অভিমান-ভরে অমরকুমারের হস্ত হইতে নিজের হাতটা জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বলিল, “চুরি ক’রে আমার গান শোনা হচ্ছিল।”

অমরকুমার তাহার স্বভাবসিদ্ধ স্তম্ভুর উচ্চ হাস্তে ঘর পূর্ণ করিয়া বলিলেন, “বেশ! উচ্চ বিচারপতি বটে! কলি কাণ কি না! নিজের জিনিষ নিয়ে উপভোগ করলে গাছের বৃক্ষি চোর হয়? তোমাকে গান-বাজনা শিখিয়েছিলুম কেন? শুনব বলেই

ত আমি ত আর লুকিয়ে পর-স্বীর গান
তিনি নি !”

আশালতা আর কোন উত্তর করিতে
সমর্থ হইল না ; পরাজিতা হইল । অমর-
কুমার বিজয়ী বীরের মত সগর্বে সাগরে

পদ্মীকে বক্ষে ধরিলেন । কিছুক্ষণ পরে জৈনক
ভূতা আসিয়া সংবাদ দিল—“বড়বাবু
আসছেন ।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীচাক্ষুশীলা মিত্র ।

নবোভা

সরম-কম্পিত বক্ষ, চকিত, সভয়,
মৃদু-ভাষ, বীর-গতি, দৃষ্টি নধুময় !
ফুটে কি না ফুটে হাসি অধরে মিলায়,
প্রাণ কেড়ে লয় তবু আমিরা বিকায় !

উদায় সবার আগে মেলিয়া নয়ন
বন্দিয়া আনন্ত-শিরে পতির চরণ
কক্ষে কক্ষে গৃহকর্মে আপনা বিলায়
নাহি শান্তি, নাহি শান্তি, বিশ্রাম কোথায় !

নিশীথে পতির বক্ষে আশ্র-সমর্পণ
আশা-আকাঙ্ক্ষার কত নিবিড় মিলন !
চুম্বনে শিহরে কভু, কভু আলিঙ্গনে
যেনে লয় নারীজন্ম সার্থক ভুবনে !

অচেনা অজানা জনে করিয়া আপন
বরণে কল্যাণ-শান্তি আনন্দে কেমন !

শ্রীকীর্ত্তীকুমার দত্ত

কাণ্ডা-পথে ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

কাণ্ডায় আমাদের একজন বিশেষ আত্মীয়
পূর্বেই পরিবার সহ গিয়াছিলেন । তিনি
আমাদের জন্ত ওধানকার তাৎকালিক দেবীর
মন্দিরের নিকটবর্তী একটা ছোট বাড়ী ঠিক
করিয়া রাখিয়াছিলেন । তাহাতে আমরা
রাইয়া উঠিলাম । সে রাত্রির আহার সেই
আত্মীয়ের বাটী হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিল ।
পৰশ্রমে এত রাস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে,
কোন ক্রমে আহার-সমাপন করিয়া শয়ন

করিবামাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া
পড়িলাম । আরামদায়িনী স্নান নানি
নিদ্রার কোড়ে বিশ্রাম পাইয়া সকল ক্লান্তি
দূর হইল । নিদ্রার স্রাব এমন সুখকর আর
কিছুই নাই, মাতুষ যতই পরিশ্রম করিয়া
আহুক না কেন, একবার নিদ্রিত হইলে
তাহার সকল ক্লান্তি দূর হইবে ।

আমাদের বাড়ীটা তাৎকালিক-দেবীর মন্দি-
রের সম্মুখেই ছিল । প্রাতঃকালে নহবন্তের

বাঘ্য এবং পূজা হইত, বেলা ১২ টার সময় শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া দেবীর ভোগ দেওয়া হইত এবং সন্ধ্যার সময় পুনরায় নহবৎ বাজাইয়া পূজা ও আরতি হইত। তৎপরে অনেক লোক মিলিয়া সঙ্গীতের স্বরে মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ করিত।

ভাওয়াল-মন্দির একটা পীঠস্থান। এখানে দেবীর কোন এক অঙ্গ পড়িয়াছিল। সেই-অঙ্গ এই মন্দিরে সর্বদাই মহা ধুমধাম দেখিলাম। কত দূর দেশ-দেশান্তর হইতে দলে দলে শত শত লোক পূজা দিতে আসিতেছে! লোকের কোলাহলে সর্বদাই মন্দির পরিপূর্ণ।

১৯০৫ সালে কাংড়ার ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে কাংড়ায় একটি বাড়ীরও চিহ্ন ছিল না; সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়াছিল। পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, দুইধারে ভগ্ন মন্দির-সমূহের চিহ্ন আজিও বর্তমান রহিয়াছে। যখন ভূমিকম্পে বাড়ী ঘর পড়িয়া যায়, তখন এই ভাওয়াল-দেবীর মন্দিরও পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মন্দিরটা সমস্তই প্রায় পড়িয়া গিয়াছিল, কেবল দেবী-প্রতিমার কোন ক্ষতি হয় নাই। এক্ষণে নূতন মন্দির তৈয়ার হইতেছে। মন্দিরটা অনেকটা ভুবনেশ্বরের স্তায় গঠিত হইতেছে। মন্দির-সংলগ্ন অনেকগুলি ধরমশালা প্রস্তুত আছে; তাহাতে যাত্রীদিগের কোন কষ্ট হয় না। মোকান-পাটও মন্দির-সংলগ্ন, একজ্ঞা যাত্রীদের সবিশেষ সুবিধা।

এখানকার বাড়ীগুলি কোনটি বা দ্বিতল কোনটি বা ত্রিতল। দেওয়ালগুলি প্রস্তরের ইটকে নির্মিত। দরজা, জানালা কাটের দ্বারা নির্মিত। বড় বড় স্টেট পাথর

বিছাইয়া তাহার উপর মাটি ফেলিয়া এক-তালার ছাদ প্রস্তুত; দ্বিতলের ছাদ করোগেট আয়রণ-দ্বারা নির্মিত। এ-স্থানে গ্রীষ্মকালে তেমন গরম নাই; প্রায়ই বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি হইলে পথে বাদা হয় না; কারণ উচু নীচু পথ, জল গড়াইয়া খাদে পড়িয়া যায়।

বাক্সারের পথগুলি প্রস্তর দিয়া বাধান; বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অদূরে নদীর শব্দ শোনা যাইত। কি ভীষণ শব্দ! ভূমিকম্পের পর বহু লোক পুরাতন কাংড়া ছাড়িয়া এই ভাওয়ালে আসিয়া বাড়ী-ঘর প্রস্তুত করিয়া বসবাস করিতেছে। এখানে হাসপাতাল, ছেলেদের স্কুল, একটা মেয়েদের স্কুল, একটা কন্যদের হাসপাতাল ও বাছারী ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে।

লোকদিগের যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত এখানকার নদীতে মাঝে মাঝে সেতু নির্মিত আছে; যেখানে সেতু নাই, সে-স্থানের লোকেরা মসকে চড়িয়া নদী পার হয়।

আমরা ভাওয়ালে দুই মাস জিলাম। এখানে যেমন মন্দির, তেমনি কুণ্ডও আছে। এক-একটা মন্দিরের সঙ্গে এক-একটা করিয়া কুণ্ড আছে। কুণ্ডগুলির নাম—সূর্য্যকুণ্ড, চক্রকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, রামকুণ্ড, ইত্যাদি। সূর্য্যকুণ্ডের জল ভাওয়ালের লোকেরা পান করে। কুণ্ডগুলিতে জল অল্পই আছে। আমাদের দেশের বড় চৌবাচ্চার মতন ইহার চারি দিক্ পানির দিয়া বাধান; তাহার মাটি আছে; সেখান দিয়া বুড়্-বুড়্ করিয়া সর্বদাই জল উঠিতেছে।

কুণ্ডগুলির জল এত পরিষ্কার যে তলা পর্য্যন্ত দেখা যায়। আমরা প্রতিদিনই কুণ্ডে

মান করিতে বাইতাম। জল অপরিষ্কার হইবে বলিয়া তাহার ভিতরে নামিয়া মান করা নিষেধ; এজন্য সকলেই জল তুলিয়া মান করে। আমরা মূনিবরণ-নামে একটা কুণ্ড দেখিলাম; ওনিলাম, সেট কুণ্ড-সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পূর্বেকালে তাহার চারিধারে মূনিঈশিয়া বসিয়া তপস্বী করিতেন; এজন্য তাহার নাম মূনিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই কুণ্ডটি হইতে এত জল উঠিতোছে যে, দুইটা পাখরের বাথের মুখের ভিতর দিয়া কুণ্ড হইতে অনবরত জল বহিরা নদীতে গিয়া পড়িতেছে। এই বাথের মুখের নীচে মান করিবার নিমিত্ত পাথর দিয়া বাধান আছে। এখানে মান করিয়া অত্যন্ত আশ্রম হইল।

ভাওয়াল হইতে পুরাতন কাংড়া প্রায় এক মাইল দূরে। এখানে একটা দুর্গ দেখিলাম। সেই দুর্গ ভূমিকম্পে প্রায় ভূমিসাৎ হইয়াছে। যে ভয়াবশেষ গুলির চিহ্ন আছে, তাহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্গের ফটকটা লোহের দ্বারা নিশ্চিত; ফটকটা আজিও অটুটভাবে দাঁড়াইয়া হইয়া দুর্গটার পূর্বকালের ঐখণ্ডের সাক্ষ্য দিতেছে। একটা বৃহৎ নদীর দ্বারা দুর্গটার চারিদিক বেষ্টিত, দেখিলাম। এই সকল চিহ্নে অতীত ইতিহাসের কত কথাই মনে করিয়া দিল! পুরাতন কাংড়া, ওনিলাম, বামচন্দ্রের সময়ের অতিপুরাতন স্থানের স্থল ছবি, টাঙ্গা ও পুরাকালের আরও অনেক জিনিষ পাওয়া গিয়াছে।

এখানকার পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা বহু দূর হইতে মন্দিরে পূজা দিতে আসে। এই

সকল স্ত্রীলোকেরা পথে সকলে মিলিয়া সঙ্গীত করিতে করিতে পর্বতের উপর উঠে। সেই সঙ্গীত করিবার একটু বৈচিত্র্যও দেখিলাম। স্ত্রীলোকেরা একটু করিয়া উপরে উঠে, আর তিন-চারিজন মৃণালী করিয়া দাঁড়াইয়া দুই লাইন গান গায়ে, আবার চলিতে আরম্ভ করে। এইরূপ করিয়া ইহার পাগড়ে চড়ে। ইহাতে পাগড়ে, চড়িতে উহাদের কোনও কষ্ট হয় না। স্ত্রী, পুরুষ, সকলে মিলিয়া যখন ‘জয় ভাওয়াল মাইকি জয়’ বলিয়া উঠে: যখন চিৎকার করে, তখন বড়ই স্থলর লাগে।

পাহাড়ী স্ত্রীলোকের পোষাক বহু রং-বেরংয়ের। এই পোষাককে “পেগওয়াঙ্গী পোষাক” বলে। একটা পুরা হাতের কুর্তা ও পা-পর্ধ্যন্ত পাজামা; ইহার উপর বুক হইতে পা পর্যন্ত ঘাঘরা। তাহার উপরে মস্তক ও সর্কশরীর আচ্ছাদন করিয়া ওড়না। আমার বাড়ীর দ্বিতলের উপর বসিয়া সর্কদা ইহাদের যাতায়াত দেখিতাম এবং বেশ ভাল লাগিত। প্রায় দুই মাস শেষ হইয়া আসিল তথাপি এখান হইতে ফিরিতে ইচ্ছা হইত না, এমন স্থলর মনোহর স্থান!

ভাওয়ালের সম্মুখে এক সুবিশাল পর্বত। তাহার উচ্চশৃঙ্গ বরফে আচ্ছন্ন! এই পর্বতের নাম সূমেকপর্বত। শীতের সময় সূমেকপর্বত বরফের মধ্যে ডুবিয়া থাকে, গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া জল হইয়া নদীর স্রোতের বৃদ্ধি করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির একটা নূতন মাধুরী পরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

পুনরায় লাহোরে ফিরিবার আয়োজন

করিতে লাগিলাম। ১লা সেপ্টেম্বর লাহোরে পৌছিতে হইবে। সেজন্য তিন দিন পূর্ব হইতেই বাহির হইতে হইল। বিবেচকের বিশ্বশ্রুতির যে মহাদৃষ্ট ও সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবিয়াছিলাম, ইচ্ছা না থাকিলেও জোর করিয়া মনকে তথা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিতে হইল। সংসারী মানুষের ইহাই শাস্তি।

যে পথ দিয়া আসিয়াছিলাম, সেই পথ দিয়া যাওয়া হইবে; সে-জন্য সবই জানা ছিল। আবার দুই মাস পরে একদিন মধ্যাহ্ন ২ টার সময় সেই নির্জন সঙ্গীর্ণ পার্কতা পথ দিয়া জুইখানা জীর্ণ টম্‌টম চড়িয়া আমরা কিরিয়া চলিলাম; মনটা অত্যন্ত খারাপ হইল। সেই সুন্দর পথ, পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেক লোকের বাড়ী, তুষারচ্ছন্ন অভূতদেয়ী সুমেক পর্বত এবং পর্বতের মধ্য দেশে

সুসুন্নত সুন্দর শ্রী-সম্পন্ন বৃক্ষরাজী দেখিতে দেখিতে আমরা অগ্রসর হইলাম।

এবার কিরিবার পথে সবই জানা ছিল, সেজন্য তেমন কষ্ট হয় নাই; একদিন পরেই লাহোরে গিয়া পৌছিলাম।

যেটা যেমন করিয়া বলিলে ভাল হইত, যেটা যে ভাবে বর্ণনা করিলে ঠিক কথাটা ও ভাবটা প্রকাশ হইত, হুর্কল লেখনী তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না, আর যে রকম করিয়া দেখালে ঠিক দেখা হইত, তাহাও আমার মোটেই হয় নাই।

চারিদিকে কি সুন্দর স্বর্ণের দৃষ্ট, পরমেশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য মহিমা দর্শন করিলাম, তাহা এ জীবনে ভুলিবার নয়। এখন সে দিনের কথা যখন মনে করি, সব যেন স্বপ্নের স্থায় মনে হয়।

শ্রীবিভুবালা মিত্র।

প্রেমময়ী

যত আশা আছে মোর লইয়া তোমায
মিটিবারে চায়,

যত ব্যথা আছে মোর তোমার ছায়ার
জুড়াইয়া যায়,

যতই উদ্বেগ মম সাধনার আশে
চাহে তব পানে,

যতই ব্যর্থতা মম সিদ্ধি পথে পথে
তোমার আস্থানে।

অমিয় করহ মম গরল হিমার
অমৃত রূপিনি!

ঐশ্বর্য করহ যত দীনহী আমার
হে পরশ-মণি!

বেহর মরমে মম তব স্বর বাজে
মধুর কঙ্কারে,

জন্মের শূন্য কক্ষে তব হিরা রাজে
পূর্ণ করিবারে।

যা কিছু আছিল তব কর্ণকল সহ
তুলি' ধরি' দিয়া

আপনা তুলিবে কিসে ভাব অহরহঃ
আমার লাগিয়া!

শত জনমের দুখ মনে নাহি গণি'
সাদি' তপস্তায়

হুর্জিত দেবক আনি' ওগো তপস্বিনি!
দিতেছ আমার।

শ্রীভবকৃতি বিদ্যায়ত্ন।

জপজী ১

যে যুগ চারে আরজা হোর দণ্ডনী হোই ।
নবী খণ্ডা বিচ জানিই, নাল চলৈ সত্ কোই ॥
চলা নাউ রথায়টেক, যণ কীরতি জগ লেই ।
যে তিস্ নদরি ন আবই, ত বাত ন পুইহে
কেই ॥

কীট অম্মরি কীট করি, দোদী দোব ধরে ।
নানক, নিরগুনী গুণ করে, গুণবন্ত্যা গুণ দে ॥
তেহা কোই ন জুই, যি তেন গুণ কোই করে ॥

[যে=যদি (কাহারও তপস্তা-হেতু) ;
যুগচারে=চারি যুগ ব্যাপিয়া ; আরজা=
পরমায়ু ; হোর=আরও ; দণ্ডনী =দশগুণ ;
হোই=হয় ।

নবী খণ্ডা বিচ=নব-খণ্ডযুক্ত পৃথিবীর
মধ্যে সকলেই ; জানিই=তাহাকে জানে
নাল চলৈ সত্ কোই=সকলে তাহার অমুভবতা
হয় ।

চলা নাউ রথায়টেক=যদি তাহার ভাল
নাম রাখে ; যণ কীরতি জগ লেই =জগতে
যণ ও কীর্তি লাভ করে । যে তিস্ নদরি ন
আবই=যদি তাহার দৃষ্টি ভগবানে পতিত
না হয় । ত বাত ন পুইহে কোই=তাহা
হইলে তাহার কথা আর কেহই জিজ্ঞাসা
করে না ।

কীট অম্মরি কীট করি=তখন তাহার
অন্তিমীচ কীট-যোনিতে জন্ম হয় । দোদী
দোব ধরে =পানীরাও তখন তাহার নিম্বাবাদ
করে ।

নানক=নানক বলিতেছেন । নিরগুনী
কর=তিনি ত্রিগুণাতীত পুরুষ, অথচ

তিনি গুণের আধার ; গুণবন্ত্যা গুণ দে=
ভক্তকে তিনি ভোগৈশ্বর্য্য দেন । তেহা কোই
ন জুই=কিন্তু এ-সংসারে এমন কাহাকেও
দেখি না । যি তিস্ গুণ কোই করে=যে
সেই ভক্তকে ভোগৈশ্বর্য্য-সংশ্লিষ্ট-হেতু মায়াতে
নিপাতিত করিতে পারে ।]

অর্থ—"যদি কাহারও তপস্তা-হেতু চারি
যুগ ব্যাপিয়া অথবা তাহারও দশগুণ পরমায়ু
হয়, যদি নবখণ্ডযুক্ত পৃথিবীর মধ্যে সকলেই
তাহাকে জানে এবং সকলে তাহার অমুভবতা
হয়, যদি তাহার উৎকৃষ্ট নাম রাখা হয়, এবং
যদি সে জগতে যণ ও কীর্তি লাভ করে,
কিন্তু এ-সকল লাভ করিয়াও যদি তাহার
দৃষ্টি ভগবানের উপর পতিত না হয়, তাহা
হইলে তাহার কথা আর কেহই জিজ্ঞাসা
করে না ; তখন তাহার অন্তিমীচ কীট-
যোনিতে জন্ম হয়, এবং পানীরাও তখন
তাহার নিম্বাবাদ করে । নানক বলিতেছেন,
সেই ব্রহ্ম গুণাতীত পুরুষ, অথচ তিনি গুণের
আধার ; ভক্তকে তিনি ভোগৈশ্বর্য্য প্রদান
করেন ; কিন্তু এ সংসারে এমন কাহাকেও
দেখি না, যে সেই ভগবদ্ভক্তকে ভোগৈশ্বর্য্য-
সংশ্লিষ্ট-হেতু মায়াতে নিপাতিত করিতে
পারে । অর্থাৎ ভগবানের দিকে দৃষ্টি ঐক্যিলে
তাহার আর কোন ভয়ের কারণ থাকে না ।"

৮

তনিই সিধ পীর সুরনাথ ।
তনিই ধরতী ধবল আকাশ ।
তনিই বীণ মোহ পাতাল ।
তনিই পৌহি ন সঠৈ কাল ।

নানক ভগতা সদা বিকাশ।

তনিতৈ হুঃখ পাপকা নাশ।

[পরমেশ্বরের নাম-মায়ায় বর্ণিত হইতেছে।

তনিতৈ=পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া।

সিখ=সিদ্ধ; পীর=পীর; সুর=দেবতা;

নাথ=শুদ্ধ গৌরব-নাথের পদ্যায় যোগিগণ;

ইহার আগন আপন পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তনিতৈ ধরতী ধবল আকাশ=পরমেশ্বরের

নামের প্রভাবে পৃথিবী, ধবল অর্থাৎ ধবল

বৃষ বাহা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে এবং

আকাশ নিরাধার অবস্থিতি করিতেছে।

তনিতৈ দীপ লোহ পাভাল=ভগবানের নাম

স্মরণ করায় ভগবন্তের সপ্তদীপের, সপ্ত-

লোকের এবং সপ্তপাভালের সমস্ত পদার্থের

জানলাভ হয়। তনিতৈ পোহি ন সটেক কাল

=ভগবানের নাম স্মরণ করায়, কাল

ভগবন্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। নানক

=নানক বলিতেছেন। ভগতা=তাহার ভক্ত;

সদা=সদাই; বিকাশ=প্রকৃত। তনিতৈ

হুঃখ পাপকা নাশ=ভগবানের স্মরণে সাধকের

হুঃখ এবং অনেক জন্মের পাপ দূর হইয়া

যায়।]

অর্থ—“ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সিদ্ধ,

পীর, দেবতা এবং নাথ-যোগিগণ, সকলে

আগন আপন পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। পর-

মেশ্বরের নামের প্রভাবে, পৃথিবী, ধবল বৃষ

(যিনি পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন) এবং

আকাশ নিরাধার অবস্থায় অবস্থিতি

করিতেছে। ভগবানের নাম স্মরণ করায়

ভগবন্তের সপ্তদীপের, সপ্তলোকের, এবং

সপ্তপাভালের সমস্ত পদার্থের জানলাভ হয়।

ভগবানের নাম স্মরণ করায়, কাল ভগবন্তকে

স্পর্শ করিতে পারে না। নানক বলিতেছেন,

ভগবানের ভক্ত সদাই প্রকৃত। ভগবানের

স্মরণে সাধকের হুঃখ এবং অনেক জন্মের

পাপ দূর হইয়া যায়।”

২

তনিতৈ ঈশ্বর বরমা ইন্দ।

তনিতৈ সুখি সালাহন মন্দ।

তনিতৈ যোগ যুগতি তনি ভেদ।

তনিতৈ শাসএ সিমুতি বেদ।

নানক, ভগতা সদা বিকাশ।

তনিতৈ হুঃখ পাপকা নাশ।

[তনিতৈ ঈশ্বর বরমা ইন্দ=ভগবানের

নাম স্মরণে শিব, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রতাপমান

হইয়াছেন। তনিতৈ সুখি সালাহন মন্দ=

ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া “মন্দ” অর্থাৎ

নীচ জাতিও তত্ত্বলাভ করে ও ভগবানের

স্তুতিগান করে। বখা গীতায়—“অপিচৎ

হুহুরাচারো ভজতি-নামনস্তাক্। সাধুয়েব

স মন্তব্যঃ সম্যথাবাসিতা হি সঃ।”

তনিতৈ যোগ যুগতি তনি ভেদ=ভগবানের

নাম স্মরণ করায় সাধক আপনা হইতেই

যোগফল-লাভ করিয়া থাকে ও তাহার

“তনিভেদ” অর্থাৎ ঘটক্রভেদ হইয়া থাকে।

বখা পাভলে—“ঈশ্বরপ্রাধিকার্য বা”।

তনিতৈ শাসএ সিমুতি বেদ=ভগবানের নাম-

স্মরণে শাস্ত্র, স্মৃতি এবং বেদের জ্ঞান আপনা

হইতেই তত্ত্বজ্ঞানে প্রকাশিত হয়। নানক=

নানক বলিতেছেন। ভগতা সদা বিকাশ=

ভক্ত-জন্ম সদাই বিকশিত, অর্থাৎ জ্ঞান, বর্ণ

ও সৌন্দর্য্যে বিকশিত। তনিতৈ হুঃখপাপকা

নাশ=ভগবানের নাম স্মরণ করায় হুঃখ

এবং জন্ম-জন্মান্তরের পাপ নষ্ট হইয়া যায়।]

অর্থ—ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া শিব, ব্রহ্মা, ও ইন্দ্র প্রভাপবান্ হইয়াছেন। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া নীচজাতিও ভক্তিস্নাত করে ও ভগবানের স্তুতিগান করে। ভগবানের নাম স্মরণ করায় সাধক আপনা হইতেই যোগফল লাভ করিয়া থাকে ও তাহার বটুকুন্তের হইয়া থাকে। ভগবানের নাম-স্মরণে শাস্ত্র, স্মৃতি এবং বেদের জ্ঞান আপনা হইতেই ভক্ত-হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। নানক বলিতেছেন, ভক্ত-হৃদয় সদাই বিকশিত, অর্থাৎ জ্ঞান, ধর্ম ও দৌন্দর্য্যে বিভূষিত। ভগবানের নাম-স্মরণ করায় দুঃখ এবং জন্মজন্মান্তরের পাপ কাটিয়া যায়।

১০.

তুনিয়ৈ সৎ সন্তোষ জ্ঞান।

তুনিয়ৈ অষ্টসিটিকা ইস্নান।

তুনিয়ৈ পঢ়ি পঢ়ি পাবহি মান।

তুনিয়ৈ লাগৈ সহজি ধিয়ান।

নানক, ভগতা সদা বিকাশ।

তুনিয়ৈ দুঃখ-পাপকা নাশ।

[তুনিয়ৈ সংসন্তোষজ্ঞান—ভগবানের নাম শ্রবণে সত্য, সন্তোষ এবং জ্ঞানলাভ হয়। তুনিয়ৈ অষ্টসিটিকা ইস্নান—ভগবানের নাম শ্রবণে ৬৮ তীর্থ-স্থানের ফললাভ হয়। পঢ়ি পঢ়ি পাবহি মান—ভগবানের নাম শ্রবণে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সম্মানলাভ হয়। তুনিয়ৈ লাগৈ সহজি ধিয়ান—ভগবানের নাম-শ্রবণে সহজে ধ্যান-ধারণা হয়।]

অর্থ—ভগবানের নাম-শ্রবণে সত্য, সন্তোষ ও জ্ঞানলাভ হয়; তাঁহার নাম-শ্রবণে ৬৮ তীর্থস্থানের ফললাভ হয়; তাঁহার নাম-শ্রবণে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সম্মান-লাভ হয়; তাঁহার

নাম-শ্রবণে সহজে ধ্যান-ধারণা হয়; নানক বলিতেছেন, ভগবন্তের হৃদয় সদাই বিকশিত; ভগবানের নাম শ্রবণে দুঃখ ও জন্ম জন্মান্তরে পাপ দূর হয়।

১১

তুনিয়ৈ সরা গুনাকে গাহ্।

তুনিয়ৈ সেখ পীর পাতসাহ্।

তুনিয়ৈ অন্ধে পাবহি রাহ্।

তুনিয়ৈ হাথ হোবৈ অসগাহ্।

নানক, ভগতা সদা বিকাশ।

তুনিয়ৈ দুঃখ-পাপকা নাশ।

[সরা, গুনাকে—সর্বগুণের আধার সেই ভগবানের; গাহ্—গাথা, গান; তুনিয়ৈ—ভক্তগণ শ্রবণ করিয়া থাকেন।

তুনিয়ৈ সেখপীর পাতসাহ—তাঁহার গুণ-শ্রবণে সেখ, পীর এবং বাদশাহ পদবী পাইয়াছেন।

তুনিয়ৈ অন্ধে পাবহি রাহ—তাঁহার গুণ-গান শ্রবণে মোহাক্ত ব্যক্তিগণও কল্যাণ মার্গ প্রাপ্ত হ'ন। তুনিয়ৈ হাথ হোবৈ অসগাহ—তাঁহার গুণগান-শ্রবণে সংসার-সমুদ্র এক হাত মাত্র বোধ হয়, এবং ভক্ত তাহা অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়।]

অর্থ—সর্বগুণের আধার সেই ভগবানের গান ভক্তগণ সদা শ্রবণ করিয়া থাকেন; তাঁহার গুণগান শ্রবণে সেখ, পীর, এবং বাদশাহগণ মহান পদবী পাইয়াছেন। তাঁহার গুণগান-শ্রবণে মোহাক্ত ব্যক্তিগণও কল্যাণ-মার্গ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার গুণগান-শ্রবণে অকূল সংসার-সমুদ্র অতিক্রম হইয়া যায় ও ভক্ত তাহা অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়। নানক বলিতেছেন, ভগবন্তের হৃদয় সদাই বিক-

সিত ; তাঁহার গুণগান-শ্রবণে হৃৎক এবং
জন্ম-জন্মান্তরের পাপ দূর হয়।”

১২

মনেকি গতি কহি ন যাই ।
যে কে কহৈ পিছে পছতাই ॥
কাগদি কলম ন লিখন হার ।
মনেকা বহি কর ন বিচার ॥
এয়া নাম নিরঞ্জন হোই ।
যে কো মন জ্ঞানৈ মনকোই ॥

[মনে কি গতি-নাউকে মনেকি গতি—
নামে মন লাগাইয়া থাকার যে অসংখ্য ফল ;
কহি ন যাই—তাহা কথায় প্রকাশ করা
যায় না।

যে কো কহৈ পিছে পছতাই—যদি কেহ
সেই ফল ব্যক্ত করিতে চায়, তাহা হইলে
তাহাকে শেষে অহুতাপ করিতে হয়, অর্থাৎ
ব্যক্ত করা অসম্ভব ; অথবা ইহাও অর্থ হইতে
পারে—“আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা
তথা।”

কাগদি কলম ন লিখন হার—যে ফল
কাগজ-কলমে লিখিয়া ইয়ত্তা করা যায় না।

মনেকা বহি কর ন বিচার—ইহার ফল
কোন পুস্তক বিচার করিতে পারে নাই।
এয়া নাম নিরঞ্জন হোই—সেই নিরঞ্জন পুরু-
ষের নামের গুণ এইপ্রকার অব্যক্ত। যেমন
পতিব্রতা জীব পতিব্রতা-ধর্ম তিনি নিজেই
বুঝিতে পারেন, আর কেহ তাহা বুঝিতে
পারে না, এবং অপরকে তাহা বুঝাইয়া
দেওয়াও যায় না, সেইরূপ নামজপের ফল,
যিনি জপ করেন, তিনিই জানেন, অপর
বুঝে না, বা অপরকে তাহা বুঝানও যায় না।

যে কো মন জ্ঞানৈ মনকোই—যে মনে

সেই আনন্দ বুঝিযাছে, সে হৃদয়কোষে সেই
আনন্দ ভোগ করে।]

অর্থ—“নামে মন লাগাইয়া থাকার যে
অসীম ফল, তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না ;
যদি কেহ সেই ফল ব্যক্ত করিতে চায়, তাহা
হইলে তাহার অসমর্থতা-হেতু সে অহুতাপ
করে ; কাগজে লিখিয়া সে ফলের ইয়ত্তা করা
যায় না, এবং ইহা কোনও পুস্তকেও বিচার
করিতে পারে নাই। সেই নিরঞ্জন পুরুষের
নামের গুণ এই প্রকার অব্যক্ত। যে সাধক
মনে সেই নামানন্দ বুঝিয়াছে, হৃদয়কোষে
সেই আনন্দ সে উপভোগ করে।”

১৩

মনৈন সুরত হোটে মন বুদ্ধি ।
মনৈন সগল ভবনকী সৃষ্টি ॥
মনৈন মুহি চোটাঁন খায় ।
মনৈন যমকি সাথ ন যায় ॥
এয়া নাম নিরঞ্জন হোয় ।
যে কো মন জ্ঞানৈ মন কোয় ॥

[মনৈন=নামে মন লাগাইয়া থাকিলে ।
সুরত=একাগ্রতা । মন বুদ্ধি=মনে জ্ঞানের
সঞ্চার । হোটে=হয় । সগল=সমস্ত ।
ভবনকী=ভবনের, অর্থাৎ জিভবনের এবং
তদন্তর্গত সমস্ত বস্তুর ॥ সৃষ্টি=জানিলাভ
হয় । মুহি=যুগ্মে । চোটাঁ=আঘাত । ন
যায়=পায় না । যমকি সাথ ন যায়=যম-দ্বারে
যাইতে হয় না।]

অর্থ :—“ভগবানের নামে মন লাগাইয়া
থাকিলে মনে একাগ্রতা ও জ্ঞানের সঞ্চার
হয়। তাঁহার নামে মন লাগাইয়া থাকিলে
জিভবনের ও তদন্তর্গত সমস্ত বস্তুর জ্ঞান
লাভ হয়। তাঁহার নামে মন লাগাইয়া

থাকিলে মুখে আঘাত পাইতে হয় না, এবং
যমের সঙ্গে বাইতেও হয় না। সেই নির্মল
পুরুষের নামের এমনই গুণ। যে তাঁহার
নামানন্দ বুঝিয়াছে, সে হৃদয়কোষে সেই
আনন্দ উপভোগ করে।”

১৪

মংনৈ মারগ ঠকি ন পায়।

মংনৈ পতন্তো পরগট যায় ॥

মংনৈ মগন চটল পংখ।

মংনৈ ধর্মসেন্তী সমবংধ ॥

এয়া নাম নিরঞ্জন হোয়।

যে কো মন জটনৈ মন কোয় ॥

[মংনৈ = নামে মন লাগাইয়া থাকিলে।

মারগ = রাস্তায়, অর্থাৎ সাধন-পথে। ঠকি =
বাটা। ন পায় = পায় না। পতন্তো = সম্মানের
সহিত। পরগট = সংসার-সমুদ্রের পরপারে।
মগন = ভগবত্বাবে মগ্ন হইয়া। চটল পংখ =
সাধন-পথে চলিতে থাকে। ধর্মসেন্তী = ধর্মের
সঙ্গে। সমবংধ = সম্বন্ধ হয়।]

অর্থ।—ভগবানের নামে মন লাগাইয়া
থাকিলে, সাধন-পথে বাধা পাইতে হয় না।
তাঁহার নামে মন লাগাইয়া চলিলে সংসার-
সমুদ্র সম্মানের সহিত পার হওয়া যায়।
তাঁহার নামে মন লাগাইয়া থাকিলে ভগবত্বাবে
মগ্ন হইয়া সাধক সাধন-পথে চলিতে থাকে
এবং ধর্মের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হয়। সেই
নিরঞ্জন পুরুষের নামের এমনই গুণ! যে
তাঁহার নামানন্দ বুঝিয়াছে, সে হৃদয়কোষে
সেই আনন্দ উপভোগ করে।”

১৫

মংনৈ পাবহি মোখ-দুয়ার।

মংনৈ পরবারৈ সাধার।

মংনৈ তরে তাঁটৈ গুরুশিখ।

মংনৈ নানক ভবহি ন ভিখ ॥

এয়া নাম নিরঞ্জন হোয়।

যে কো মন জটনৈ মন কোয় ॥

[পাবহি = প্রাপ্ত হয়। মোখ-দুয়ার =

মোক্ষের দ্বার অর্থাৎ সংসার। পরবারৈ = সমস্ত
পরিবারের। সাধার = উদ্ধারের কারণ হয়।
(যেমন ঋষ, প্রহ্লাদ সমস্ত পরিবারের উদ্ধার
সাধন করিয়াছিলেন।) তরে = তরিয়া যায়।
তাঁটৈ = তরাইয়া দেয়। গুরুশিখ = গুরুশিষ্য
উভয়কেই। নানক = নানক বলিতেছেন।
ভবহি ন ভিখ = তাহাকে আর পার্থিব
বিষয়ের জন্য প্রার্থনা বা আশ্রয় করিতে
হয় না; ভগবান্ নিজেই তাহাকে যোগ-
ক্লেম প্রদান করেন।]

অর্থ।—“ভগবানের নামে মন লাগাইয়া
থাকিলে মোক্ষদ্বার অর্থাৎ সংসার লাভ হয়।
তাঁহাতে যে মন লাগাইয়া থাকে, সে পরি-
বারস্থ সমস্ত আত্মীয়-কুটুম্বকে ঋষ-প্রহ্লাদের
জায় উদ্ধার করে। তাঁহাতে মন লাগাইয়া
থাকা হেতু গুরুশিষ্য—উভয়েরই উদ্ধার হয়।
তাঁহাতে মন লাগাইয়া থাকিলে কিছুই
অভাব থাকে না। সেই নিরঞ্জন-পুরুষের
নামের এমনই গুণ! যে মনে তাঁহার নামানন্দ
বুঝিয়াছে, সে হৃদয়কোষে সেই আনন্দ উপ-
ভোগ করে।”

(ক্রমঃ)

ঐজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত ॥

মুখা ।

(১)

বারণ ক'রে আয়না তোরা,
আজ্জকে সখি অমণ ক'রে,
কানন পথে বাজার বাশী
প্রাণ মাতান করণ ঘরে ;
(২)

হতাশ প্রাণের রুদ্ধ ব্যাথা,
গুঞ্জরিয়ে বাশীর তাণে,
কাহার হৃদয় লক্ষ্য করি
চাচ্ছে কে আজ আকুল প্রাণে ?
(৩)

ফুলগুলি সব শিউরে উঠে,
পড়ুছে ঝরে বকুল মূলে,
আপন হারা মুগ্ধ তরু
লতার সোহাগ গেছে ভুলে ;
(৪)

পাগল হাওয়া নিচল নীরব
যায়নিক' সে লতার পাশ,

তাদের সনে ক'রতে খেলা,
ক'রতে চুরি ফুলের বাস ;
(৫)

পাপিয়া তার গেছে ভুলে,
চোকে গেল সেই মধুর গান,
নীরব তাহার কণ্ঠবীণা
বাশীর তানে মুগ্ধ প্রাণ ;
(৬)

অবশ আমার মুগ্ধ হিয়া,
নিরালা ওই শ্রাম কাননে,
সকল বীধন তুচ্ছ ক'রে
পড়বে লুটে তার চরণে ।
(৭)

বারণ ক'রে আরলো তোরা,
আজ্জকে তোদের ধরি পায়,
উদাস বাশীর করণ তানে,
ঘরে থাকা হলো দায় ॥
ঐশীরেজনাথ চৌধুরী ।

প্রসূতি ও সন্তান মঙ্গল ।

শিশুদের মঙ্গলের উপর জাতির
ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ।

(বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-কমিশনারের প্রচারিত
বিজ্ঞপ্তি হইতে গৃহীত) ।

প্রসূতির কল্যাণের সহিত শিশুর কল্যাণ
বিজড়িত । শিশুর স্বাভাবিক বর্ধন প্রসূতির
স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে । প্রসূতি-রক্ষার
সুব্যবস্থা না করিলে সন্তান-রক্ষা হইতে পারে

না । প্রসূতির স্বাস্থ্য-রক্ষার সুব্যবস্থার উপর
জাতির উন্নতি নির্ভর করিয়া থাকে ।

কোন কোন বিষয়ের উপর শিশুর মঙ্গল
নির্ভর করে ?

১। জনক-জননীর স্বাস্থ্য ও সদ্ভাবে
জীবন যাপন ।

২। সন্তান-প্রসবের সময় সমাগত হইলে
প্রসূতির অতিরিক্ত পরিশ্রম না করা, তাহার

আহার অগ্রচর না হওয়া, তাহার মানসিক বিরক্তির কোন হেতু না ঘটা।

৩। গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান-প্রসবের পরে প্রসূতি যতদিন শয্যাশায়িনী থাকেন ততদিন তাহার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত সুশিক্ষিতা দাত্তী নিযুক্ত করা।

৪। প্রসবান্তে প্রসূতি যতকাল শয্যাশায়িনী থাকিবেন ততদিন তাহার যথোচিত সেবা ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকা।

৫। সন্তান বাহাতে মাতৃতত্ত্বে পূর্ণ হইতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা।

৬। সন্তান বাহাতে সর্বদা গৃহে বুদ্ধিমতী জননীর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

মাতৃত্ব।

মাতৃত্ব পরম পবিত্র। যে-দিন সন্তান জন্মলাভ করে, উহার ১ মাস পূর্বে যে কোন সময়ে প্রসূতির কোন প্রকার অনিষ্ট হইলে অজ্ঞাত মাতৃজঠরবাসী সন্তানকেও সেই ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। প্রসবকালে কোন প্রকার অবরূপ হইলে উহার দ্বারা জননী ও সন্তান উভয়ের অনিষ্ট হয়। প্রসবান্তে সন্তান যত দিন সন্তপণে জীবন ধারণ করে ততদিন তাহার স্বাস্থ্য জননীর স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

শিশু-মৃত্যু।

বঙ্গদেশে প্রত্যেক বৎসর যত শিশু জন্মে, উহাদের মধ্যে ৩ লক্ষ এক বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্বেই পরলোক যাত্রা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দুই লক্ষ শিশুর বয়স ১ মাস না হইতেই তাহারা প্রাণত্যাগ করে। অনেক শিশুই এমন রুগ, এমন

ক্ষীণ, এমন অবসন্ন ভাবে জন্মে যে তাহারা অনেকক্ষণ জীবন ধারণ করিতে পারে না। সন্তানের এইরূপ দুর্বলতার কারণ এই যে, গর্ভাবস্থায় প্রসূতির স্বাস্থ্যের বিন্দুমাত্র যত্ন করা হয় নাই। সুতরাং এই দেশের ভ্রূণ-বহু শিশু-মৃত্যু নিবারণ করিতে হইলে প্রসূতিদের স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সন্তান-ধারণ-ক্লেশ।

বঙ্গদেশে প্রত্যেক বৎসর প্রসব-ক্লেশ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাধিতে ২৫৩০ হাজার প্রসূতি প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন।

সন্তান-প্রসবের পরে অনেক প্রসূতি জরে মরিয়া থাকেন। এই জর নির্বার্য। অশিক্ষিতা “দাই”দের দোষে প্রসূতিদের এই জর হয়।

বঙ্গের ১ শত কি ৮০ জন প্রসূতির মধ্যে ১ জন প্রসব কালে প্রাণত্যাগ করেন। এই দেশের প্রসূতিরা যত সন্তান প্রসব করেন, উহাদের ২০ সন্তানের মধ্যে ৩ কি ৪টি ১মাস মধ্যে মরিয়া থাকে।

এমন প্রাণ ক্ষয় হয় কেন?

বঙ্গদেশে এমন ভাবে সন্তান ও প্রসূতিরা প্রাণ হারাইতেছেন। প্রসূতিদের তত্ত্বাবধানের যত্ন ব্যতী শিক্ষিতা দাত্তী পাওয়া না যাইবে, তাবৎ এইরূপ মৃত্যু নিবারিত হইবে না।

প্রসূতির যত্ন।

সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পূর্বেই (১) প্রসূতির স্বাস্থ্যতত্ত্বাবধানের নিমিত্ত সুশিক্ষিত চিকিৎসক, সেবিকা ও দাত্তীর সহায়তা পাওয়া দরকার।

(২) প্রসূতিকে পুষ্টিকর খাদ্য এবং প্রচুর পরিমাণে ছুড় পান করিতে দেওয়া উচিত।

(৩) প্রসূতিকে প্রচুর পানীয় এবং পরিষ্কৃত জল পান করাইবে।

(৪) প্রসূতির ঘেন কোষ্ঠ কাঠিন্য না হয়।

(৫) প্রসূতি ঘেন প্রত্যাহ নান করিয়া সর্বাঙ্গ পরিচ্ছন্ন রাখেন।

(৬) প্রসূতির বিশ্রাম ও নিদ্রা প্রচুর হওয়া চাই।

(৭) প্রসূতি একেবারে অলস হইয়া থাকিবেন না। তাহার সামান্য কাধ্য করা উচিত।

(৮) প্রসূতির উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্রাদি থাকিবে। তাহার মন ভাল রাখিবার জন্য আয়োদের ব্যবস্থা থাকা বিধেয়।

(৯) প্রসূতি যাহাতে বাহিরের বিষুদ্ধ হাওয়ায় বেড়াইতে পারে, অথবা তাহার শয়ন-গৃহে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুর চলাচল হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

গর্ভাবস্থায় তত্ত্বাবধান।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ প্রসূতিই গর্ভাবস্থায় শিক্ষিতা দ্বারী পরামর্শ পাইতেছেন না।

শিক্ষিতা দ্বারী এই দেশে দুর্ভিক্ষ, কষ্ট জাতির ভবিষ্যৎ প্রসূতি ও শিশুদের মঙ্গলের উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং এই বিষয়ের প্রতি সকলের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। যাহাতে প্রত্যেক নগর ও পল্লীর জননীরা গর্ভাবস্থায় শিক্ষিতা দ্বারীর সহায়তা পাইতে পারেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে আমরা প্রয়াস, দৃষ্টান্ত: বাধ্য।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরে অন্ততঃ ৭ দিন কাল প্রসূতিকে শয্যাশায়িনী হইয়া বিশ্রাম করিতে দিবে। এইরূপ বিশ্রাম না করিলে

(১) তাহার শরীর সারিবে না;

(২) রক্তস্রাব থাকিবে না;

(৩) শিশুর পানের উপযোগী দুগ্ধ জন্মিবে না। জননী যাহা ভক্ষণ করেন, উহাই স্তন্যরূপে সন্তান গ্রহণ করে। জননী যদি কঠিন পরিভ্রম করিয়া সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করেন, তাহা হইলে সন্তান দুগ্ধ পাইবে না।

(সঙ্গীতবী হইতে গৃহীত)

বর্ষ।

ছুটির সুরে মাও গো ভরে

আজকের এই আকাশখানি,

বাড়ল দিনে ব্যাকুল হাওয়ার

তুনি ঘেন মধুর বাণী!

একলা বসে ঘরের কোণে

কাহার কথা পড়ে মনে;

সজল কালো আঁখির ভাষা,

বাঁজার প্রাণে কিসের ধ্বনি।

জ্ঞান দিবসের নীরবতা

ছড়িয়ে পড়ে লতার পাতার,

তবু কি সে বীণা বাজে,

তবু কিসে মনকে মাতার।

আজি কাহার অসুরাগে

বর্ষা প্রাতে পুলক আগে,

ফোটে কুণ্ডল হৃদয়-বনে?—

জীবন আমার খসে যানি!

ঐ অমিয়া চৌধুরী।

জীবনের রঙ।

রক্তরাগ জীবনের রঙ বলে প্রসিদ্ধি ও গৌরব লাভ করে এসেছে; কিন্তু জীবনের প্রকৃত রঙ লাল নয়। লাল হচ্ছে রক্তের রঙ। কিংবা জীবন যেখানে অত্যাচার সহ্য করে লোকের চক্ষের গোচর হয়েছে, তারি রঙ। আর যদি লাল জীবনেরই রঙ হয়, তবে সেই জীবনের, যার মর্ম-কথা চাপা আছে, চাপা হয়ে লোকের নয়ন-মনের গোচর হয় নি। রক্তরাগ জীবনের গোপনতার রঙ, তার প্রকাশের চিহ্ন নয়। এ এমন একটা জিনিষ যার প্রকৃত দাম তার গোপনতায়। অপ্রকাশিত রক্ত-চাকলো শরীরে যে রঙ ফুটে উঠে, সেইটাই যথার্থ জীবনের রঙ।

এ মিশ্র বর্ণটি বিশ্বের বর্ণবৈচিত্রের মধ্যে আপনাকে মিশিয়ে রেখেছে, কখনও বিশেষ করে ধরা দেয় নি। এর বিশেষ সৌন্দর্য হচ্ছে এর গুপ্ততা, কিন্তু সে গুপ্ততা হৃদয়-কেন-নিত নয়, ধূসরতা—কিন্তু পৃথিবীর শুমাট ধূসরতা এতে নেই, রক্তাভ—কিন্তু সূর্যাস্ত বা উষা-রবিয়র রক্তরাগ এর মধ্যে নেই। ইহা স্বচ্ছ কিন্তু পদ্মদলের স্বচ্ছতার কাছে ছায় মেনেছে। এর মধ্যে সেই স্বর্ণাভ আছে যা সকল বর্ণের অন্তরতম, সেই না যার ধরা, না যায় ছোঁয়া বর্ণাভা। আমাদের দেশের পথে প্রান্তরে পল্লী-নগরে এই রঙ সময়ে-সময়ে আমরা দেখতে পাই। প্রকৃতির শোভা-ভাণ্ডারে এটির অভাব নাই। আমাদের দেশে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংস্রব বিশেষ ঘনিষ্ঠ বলে দেশের লোক কাল হলেও তার মুখে জীবনের সেই রক্তের

আলো এখনও আছে। জীবন যেখানে আপনাতেই পূর্ণ সেইখানেই তার যথার্থ বিকাশ, যথার্থ জীবনের কালিমলিগ্ন হতাশার কিংবা ব্যভিচারগ্রস্ত মর্মপীড়িত জীবনের রঙে আমরা অপূর্ণতা দেখি। শুধু লোকের শরীরে নয়, জাতির শরীরে যখন সেই রঙ দেখা যায়, তখন বুঝতে হ'বে তা ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে।

পল্লীতে আমরা যা দেখি, সেই রঙটা সমস্তে সব সময়ে আমাদের চ'খে পড়ে না। তার সত্যতা ও ভাব্যতার বজ্রিশ বন্ধনের চাপ পেয়ে জীবনের অন্তর রস শুকিয়ে উঠে; প্রসার লাভ করতে পায় না। জীবন ত বন্ধন নয়, মুক্তির উদারতার মধ্যে তার স্ফুষ্টি ও ব্যক্তি; তাই যখন আপনার হাতে-গড়া দেয়ালের মায়া ছেড়ে মানুষ যথার্থ জীবনের পথে বেরিয়ে পড়ে, সেই সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণীর প্রাঙ্গণ-তলে মানব-মনের সুগভীর মিলনের মধ্যে আমরা জীবনের প্রকৃত রঙের আভাস পাই,—সেই স্বর্ণাভ গুপ্ততা, সেই রক্তাভ ধূসরতা, যার মধ্যে বিশ্বের বর্ণবৈচিত্র ইঙ্গিতে আপনাকে প্রকাশ করে। কিন্তু সব চেয়ে স্বন্দরভাবে জীবনের রঙটা আমরা দেখি শিশুর মুখে—তার নিটোল অনাবৃত স্বর্গায় দেহে। তার হাসি-খেলা, তার সকল চাকল্যের মধ্যে একটা প্রশান্তি আছে এবং সেই প্রশান্তি জীবনের পূর্ণতার মধ্যেই জন্মলাভ করে। এই পূর্ণতাই তার দেহ-মন ছাপিয়ে আপনাকে বথন প্রকাশ করে, তখনই আমরা জীবনের

রঙটিকে দেখি। কিন্তু সেই পর্দা। সংসারকে যে-দিন সে বুদ্ধির চোখ দিয়ে দেখে, তখন আর তাকে চেনা দায় হবে,—তার চোখের কোণে কালী পড়বে, শ্রাম দেহের সৌম্য প্রশান্ত রঙটি ক্রমে ধূসর ও ধূসর থেকে ক্রমে গীতের দিকে অগ্রসর হবে, সেই যুত্মার দিকে।

নারীর মুখে আমরা এই রঙটিকে দেখেছি। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে নারী কল্যাণময়ী লক্ষ্মী-মূর্তিতে সংসারে বিরাজ কচ্ছেন; স্নেহ প্রেম করুণার অমৃত রসে তাঁদের মন সিক্ত, তাই মুখে সেই ভাবটা চিরদিনই ফুটে থাকে। সংসারে কল্যাণ-কামনা ক'রে এমন তাঁদের অভ্যাস হয়ে গেছে যে, তার কাছ থেকে অপমান সহ্য করে ফিরে তাকে ভালই বেসেছেন—সকল, অপমান অবহেলা ও অবজ্ঞার আবর্জনা সরিয়ে তাঁরা শুধু শান্তি ও সুখ বিতরণ করেন এবং সেইখানেই তাঁদের জীবন সার্থকতা লাভ করেছে। তাই জীবনের সত্য রঙটি তাঁদের মুখে সব সময়ে দেখতে পাই।

কিন্তু শ্রীমতী Alice Keynell বলেছেন যে, তাঁদের দেশে সব সময়ে এ রঙটি পাওয়া যায় না ;—সেখানকার নারী-জীবনের মধ্যে প্রেম বাৎসল্য করুণার যে অভাব আছে, তা নয় ; কিন্তু জীবন-সংগ্রামে অবিরাম ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যোগ দেওয়ার দরুণ তাঁদের জীবন সবটুকু আর চাপা নেই ; সামাজিক রাষ্ট্রিক প্রভৃতি নানা আন্দোলনের মধ্যে তাঁদের জীবনের আবহাওয়া অনেকটা বদলে গেছে, তাই গোপনতার আবরণ তেন করে যে

লাল রং মুখে দেখা দেয়, তা রক্তের রঙ,, জীবনের পূর্ণতার রঙ নয়।

এ থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, আমরা যে পথ অবলম্বন করেছি সে পথ জীবনের পূর্ণতার নয়, যুত্মার—রক্ততার দিকে চলেছে। বন্ধন-গ্রস্ত হিসেবী জীবন অতি-নিয়মচারিতার অত্যাচারে মলিন ও জর্জর হয়ে উঠেছে ;—দেহে আর জীবনের রঙ প্রতিকলিত হচ্ছে না। তাই একটা প্রশ্ন উঠেছে, এ রঙটিকে আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে কি না ? প্রকৃতি যেমন করে পীতের জায়গায় সবুজ প্রতিষ্ঠিত করে, তেমন করে মানুষকে যদি পুরাণ বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে যথার্থ মানবতা প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে কাজটা খুবই সহজ হয়ে উঠে। মানুষ যা তৈরী করে, তা অনেক সময় জোড়া-তালি দিয়ে খাড়া করে রাখতে হয়। কিন্তু জীবন ত আর কল নয় ; এ যে স্বতঃস্ফূর্ত রসাদার। অব্যাহত উদারতা যেখানে, সেইখানেই এ সত্য ও সুন্দর হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কিন্তু জীবন যেখানে নিজস্ব হারিয়ে দলের মধ্যে মাথা ডুবে দাঁড়িয়েছে, সেখানেই তার সম্পূর্ণ বিকাশে বাধা পড়েছে ; দলের মধ্যে ঠেলা-ঠেলিতে দেহ হয় ত সবল হয়েছে, প্রাণ-বস্তুর কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি। আমরা চোখে দেখি, প্রাণে কাণা—তাই জীবনের পূর্ণ রূপটি আমাদের চোখের বাহিরে চিরকাল থেকে যাচ্ছে। কাজকে আমরা এত বড় করে দেখি যে, মানুষ এখন কাজের হয়ে পড়েছে, কাজ আর মানুষের নেই ; আর সেই কাজের অবিরাম সংঘর্ষের ফলে তার সর্বস্ব টোল খেয়ে গেছে, নিজের মধ্যে

স্বন্দর ভাবে গড়ে উঠতে পারে নি। তাই দেহের বেরঙ, আমরা সদরচিত দেখছি তা স্বস্তের রঙ, পীড়িত জীবনের রঙ, পূর্ণতার আভাস মাত্রও তাতে নেই।

এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যথার্থ শিল্পীর চোখ দিয়ে জীবন দেখা, শিল্পীর মন নিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করা। সু-ব্যবস্থ-ভাবে সাধন বরের বেশী পক্ষাঠেলে যদি ছুট বানর ঢুকে পড়ে, তবে ঘরের যেমন অবস্থা হয়, আমাদের জীবনের শাস্ত্রের পক্ষাঠেলে কাজ তেমনই করে ঢুকে যে কুংসিং নৃত্য জুড়ে দিয়েছে, তার অনাবশ্যক চঞ্চল্যে জীবনের পূর্ণ উপলব্ধির পথে বাধা পড়েছে। আমাদের দেখতে হবে, যাতে এই হাকাতাঁকি ছুটোছুটি প্রভৃতি কাজের উপসর্গ ও উপপ্রব মনের প্রসারের পথে বাধা না দেয়। কাজ

আমরা করব, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সে শিল্পীর মত আনন্দের প্রেরণায়, আর কোন হিসাবের তাগিদে নয়। পর্তুকের অচল বৈদ্য, আকাশের অবাধ উদাস বিস্তার ও সাগরের উপরকার সমস্ত চাকল্যের নীচে অগাধ স্তব্ধতার মধ্যে যে শান্তি, যে সুবিপুল বিরতি, আমাদের জীবনকে সেই বিরতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, তাকে যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করা হবে। কারণ, জীবনের অন্তরতম বাণী বারই মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করেছে। ভোগের আরোহণ বাড়িয়ে জীবনকে খাটো করে নয়, জীবনকে ভিতরে ও বাহিরে অবাধ প্রসার লাভ করতে দিয়ে, ভোগকে খাট করাই জীবন-বাণী; তার পথ সন্তোর দিকে, স্বন্দরের দিকে, আনন্দের দিকেই প্রেরণ করেছে।

ত্রিগ্রবোধচক্র চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

১। ইউরোপীয়-মহাযুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষ সাহায্য করিবার জন্য লণ্ডনে এক ফণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জ এই ফণ্ড কমিটির পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। লণ্ডন হইতে ব্রিটিশ রাজ্যের সর্বত্রই এই ফণ্ড হইতে দুর্ভিক্ষে সাহায্য প্রদানের জন্য ব্যবস্থা হইবে।

২। সম্প্রতি গারটুড-বসার নামী একজন জ্রীলোককে বানিনের স্থল বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার পূর্বে জাম্বানীতে আর কোনও জ্রীলোক একরূপ পদ পান নাই।

৩। ইউরোপের মধ্যে ফরাসী জাতি

বিলাসিতার জন্য বিখ্যাত। কিন্তু বর্তমান মহাযুদ্ধে সমগ্র জাতির অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে, এখন ফরাসীগণ যদি পূর্বের তায় বিলাসিতা বজায় রাখিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে ফরাসী জাতি আর গড়িয়া উঠিতে পারিবে না; সেই জন্য ফরাসী গবরনেন্ট ফরাসী জাতিকে বাঁচাইবার নিমিত্ত আইন জারি করিয়াছেন যে, লথের জিনিষ, বিলাসিতার জিনিষ আর ফরাসী রাজ্যের মধ্যে আমদানী হইতে পারিবে না। বিদেশ হইতে আনীত পাশিশের কাজ করা জিনিষ, হীরার গহনা, চিকণ কাপড়, পশমী ও

রেশমী জ্বায়াদি, তামাক প্রভৃতি আর ফরাসী দেশে আসিতে পারিবে না ।

৪। সম্রাট জননী রাণী আলেক্সান্দ্রা অতিশয় জরুরী হইয়া পড়িয়াছেন । তাঁহার জন্ত অনেকেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন ।

৫। পুনাতো যেমন অধ্যাপক কার্ডের প্রতিষ্ঠিত নারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, গুজরাটে মেয়েদের সেইরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার কথা হইতেছে । সার ভিটলদাস থ্যাকাসে মহোদয় এই কার্যে ১২ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে ।

৬। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্বপ্রথম যে দুইজন মহিলা এম.এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীমতী কঙ্কালক্ষ্মীমা পাঠোদ্দেশ্যে বিলাত যাইতেছেন । পাঠোদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যের গোঁড়া ব্রাহ্মণ মহিলাদের ভিতর ইনিই প্রথম বিলাত যাইতেছেন । মহীশূর গভর্নমেন্ট ইহাকে ৩০০ টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রদান করিবেন ।

৭। গত ২১মে শুক্রবার রাত্রি দ্বায় নবটার সময় প্রসিদ্ধ ঔষধ-ব্যবসায়ী বাবু ভূতনাথ পাল মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন । ইনি মেসার্স বটকুই পাল কোম্পানীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন ।

৮। সম্প্রতি মার্কিন দেশের একটি অত্যন্তব্য বুদ্ধিমতী মেয়ের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । এই মেয়েটির যখন চারিবৎসর বয়স তখন সে ডার্কিলের ল্যাটিন ভাষার কাব্যের অনুবাদ করিয়াছিল । নয় বৎসর যখন ইহার বয়স, তখন ইহাকে

লিলাণ্ডটোনফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয় । মেয়েটির বয়স এখন ১৭ বৎসরের বেশী নয় । এই বয়সেই সে ১৭ খানি বই লিখিয়াছে, দশদ্বাজারের বেশী কবিতা রচনা করিয়াছে । মেয়েটির একখানি ডাইরী-পুস্তক আছে, এই পুস্তক সে দুই বৎসর বয়স হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল । মেয়েটি ১৭ রকম ভাষা জানে, অনেকগুলি কাগজে সে নিয়মিত লিখে, অভিনয়ে নায়িকা সাজে এবং সুন্দর বক্তৃতাও দিতে পারে । দুই বৎসর বয়সের সময় সে লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল, চারি বৎসর বয়সের সময় সে তার বাপ-মার সহিত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিল ; এই সময়ে সে ল্যাটিন ভাষায় একটি বই অনুবাদ করে, এবং ইহা বাতীত কয়েকটি সুন্দর ভ্রমণকাহিনীও লিখিয়াছিল । মণ্ট-রিয়েল ও নিউইয়র্কের অনেক হাসপাতালে আহত ও অসমর্থ সৈনিকদিগের সেবা দুই বৎসর ধরিয়া করিয়াছিল । মেয়েটির দেহের উচ্চতা প্রায় চারি হাত ও গুজন দেড় মণের কিছু বেশী । সম্প্রতি একজন পুরুষ মানুষের সহিত তাহার বচসা হওয়ায় সে রাগিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল । বই রচনা করিয়া সম্প্রতি ২৫০, ৩০০ টাকা উপার্জন করে । মেয়েটির নাম মিস্ টোনার । সাহিত্যচর্চায় মিস্ টোনার এমন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে যে, মার্কিন দেশের লোকে তাহাকে খন্ড খন্ড করিতেছেন । কুমারী বলিতেছেন, “এইবার বিবাহ করিব, স্বামীকে কেমন কারখা মাছুয় করিতে হয় তাহা দেখাইব এবং ছেলেমেয়েদের খুব বুদ্ধিমান করিয়া গড়িয়া তুলিব ।

৯। কুচবিহারের রাজমাতা মহারানী
রূনীতি দেবী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিলাত-যাত্রা
করিয়াছেন।

১০। মিঃ আর্গল্ড মালাবার নামে এক
ইংরেজ সম্মতি কলকোষে সহরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ
করিয়াছেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের জন্য
শীঘ্রই ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন।

১১। আমেরিকায় রে নামে এক রকম
সামুদ্রিক মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। ইহার দ্রাঘ

প্রকায় মৎস্য আজ পর্যন্ত আর কোথাও
পাওয়া যায় নাই। মৎস্যটি ওজনে একশত
বার মণ। ইহাকে গুল হইতে ডাঙায় টানিয়া
আনিতে ছয়টা বলদ ও বাইশ জন লোকের
সরকার হইয়াছিল এবং নয় ঘণ্টা ক্রান্ত
মৎস্যটি মানুষ ও বলদের সহিত টানাটানি
ধনাত্মক করিয়াছিল। ইহার ল্যাজের
ঝাপটায় সমুদ্রের জল ত্রিশ ফিট পর্যন্ত
ছটকাইয়া উঠিয়াছিল।

স্বরগের ঠিকানা

(অন্তিম রোগ-শযায় লিপিত)

স্বরগের ঠিকানা আমার

কেহ কি বলিতে পার ভাই?

বহুদিন গেছেন জনক

স্নেহ-লিপি আজো পাই নাই!

২

আশা-পথ চাহিয়' চাহিয়া

দিন মোর যুথ! কেটে যায়,

পূরে মা-ক প্রাণের বাসনা

অশ নিতি করে নিরাশায়।

৩

ছিহু তাঁর ছবিরে ধন,

রাখিতেন নয়নে নয়নে,

কণকণ হলে বিধাদিত

ভূলাতেন হুমিষ্ট বচনে।

৪

কণতরে হ'লে অনর্শন

হইতেন কি আকুল হায়!

সারা প্রাণ উঠিত কাঁদিয়া

কত যে অন্তত ভাবনায়!

বুকে ক্ষত আজি যে বিষম,

প্রাণ মোর করে হায়, হায়!

তাঁর কি গো গলে না হৃদয়!

হার পিতঃ! রয়েছে কোথায়?

৬

আছ কেবা সুখন্ এমন

বলে দিবে ঠিকানা তাঁহার,

দূরে যাবে তপ্ত দীর্ঘ যাম

ও-চরণ লভিলে আবার?

৭

আর আমি ছাড়িয়া জনকে

নাহি চাহি রহিতে ধরায়,

কেগো আছ দয়ালু তেমন

নিয়ে যাবে আমারে সেধায়?

ধর্মীয়া হেমন্তবালা দত্ত।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল ।

নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ এ বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে—

প্রথম বিভাগ ।

১। সত্যবতী ব্রুবে—ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন।	২৬। সুধাময়ী সেন—বেথুন স্কুল।
২। ননীবালা বসু "	২৭। কমলা রায় "
৩। মায়া রায় "	২৮। উদারাগী বসু "
৪। উষাবালা মিত্র "	২৯। লিলিয়ান মিত্র—ক্রাইস্টচার্চ হাইস্কুল।
৫। হেমলতা বসু—ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়।	৩০। শান্তিময়ী দে—ডাওসেশন স্কুল।
৬। শান্তিবালা সেন "	৩১। সীতা সিংহ "
৭। শিখপ্রভা দত্ত "	৩২। বাণী ঠাকুর "
৮। প্রকৃতি গুপ্তা "	৩৩। ইলিয়ান্স টেমাস্ "
৯। অপর্ণা সান্যাল "	৩৪। জুলেখা বাণো "
১০। স্থলতা বসু "	৩৫। রমা মৈত্র "
১১। বীণাপাণি সিংহ "	৩৬। কল্যাণী মুখার্জি "
১২। আশ্রমা খাতুন "	৩৭। সুধীরা বসু "
১৩। চাক্রবালা বসু "	৩৮। লীলাবতী গ্রেসবক্স—গ্রাইতেট।
১৪। আশালতা বসু "	৩৯। অমিতা দত্ত "
১৫। মালতী বসু—মহারাজী স্কুল, মার্জিলিং।	৪০। উদালতিকা হালদার "
১৬। কমলাক্ষী রাধ—ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস্।	৪১। প্রেমলতা ঘোষ "
১৭। কনকলতা বিশ্বাস "	৪২। সরোজবালা দর "
১৮। শ্রুতিকুমারী দাসগুপ্তা "	৪৩। সাবিত্রী দত্ত—ঢাকা ইডেন স্কুল।
১৯। কমলিনী রুদ্র "	৪৪। শোভারাজী ঘোষ "
২০। কনকলতা চট্টোপাধ্যায় "	৪৫। আশালতা দাসগুপ্তা "
২১। হেমলতা বসু—ইউ, এফ, সি, হাইস্কুল।	৪৬। নিরঞ্জনকুমারী বৈরাগী—ঢাকা ইডেন স্কুল।
২২। পরিমল দাস "	৪৭। উষাবালা দত্ত "
২৩। সুধা মজুমদার—বেথুন স্কুল	৪৮। নীহারবালা দাসগুপ্তা "
২৪। বীণাপাণি বসু "	৪৯। লীলাবতী সেন "
২৫। সুশোভা মজুমদার "	৫০। সরোজিনী দে "
	৫১। তারাকিন্দরী বিশ্বাস "

- ৫২। আশালতা সরকার—ঢাকা ইডেন স্কুল
৫৩। কর্ত্তী এম, এল, গুইনস্—
প্রাইভেট।
৫৪। অননুয়া রায়—ব্রাহ্মবালিকা শিকালয়।
৫৫। উমাতারা রায়—মহারানী গার্লস্
স্কুল দার্কিলিং।
৫৬। সুবতিবালা রায়—ময়মনসিংহ বিভাগময়ী
গার্লস্ স্কুল।
৫৭। মেহপ্রভা রায়
৫৮। পূর্ণপ্রভা রায়
৫৯। শূণালবালা নন্দী
৬০। কপিকা গুপ্তা
৬১। কিরণশশী দত্ত
৬২। জ্যোতিপূর্ণী দাস
৬৩। পঙ্কজিনী চক্রবর্ত্তী
৬৪। কনকপ্রভা বিশ্বাস
৬৫। জ্যোৎস্না দত্ত—প্রাইভেট।
৬৬। চাক্রবালা রায়
৬৭। জ্যোতিপূর্ণী চৌধুরী—চট্টগ্রাম ডাক্তার
খাত্তগিরী বালিকা বিদ্যালয়।
৬৮। সুবতিবালা আইচ

দ্বিতীয় বিভাগ।

- ১। অমিরাবালা ঘোষ—ব্রাহ্মবালিকা
শিকালয়।
২। লীলা দত্ত।
৩। প্রবাহিনী রায়
৪। সুকপ্রভা বসু—মহারানী স্কুল,
দার্কিলিং।
৫। বিনোদিনী মলিক—ইউনাইটেড
মিশনারী গার্লস্ স্কুল।

- ৬। মেহলতা বিশ্বাস—ইউ, এক, সি,
হাই স্কুল।
৭। যামিনীপ্রভা বসু
৮। ইন্দুবালা রায়—ক্রাইষ্ট চার্চ।
৯। হেমললিনী দে
১০। সরস্বতী স্তম্ভজী এডেক—ইউ, এক,
সি, হাইস্কুল।
১১। গৌরী ঘোষ—ডাওলেন্সন স্কুল।
১২। মার্গারেট, এল, জন
১৩। শোভা সরকার
১৪। স্তম্ভজীবাই দুবে—প্রাইভেট।
১৫। সুনীতি দত্ত
১৬। নলিনী মহলানবিশ
১৭। বীণাপাণি সাম্রায়াল
১৮। মাধুরী চৌধুরী
১৯। সাবিত্রীবালা দাসগুপ্তা—ঢাকা ইডেন
স্কুল।
২০। সুবরবালা চৌধুরী—চট্টগ্রাম ডাক্তার
খাত্তগিরী বালিকা বিদ্যালয়।
২১। লীলা খাত্তগীর—প্রাইভেট।
২২। এলেন পেরিরা
২৩। উম্মিলি ব্যানার্জি—চট্টগ্রাম ডাক্তার
খাত্তগিরী বালিকা বিদ্যালয়।

তৃতীয় বিভাগ।

- ১। উষাঙ্গিনী মণ্ডল—ইউ, এক, সি,
হাইস্কুল।
২। কল্পণাময়ী মাইতী—প্রাইভেট।
৩। হিমাল্যবালা চক্রবর্ত্তী
৪। বাসন্তীকুম্ম নাগ—ময়মনসিংহ
বিদ্যাময়ী গার্লস্ স্কুল।

৫৭ বর্ষ

বামানবোবিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্তৃক প্রবর্তিত।

আষাঢ়, ১৩১৭—জুলাই, ১৯২০।

সূচী

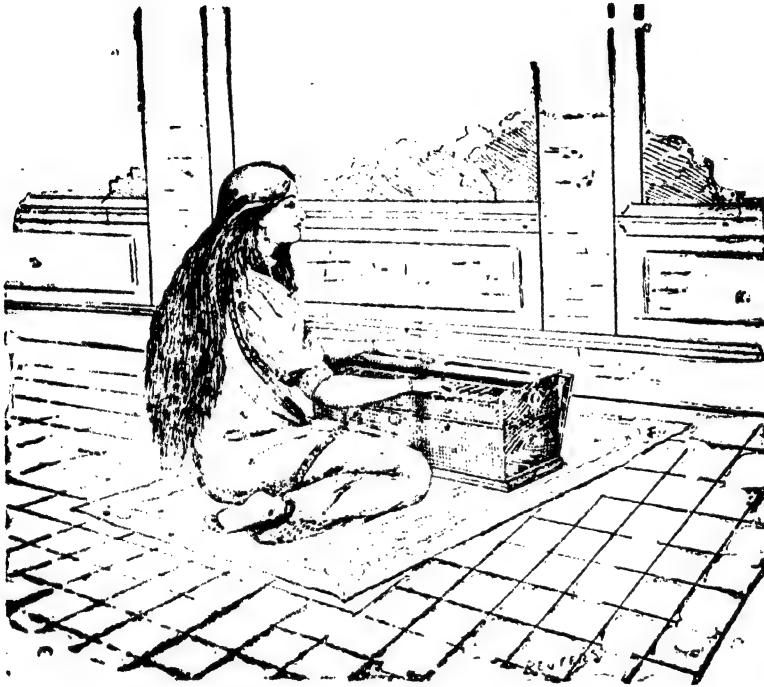
১। কে জানে। কবিতা	শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্	৬৪
২। জপজী	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত বি-এল্ ...	৬৬
৩। গান	শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্ ...	৭১
৪। গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ...	৭২
৫। আহা জুড়ি (উপভাস)	শ্রীমতী চাকশীলা মিত্র ...	৭৩
৬। আমরা কি ভ্রাম ? (কবিতা)	শ্রীমতী সুনীলাসুন্দরী মিত্র ...	৮৬
৭। হিন্দুর তীর্থ-নিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী ...	৮৭
৮। শুচি বায়ু	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন ...	৯০
৯। সাময়িক-প্রসঙ্গ	৯৫

অগ্রিম ব্যাধিক মূল্য ২৫/০ ; অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ১৮/০

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ১০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোরার্কিনের হারমোনিয়ম ।

বাজারে জিনিসের মত নয় ।



বাস্তব হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০, ও ২৪ টাকা ।

২ সেট রিড মূল্য ৩০, ৪০, ৪৫, ৫০ হইতে ১৫০ টাকা পর্যন্ত ।

কোন্টিং অরগেন—মূল্য ৩৫, ৪৫, ৭০, ৭৫, ও ১০০ টাকা ।

বেহালা—মূল্য ৫০, ১০০, ১৫০, ও ২৫০ হইতে ৩০০ টাকা পর্যন্ত ।

সেতার—মূল্য ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০ ও ৩০০ টাকা ।

এসব্রাজ—মূল্য ১২০, ১৫০, ১৮০, ২০০ ও ২৫০ টাকা ।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয় ।

ডোরার্কিন এণ্ড সন,

৮১ নং ভালহাউসি কোয়ার, লালহাটী, কলিকাতা ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 683.

July, 1920

“স্বন্যাত্মা ন পান্দরীয়া সিন্ধুসীমান্তবাসিনঃ।”

কষ্টাক্রমে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৮৩ সংখ্যা।	আষাঢ়, ১৩২৭। জুলাই, ১৯২০।	১২শ কল্প। ১ম ভাগ।
-------------------------	---------------------------	----------------------

কে জানে—

(গান)

ভৈরবী।

এই যে মোহন বিশ্ব-ছবি—

এর অর্থ কিবা

কে জানে—কে জানে—কে জানে!

এই আকাশ আলো চক্রে রবি—

এর অর্থ কিবা

কে জানে—কে জানে—কে জানে!

এত যে ফুল কোটাও বনে,

পাঠাও দধিন সন্নীরণে,

এত যে সুর জাগাও মনে,—

এর অর্থ কিবা

কে জানে—কে জানে—কে জানে!

এত যে ঢেউ তোল বুকে

কতুও হুখে—কতুও হুখে,

অশ্রু-হাসি কোটাও চোখে,—

এর অর্থ কিবা

কে জানে—কে জানে—কে জানে!

এতই গন্ধ, এত যে গান,

এতই ছন্দ, এত যে তান,

এত আনন্দ, এত যে প্রাণ,—

এর অর্থ কিবা

কে জানে—কে জানে—কে জানে!

ঐনির্দলচন্দ্র বড়াণ।

জপজী।

১৬

পঞ্চ পরবান পঞ্চ পরধান।
 পঞ্চে পাবহি দরগহি মান ॥
 পঞ্চে শৌহে দর রাজান।
 পঞ্চক গুরু একহি ধিয়ান ॥
 যে কো কটৈ কটৈ বিচার।
 করতে কৈ করণৈ নহি স্মার ॥
 খোল ধরম দয়াক পুত।
 সংতোষ খাপি রখা যিন স্মৃত ॥
 যে কো বুটৈ হোটৈ সচিয়ার।
 খবলৈ উপর কেতা ভার ॥
 ধরতী হোর পটৈ হোর হোর।
 তিসতে ভার তলে কোন জোর ॥
 জিরজন্ত রজাকে নাব।
 সত না লিখা বড়ি কলাম ॥
 এই লেখা লিখি জাটৈ কোয়।
 লেখা লিখিয়া কেতা হোয় ॥
 কেতা তানি স্মারি রূপ।
 কেতা দাতি জাটৈ কোন কৃত ॥
 কেতা পসাই একো কবারো।
 তিস্তে হোয় লেখ দরিয়াউ ॥
 কুদরত কবন কথা বিচার।
 বরিয়া ন যাবা একবার ॥
 বো জুখ ভাটৈ সোই ভলিকার।
 হু সবা সলামত নিরকার ॥

সাধুর মহিমা ব্যাখ্যাত হইতেছে।—

পঞ্চ—সত্য, সন্তোষ, দয়া, ধর্ম এবং
 শৌহ, এই পাঁচটা গুণযুক্ত পুরুষকে পঞ্চ
 কহে। পরবান—পবিত্র। পরধান—প্রধান
 অর্থাৎ মাননীয়।

পঞ্চ=উক্তপ্রকার সাধুপুরুষগণ। পাবহি
 —পাইয়া থাকেন। দরগহি=হরির গৃহের
 ঘারে। মান=সন্মান। শৌহে=শোভিত
 হয়। দর=ঘারে। রাজান=রাজদরাজের
 ভগবানের। পঞ্চক=উক্তপ্রকার সাধুপুরুষ-
 গণের। গুরু একহি ধিয়ান=গুরুই সকলের
 একমাত্র ধ্যেয়।

যে=যদি। কো=কেহ। বুটৈ=সাধুর
 মহিমা ব্যাখ্যা করিতে যায়। কটৈ বিচার=
 সাধুর মহিমা বিচার করিতে যায়। করতে
 কৈ=সেই সৃষ্টি কর্তা পরমেশ্বরের। করণৈ=
 কার্যের, অর্থাৎ সাধুদিগের মধ্যে যে সকল
 জ্ঞান গুণ একত্র করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার।
 নহি স্মার=সংখ্যা নাই।

খোল=পবিত্রতা। দয়াক পুত=দয়ার
 পুত্র। দয়া হইতেই পবিত্রতা এবং ধর্মের
 উৎপত্তি, অর্থাৎ দয়া সকল ধর্মের মূল। স্মৃত=
 স্মৃত, সন্তোষরূপ স্মৃতি। খাপি=গ্রথিত।
 যিন রখা=যিনি রাখিয়াছেন।

যে কো=যাহারা। বুটৈ=বুঝিয়াছে।
 হোটৈ=হইয়া যায়। সচিয়ার=সত্যজ্ঞানী।
 নানক ভগবানের অনন্ত শক্তির আভাস
 দিতেছেন।—

খবলৈ উপর কেতা ভার=খবল বৃষ, যিনি
 পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, তাহার উপর
 কত ভার রহিয়াছে! ধরতী হোর পটৈ হোর
 হোর=এই পৃথিবীর পরে অস্ত্র পৃথিবী।
 তাহার পরে আবার অস্ত্র অস্ত্র পৃথিবী, এই
 প্রকারে অসংখ্য পৃথিবী অর্থাৎ সৃষ্ট জগৎ
 রহিয়াছে।

তিসূত্রে তার তলে কোন ভোর—এই সকল ভোরের মূলে কাহার শক্তি সমস্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছে!!

কির জন্ত রত্নকে নাব—এই অসংখ্য জগৎ-মধ্যে অসংখ্য জীব, অসংখ্য জন্ত, অসংখ্য তাহাদের রং, অসংখ্য তাহাদের নাম রহিয়াছে।

সভনা লিখা বড়ি কলাম—সভনা—এই সকল অনন্ত জীবের। লিখা—প্রারম্ভ লেখা। বড়ি—বড় অর্থাৎ কঠিন। কলাম—লেখা।

এছ লেখা লিখি জ্ঞান কোই—যদি কেহ এই সকলের হিসাব আপনাত্মক জ্ঞান অনুসারে লিখিতে থাকে।

লেখা লিখিয়া কেতা হোয়!—বল দেখি, সে লেখা কত অনন্ত লেখা হয়! কেতা তানি স্মারিতরূপ—কেতা—কত। তানি—তাঁহার শক্তি। স্মারিত—স্মরণ। রূপ—রূপ। সেই ভগবানের কি অপার শক্তি, কি স্মরণ রূপ!

কেতা দাতি জ্ঞান কোন কৃত :—কেতা—কত বে। দাতি—দিতেছেন। জ্ঞান কোন—কে জানে। কৃত—পরিমাণ।

কেতা পসাই একো কবায়ো :—কেতা পসাই—সেই ভগবান্ আপনার মায়াশক্তির কি বিস্তার করিয়াছেন! একো কবায়ো—এক পরমেশ্বর বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া বহুরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন।

তিসূত্রে হোয় লখ দরিয়াউ :—তাঁহা হইতেই লক্ষ অর্থাৎ অনন্ত ‘দরিয়াউ’ অর্থাৎ সাগরের (অথবা স্রব্ধার) উৎপত্তি। দরিয়াউ—প্রায়ঃসমুদ্রে যিনি উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করেন—অর্থাৎ ব্রহ্মা।

কুদরত কবন কহা বিচার?—কুদরত—

তাঁহার অনন্ত শক্তির। কবন—কতদূর। কহা—কে। বিচার—বিচার করিবে?

বরিয়া ন বাবা একবার—বরিয়া—শ্রেষ্ঠত্ব। ন বাবা—ব্যাখ্যা করা যায় না। একবার—একবারও।

যো তুধ তাঁব—হে প্রভু, বাহা তুমি ভালবাস। সোই ভালকার—তাঁহাই ভাল। তু সনা—তুমি সদাই। সলামতে—নিষিকার, নিগিষ্ঠ। নিরকার—নিরাকার পুরুষ। যদিও তুমি মায়াশক্তিতে অসংখ্যজগৎ সৃষ্টি করিতেছ এবং আপনি এক হইয়া বহুরূপে প্রকাশ হইয়াছ, তথাপি তুমি সেই এক নিষিকার এবং নিরাকার পুরুষ নিগিষ্ঠ ভাবে বিরাজমান আছ।

প্রথমে নানক সাধুর মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছেন—‘পক’ অর্থে সত্য, সন্তোষ, দয়া, ধর্ম এবং শৌর্য সাধুপুরুষ। এইপ্রকার সাধুপুরুষগণ পবিত্র এবং মাননীয় হইবেন। তাঁহারা হরির গৃহধারে সম্মান পাইয়া থাকেন। তাঁহারা রাজ্যরাজেশ্বর ভগবানের দ্বারে শোভিত হন। তাঁহাদের শুকই একমাত্র ধ্যেয়। যদি কেহ সাধুর মহিমা ব্যাখ্যা করিতে যায়, যদি কেহ তাঁহার মহিমার বিচার করিতে যায়, সে বুদ্ধিতে পারে যে সেই সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর সাধুদিগের মধ্যে যে সকল অপার গুণ একত্র করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার ইয়ত্তা করা যায় না। সেই ভগবান্ এই সাধুদিগের মধ্য দিয়া, সন্তোষ এবং পবিত্রতা একস্থানে রাখিয়া রাখিয়াছেন।

তৎপরে তিনি ভগবানের অনন্ত শক্তির আভাস দিতেছেন...

বাহারা সেই ভগবানের শক্তির একটু-

সাম্রাজ্যে, তাহার সভ্যজ্ঞানী হইয়াছে ।
 ধবল বুঝ, যিনি পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন,
 তাঁহার উপর কত তার রহিয়াছে! এই
 পৃথিবীর পরে অস্ত্র পৃথিবী, তাহার পরে
 আবার অস্ত্র পৃথিবী, এই প্রকারে পর পর
 অসংখ্য পৃথিবী অর্থাৎ সৃষ্টজগৎ রহিয়াছে ।
 এই সকল তারের মূলে কাহার শক্তি সকলকে
 ধারণ করিয়া আছে! এই অসংখ্য জগতের
 মধ্যে অসংখ্য জীব, অসংখ্য ভক্ত, অসংখ্য
 তাহাদের রং, অসংখ্য তাহাদের নাম । এই
 অসংখ্য জীবের প্রায়ঃ-লেখা কত কঠিন !!

যদি কোন মানুষ এই সকলের হিসাব
 আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞান অল্পসারে লিখিতে থাকে,
 বল দেখি, তাহা হইলেও সে লেখা কত অনন্ত
 লেখা হয় !

সেই ভগবানের কি অসীম শক্তি! আবার
 কি তাঁহার মধুর রূপ। তিনি যে জীবকে
 কত দান করিতেছেন, তাহার কি কেহ
 পরিমাপ করিতে পারে? সেই পরমেশ্বর এক
 হইয়া বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া, আপনার মায়া
 শক্তির বিস্তার করিয়াছেন এবং বহুরূপে
 প্রকাশমান হইয়াছেন। তাঁহা হইতেই অনন্ত
 জ্ঞান উৎপত্তি। তাঁহার অনন্ত শক্তির কে
 কতটুকু বিচার করিবে? তাঁহার প্রেতৎ
 একবারও ব্যাখ্যা করা যায় না। হে প্রভু!
 বাহা তুমি ভালবাস, তাহাই ভাল। হে প্রভু!
 যদিও তুমি আপনার মারাত্মকিতে অসংখ্য
 জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে এক তুমি বহু
 হইয়া বিরাজমান আছ, তথাপি তুমি সেই এক
 নির্মিত্যকার নিরাকার পুরুষ নির্দিষ্ট ভাবেই
 রহিয়াছ, জগৎসৃষ্টিতে তোমার ভাবের কোন
 ব্যত্যয় হয় নাই।

১৭

অসংখ্য জপ অসংখ্য ভাউ ।
 অসংখ্য পূজা অসংখ্য তপভাউ ॥
 অসংখ্য গ্রন্থ মুখি বেদ পাঠ ।
 অসংখ্য যোগ মন বহুই উদাস ॥
 অসংখ্য ভগত গুণ গিয়ান বিচার ।
 অসংখ্য সত্য অসংখ্য দাতার ॥
 অসংখ্য সুর মুহ তথসার ।
 অসংখ্য মোনি লিবলাই তার ॥
 কুদরতি কবন কথা বিচার ।
 বরিয়ান দাবা একবার ॥
 যো ভুখ ভাটৈ সোই ভলীকার ।
 তু সদা সলামতি নিরকার ॥

অর্থ—হে প্রভো! অসংখ্য সাধক তোমার
 নাম জপ করিতেছেন, অসংখ্য সাধক
 তোমাকে প্রেম (ভাউ) করিতেছেন। অসংখ্য
 প্রেমিক ভক্ত তোমার পূজা করিতেছেন;
 অসংখ্য প্রকারে অসংখ্য সাধক তোমার
 তপস্যা করিতেছেন। অসংখ্য সাধক
 তোমার উপাসনার উদ্দেশ্যে অসংখ্য গ্রন্থপাঠ
 করিতেছেন ও বেদ কণ্ঠস্থ করিতেছেন।
 এই সংসারে কত কত সাধক চিন্তাবৃত্তিনিরোধ
 করিয়া সংসার-সুখে উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন।
 অসংখ্য ভক্ত তোমার গুণের ও জ্ঞানের
 সমালোচনা করিতেছেন। অসংখ্য সত্য সত্যী,
 অসংখ্য দাতা, অসংখ্য ধর্মবীর, সুখে সংসারের
 সার যে তোমার নাম, তাহারই ভাষণ করেন।
 আবার অসংখ্য মোটা সাধক তোমার ধ্যানে
 চিন্তাবৃত্তিকে একাকার করিয়া লাগাইয়া
 রাখে।

হে প্রভো! তোমার অনন্ত শক্তির কে
 কতটুকু বিচার করিবে! তোমার প্রেতৎ

একবারও ব্যাখ্যা করা যায় না। হে প্রভো!
তুমি বাহা ভালবাস, তাহাই ভাল। হে
নিরাকার পুরুষ, তুমি সদাই একভাবে বিরাজ
করিতেছ, তোমার কোনও পরিবর্তন নাই।

১৮

অসংখ্য মূৰ্খ অন্ধ ঘোর।
অসংখ্য চোর হারামখোর।
অসংখ্য অমর করি বাহি জোর।
অসংখ্য গলবড় হতিয়া কমাহি।
অসংখ্য পাপী পাপ কর বাহি।
অসংখ্য কুড়িয়ার কুড়ে ফিরাহি।
অসংখ্য মলেছ মল তথ বাহি।
অসংখ্য নিন্দক শির করাহি ভার।
নানক, নীচ কঠৈ বিচার।
বন্নিয়া ন বাবা একবার।
বো তুধ ভাটৈ সেই ভলিকার।
তু সদা সলামতি নিরঙ্কার।

অর্থ—ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে অসংখ্য
মূৰ্খ রহিয়াছে, অসংখ্য ব্যক্তি অজ্ঞানান্ধকারে
ডুবিয়া রহিয়াছে; অসংখ্য চোর এবং অসংখ্য
বিশ্বাসঘাতক রহিয়াছে। এই জগতে রাব-
পাদি অসংখ্য অমর নিজ নিজ শক্তি প্রকাশ
করিয়া জগৎকে উৎসন্ন করিয়া গিয়াছে।
এ সংসারে অসংখ্য ব্যক্তি অপরের গলা কাটরা
নরহত্যা করে, অসংখ্য পাপী পৃথিবীতে পাপ
করিয়াই চলিয়া যায়; অসংখ্য মিথ্যাবাদী
মিথ্যাই বলিতে থাকে; অসংখ্য স্বেচ্ছ অভক্ষ্য
ভোজন করিতেছে; অসংখ্য নিন্দক পরের
নিন্দা করিয়া নিজের শির ভার করিতেছে।
নানক বলিতেছেন, ভগবানের এই মায়িক
সৃষ্টির মধ্যে অনন্ত নীচ রহিয়াছে, আমি কত
তাহার বিচার করিব। তাঁর বায়া-শক্তির

বিচার আমার দ্বারা সম্ভবে না। হে প্রভো!
যাহা তুমি ভালবাস তাহাই ভাল; হে
নিরঙ্কার পুরুষ, এত সৃষ্টি সত্ত্বেও, তুমি সর্বদা
একভাবেই বিরাজ করিতেছ।

১৯

অসংখ্য নাব অসংখ্য খাব।
অগম্য অগম্য অসংখ্য লোম।
অসংখ্য কথাহি শিরভার হোই।
অখরী নাম অখরী সালাহ।
অখরী গিহান গীতগুণ গাহ।
অখরী লিখন বোলন বাণী।
অখরী শির সংযোগ বখানি।
ঘিন এহ দিখে তিস্ শির নাহি।
ধিব হুরমায়, তিব তিব পাহি।
যেতা কীতা তেতা নাউ।
বিন নাটৈ নাহি কো খাউ।
কুদরতি কবন কথা বিচার।
বরিঘান বাবা একবার।
ঘো তুধ ভাটৈ সেই ভলিকার।
তু সদা সলামতি নিরঙ্কার।

অর্থ—“হে অনন্ত পরমেশ্বর! তোমার
অসংখ্য নাম এবং অসংখ্য তোমার স্থান,
অর্থাৎ তুমি সর্বব্যাপী। কত কত অসংখ্য
অগম্য লোক তোমার সৃষ্টি রহিয়াছে।
তোমার অসংখ্য সৃষ্টির কথা বলিতে গেলে
মাথা ঘুরিয়া যায়। অন্ধরেই তাঁহার নাম,
অন্ধরেই তাঁহার নামের স্তুতি। অন্ধর-দ্বারা
বাণী এবং শব্দ। অন্ধর-দ্বারাও মন্তকে
সংযোগ-বিয়োগের প্রারম্ভ লেখা হয়। তিনি
সকল জীবের এইরূপ সংযোগ-বিয়োগরূপ
প্রারম্ভ লিখিতেছেন, সেই পরমেশ্বরের মন্তকে
কোন প্রারম্ভ লেখা নাই। তিনি কণ্ঠবন্ধন-

রহিত। যেমন যেমন সেই পরমেশ্বরের
দাস্য হয়, তেমনি তেমনি জীব নিজ কর্মকল
ক্রান্ত হয়। পরমেশ্বর যত জগৎ সৃষ্টি করিয়া-
ছেন, সকলেরই নাম দিয়াছেন। নামহীন
কোন স্থান নাই। অর্থাৎ সকলই
নামরূপ-দ্বারা ব্যাপ্ত। সেই পরমেশ্বরের
দাস্যশক্তির কে বিচার করবে? তাহার
শরণ বিনা সেই দাস্য হইতে কণমাত্র কেহ
পরিজ্ঞান পাইতে পারে না। (শুকদেব
সেই দাস্যর ভয়ে গর্ত হইতে নির্গত হইতে
ভীত হইতেছিলেন)। হে প্রভো! তুমি
বাহ্য মঙ্গল বিবেচনা কর, আমার পক্ষে তাহাই
মঙ্গলকর। হে প্রভো! জগতে এত দাস্যর
প্রকাশ সত্ত্বেও তুমি নিত্য একভাবে বিরাজ-
মান আছ।

২০

ভরিতৈ হৃথ পৈর তসু দেহ ।
পানি ধোতৈ উত্তরস সেহ ।
মুত পলিতী কপড় হোই ।
দেহ সাবন লইয়ে উহ ধোই ॥
ভরিতৈ মতি পাগকে সজ ।
উহ ধোটে নাইবৈ কৈ রজ ।
পুননী পাণী আখন নাহি ।
করি করি করনা লিখ লে যাহি ॥
আপে বীজে আপে হি খাং ।
নানক, হকমী আবহ বাহ ॥

অর্থ :- এই হুল, শরীরের হস্ত পদ বা
শরীর যদি মল-দ্বারা মলিন হয়, জলের দ্বারা
সে মলিনতা দূর করা যায়।

মলমুক্ত দ্বারা-যদি বস্ত্র অপবিত্র হয়,
দাবাদ-দ্বারা তাহা পরিষ্কৃত করিতে পারা
যায়।

বাহ্যর বুদ্ধি পাপসঙ্গে ভারাক্রান্ত হইয়াছে,
নামের রন্ধে তাহা পবিত্রীকৃত হয়।

যে ভগবানের নিকাম ভক্ত, সে পাপ-পুণ্য
হইতে অতীত। যে সকামী পুরুষ, সে সকাম
কর্ম করিয়া করিয়া, সেই সেই কর্ম-সংস্কার
আপনার বুদ্ধিতে লিখিয়া জন্মজন্মান্তর আপনার
সঙ্গে লইয়া যায়। সেই সকামী পুরুষ
আপনিই বীজ বপন করে, আপনিই তাহার
ফলভোগ করে।

নানক বলিতেছেন, পরমেশ্বরের হুকুমেই
জীব নিজ কর্ম অনুসারে এক যোনি হইতে
অপর যোনিতে জন্ম লইতে থাকে। নাম-
রূপ বিনা আসা-যাওয়া ঘুচে না ॥

২১

তীরথ তপ দয়া যতু মান ।
কে কো পাটব তিলকা মান ॥
স্তনিয়া মল্লিয়া মন কিতা ভাউ ।
অস্তর গতে তীরথ মল নাউ ॥
সতি গুণ তেরে মৈ নাহি কোই ।
বিন্ গুণ কিতে ভগতি ন হোই ॥
অতি আখি বাণী বরমাউ ।
সং স্তহান সদা মন চাউ ॥

কোন স্বেশা, বধত কোন, কোন
তিথি কোন বার। কোন সিরুতী, মাহ
কোন, যিত হোয়া আকার ॥ বেল ন পাইয়া
পণ্ডিত, যি হোটেব লেখ পুরাণ। বধত ন
পাইউ কাদিয়া, যি লিখন লেখ কোরাণ ॥
তিথি বার ন যোগী জাটন, কতী মাহনা কোই।
বা করতা সিরিঠি কউ সাজে, আপে জাটন
সোই ॥ কিব করি আর্থা, কিব সালাহী,
কিউ বরণী, কিব জানা। নানক, আখনি
সতকে আটে, ইক হ ইক সিয়ানা ॥ বজা

সাহিব, বড়ী নাই, কি তা ধাকা হো বৈ । নানক
বেকো আপো জাটন, অগৈ গয়া ন সোটেই ।

অর্থঃ—গঙ্গাদি-তীর্থসেবা, কচ্ছ, তপস্যা,
দয়া, সংযম, দান,—ইহার কোন একটা সামান্য
পরিমাণে (তুলকা মান) অবলম্বন করিলেও
ভগবানকে লাভ করা যায় । ইহার কোন
একটা অবলম্বন করিয়া ভগবানের মায়ায়
অবণ, তাঁহাকে মনন এবং মনে তাঁহার প্রতি
শ্রেয় রাখিতে হইবে । উত্তম অধিকারী সাধক-
গণ, শরীরাত্তর্পত যে তীর্থ তাহাতেই স্নান
করেন । যথা।

তপতীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিস্ত্রিয়নিগ্রহঃ ।
সর্বভূতদয়াতীর্থং ধ্যানতীর্থমশ্রুতম্ ॥ এতানি
পঞ্চতীর্থানি সত্যং বষ্টং প্রকীর্তিতম্ । দেহে
তিষ্ঠন্তি সর্বস্ত তেষু স্নানং সমাচরেৎ ॥
তপস্যা, ক্ষমা, ইস্ত্রিয়দমন, সর্বভূতে দয়া, ধ্যান
এবং সত্যবাক্য—ঐ ছয় তীর্থ শরীর-মধ্যে
রহিয়াছে, তাহাতে প্রত্যহ স্নান করা কর্তব্য ।

হে প্রভো, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন গুণই
তোমাতে বর্তমান, অথচ তোমাতে কোন
গুণই নাই, অর্থাৎ তুমি ত্রিগুণাতীত ।
আবার তোমাতে গুণ আরোপণ না করিলে
ভক্তি-লাভ হয় না, অর্থাৎ সঙ্গুণ উপাসনাই
ভক্তির অঙ্গ ।

স্বয়ম্ভূতি—স্বত্বিপূর্ণ, অর্থাৎ বলাপন্ন ।
বয়মাউ—ব্রহ্মার । আথবাণী—বেদরূপ বাণী ।
সেই সঙ্গুণ ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মার
দ্বারা বেদরূপ বাণী প্রকাশ করিয়াছেন ।

সৎ—তিনি সঙ্গুণ । সুহান—ভিনি
চেতনস্বরূপ । সদা—নিত্য । মনচাউ—
আনন্দস্বরূপ । তিনি সত্যস্বরূপ, চেতন-
স্বরূপ, নিত্য ও আনন্দস্বরূপ ।

কোন সুবেলা—সে সময়ে কোন ছিল ।
বখত কোন—দিবসের কোন ভাগ ছিল ।
কোন তিথি কোন বার—কোন তিথি এবং
কোন বার ছিল ; কোন সিক্তি—কোন ঋতু
ছিল ? মাহ্—কোন—কি মাস ছিল ; যিভ
হোয় আকার—যে সময় সেই নিরাকার পুরুষ
হইতে এই সাকার জগৎ উৎপন্ন হইল । সেই
নিরাকার পুরুষ হইতে যখন এই সাকার জগৎ
উৎপন্ন হইল, সে কাল, সে সময়, সে তিথি,
সে বার, সে ঋতু, সে মাস কি ছিল ?

বেল ন পাইয়া পণ্ডিত—পণ্ডিতেরাও সে
সময় নিরূপণ করিতে পারেন নাই । যি
হোবে লেখ পুরাণ—যদি পণ্ডিতেরা জানিতেন,
তাহা হইলে পুরাণে তাহা লেখা হইত ।

(ক্ৰমশঃ)

শ্রীজানেশমোহন দত্ত ।

গান ।

(সিদ্ধ মিশ্র—তেতাল)

আজি মম জীবনের হৃদয় এল— !

জ্যোৎস্না-রাতে—তারকা সাথে

এ মম জীবনের হৃদয় এল !

কুটিল ফুলে,—তটিনী-ফুলে

নদী-জল-কল্লোলে—হৃদয় এল— !

ছুরার খুলিয়া,—আপনা ভুলিয়া,

প্রেম-ভালি লাজা মন, হৃদয় এল !

ঐনির্দলচন্দ্র বড়াল ।

গানের স্মরণলিপি ।

মিষ্ট্র—একতাল।

সারা জীবন ধরে কাঁদতে হবে— গল্বে রে মোর প্রাণ
সেই তো ভালো—সেই তো ভালো ! গাইবে করুণ বুক-চেরা গান,
ধুয়ে যাবে মোর সকল কলঙ্ক— তুল্বে গভীর নীরব তান—
সেই তো ভালো—সেই তো ভালো ! সেই তো ভালো—সেই তো ভালো !

আমার অশ্রু-জলের কমলগুলি,

তোমার চরণ-তলে পড়বে ছলি ;

মুক্তা-সম বলসিবে—

সেই তো ভালো—সেই তো ভালো !!

কথা ও হর—শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র রডাগ, বি-এল। স্মরণলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্ত।

আস্থায়ী ।

২' ৩ ০ ১
-II সা সা সা | সা -দা দা | দা পা -া | গা দা পমজরসা I
সা রা জী ব ন ধ রে কাঁ দ তে হ বে.....

২' ৩ ০ ১
I গা -া সা | জ্ঞা জ্ঞা -া | যা -া পা | যা পা -া I
সেই . তো ভা লো . সে ই তো ভা লো .

২' ৩ ০ ১
I পা পা গা | গা সা সা | সা দা পা | সা -গদপমা -জরসা I
ধু য়ে যা বে মোর স কল ক ল ক

২' ৩ ০ ১
I গা -া সা | জ্ঞা জ্ঞা -া | যা -া পা | যা পা -া II
সেই . তো ভা লো . সে ই তো ভা লো .

অন্তর্য।

২' ৩ ০ ১
II পা -া পা | গা গা -া | সা -া -রা | -া -পা -সা I
গ ল্ বে রে মো র প্রা

২' ৩ ০ ১
I গা -১ গা | সা সা -রা | সা -১ গা | দা পা -১ I
গা ই বে ক ক ন বু ক চে রা গা ন

২' ৩ ০ ১
I পা -১ দা | দা দগা -সা | গা দগা -দা | পমজা -রসা -১ I
তু ল বে গ ভী. র নী র. ব তা... .. ন

২' ৩ ০ ১
I গা -১ সা | জা জা -১ | মা -১ পা | মা পা -১ II
সেই . তো ভা লো . সে ই তো ভা লো .

আভোগ।

২' ৩ ০ ১
II পা পা পা | গা গা গা | -সা সা সা | রা -গা সা I
আ মার অ ঞ জ লে র ক মল ও . লি

২' ৩ ০ ১
I গা গা গা | গা -১ সা | রা গা সা | সা গা পা I
তো মার চ র গ ত লে পড় বে ছ . লি

২' ৩ ০ ১
I গদা -১ দা | দা দগা -সা | দা দগা দা | পমা -জরা -সা I
মু ক তা স ম. . অ ল সি বে... ..

২' ৩ ০ ১
I গা -১ সা | জা জা -১ | মা -১ পা | মা পা -১ II II
সেই . তো ভা লো . সে ই তো ভা লো .

জাহাজ ছুবি।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বুড় রাধাগোবিন্দবাবু বছদিনের পুরাতন বহুদর্শী এই দেওয়ানকে ইতর তর সকল দেওয়ান। উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পিতার শ্রেণীর লোকেই অসাধারণ প্রজ্ঞা-ভক্তি আমল হইতে তিনি এই কার্য করিতেছেন। করিত। তিনি উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর অপে- সৌম্য, সরল, উদার, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও দাও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া লোকে উপেন্দ্র.

বাবুকে 'বাবু', এবং দেওয়ান রাধাগোবিন্দ বাবুকে "বড়বাবু" বলিয়া ডাকিত। স্বয়ং উপেন্দ্রকিশোরবাবুও তাঁহাকে কৰ্মচারীর ভায় জ্ঞান করিতেন না; নিজের অগ্রজের মত শ্রদ্ধা করিতেন। তাহার পর উপেন্দ্রকিশোরবাবুর মৃত্যুর পরে অমরকুমার যখন বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইলেন, তখন অমরকুমার রাধাগোবিন্দবাবুকে পিতার মত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন; সকল কাৰ্য্যভার তাঁহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। কোন দিন কোন কাজ তাঁহার অনতিমতে অমরকুমার করিতেন না। উপেন্দ্রকিশোরবাবুর গৃহে রাধাগোবিন্দবাবুর অব্যাহতচার ছিল। তিনি যেন এই গৃহেরই কেহ, ঠিক এমন ভাব ছিল। তিনিই আসিতেই ভৃত্য চলিয়া গেলে পর, অমরকুমার আশালতাকে বলিলেন। "আমি ত্রোঁ-মশাইকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম; তাঁকে সমস্ত কথা বলে, তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করে জমিদারীর প্রকৃত মালিকের অনুসন্ধান করতে হবে। আমি বলিজেছি, তাঁকে পাওয়া গেলে, ষাঁর বিষয় তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে, আমি চলে যাব। এ পরের বোঝা বইতে আর আমার ভাল লাগছে না। আমি যে দিন থেকে জানতে পেরেছি, আমি জমিদার উপেন্দ্রকিশোর বাবুর ঔরসজাত পুত্র নই, সেই দিন থেকে এ সকল বিষয়-সম্পত্তি যেন আমার প্রাণে হুচেন, মতন বিধুছে।"

আশালতা চূপ করিয়া রহিল। আশালতাকে নীরব দেখিয়া অমরকুমার বলিলেন, "কষ্ট হচ্ছে তোমার? বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে দিচ্ছে বাব বলে, তোমার মনে দুঃখ হচ্ছে কি,

আশা? এ-সব ষাঁর তাঁকে যদি দিয়ে বাই, তা হ'লে তোমার কষ্ট হবে কি? আমার সঙ্গে দারিদ্র্য-ভোগ করতে পারবে না?"

তাড়াতাড়ি আশালতা বলিল, "না না, আমার কিসের দুঃখ? আমার কষ্ট হবে কেন? তুমি যেখানে থাকবে আমিও সেই খানে থাকব। তুমি যেখানে থাকবে, সেই আমার অমর্যাবতী! তোমার সঙ্গে যদি আমার বনে বাস করতে হয়, তাতেও আমার দুঃখ! কাজ কি আমার এ পরের সম্পত্তিতে! সত্যি কথা বলতে কি, আমার আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। সব যেন কেমন কেমন বলে মনে হচ্ছে।"

সাগ্রহে অমরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি বলছ ত, লতা?"

আশালতা বলিল, "সত্যি নয় ত' কি মিথ্যে কথা বলছি তোমার কাছে? কোনও দিন কি বলেছি?"

বৃদ্ধ রাধাগোবিন্দবাবু একটু কানিয়া সাড়া দিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আমাকে ডেকেছ, অমর?" বৃদ্ধের আগমনে অবস্ফুৰ্ত্তন টানিয়া আশালতা অস্ত্র দ্বারপথে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। অমরকুমার সমস্তম্বে বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ! আহুন, বহুন!" ইহা বলিয়া অমরকুমার একখানা চেয়ার টানিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলেন। "থাক, থাক"—এই যে বসছি।" বলিতে বলিতে রাধাগোবিন্দবাবু উপবেশন করিয়া বলিলেন, "কোন বিশেষ দরকারি কথা আছে কি?"

অমরকুমার বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ! দরকারও আছে বটে! বিশেষ রহস্যযুক্তও বটে!" বিষয়-বিস্ফারিত-নেত্রে অমর-

কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রাধাগোবিন্দ-
বাবু বলিলেন, “ব্যাপারটা কি বল দেখি?”

অমরকুমার একটু শুক হাসি হাসিয়া
বলিল, “আমি কঁার ওঁরসজাত পুত্র জানেন?”

অমরকুমারের এইরূপ অভ্যস্ত প্রশ্ন
শুনিয়া রাধাগোবিন্দবাবুর বিশ্ময়ের সীমা
রহিল না। অমরকুমারের প্রশ্নের ভাবার্থ-
গ্রহণে অসমর্থ হইয়া তিনি সন্ধিগ্ধচিত্তে
বলিলেন, “কেন বল দেখি, অমর, এমন কথা
বলছ?”

অমরকুমার বলিলেন, “আপনি বিজ্ঞ
প্রাচীন ব্যক্তি। বহুদিন হতে এই বনু-বংশের
সহিত আপনার বনিষ্ঠতা আছে, এ বংশের
অনেক কাহিনীই আপনি জ্ঞাত আছেন,
তাই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি।”

রাধাগোবিন্দবাবু অনেকক্ষণ ভাবিয়া
কিছুই অসুমান করিতে পারিলেন না। তিনি
কথাটা অল্প ভাবে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,
“হঠাৎ জাহাজ এ-কথা কেন তোমার মনে হ’ল,
অমর? কেন, এ সন্দেহের কারণ কি?”

অমরকুমার প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন,
“সন্দেহ নয়, জেঠা-ম’শাই, প্রমাণ পেয়েছি।”

বিশ্ময়ের উপর বিষয়ে অভিভূত হইয়া
রাধাগোবিন্দবাবু বলিয়া উঠিলেন, “প্রমাণ?
তুমি তুল বুঝছ অমর! তোমার স্বর্গীয়া
জননী যথার্থই সত্যী লক্ষ্মী ছিলেন। ও-সব
কথা তুমি মনে এনো না!”

রাধাগোবিন্দবাবু যে অমরের কথাটা
অস্ত্রভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে
পারিয়া অমর অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি
বলিলেন “না, না, আমি সে কথা বলি নি।
আপনি বুঝতে পারেন নি; জেঠা-ম’শাই!

আমি বলছি যে, আমি এ বনু বংশের ছেলে
নই। এ বংশ আমার জন্মই নয়।”

তবুও রাধাগোবিন্দবাবু সবিষ্ময়ে বলিলেন,
“কি রকম? তোমার জন্ম তো আজিম-
গঞ্জেই হয়! সে ত এই সে-দিনের
কথা! তোমার আটকোড়ের দিন বাছনা
বাড়িয়া রামা ঢুলি শালের জোড়া নিয়ে
গেছিল। সে, বোধ হয়, এখনও বেঁচে
আছে। ওঃ সে কি আনন্দের দিন! ‘ছেলে
হবে না, হবে না; ক’রে কর্তার অনেক বয়সে
তোমার জন্ম হয় কি না, তাই গরিব দুখী,
চাকর, লোক-জন যে যা চেয়েছিল কর্তা
তাকেই তাই দিয়ে ছিলেন। আর সেই
জন্মেই কর্তা তোমার নাম রেখেছিলেন
‘অমর’!”

যুহ হাসিয়া অমরকুমার উত্তর করিলেন,
“সে আমি নই, জেঠা-ম’শাই! সে অল্প
এক অমর!” এই বলিয়া অমরকুমার
সেই গজদস্তনিশ্চিত ক্ষুদ্র বাক্সটা খুলিয়া
উপেক্ষিকিশোরবাবুর লিখিত সেই খাতাখানি-
রাধাগোবিন্দবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন,
“এইখানা পড়ে দেখুন, তা হলেই সব বুঝতে
পারবেন।”

রাধাগোবিন্দবাবু খাতাখানি লইয়া বহুক্ষণ
ধরিয়া তাহা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া,
নাড়িয়া চাড়িয়া, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া
তাহা যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

অমর কুমার বলিলেন, “কি বুঝলেন,
জেঠা মশাই?”

মাথা নাড়িয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন,
“কিছুই নয়, বাবা! দেখ অমর! আমার মনে
হচ্ছে, এ কোন শত্রু-পক্ষের লোকের কাজ।”

অমর কুমার বলিলেন “না, জেঠা ম’শাই, এমন শত্রু আমার কে আছে, যে এরকম অক্লান্ত কথা লিপিবদ্ধ করে আমার ঘরে রাখবে? তা’তে তাঁর লাভই বা কি!”

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “তোমরা ছেলেমানুষ, সংসারের লোকচরিত্র জানতে এখনও তোমাদের চের দেরি! তুমি জান না অমর, এ-সংসারে এমন লোক আছে, তারা ভালর ভাল দেখতে পারে না। আমার ধারণা, তোমাকে অপদস্থ করবার জন্যই কেউ এ কাজ করেছে।”

অমরকুমার একটু দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, “না জেঠা ম’শাই! তা কখনো হতে পারে না। এই দেখুন, এ বাকসটার কল খুব ভাল, এ বাকস বাবার শোবার ঘরে, তাঁর দেওয়ালের ভিতর একটা গুপ্ত ড্রয়ারের মধ্যে অতিথয়ে লুকান ছিল। দেখেছেন তো বাবার ব্যবহারি জিনিষগুলি আমি তাঁর নুতি-চিকনরূপ অতিথয়ে নিজের হাতে ঝেড়ে য়ছে যত্ন করে রাখি। কোন দিন কা’কেও কিছু দিইও নি, নিজেও তাঁর কোন জিনিষ ব্যবহার করি নি। বাবার আমলে যেমন তাঁর জিনিষগুলি তাঁর ঘরে সাজানো শুছোনো থাকত, আমি ঠিক তেমনি করে রেখে দিয়েছি। সে-দিন তাঁর সমস্ত কাপড়-চোপড় রোদে দিবে ঝেড়ে ঝুড়ে যখন তুলে রাখি, তখন হঠাৎ এই গুপ্ত ড্রয়ারটার উপর নজর পড়লো। এত দিন তো লক্ষ্য করি নি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তা খুলতে পারলুম না। নাড়া চাড়া করতে করতে হঠাৎ একটা জীং যেমন একটু হয়ে পড়ল, অমনি টপ করে ড্রয়ারটা বেরিয়ে পড়ল। দেখলাম,

তাঁর ভিতরে এই সুন্দর বাকস টা একখানা কাগজে-মোড়া অতিথয়ে করে তুলে রাখা হয়েছে। বাকসের ভিতর কি আছে দেখতে কোতুল হ’ল। কিন্তু বাকসের চাবি কোথাও খুজে পেলুম না। একবার মনে করলুম, ‘থাক, যা আছে, বাবা যেমন যত্ন করে রেখে দিয়েছেন, তেমনি যত্ন করে তুলে রেখে দিই, কিন্তু বাকসটার সমস্ত আমার এতকোতুল-বুদ্ধি হলো তা’ আর আপনাকে কি বলব? বাবার টাকা-কড়ি মূল্যবান আসবাব, হীরে জহরত, দলিল দস্তাবেজ যা কিছু ছিল, সমস্তই তিনি মৃত্যুর পূর্বেই আমাকে দিয়ে গেছলেন, তাঁর আলমারি সিঁদুক আয়রেন চেষ্টের চাবি, সব তিনি অনেক দিন হ’তেই আমাকে দিয়ে ছিলেন এবং কোন খানে কি আছে তা সমস্তই আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু কই বাকসটার কথা তো তিনি একদিনও আমার কাছে বলেন নি! এ বাকসের ভিতর কি এমন জিনিষ এত যত্ন পূর্বক গোপন করে রেখেছেন, দেখবার ইচ্ছাটা আমি কিছুতেই দমন করতে পারলুম না। তাই মিস্ত্রী ডাকিয়ে বাকসটি খুলিয়ে নিলুম। নিয়ে দেখি বাকসটি শূন্য। দেখে আশ্চর্য হলুম। শূন্য বাকসটি এত যত্ন করে রাখবার বাবার কি এত দুর-কার। কিছু বুঝতে পারলুম না। বাকসটিও ম্যাজিক বাকসের মতন কত রকম ঝাঁজ-কাটা। খুঁজতে খুঁজতে শেষে এই খাতাখানি বাকসতে দেখতে পেলাম। খুলে দেখলুম, তাঁর নিজের হাতের লেখা; পড়ে দেখলুম—আমারই একপ্রকার জীবন-কাহিনী। তাঁর গুপ্ত সম্পত্তি বাহির করে পাণ করেছি কি না জানি না, কিন্তু পিতার অবর্তমানে যখন সকল

দ্ব্যই আমার, তখন এ বাস্তবীও আমার, সেই তাবেই খুলেছিলুম। তখন ত আর জানতুম না, আমি এ-বংশের কেউ নই।” কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলেন। তাহার পর অমরকুমার বলিলেন, “এই দেখুন লেখা তাঁর নিজের হাতের।”

বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “হ্যাঁ, লেখাটা ঠিক তাঁর হাতের লেখার মতনই বটে! কিন্তু লেখা ত অনায়াসে-কেউ জাল করতে পারে!”

অমর। এই দেখুন নীচে তাঁর নামযুক্ত মোহর করা রয়েছে।

রাধাগোবিন্দবাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন। অমরকুমার বলিলেন, “আপনি কি তাঁর কাছে আমার সম্বন্ধে কোন দিন কোন কথা শোনেন নি?”

মাথা নাড়িয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “না। তিনি আমার কাছে ত কোন দিন কোন কথা গোপন করতেন না। কিন্তু এ কথা ত আমি এক দিনের জন্য ঘূর্ণাক্ষরেও জানতে পারি নি। তাই ত আমার সম্ভেদ হচ্ছে, এ লেখা তাঁর নিজের হাতের কি না!”

অমরকুমার বলিলেন, “না জেঠা ম’শাই; সন্দেহের কোন কারণ নেই; এই লেখা যে তাঁর নিজের হাতের সে বিষয়ে কোন ভুল নেই! যে কারণে একথা তিনি গোপন করেছিলেন তা ত নিজে লিখেই রেখেছেন। তবে আপুনি যখন সকল বিষয় জানেন, তখন আমার সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে পেরেছিলেন কি না, তাই বিজ্ঞাসা করছিলাম।”

রাধাগোবিন্দবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, “অমর রাগ

কোরো না বাবা। আমি বুঝতে পারছি না, তোমার মাথা বিগড়েছে, কি তাঁর মাথা বিগড়েছিল, কিংবা তিনি কোনও উপক্ৰাস রচনা করছিলেন? হয় ত বা এ তা’রই উপকরণ!”

অমর। আপনি জানেন কি, তিনি কখনও নোয়াখালিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন কি না?

রাধা। হ্যাঁ, তা জানি। গেছেন। সে কথা আমার বেশ মনে রয়েছে।

অ। নোয়াখালিতে তাঁর কোনও উকিল বন্ধু ছিলেন?

রাধা। হ্যাঁ তা ছিলেন, জগদীশবাবু। তিনি এখানেও কতবার এসেছিলেন। তাঁকে দেখেছি। পাতলা একছারা ছিপু ছিপে লম্বা হেন লোকটি।

অ। শব্দ বললে তাঁর কোনও পুরোণো চাকর তাঁর সঙ্গে গেছে নোয়াখালিতে?

রা। হ্যাঁ গেছে।

অ। সে বাবার সঙ্গে ফিরে এসেছিল কি?

রা। না।

অ। কেন আসেন নি সে কথা তিনি এসে, কিছু বলেন নি?

রা। হ্যাঁ বলেছিলেন—বেচারি নোয়াখালিতে গিয়ে হঠাৎ মারা পড়ল। আহা বুড়োর নোয়াখালিতে মাটি কেনা ছিল আর কি?

অমরকুমার রাধাগোবিন্দবাবুর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া পিঠের জামাটা তুলিয়া বলিলেন, “দেখুন দেখি, আমার পিঠে কিছু লেখা আছে কি না?”

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “হ্যাঁ, তোমার

নাম লেখা রয়েছে। বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে “ঐ অমরকুমার বহু।”

অমরকুমার কিরিয়ী বলিলেন, “তবে জেঠামশাই, একথা মিথ্যা উপস্থাপন করছেন কি করে? আর যদি এ উপস্থাপন হয়, তা হলে এ উপস্থাপনের প্রধান নায়ক হয়েছি আমি।”

রাধাগোবিন্দবাবু অধোবদনে নিরুত্তর রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, “আশ্চর্য ব্যাপার! মানুষ এমন করে কি পুত্রশোক চেপে রাখতে পারে? এ প্রহেলিকা-ভেদ করা মানুষের অসাধ্য।”

কিছুক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর অমরকুমার বলিলেন, “আজ্ঞা, জেঠামশাই, ছোটবেলায় সে অমরকেও দেখেছেন, আমাকেও দেখেছেন, দেখে কি তখন আপনাদের মনে কোনও সন্দেহ হয় নি?”

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “না বাবা! তুমি যদি যথার্থই সে অমর না হও, তা হলে তোমাদের উভয়ের যমজ-সহোদরের মত আকৃতিগত অতিশোবাদৃশ্য! যা অপরে দেখলে হঠাৎ বুঝতে পারে না। সুতরাং তুমি যে উপেক্ষাকিশোরবাবুর ছেলে নও, তা কেমন করে বুঝবে? সে সম্ভব কেমন করে করবে? উপেক্ষাকিশোরবাবু তাকেও যেমন ভাবে রাখতেন, তোমাকেও ঠিক তেমনি ভাবে রাখতেন, তাকেও যেমন একমুহূর্তের জন্য চক্ষের অন্তরাল হতে দিতেন না, তোমাকেও সেই রকম একমুহূর্তের জন্য চক্ষের অন্তরাল করতেন না। কোন ভাব-পরিবর্তনের বৈলক্ষ্য্যও ত দেখিনি! মানুষ নিজের সন্তান

হারিয়ে পরের সন্তানের প্রতি যে এমন প্রাণ ঢেলে ভালবাসা দিতে পারে, তা বাপু, আমাদের এতখানি বয়েস হল, আমি তা কল্পনাতেও আনতে পারি না। একমাত্র-পুত্রশোক মানুষ যে এমন করে প্রাণের ভিতর ঢেপে লুকিয়ে রাখতে পারে, এও জীবনে কখনও শুনি নি।”

কৃতজ্ঞভরে অমরকুমার বলিলেন, “হ্যাঁ, তাঁর মহত্বকে ধন্যবাদ! যথার্থই তিনি আমাকে নিজের ঔরসজাত পুত্রের মতন ভাল বাসতেন। তাঁদের সে স্নেহ-ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করতে পারব না। তবে মনে কছি, তাঁর নিকৃষ্ট পুত্র অমরকুমারের সন্ধান করে তাঁর সম্পত্তি তাঁর হাতে দিয়ে আমার স্বর্গীয় মহাত্ম্য প্রতীপালকের প্রেত আত্মাকে সন্তুষ্ট করব।”

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন “অমর! তুমি ছেলেমানুষ, এ বুড়োর কথা শোন। কোন দিনও বাবা, তুমি আমার অমতে কোন কাজ কর নি, তবে আজ আর আমার শেষ-দশায় আমার কথা ঠেলে আমার মনে কষ্ট দিও না।”

অ। সে কি কথা জেঠামশাই! আপনাদের মনে কষ্ট দোব! আমি যার ছেলেই হই না কেন, ছেলে-বেলায় আমাকে যে স্নেহ যত্ন করেছেন, আজ পর্যন্ত আমাকে যে-রকম ভালবাসেন, আমি কি সে-কথা ভুলে যাব? সে রকম কৃতজ্ঞ আমি নই। কি বলবেন বলুন!

রা। আমার কাছে যা বলছে তা’ বলে, কিন্তু একবার আর কোনও উত্থাপন করো না। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, উপেক্ষাকিশোরবাবু জীবিত-কালে যখন এ-কথা প্রকাশিত হয় নি, তিনি যে কালে এ-কথা

প্রকাশ করেন নি, তখন একথা নিয়ে ব্যস্ত হ'বার তোমার কোনও দরকার নেই।

অ। দরকার নেই! বলেন কি জেঠা-বশাই? যে-দিন থেকে আমি একথা জানতে পেরেছি, সেই-দিন থেকে আমার স্বধ-শাস্তি কিছুই নেই। আমি অস্তায়রূপে এ বিষয় ভোগ করছি। যার এ সম্পত্তি, তাঁর হাতে বুঝিয়ে দিতে পারলে, তবে আমি শাস্তি পাব। তা হলেও জানুব, আমার স্বর্গগত আশ্রয়-দাতার স্নেহের ঋণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে শোধ হল।

রা। কথাটা যদি সত্যই হয়, তা হ'লে তুমি মনে করছ কি অমর, সে বেঁচে আছে? বেঁচে যদি থাকত, তা হলে এতদিন অবশ্যই কোন রকম না কোন রকমে তা'র সন্ধান পাওয়া যেত।

অ। আমার বিশ্বাস, তিনি বেঁচে আছেন। শব্দের হত্যাকারীরা যদি তাঁকে হত্যা করত, তা হ'লে সেইখানেই করত। তা যখন করে নি, সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে পালিয়ে গেছল, তখন নিশ্চয় তাঁর প্রাণবধ করে নি।

রা। তাই যদি হয়, তা হলেও আর তাকে পাওয়া যাবে না, অমর! তার যদি দেশভূঁই, বাপ-মাকে মনে থাকত, তা তা হ'লে কি এই পঁচিশ বছরের মধ্যে সে কিরে আসত না! বুড়োর কথা শোন, অমর! মনকে স্থির কর, বুধা ছেলে-মা'হুসী কোর না। এ-বিষয়ে আর উচ্চ-বাচ্য কোরে কাজ নেই।

অ। আমি মনে করছি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দোব। দেশে যেনে তাঁর অস্থ-সন্ধান লোক পাঠাব। যেমন করে হোক,

তাঁর অস্থসন্ধান আমি করুব। আপনি বল-ছেন যে এতদিন তাঁর কোনও খবর পাওয়া যায় নি। কিন্তু আমার প্রতিপালক পিতা নিজের পুত্রের কোনও অস্থসন্ধান করেছিলেন কি? তিনি পিতার কর্তব্য পালন করেন নি। আমাকে নিয়ে তিনি পুত্রশোক এক রকম বিশ্বৃত হয়েছিলেন। তাঁর পে ঐটি আমি সংশোধন করবো। আমাকে আর আপনি নিষেধ করবেন না। প্রাণপণ চেষ্টা করেও যদি তাঁর কোনও অস্থসন্ধান করতে না পারি, যথার্থই যদি তিনি হত হয়ে থাকেন, তখন যা উচিত হয় করুব। কিন্তু এখন এ বিষয়-সম্পত্তিতে আমার কোনও অধিকার নাই।

মাথা নাড়িয়া রাখাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “অমর! তুমি সংসারানভিজ্ঞ বালক। তাই কাজটাকে এত সহজ মনে করছ! কিন্তু বড় সহজ ভেবেছ, কাজটা তত সহজ হবে না। তুমি নিজের উদার মনটির মত সমস্ত জগৎ-টাকে দেখছ! জান না তো বাপু, কত জাল জোচ্চুরি, ঠকামি, ফেরাবাজী এর ভেতর আছে! তুমি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটি বা'র করবামাত্র রাশি রাশি লোক বিংয়ের লোভে ছুটে এসে বলবে—“আমি উপেন্দ্র-কিশোরবাবুর ছেলে, তখন?”

একটু চিন্তা করিয়া অমরকুমার বলিলেন, “সেটা অবশ্য আমাদের ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।”

রাখাগোবিন্দবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “অমর! পঁচিশ বছর তোমাকে নিয়ে ঘর করছি, নিজের ছেলের মতন তোমার উপরে মায়া পড়েছে, তোমার

মতন মহৎ উদার সরল যুবক এ-সংসারে খুব
কর দেখেছি। তুমি দেশ ছেড়ে চলে যাবে
এ-কথা তাবতে গেলেও বুকেটা কেটে যায়।
তোমাকে বঞ্চিত করে কি শেষে একটা
দোঁচোর এসে এতটা বিষয় ভোগ করবে?—
হা ভগবান! এমন অঘটন ঘটবে, এ যে
কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নি!—আবার বলছি
অমর এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।” বলিতে
বলিতে বুকের চক্ষু হঠাতে টপ্ টপ্ করিয়া
কয়েক বিন্দু অশ্রু নির্গত হইল। তাহা
দেখিয়া অমরকুমারের চক্ষের কোণ দুইটাও
যেন কেমন একটু ছলছল ভাব হইয়া আসিল।
কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহার সংকল্প
অটুট।—তাঁর সেই একই কথা। “বার বার
আপনার কথার প্রতিবাদ করছি, সে ভুলে
কথা করবেন। কিন্তু এ-কথা ঠিক জানবেন,
আমি বধম এ পরিবারের কেউ নই, তখন
এ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করার আমার কোনও
অধিকার নেই। তখন আর আমাকে এখানে
বৈধে রাখতে পারবেন না। আপনারা
আমার জীবনকে সে ভাবে গঠিত করেন নি।”
অমরকুমারকে কিছুতেই যখন তাঁহার সংকল্প-
চ্যুত করিতে পারিলেন না, তখন অগত্যা
ক্লমমনে অমরকুমারের নিকটে বিদায় লইয়া
স্বাধোগোবিন্দবাবু গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

(৩)

অপহৃত অমরকুমারের ধোনও প্রকার
অহুসন্ধান নোয়াখালির পুলিশ অফিসারগণ
জানিতে পারিয়াছিলেন কি না এবং শবরের
হত্যাকারীদিগের কোনও সন্ধান পাওয়া
দিয়াছে কি-না, তাহা জানিবার নিমিত্ত অমর-
কুমার নোয়াখালিতে জগদীশবাবুর নামে এক

পত্র লিখিলেন। জগদীশপ্রসাদের যত্ন হইয়া-
ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভবানীপ্রসাদ কৃতবিদ্যা
হইয়া তৎপদে অধিষ্ঠিত হইয়া জজ-আদা-
লতে ওকালতি করিতেছিলেন। অমরকুমারের
প্রেরিত পিতার নামাঙ্কিত পত্রের উত্তর দান
তিনিই করিলেন;—লিখিলেন, “আমরা
জানিয়াছিলাম, উপেন্দ্রকিশোরবাবু তাঁহার-
অপহৃত পুত্র অমরকুমারকে পাইয়াছিলেন।
আজ জানিতেছি, তিনি পালক পুত্র।
জানিয়া বড় আশ্চর্য্যাম্বিত হইলাম। শবরের
হত্যাকারীর পুলিশ কোন অহুসন্ধান
করিতে সমর্থ হয় নাই। ইত্যাদি।” পত্র পাঠ
করিয়া অমরকুমার কিছু হতাশ হইলেন;
কিন্তু নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। বিজয়কুমার
মিত্র নামক জনৈক ভদ্র যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের
উপাধিভাষ্য করিয়া পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে
কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি যদিও নবীন
কর্ম্মচারী কিন্তু তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া
অনেক প্রবীণ কর্ম্মচারীও সঁধ্যাপূর্ণনেত্রে
তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে
যে যে-কার্য্যভার প্রদান করিত, অতি বিচক্ষণ-
তার সহিত তিনি সত্ত্বর সে কার্য্য সম্পন্ন
করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার অদ্বুত মেধা-
দর্শনে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যেখানে জটিল রহস্ত-
যুক্ত ব্যাপার সম্মুখিত হইত, সেইখানেই কার্য্য-
ভার দান করিলেন। সম্প্রতি একটা মাদ্রাস-
চুরির ব্যাপারে তিনি এরূপভাবে তদন্ত
করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার শক্তি ও
সাহস এবং প্রত্যাশপূর্ণমতিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত
হইয়া সমস্ত দেশবাসী ‘ধস্ত ধস্ত’ করিতেছিল।
তাঁহার নাম, বংশ ও ব্যাতি-প্রতিপত্তি এই
ব্যাপারে দেশবিখ্যাত হইয়া পড়িল। তাঁহার

কার্যদক্ষতা-দর্শনে কর্তৃপক্ষগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অমরকুমার মনে করিলেন, উপেন্দ্রকিশোর বাবুর অপহৃত পুত্রের উদ্দেশ্যে জন্ত এই বিজনকুমারের সাধায়া গ্রহণ করিবেন। একদিন অপরাহ্নে অমরকুমার বিজনবাবুর বাটিতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সকল কথা বলিলেন। বিজনকুমার সকল কথা মনোযোগপূর্বক শুনিয়া বলিলেন, “বহুদিনের পুরাতন ঘটনা, কৃতকার্য হইতে পারিব কি না বলতে পারি না, তবে চেষ্টা করে দেখিব। আমার সাধ্য-মত আমি ফ্রটি করব না।” অমরকুমার তিন-হাজার টাকার তিনখানি নোট তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, “এ-কাজে আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হবে, আপনার অনেক পরিশ্রম হবে, অমুগ্রহ করে এই নোট-তিনখানি গ্রহণ করুন।”

বিজনকুমার নোট-তিনখানা দেখিয়া বলিলেন, “টাকা এখন আপনি রেখে দিন। কাজ করবার আগে টাকা নেওয়া আমার অভ্যাস নয়।”

শুধু হইয়া অমরকুমার বলিলেন, “এ-কাজের জন্ত আপনাকে অনেক যোগাযোগ করতে হবে, রাস্তা-খরচও হবে; পণ্যখরচ-স্বরূপ এটা দিন।”

বি। আগে আপনার কাজ উদ্ধার করে দেই, তারপর যা অভিক্রটি হয় দেবেন।

অ। প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে পাওয়া গেলে আমি স্থির করেছি, তাঁর স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাব। তখন আর আমার কোনও হাত

থাকবে না, কেমন করে আপনাকে টাকা দোব?

বি। তা' না হয় যিনি বিষয় গ্রহণ করবেন, তাঁর কাছ থেকেই টাকাটা নোব।

অমরকুমার কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “আপনাকে কাজের ভার দিচ্ছি আমি। তিনি যদি টাকা দিতে কুণ্ঠিত হন, তাহলে আমি লাজ্জিত হব। অথচ তখন আমার কোনও হাত থাকবে না।

মুহু হাসিয়া বিজনবাবু বলিলেন, “অমরবাবু তখন যদি আপনার কোনও অধিকার না থাকে, তা হলে এখনও ত এ-টাকা দান বা বায় করবার অধিকার আপনার নাই! আপনি ত রক্ষকমাত্র।

অপ্রতিভ হইয়া অমরকুমার বলিলেন, “না না, রক্ষক ঠিক নয়! আমার মহামুত্তব প্রতিপালক আমাকেই তাঁর পুত্রবলে জন-সমাজে প্রচার করেছিলেন, তাঁর সর্বস্ব আমাকেই দিয়ে গেছেন। দৈবক্রমে প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে আমি যেচ্ছায় তাঁর পুত্রের অমুসন্ধান প্রবৃত্ত হয়েছি।”

বিজনকুমার বলিলেন, “মাপ করবেন। আমি পরিহাস করছিলাম। আপনার মহত্ত্ব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। মাহুদ বিষয়-সম্পত্তির জন্তে সহোদর ভাইকেও বঞ্চিত করতে পারলে ছাড়ে না। এই ধন-সম্পত্তির জন্তে লোকে মারামারি, নালিস-মোকদ্দমা, এমন কি খুনোখুনি পর্যন্ত করে। আপনি যেচ্ছায় এত বিপুল সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে চাইছেন!”

অমরকুমার বিদায়-গ্রহণের জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “বাই হোক, আপনি

খরচের জন্তে টাকাটা অগ্রিম নিলে কিছ
আমি বড় স্বামী হতাম্।”

বিজ্ঞানবাবু বলিলেন, “আপনি মনে কব-
বেন না যে, টাকা নিলাম না বলে আপনার
কাজে আমি অবহেলা করুব। আমার যথা-
সাধ্য আমি আপনার আদেশাঙ্কবাধী কাজ
করবার চেষ্টা করুব।”

অমরকুমার শিঠাচার জানাইয়া বিদায়
গ্রহণ করিলেন। পরদিন অমরকুমার সংবাদ-
পত্রে এই বর্ণে বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন—
“প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল আজিমগঞ্জের
বৃত্ত জমিদার উপেন্দ্রকিশোর বহুব পুত্র
শ্রীযুক্ত অমরকুমার বহু সাত বৎসর বয়ঃ-
ক্রমকালে নিকৃষ্টি হ’ন। তাঁহার গলার-
একছড়া বহুমূল্য হীরক-হার ছিল। লোকের
অজ্ঞান, সেই হারের জন্ত কেহ তাঁহাকে অপ-
হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। যদি কেহ
তাঁহার সংবাদ বলিতে পারেন, তাহা হইলে
তিনি স্বয়ং এখানে আসিয়া তিনি যে উপেন্দ্র-
কিশোরবাবুর পুত্র তাহা প্রমাণ করিতে
পারিলে, তাঁহার পিতার বিষয়-সম্পত্তির
অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। তাঁহার
পায়ে ছয়টা আঙ্গুল ছিল।”

সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত
হইবার পর অনেকেই এ শুণ্ড রহস্য জ্ঞাত
হইয়া বিস্মিত হইল। জনরব সংশ্লিষ্টে
ক্রমে ক্রমে একথা রাষ্ট্র করিল যে, অমরকুমার
উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্র নহেন, এবং উপেন্দ্র-
কিশোরবাবুর পুত্রকে পাওয়া গেলে অমর-
কুমার বিষয় সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া
যাইতে বাধ্য হইবেন। দরিদ্র প্রজাগণ
প্রবাদ গণিল। এমন দয়ালু প্রজারাজক দরিদ্র-

পালক জমিদারের পরিবর্তে কোন্ নিষ্ঠুর
আততায়ী তাহাদের জমীদার হইয়া বসিবে,
তাহা ভাবিয়া তাহারা কাতর হইল। একবার
সজল চক্ষে করযোড়ে দাঁড়াইয়া নিজের দুঃখ
জানাইতে পারিলেই তাহাদের খাজানা মকুব
হইয়া যাইত, তাহা ছাড়া কিছু বখশিসও
মিলিত। অভুক্তকে অন্ন, রোগগ্রিষ্টকে পথ্য,
কন্ডাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে অর্থদান এমনটি আর
কে করিবে! তাহারা ‘হায় হায়’ করিতে
লাগিল। অমরকুমারের শৃণুর আশালতার
পিতা নিশাদলের রাজার ম্যানেজার ছিলেন।
ম্যানেজার নামমাত্র, তাঁহাকেই প্রকৃত রাজা
বলিলে অত্যাক্তি হয় না। কারণ, রাজা
পুত্রহীন। তিনি বিষয়-কার্যের কিছুই পর্য-
বেক্ষণ করিতেন না। সমস্ত ভার ম্যানে-
জারের উপর অর্পণ করিয়া তিনি স্বয়ং সঙ্গীক
তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। জন-
শ্রবাদ, ম্যানেজার অবনীভূষণের কনিষ্ঠ
পুত্রকে মহারাজ পোষ্য-পুত্র রূপে গ্রহণ
করিবেন। অবনীবাবু রাজপ্রতিনিধি হইয়া
সকল কার্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার
মান-সম্মান, চাল-চলন, অখণ্ড প্রতাপ ঠিক
রাজার মতনই ছিল। লোকে বলিত, তিনি
অত্যন্ত অহঙ্কারী। হঠাৎ একদিন একথানা
কাগজে অমরনাথের এই বিজ্ঞাপনের উপর
অবনীবাবুর দৃষ্টি পতিত হইল। বিজ্ঞাপন
পাঠ করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। অমর-
কুমার যে উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্র নহেন,
এ-কথার তাঁহার বিষয়ের সীমা রহিল না;
এবং ক্রোধে তিনি দিগ্‌বিদগ্‌-জ্ঞানশূন্য হই-
লেন। উপেন্দ্রবাবুর জীবদ্দশায় যখন এ-কথা
প্রকাশ পায় নাই, তাঁহার মৃত্যুর পরেও যখন

অমরকুমার তাঁহার পুত্ররূপে একমাস অশৌচ গ্রহণ করিয়া রীতিমত শ্রাদ্ধ-শাস্তি করিয়া-ছিলেন, তখন এতদিন পরে হঠাৎ কেন যে অমরকুমার ইহা প্রচার করিতেছেন, সে-কথার মর্ম তিনি অবগুত হইতে পারিলেন না । ইহা অমরকুমারের বিরূপ উন্নততা, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না । কথাটা যদি সত্যই হয়, তবে উপেক্ষাবাবু যখন এতদিন কথাটা গোপন রাখিয়াছিলেন, তখন অমরের এখন তাহা প্রকাশ করিয়া অতটা সম্পত্তি পরকে ডাকিয়া বিলাইয়া দেওয়া তিনি উন্নততা মনে করিলেন । অদম্য ক্রোধ, বিস্ময় এবং কৌতু-হলের বশবর্তী হইয়া একদিন তিনি আজিম-গঞ্জে জামাতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; আসিয়াই ক্রোধপূর্ণ স্বরে অমরকুমারকে বলিলেন, “তোমার হয়েছে কি ? মাথা বিগুড়ে গেছে না কি ? এ-সব কাণ্ডখানা কি তোমার ?”

শব্দের এই অকারণ ক্রোধ দর্শনে অমর-কুমার আশ্চর্য্যাবিত হইয়া বলিলেন, “কেন বলুন দেখি ? কি করেছি আমি ?”

অবনীবাবু তেমনিভাবে বলিলেন, “উপেক্ষাবাবুর পুত্র নও বলে তুমি বিজ্ঞাপন দিয়েছ ?”

বিনীতভাবে অমরকুমার বলিলেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ, দিয়েছি ।”

অবনী । এতে তোমার লাভ ?

ধীর প্রশান্ত ভাবে অমরকুমার উত্তর করিলেন, “লাভালাভ বুঝি না, বা কর্তব্য বোধ করেছি, তাই করেছি ।”

অব । কর্তব্যটাই বা তোমার কি রকম ভনি ! বিয়ে করেছ সেটা মনে আছে ?

অম । আজ্ঞে হ্যাঁ । আছে বাই কি ।

অব । তবে ? বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে চলে যাবে বলে যে বড় কার্বানী করেছ, তোমার স্ত্রীর অবস্থা কি হবে ?

দৃঢ়ভাবে অমরকুমার বলিলেন, “বা অদৃষ্টে আছে, হবে । প্রবঞ্চনা করে পরের বিষয় ভোগ করার চেয়ে নিশ্চল দারিত্র্য সহ্যশূণ্যে শ্রেয়ঃ ।”

অব । পরের কি করে হ'ল তুমি ?

অম । আমি যখন তাঁর পুত্রই নই, তখন সম্পত্তি আমার কেমন করে হবে ?

অব । তুমি তাঁর পুত্র বলেই পরিচিত, বিষয়ে তোমার পূর্ণ অধিকার ।

অম । তিনি যদি আমার কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ ক'রে আমাকে তাঁর সম্পত্তি দান ক'রে যেতেন, তা হলে আমি এ বিষয় ভোগ করতে পারতুম । তা যখন তিনি করেন্ নি, স্মারতঃ এ সম্পত্তিতে আমার কোনও অধিকার নেই ।

অব । তিনি যদি তোমাকে বলেন নি যে তুমি তাঁর পুত্র নও, তবে হঠাৎ তোমার মাথায় এ খেয়াল চাপল কেন ? কথাটা কি বড় পৌরুষের মনে কর তুমি ?

অম । পৌরুষ হোক বা নাই হোক, বা ভাষ্য তাই কর্ব ।

অব । তাঁর কাছে যদি কিছু শোন নি, তবে তুমি জান্লে কেমন করে, তুমি তাঁর পালিত পুত্র ?

অম । আমি তাঁর হস্তলিখিত ভায়েরি দেখে এ গুপ্ত রহস্ত জানতে পেরেছি ।

অব । ভায়েরিতে লিখে রেখে গেছেন, তুমি তাঁর ছেলে নও ?

অম। হ্যাঁ।

অব। তুমি তবে কা'রু ছেলে ?

অম। তা' বলতে পারি না।

অব। কই সে ডায়েরি, আমি দেখতে পারি ?

অমরকুমার তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে সেই খাতাখানি আনিয়া অবনীবাবুর হাতে দিলেন।

অবনীবাবু তাহা পূর্ব মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “উঃ এত বড় জোচ্চোর ছিল উপেন্ বোস !”

অমরকুমার আজ জানিতে পারিচ্ছিলেন, উপেন্দ্রবাবু তাঁহার জন্মদাতা নছেন, তথাপি তাঁহার প্রতি তাঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধা তিনমাত্র হ্রাস হয় নাই। বরং তিনি যে অপরের পুত্রকে পালন করিয়া নিদারুণ পুত্রশোক বিস্তৃত হইয়াছিলেন, অমর যে তাঁহার পুত্র নয় একথা বুঝাঙ্করে কাহাকেও জানিতে দেন নাই, তাঁহার এরূপ অদৃষ্ট সহিষ্ণুতা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি অমরকুমারের ভক্তি-শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই স্বর্ণগত মহাত্মার প্রতি হৃদয়াকা-প্রয়োগ করাতে তিনি স্বপ্নের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কিন্তু মুখে সে-ভাবে প্রকাশ না করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অবনীবাবু খাতাখানা আদ্যোপাস্ত পাঠ করিয়া অবজ্ঞা-ভরে গৃহতলে তাহা ফেলিয়া দিলেন। অমরকুমার তাহা কুড়াইয়া লইলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলেন। তাহার পরে অবনীবাবু স্নেহ-ভরে বলিলেন, “এ কেলেঙ্কারি প্রকাশ করে তোমার কতদূর বোকামি হয়েছে, তা বুঝতে পাচ্ছ ? বাপ-মায়ের

পরিচয় জান না, লোকের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে ? লোকে বলবে কি ?”

অমরকুমার এবার বিরক্তির সহিত বলিলেন, “সে পরামর্শ যখন আপনার কাছে চাইব, তখন দেবেন। এখন আমি যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি।”

ক্লান্ত হইয়া অবনীবাবু বলিলেন, “আমি যে তোমাকে মেয়ে দিয়েছি, নইলে কি দরকার ? তোমায় উপেন বোসের ছেলে জেনেই তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে-ছিলুম, কিন্তু যখন লোকে জানতে পারবে সেটা জোচ্চোর, আর তুমি তার ছেলে নও, তোমার জন্মের হিরতী নেই, তখন লোক-সমাজে আমার যে আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।”

ক্রোধে অমরকুমারের সর্বাস্ব কাপিতে লাগিল, কিন্তু কি করিবেন ? তাঁহার উত্তর দিবার কিছুই নাই। যথার্থই তিনি মাতা-পিতার বিষয় কিছুই অবগত নন। দূর অর্ধাত জীবনের কোন ঘটনাই তাঁহার স্মরণ নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি শিশু কালের কোন কথা স্মৃতিপথে আনিতে পারেন নাই। কষ্টে আত্ম সংবরণ করিয়া দীর্ঘ প্রশান্ত ভাবে তিনি সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অবনীবাবু কিছুক্ষণ একাকী সেই কক্ষমধ্যে বসিয়া চিন্তা করতে লাগিলেন। তাহার পর মনঃস্থ করিলেন, কতাকে লইয়া তিনি চলিয়া-যাইবেন ; জামাতার সহিত কোন সম্বন্ধই আর রাখিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি আশাশুভার নিকটে আসিয়া বলিলেন, “অমরটার তো একেবারে মাথা বিগুড়ে গেছে। যে রকম বিজ্ঞাপন-বার করেছে, এই কোন

দিন কোন ব্যাটা জোড়োর এসে বলে,—‘এই যে আমি উপেক্ষাকিশোর বোসের ছেলে!—তখন সে ব্যাটা তো গালে চড় মেয়ে সর্ব্ব্ব্ব কেড়ে নেবে, অমরকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। তুই মা ও হতভাগার সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় কোথায় বেড়াবি? তুই আমার সঙ্গে আয়, আমি তোকে নিয়ে যাই। ও যাই হোক, তুই ত আমার সেই মেয়ে। আহা! কি কল্প বল? বড়লোকের ছেলে মনে করে বিয়ে দিলুম, হয়ে গেল পথের ভিকিরি। সব তোর অদৃষ্ট! আমি তো টাকা খরচ করতে কণ্ডর করি নি মা! হাক্‌ বা হবার হয়ে গেছে, তার তো আর কোনও উপায় নেই! তুই আমার সঙ্গে চ’। তোর কোন কষ্টই আমি রাখব না।’

আশালতা নীরব। পিতার এত কথাই সে কোনই উত্তর দিল না; নতমুখে দাঁড়াইয়া একপদের বুদ্ধাজুলি দিয়া অপর পদের বুদ্ধাজুলি খুঁটিতে লাগিল। কতাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া একটু ব্যস্তভাবে অবনীবাবু বলিলেন, “নে মা শীগ্‌গির করে তোর জিনিষপত্র, গহনা টহনাগুলো গোছগাছ করে নে। আমি আর বেশীক্ষণ থাকতে পারব না; ও দিকে ট্রেনের সময় হয়ে এল।”

ঘীরে ঘীরে আশালতা বলিল, “আপনি যানু বাবা, আমি যাব না।”

বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়া অবনীবাবু বলিলেন, “আমার সঙ্গে যাবি না? সে কি? থাক্‌রি কোথায়?”

আশালতা পূর্ব্ববৎ ঘীরে ঘীরে বলিল, “এই খানে।”

বিক্রপের সহিত অবনীবাবু বলিলেন, “এই

খানে? এখানকার লীলাখেলা ত হুঁরিয়ে এসেছে! তার পর?”

সহজভাবে আশালতা উত্তর করিল “তার পর যা অদৃষ্টে আছে, হবে।”

অবনীবাবু স্বর কিছু নরম করিয়া বলিলেন, “লক্ষ্মী মা, আমার! তুই আমায় ঘেয়ে হয়ে এমন লোক-হাসান কাজ করিস্‌ নি। আমি তোর বাপ, তোর যাতে ভালো হয় আমি তাই করব। আমার কথা শোন, আমার সঙ্গে চল। ও ছোঁড়ার কপালে অনেক দুর্‌গতি আছে, নইলে ওর এমন মতি-গতি হবে কেন? লোকে দশটাকার সম্পত্তি পেলে ছাড়তে চায় না, আর ও হতভাগা এই বিপুল সম্পত্তি যেচে বিলিয়ে দিচ্ছে। নিজের জন্মের কেলঙ্কারি নিজে বার করে লোক সমাজে নিজের মাথা হেঁট করচ্ছে। ছি! ছি! কি বলব! ছোঁড়া একেবারে অধঃপাতে গেছে।”

ঘীর প্রশান্ত ভাবে আশালতা বলিল, “বাবা, ঘীর হাতে দিয়েছেন, তাঁর যখন যে অবস্থা হবে, আমাকেও সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।”

কুক্‌ হইয়া অবনীবাবু বলিলেন, “দেখ, এখনও ভাল করে বুঝে দেখ। ভেবে দেখ, ভবিষ্যতে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা দাঁড়াবে। যদি নিজের ভাল চাও ত আমার সঙ্গে চল, নইলে এর পরে “বাবা বাবা” করে কেঁদে মরে গেলেও আর আমি ফিরে চাইব না, তা তেনা।”

বেশ একটু দৃঢ়তার সহিত আশালতা বলিল, “তা হলে রাস্তায় পড়ে মরে থাক্‌ব, তবু হঃসময়ে তোমার আজন্ম চাইব না। এ

শিকা আমি আমার মায়ের কাছে পেয়েছি।
আপনি এখন ফিরে যান। যদি ভগবান
কখনও দিন দেন, তখন আবার আপনাকে
প্রণাম করতে যাব।”

কস্তার মুখে এইরূপ গর্জিত উত্তর পাইয়া
ক্রোধে ফুলিয়া রক্তবর্ণ হইয়া অবনীবাবু প্রস্থান
করিলেন। আশালতা একাকী নীরবে তথায়
দাঁড়াইয়া রহিল। এতক্ষণ কক্ষান্তরে থাকিয়া
অমরকুমার শিতাপুত্রীর সকল কথা শুনিতে
পাইতেছিলেন। আশালতার কথা শুনিয়া
তিনি মনে মনে বেশ একটু গর্জ ও আনন্দ
উপভোগ করিতেছিলেন। অবনীবাবু

চলিয়া যাইবার পর তিনি আশালতার নিকটে
আসিয়া, স্নেহে তাহার একখানি হাত ধরিয়া
বলিল, “তোমার বাপু নিয়ে যেতে চাইলেন,
কেন তুমি গেলে না? বেশ থাকতে! সত্যই
ত আমি হৃদ্যাগ্রস্ত। সত্যই অদৃষ্টে অনেক
কষ্ট আছে। আমার সঙ্গে থাকলে সত্যই ত
তুমি অনেক কষ্ট পাবে। তার চেয়ে বাপের
বাড়ীতে থাকলে বেশ সুখে থাকতে!”

হাসিতে হাসিতে আশালতা উত্তর করিল,
“তুমি নিজে যদি আমার বাপের কাছে
আমাকে রেখে আসতে পার, আমি যাব।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীচাক্রশীলা মিত্র।

শ্যামা কি শ্যাম ?

বল রে তুই শ্যামা কি শ্যাম ?
জানি না আমি তোঁর কি নাম !
স্বরূপ তুলিয়া তোঁর,
এ-হেন হৃদশা মোর,
রিপুর লাঞ্ছনে যদি হয়েছে অশ্রান,
আত্মরিক বলে সদা ব্যথিত পরাণ।
তুই যদি হ'স শ্যামা,
মহাশক্তিময়ী বামা,
পাবাপি। পাবাণ হয়ে থাকিস্ নে আর,
দাক্ষিণ্য হুঃখের মা গো কব্ প্রতীকার।
দইজ-দলনী সে মুরতি ধরে,
আবার মা তেঁহনি তেঁহনি করে,
নাচ-রে হৃদয়-অশ্রান উপরে,
শাপিত কুপাণ করেছে ধরি।

দম্ভ-শক্তি করিয়া দলিত,
কর মা ! আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত,
হৃদি অশিবতা কব্ দূরীভূত,
আরোহি' শিবের হৃদধোপরি।
বল রে তুই শ্যামা কি শ্যাম ?
জানি না আমি তোঁর কি নাম ?
তুই যদি হ'স সে শ্যাম স্তম্বর,
তবে চুড়া খড়া বাঁশরী ফেলিয়া,—
শরীর রথের সাজিয়ে সারথি,
মুকতির পথ দে রে দেখাইয়া।
কুকক্ষেত্রে যথা সারথির বেশে,
দিয়াছিলে পার্শ্ব পথ সে বলিয়া,
তেমনি আমার মুকতির পথ,
দে শ্যাম ! দেখায়ে সারথি সাজিয়া !
শ্রীমতী শ্রীলক্ষ্মীমতী মিত্র।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

বলদেব।

মহাবনের ছয় মাইল দূরে বলদেবের মন্দির অবস্থিত। বলদেব-সহরের লোক-সংখ্যা ২৮৩৫। মন্দিরের সন্নিকটে ইষ্টক নির্মিত একটি সরোবর আছে। ইহাই কীর-সাগর নামে খ্যাত। কেহ ২ ইহাকে কীর-কুণ্ড বা বলভদ্রকুণ্ড কহিয়া থাকে। সরো-বরটী ধ্বংস-দশা প্রাপ্ত এবং জলটী শৈবালের হরিদাত একটি স্তর-দ্বারা আবৃত। এই স্থানেই গোসাই গোবিন্দনাথ স্বপ্নে দেখেন যে, একটি দেবতা-বিগ্রহ প্রোথিত আছে। তৎক্ষণাৎ অব্বেষণ আরম্ভ হইল ও বলদেবের মূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গেল। বিগ্রহটীকে গোবিন্দে লইয়া বাইবার জঙ্গ প্রয়াগ পাওয়া হয়, কিন্তু যে যে শকটে বিগ্রহটী বহন করা হয়, তাহার সকল-গুলিই ভাঙ্গিয়া যায়। এইরূপে অনেকগুলি গাড়ী ভাঙ্গিয়া যাইলে, বিগ্রহকে গোবিন্দে লইয়া বাইবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, তথায় একটি মন্দির-নিৰ্ম্মাণ করা হয়। তদ্বতীয়া-নামক স্থানের অধিবাসী কল্যাণ-নামক জনৈক ব্রাহ্মণের উপর দেবতার পূজার ভার ন্যস্ত করা হয়। তাহার পুত্রপৌত্রগণই এখন দেবতার পাণ্ডা। দেব-সেবার জন্ত কতকগুলি গ্রাম আছে। সেগুলির নাম—অরতোলী, নেরা, ছীবারেই, ধরাইরা, নুরপুর, এবং সাহবপুর। ইহার আয় হইতে দেবসেবা চলিয়া থাকে। উক্ত গ্রামগুলির বাৎসরিক আয় ৩৮৫০ টাকা। এতদ্ব্যতীত যাজিগণ প্রতি-বৎসর প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার পূজা দিয়া থাকে। কীরসাগরে স্নান করিতে হইলে

তীর্থসেবী ব্যক্তিকে বাহা দিতে হয়, তাহা মন্দিরের পাণ্ডার প্রাপ্য নহে—খনাঢ়া ব্রাহ্মণ-দিগের প্রাপ্য। এখানে ১১টী কুঞ্জ আছে। প্রত্যেক কুঞ্জ তাহার নির্দিষ্টতার নামে নামা-কৃত হইয়াছে। সরোবরের সন্নিকটে হরি-দেবের মন্দির অবস্থিত। মুরসান-নিবাসী বেহারীলাল বোহরা ইহার নির্মাতা।

বলদেবে দুইটী মেলা হইয়া থাকে; তন্মধ্যে একটি ভাদ্রমাসের ৬ই এবং অপরটী অগ্রহা-র্য-মাসের পূর্ণিমায়। মেলা উপলক্ষে প্রতি-দিন অন্তর একশত লোকের সমাগম হয়। পূজা দিতে যাত্রীদিগের খরচ অতিশয় অল্পই হইয়া থাকে; কিন্তু পূজার জন্য একত্র করিলে তাহার মূল্য বড় কম হয় না। এখানে পূজাতে ৩৪ দিনে যে চিনি চড়ে, তাহার মূল্য অল্পহারে ৮০ টাকা হইবে।

গোবর্দ্ধন বা গিরিরাজ।

গোবর্দ্ধন-সহরটী অত্যন্ত বড়। এখান-কার লোক-সংখ্যা ৪২৪৪। বরসানী ও গোবর্দ্ধন পরস্পর হইতে কেবলমাত্র সাত ক্রোশ দূরবর্তী। পরন্তু গোবর্দ্ধন বাইতে হইলে মথুরা হইতে যাওয়াই সুবিধাজনক। কারণ, রাস্তাটী পাকা। মথুরার ১৪ মাইল দূরে গোবর্দ্ধন অবস্থিত। ইজ বধন পূজাতাবে ক্রোধাধিত হইয়া বারি বর্ষণ করেন, তখন রাজের নরনারীকে রক্ষা করি-বার জন্ত রক্ষা এই পরীকটীকে ৭ দিন ও ৭ রাত্রি উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছিলেন। হিন্দু-

গণ ইহাকে গিরিরাজ বলিয়া থাকে। পুরা-
কালে ইহার নাম অন্নকূট ছিল। এখনকার
লোকদিগের বিশ্বাস এই যে, যমুনা যেমন
প্রতিবৎসর কৌণকায়া হইতেছেন, তেমনই
গোবর্দ্ধনও উচ্চতার প্রতিবৎসর বৃদ্ধতা প্রাপ্ত
হইতেছে। পূর্বে ইহাকে অরীং হইতে
দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন কয়েক
খত গঙ্গা যাইলেই, পর্বতটী চক্ষুর অদৃশ্য
হয়।

জাতিপুর ও অনিয়োর-নামক গ্রামের
মধ্যবর্ত্তি-স্থানে পর্বতটীর উচ্চতা সর্কাপেক্ষা
অধিক। ইহার চূড়ায় ১৫১০ ফুট গোকুলের
বলভাচার্য্য ত্রীনাথের নামে একটি মন্দির
স্থাপিত করেন। সম্রাট ঐরাজ্যের মন্দিরটী
আক্রমণ করিবেন্ ভাবিয়া বিগ্রহটীকে উদয়-
পুরের সীমানায় নাথদোয়ারা-নামক স্থানে
জইয়া থাকিয়া হয়। গিরিরাজের উপরিস্থ
মন্দিরটী ক্রমে ধ্বংস-দশায় পতিত হয়।

পর্বতের নিম্নে যতীপুরা নামে একটি গ্রাম
আছে এবং তথায় অনেকগুলি মন্দিরও অব-
স্থিত। তন্মধ্যে গোকুলনাথের একটি মন্দির
দৃষ্ট হয়। এখানে বৎসরে দুইটী উৎসব হইয়া
থাকে ;—একটী গিরিরাজ-পূজা, অপরটি
অন্নকূট-পূজা।

কার্ত্তিক-মাসই গোবর্দ্ধনের পরিক্রমার সময়।
পরিক্রমার সীমা ৭ ক্রোশ। লোকে দণ্ডবৎ
হইয়া পরিক্রমা করে। এই দণ্ডবতী পরিক্রমা
এক সপ্তাহ হইতে এক পক্ষ পর্য্যন্ত হইয়া
থাকে। পরিক্রমাটী ধনাঢ্য-ব্যক্তির জন্য। ধনাঢ্য
ব্যক্তির প্রায় পরিক্রমা করে না। তাহার
ব্রাহ্মণ রাখিয়া পরিক্রমা করায়। ব্রাহ্মণ-
গণকে ৫০ হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া

হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে পরিক্রমার
ফল ধনাঢ্য-ব্যক্তির, ব্রাহ্মণের নহে।

গোবর্দ্ধন-সহরটী মানসী গঙ্গার তটে অব-
স্থিত। মানসী-গঙ্গা একটি পুষ্করিণীমাত্র।
পুষ্করিণীর সংস্কার ভরতপুরের রাজগণ করিয়া
থাকেন। মানসী-গঙ্গার খনন-কর্ত্তা জয়-
পুরের রাজা মানসিংহ। ছয়মাস পুষ্করিণীটী
শুক থাকে। দীপ-মালিকার সময় যখন দীপ-
দান করা হয়, তখন পুষ্করিণীতে জল থাকে।
সহস্র সহস্র দীপে পরিশোভিত হইয়া ঘাটটি
অপূর্ব্বশী ধারণ করে। প্রবাদ এইরূপ যে,
মানসী-গঙ্গা-তটে দীপমালিকায় দীপদান
করিলে ফল অধিক পাওয়া যায়। এই সময়
মানসী গঙ্গার পরিক্রমাও হইয়া থাকে।

মানসী-গঙ্গার সম্মুখেই হরিদেবের বিখ্যাত
মন্দির অবস্থিত। অম্বরের রাজা ভগবান্দাস
আকবরের সময় ঐ মন্দিরটী নিৰ্ম্মাণ করান্।
মন্দিরের বায় নিৰ্ম্মাহার্থে দুইটী গ্রাম আছে,
যাহাদের বাৎসরিক আয় ২৩০০ টাকা।

মানসীগঙ্গার বিপরীত দিকে দুইটী বাটী
আছে। ভরতপুরের রাজা রণধীর সিংহ ও
রাজা বলদেব সিংহের স্মরণার্থ উক্ত বাটীদ্বয়
নিৰ্ম্মিত হইয়াছে।

সহরের একমাইল দূরে রাখাকুণ্ড-তটে
একটী জাকাল বাটী দেখা যায়। সেটী জও-
হাধীর সিংহের পিতা স্বরাজ মলের স্মরণক।
এই বাটীর দুইদিকের দুই সীমানা রাজার দুই
রাণী হংসীরা ও কিশোরীর নামে রাখা
হইয়াছে। ইহার পশ্চাতে একটী স্বরূপ
উদ্যান আছে এবং তাহার সম্মুখে কুম্ভ-
সরোবর নামে একটি সরোবর দৃষ্ট হয়।

গোবর্দ্ধনে চক্রেবর মহাদেবের মন্দির

আছে। এখানে চারিটা কুণ্ড অবস্থিত ; যথা (১) গো-মোচন, (২) ধর্ম-মোচন (৩) পাপ-মোচন এবং (৪) ঋণ-মোচন। বর্ষাকালে কুণ্ডগুলিতে সমান্ত্র জল থাকে এবং বৎসরের অগ্রান্ত সময় ইহারা শুষ্ক হইয়া যায়। পাহাড়টা তালিয়া গিয়া যে-স্থানে সহরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দান-ঘাট নামে খ্যাত। এখানে ত্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের নিকট হইতে দুগ্ধের কর লইয়া ছিলেন।

হরিবংশে লিখিত আছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশের হর্যাক্ষনামে এক নরপতি মধুদৈত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রোষ্ঠভাতা তাঁহাকে বিভাড়িত করিলে তিনি পলায়ন করিয়া শব্বরের নিকট গমন করেন। তাঁহার শব্বর তাঁহাকে সমস্ত রাজত্ব দান করেন ; কেবলমাত্র স্বীয় পুত্র লবণের জন্ত মধুবন-নামক রাজধানীটি রাখিয়া দেন। হর্যাক্ষ গিরিবরের উপর রাজবাটী নির্মাণ করিয়া অনন্তের রাজ্যকে হৃদয় ও তাহাতে অনুপ-নামক দেশ যোগ করেন। হর্যাক্ষের পুত্র ভীম। ইহার রাজত্ব-সময়ে রাম অযোধ্যার রাজা। তিনি লবণের ছর্গ মধুবনকে ধ্বংস করিয়া তৎস্থানে মথুরা-নগর নির্মাণ করিতে শক্রকে প্রেরণ করেন। মথুরা নিশ্চিত হইলে শক্র চলিয়া যান। তখন ভীম মথুরা অধিকার করেন। তাঁহার সময় হইতে তাঁহার উত্তরাধিকারী বহুদেব পর্যন্ত সহরটি ভোগ করেন। হরিবংশে যে স্লোক আছে, তাহাতে গিরিবর-শব্দ পাওয়া যায়। ইহাতে অজ্ঞমান হয় যে, হর্যাক্ষের রাজধানী গিরিরাজের উপর ছিল এবং অনুপ-দেশটি বর্তমান ব্রজ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

গোকুল।

যমুনার উপকূলে ও মহাবন-তহসিলের পশ্চিমে গোকুল অবস্থিত। মহাবন হইতে গোকুল এক মাইল এবং মথুরা হইতে ৪ মাইল দূরবর্তী। যদিও সহরটির নাম গোকুল তথাপি ইহা আধুনিক বলিতে হইবে। ত্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল আধ্যাত্মিক পুরাণে পাওয়া যায়, যদিও তাহা গোকুলে হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তথাপি সেনগুলি মহাবনের,—গোকুলের নহে। ইহাতেই বোধ হয় যে, বর্তমান গোকুল পুরাণের গোকুল নহে। গোকুলে অনেকগুলি মন্দির থাকিলেও তন্মধ্যে একটীও মনোজ্ঞ নহে। সর্কাসপেক্ষা পুরাতন মন্দিরের নাম গোকুলনাথ, মদন-মোহন এবং বিঠলনাথ। বাকী মন্দিরের মধ্যে ষারিকানাথ, বালকৃষ্ণ এবং ঘোষপুরের রাজা বিজয় সিংহ নিশ্চিত মহাদেবের মন্দির উল্লেখযোগ্য। নামী মেলায় মধ্যে ভাদ্র-মাসের জন্মাষ্টমীর মেলা, কাশ্তিকীয় প্রতীপদের অম্বকুটের মেলা, কাশ্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থীতে তৃণাবর্ন্তের মেলা প্রসিদ্ধ। সহরের প্রধান কটকের নাম গণ্ডিপুয়া দরবাজা। ইহা প্রস্তর-নির্মিত। গোকুলের লোকসংখ্যা ৩৮০০, তন্মধ্যে ১৯১০ স্বীলোক। ৭৭ জন মুসলমান ব্যতীত সমস্ত লোকই হিন্দু। গোকুলে বঙ্গভঙ্গ-সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। বঙ্গভাষাচার্যের সময় হইতে গোকুলের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

নন্দর্গাও—বর্ষাণা।

হুইট গ্রামই পার্শ্ব পার্শ্ব অবস্থিত।

দূরত্ব কেবলমাত্র চারি ক্রোশের। জি, আই, পি রেলের একটা স্টেশনও এখানে আছে। নন্দগ্রামটা বস্তুতঃপক্ষে নন্দ্রের ছিল। বর্ধাণা বুধভাঙ্গুর গ্রাম। এই বুধভাঙ্গুর কস্তা রাখা। নন্দগ্রামের মন্দিরে কৃষ্ণ, বলদেব এবং নন্দ-যশোদার মূর্তি আছে। গ্রামটা একটা ক্ষুদ্র টীলার উপর অবস্থিত। 'টীলা'টি হিন্দি শব্দ, উচ্চ স্থানকে বুঝায়। এই টীলার নিম্নে প্রস্তর-নির্মিত একটি কুণ্ড আছে; তাহা পামরী-কুণ্ড নামে খ্যাত। বর্ধাণা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম—পাহাড়ের নিম্নে অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে শেড়ীলীজীর মন্দির অবস্থিত। এই স্রব্ধং মন্দিরে রাখাক্ষের মূর্তি আছে। ইহার নীচের এক মন্দিরে নন্দ্রের, তাহার নীচের মন্দিরে বুধভাঙ্গুর পিতা মহাভাঙ্গু ও তাঁহার পত্নী, এবং

তাহার নীচের মন্দিরে রাখার পিতা বুধভাঙ্গু ও মাতা কীৰ্ত্তিমা এবং তাঁহার কয়েক ভ্রাতার মূর্তি অবস্থিত। গ্রামের বহির্ভাগে বুধভাঙ্গু কুণ্ড নামে একটি পাক্ষা সরোবর আছে। বদিও কৃষ্ণ রাধিকার সময় হইতে সহস্রেরও অধিক বর্ষ অতীত হইয়াছে, তথাপি নন্দগ্রাম এবং বর্ধাণার লোক-জন শালা-সম্বন্ধী ভাবে আচরণ করে। ব্রজের এই প্রান্ত অত্যন্ত রম্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাখার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ-রূপে উক্ত আছে। দেবীভাগবতেও উক্ত বিষয়ের চর্চা দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও রাধিকার জন্মবৃত্তান্ত আছে। পরন্তু ক্রীমদ্ভাগবৎ, মহাভারত, হরিবংশ এবং বিষ্ণু-পুরাণে রাধিকার উল্লেখও নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

শুচিবায়ু।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটা মানবদাত্তর প্রধান উপাদান। এই তিনটার সমতা থাকিলেই মানবের দেহ এবং মন সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে। কিন্তু উক্ত তিন উপাদানের ভারতন্ময় ঘটিলেই নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। যাহারা পিত্তপ্রধানদাত্ত, তাহারা প্রায়ই ক্রোধী ও খিটখিটে হয়; যাহারা কফপ্রধানদাত্ত, তাহারা প্রায়ই অলসপ্রকৃতি বা জড়ভাবুক হইয়া থাকে; এবং যাহারা বায়ুপ্রধানদাত্ত, তাহারা উন্নাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই বায়ুপ্রধানদাত্ত মানবের মন বায়ুদ্বারা যে-পথে চালিত হয়, সে ভূতাবিষ্টের মত সেই পথের চরমসীমার উপনীত হইয়া থাকে। সে পথটা

কতদূর গতিত, তাহাতে যাওয়া উচিত কি না, বা তাহাতে অন্ন এইটুকুমাত্র যাওয়া উচিত— এইরূপ একটা বিধি, নিয়ম বা শৃঙ্খলার বাধ ভাঙ্গিয়া দিয়া বায়ু অতি প্রবলভাবে মনকে যাদৃচ্ছ চালিত করে; তাহাতে যে-দিকেই মন ধাবিত হয়, সে-দিকেই ব্যক্তির এমন একটা যৌক উপস্থিত হয় যে, কিছুতেই সে যৌক রোধপ্রাপ্ত হইতে চাহে না।

বায়ু যখন প্রবল হইয়া মানবকে অন্তর্য ও অস্বাভাবিক শুচিতার দিকে পরিচালিত করে, তখন তাহার নাম শুচিবায়ু। এই শুচিবায়ু প্রায় কোমলবভাব, নভাবতঃই শুচিতাপ্রিয় নারীদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কারণ,

জীবিকাকর্ষনের জন্য নানা কার্যে ব্যস্ত, নানা স্থানে ভ্রমণরত, প্রয়োজনব্যাপনেশে নানা সংসর্গে পতিত নরদিগের শুচিতার প্রতি ততটা পক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে না, তাই শুচিবায়ু তাহাদিগকে কিছু করিয়া উঠিতে পারে না । কিন্তু অস্ত্রঃপূরনিবদ্ধ কুলবালাগণকে স্বভাবতঃ দুর্বলপ্রকৃতি ও শুচিতাগতপ্রাণ দেখিয়া এই বায়ু তাহাদিগের কতিপয়ের স্বক্ষে এমনই চাপিয়া বসে যে, তাহাদিগকে ত সংসারের অমুপযোগিনী করিয়া তুলেই, এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের অত্যাচারে সংসারের স্বাবৃত্তীয় লোককেই নানা প্রকারে অশান্তি ভোগ করিতে হয় ।

এই বায়ুটি কেবল ভারতবর্ষেরই একচেটিয়া বলিলেই হয় । কারণ, অল্প দেশের মানব শুচিতা লইয়া এতটা আলোচনা করে বলিয়া জানা নাই । এইজন্য এই প্রবন্ধে শুচিবায়ুর সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা হইবে, তাহা ভারতীয় বা বস্তুতঃ বঙ্গবাসিনী নারীর বিষয়েই বৃদ্ধিতে হইবে । এই শুচিবায়ু নারীদিগকে বিরূপভাবে নিখ্যাতিত ক্ষরে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও সকলকে বিরূপ রূপপ্রদান করিয়া থাকে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক ।

এই শুচিবায়ুগ্রস্ত নারীগণ অতিপ্রবল-ভাবে শুচিতা রক্ষা করিতে গিয়া অতিকদর্যা অশুচিতার মধ্যেই আসিয়া পড়ে । তাহারা অশুচিতাস্পর্শভয়ে শিশুগণের পরিত্যক্ত বলমূত্রাদি অথবা গৃহের অশুচি আবর্জনা-রাশি বা পরিত্যক্ত পরিধেয়বস্ত্রাদি বথাসময়ে পরিত্যক্ত বা প্রক্ষালিত না করিয়া একেবারে তাহারা যখন আনার্থ বা বস্ত্রপ্রক্ষালনার্থ

জলাশয়ে যাইবে, সেই সময়পর্যন্ত গৃহে যথানে যাহা অবস্থিত, ঠিক সেইরূপ ভাবেই রক্ষা করিয়া থাকে । সেই সমস্ত বলমূত্র ও আবর্জনা হইতে একটা পুতিগন্ধ বাহির হইয়া গৃহকে একদণ্ড-বাসেরও অমুপযোগী করিলেও এই শুচিতাপক্ষপাতিনী রমণীয়া সেগুলি স্থানান্তরিত না করিয়া সেই অপবিজ বস্ত্র-সকলের মধ্যে প্রেতিনীরুন্দের মত শোভা পাইয়া থাকে । ইহা কতদূর আক্ষেপের বিষয় ! ইহাতে গৃহস্থ অপরাপর ব্যক্তিসকলের যে অবিরত নাগিকায় বঙ্গনিঃক্ষেপপূর্ব্বক বমন হইতে কোনরূপে আশ্রয়ণা করিয়া উৎকট কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তাহা নহে, সর্বদা দুর্গন্ধ আবর্জনার মধ্যে থাকিয়া বিবিধ পীড়াভোগ করাও তাহাদের দৈনন্দিন প্রকৃতি হইয়া পড়ে । শুচিতাগ্রস্ত নারীগণ যে সে-সকল পীড়া হইতে রক্ষা পায়, তাহাও নহে ।

আরও একটা কথা । পাছে স্নান করিয়া আসিবার পর আবার গৃহে বলমূত্রাদি নূতন করিয়া সঞ্চিত হয়, এইজন্য শিশুগণের বল-মূত্রত্যাগের অথবা অন্ত্রাশ্র আবর্জনা নিঃক্ষে-পের শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাহারা একেবারে বেলা কাটাইয়া স্নানে গমন করিয়া থাকে । তাহাতে প্রত্যহ অতিরিক্ত বেলায় স্নান ও আহার করায় তাহাদিগের পিত্ত-প্রকোপজনিত স্বাস্থ্যহানি ত ঘটেই, অধিকন্তু তাহাদের 'পিত্তপড়া' ছন্দ-পান করিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুগণও বহুৎ প্রকৃতির দুহারাগ্যা রোগের কবলে পতিত হইয়া অকালে প্রাণ হারাইয়া থাকে । কেবল দুগ্ধপোষ্য শিশুই বা বলি কেন ? ইহাদের

মানাদিতে বিলম্ব-নিবন্ধন গৃহের অপর সকলেরও অতিরিক্ত বেলায় আহার জুটিয়া থাকে। কারণ, অধিকাংশস্থলেই এই সমস্ত গৃহকর্ত্রীরাই ত রন্ধন-বিধাত্রী! স্বতরাং তাহারা রন্ধন করিলে তবে অল্প সকলে খাইতে পাইবে। যদি রান করিতেই বেলা কাটিয়া গেল—তাহার পর ‘রায়া’,—তাহার পর ‘খাওয়া’। সে ত অপরাহ্নই হইয়া গেল! এই অপরাহ্ন পর্য্যন্ত ‘দাঁতে দড়ি’ দিয়া থাকা গৃহস্থ-সকলেরই একটা নিত্যকাৰ্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ফলে সকলকেই পিত্ত-প্রকোপজনিত বিবিধ পীড়া ভোগ করিতে হয়।

এই আহারের বেলাতিবর্তন ব্যতীত আর একটি কারণে শুচিবায়ুগুণ্ডা নারী এবং তাহার সংসার পীড়া ভোগ করিয়া থাকে। লেট—অতিরিক্ত জলের সংস্পর্শ। ঈদৃশী রমণী স্থানান্তরে যাইতে যাইতে একটা অপবিদ্র বস্ত্র মাড়াইল, অথবা পদদলিত বস্ত্র অপবিদ্র না হইলেও অনবরত শুচিতা-নাশাকার তাহা অপবিদ্র বলিয়া অনুমান করিল; হয়ত, রান করিয়াই ফিরিতেছিল, এই ঘটনায় আবার জলাশয় অভিযুখে গমনপূর্ব্বক দ্বিতীয়াবার রান করিল; অবোধ মার্জ্জারের মল হয়ত গৃহ-প্রাঙ্গণে গুপ্তভাবে ছিল, রানের পর কাপড় মেলাইয়া দিবার সময়, তাহা পদতল স্পর্শ করিল, অমনি সেই সিক্তবস্ত্র লইয়া পুনর্বার রানার্থ তীর্থাত্ম্যুখে সে গমন করিল; আহারাদির পর নিশ্চিন্ত মনে একটু বসিয়া আছে, এমন সময় রোজে প্রদত্ত বস্ত্রের উপর একটি পক্ষী পুরীষবর্জন করিল, অমনি হতভাগ্য

পক্ষীর উপর সমস্ত ক্রোধ ক্ষেপণ করিয়া শকুনির চতুর্দশপুত্রের নাম করিতে করিতে সরোবরের দিকে ধাবিত হইল; দাসী-কর্তৃক মার্জ্জিত ধাতব পাত্রগুলি ধুইয়া লইবার সময় স্বকীর শুচিবাতোচিত, অতিশুদ্ধদৃষ্টিতে উচ্ছিষ্টের ক্ষুদ্রকণা হয় ত কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইয়া বিষমক্রোধসহকারে ‘দাসীর চক্ষু: দাসীকে খাওয়াইয়া’ উট্টে:স্বরে পল্লীদেশ বিদার্য করিতে করিতে জলাশয়ে গিয়া সেই অপবিদ্র ধাতব পাত্রগুলি পুনরায় স্বহস্তে মার্জন করিল ও তদনন্তর তৎস্পর্শজনিত ‘শাপের কালনজন্ত অবগাহন-রান করিল। কখনও বা সমস্ত দিন পরিভ্রমের পর ঈদৃশী নারীর কণ্ঠক্ৰিষ্ট স্বামী অতিরিক্ত ক্লান্তিনিবন্ধন পত্নীর নিত্য আদেশ মত ‘গঙ্গাজলস্পর্শ’ করিতে ভুলিয়া গিয়া বিজ্ঞানার্থ দৌতশয্যাতে স্পর্শ-করিবা-মাত্রই ক্ষণকালের জন্ত সে স্বামিভক্তি ভুলিয়া গিয়া স্বামিদেবতাকে অতিকর্কশ ভৎসনা করিতে করিতে রণচণ্ডীর মত সেই সমস্ত শয্যাভার জলাশয়ে বহন করিয়া লইয়া গিয়া সেই শয্যাগুলি সমস্ত একে একে প্রক্ষালিত করিল ও স্বামীর প্রতি বিষম ক্রোধে জলে সাতবার ডুব দিয়া গৃহে ফিরিল! ক্রীড়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত শিশুসন্তানটী মায়ের আদর পাইবার জন্ত উল্লাসাতিশয্যে বা অসাবধানতা-বশত: ‘গঙ্গাজল-স্পর্শ’ না করিয়া তাহার অকল ধরিবামাত্রই সন্তানের গঙ্গাজলের অস্পর্শরূপ অপরাধ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি কয়েকটি চপেটাঘাতে তাহার আমরাকাজ্জা পুরণ করিয়া তাহার ‘মুখ পোড়াইতে পোড়া-

হইতে" ও তাহাকে "সাতবার যমের বাড়ী পাঠাইতে পাঠাইতে" তীর্থাতিথে গমন করিয়া, পূর্বে স্নাতা হইলেও পুনরায় স্নান করিয়া আসিলেন। এইরূপ ওচিবায়ুগুস্তা নারীর বারংবার অবগাহন নিত্যকার্য্য হইয়া উঠে। এই বারংবার অলম্পর্শের ফলে তাহার ও তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানের অবিরত পীড়া ভোগ করিতে হয়, এ-কথা বলাই বাহুল্য। এমন কি শরীরের অস্থিতা-কালেও সে অভিপ্সিত জলাভিষেক হইতে নিবৃত্তা হয় না। উদরাময়-রোগে, যখন স্নান একেবারে নিষিদ্ধ, তখনও প্রতিশোধকালেই সে স্নান করিয়া থাকে। তাহাতে তাহার পীড়া আরও বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। ওচিবায়ুগুস্তা জননী-গণের বিবিধ অনিয়মে সন্তান-পালনে বিলক্ষণ অনিয়ম হইয়া পড়ে। তাহাদের সন্তানগণ খাইবার সময় খাইতে পায় না, পরিবার সময় পরিতে পায় না। খাওয়া-পারার জন্ত তাহাদের একটা সাধ অভিলাষ ঘূচিয়া যায়— তাহারা সর্বদাই জন্ত মনে কর্কণভাবিনী ওচিবায়ুগুস্তা জননীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে ! সন্তানেরা যতই শিশু হউক না কেন, অথবা পীড়িত থাকুক না কেন, এই সমস্ত নির্দিষ্ট ওচিবায়ুগুস্তা স্ত্রীলোকগণ তাহাদের একটু অন্তচিন্তা-গন্ধ পাইলেই অথবা স্বকীয় বুদ্ধিতে তাহাদের অবাস্তব অন্তচিন্তাকে বাস্তব রূপে অস্থান করিলেই, আর রক্ষা নাই ! অমনি এক কলস জল তাহাদের মস্তকের উপর নিক্ষেপ হইবে ! কলস পীড়া তাহাদের নিত্য-সঙ্গিনী হইয়া পড়ে !

এইরূপ ওচিবায়ুগুস্তা নারীর স্বামীকে বহির্কর্তব্যপদেশে সকাল সকাল কর্ষক্ষেত্রে

যাইতে হয়, তাহা হইলে মাসের অর্ধেক দিন ত তাহার আহার জুটে না ; জুটিলেও, গৃহে বিবিধ তক্ষণা থাকিলেও, তাহাকে কোনরূপে দৃষ্টিদূরপুত্তি করিয়া যাইতে হয়, অথবা আহার জুটাইবার জন্ত নিজেরই রন্ধন-ক্লেশ-ভার গ্রহণ করিতে হয়। কারণ, স্বামীর আহার জুটিবে কি না জুটিবে, এই চিন্তা অপেক্ষা কিসে গৃহ-তাক্ত মলমূত্র নিঃশেষে পরিষ্কার করিয়া বহুঘণ্টাব্যাপী অলসেকেরদ্বারা ওচিভা প্রাপ্ত হইবে, ইহাই ওচিবায়ুগুস্তা নারীর প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়ায়, সে স্নানানি-সমাপন করিয়া স্বামীর গৃহ হইতে বহির্গমনের পূর্বে কোনদিন আসিয়া উঠিতে পারে না ; কাজেই স্বামীর সে দিন আহার জুটে না। কোন দিন যদি বা পূর্বেই আসিয়া পড়ে, স্বামীর বাটা হইতে বাহির হইবার এরূপ পূর্বে আসে, যে তন্মধ্যে আবশ্যক দ্রব্যগুলি রন্ধন করা অসাধ্য। কাজেই স্বামীকে 'আধপেটা' খাইয়া কর্ষক্ষেত্রে যাইতে হয়। সেইজন্য অত্যন্ত মুখপ্রত্যাশী পরিশ্রমশীল স্বামিগণ তাদৃশী স্ত্রীর উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ংই রন্ধনের কার্য্য করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদিগের একটা অনাবশ্যক পরিশ্রম-ভার ঘাঁড় পাতিয়া লইতে হয় ও তজ্জন্য অনর্থক কষ্ট-স্বীকার করিতে হয়।

এই ওচিবায়ুগুস্তা নারীর স্বামীও সন্তান-গণ কখনও ভাল শয্যা শয়ন করিতে পায় না। কারণ, নানা অন্তচিন্তা-ব্যাপদেশে শয্যা কেবলই প্রক্ষালিত হওয়ার উহা প্রায়ই সিক্ত অবস্থায় থাকে। কখনও বা গৃহিণীর অন্ত-চিন্তাপ্রকারেই শয্যা শুষ্ক থাকিলেও তাহাদের

স্পর্শের অযোগ্য থাকে। শয্যার চারদর ও বস্ত্রাবরণগুলি সর্বদাই কোনও না কোন অশুচি-বাপদেশে প্রক্ষালনীয় হওয়ায়, তাহা শয্যাভালে বিস্তৃত হইলেও উন্মুক্ত থাকা হেতু স্তরের শয্যার মত পড়িয়া থাকে। সে শয্যায় বিশ্রামলাভ করিতে কাহার অভিলাষ হইতে পারে? তাহাতে আবার দুর্গন্ধ থাকিলে ত কথাই নাই!

এতদ্ভিন্ন শুচিবায়ুগুণ্ডা নারীকে অশু-
চিত্তার ভান করিয়া সংসারের অবশ্যকর্তব্য
বহুকাৰ্য্য হইতে অনেক সময় বিরত হইতে
দেখা যায়। তখন বোধ হয়, শুচিবায়ু
আলস্ত্রেরই একটা বাপদেশমাত্র। শুচি-
বায়ুগুণ্ডাকে যদি বলা হইল, “ওগো, এই-
কাল কর”, সে অমন উত্তর দিবে, “আমি
কেনন করিয়া করিব! আমার বস্ত্র যে এখন
অনুকরণ অশুচি আছে।” এইরূপ সংসারের
অনেক কাৰ্য্য হইতে অবসর লইয়া সে নিশ্চিন্ত-
মনে কালযাপন করে। তাহার কাৰ্য্য না
করার দক্ষণ সংসার যে কোন কোন বিষয়ে
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, তাহা তাহার বোধের
মধ্যে আসে না, বা সে আনয়ন করে না। মনে
কখন, একটি সংসারে দুইটিমাত্র জীলোক
আছেন—গৃহিণী ও পুত্রবধূ। পুত্রবধূটি শুচি-
বায়ুগুণ্ডা। গৃহিণী রক্ষণকর্মে ব্যাপৃতা; গৃহের
ছাদে কতকগুলি বস্ত্র শুক করিতে দেওয়া
আছে। সেগুলি রোজে শুকাইয়াও গিয়াছে।
এ-অবস্থার আকাশে মেঘের স্ফোর দেখিয়া
গৃহিণী পুত্রবধূকে বস্ত্রগুলি তুলিতে বলিলেন।
পুত্রবধূ বলিল, “আমি এখন অনুক প্রকারের
অশুচি অবস্থার দৃতি-কাপড় ছুঁইব কিরূপে?”
এবং এই বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিল।

রক্ষণরতা গৃহিণীও ব্যস্ততার দক্ষণ সে গুলি
তুলিতে পারিলেন না। ফলে এক পাশলা
দৃষ্টি আসিয়া শুক বস্ত্রগুলি সিক্ত করিয়া দিল!
সে দিন হয়ত, সকলকে এই সিক্ত বস্ত্রই
পরিধান করিতে হইল!

আরও দেখা যায়, শুচিবায়ুগুণ্ডা নারীগণ
শৌচব্যাপদেশে নিজের ও পরিবার-বর্গের ঘে
অবিরত বস্ত্র-প্রক্ষালনের ব্যবস্থা করেন,
তাহাতে সংসারে অনাবশ্যক বস্ত্র-বাহুল্যের
প্রয়োজনীয়তা আসিয়া পড়ে। এই বস্ত্রকটের
দিনে কেবল গৃহিণীর খেয়ালেই স্বামীকে
সংসারে অতিরিক্ত বস্ত্র সরবরাহ করিতে
গিয়া অনর্থক ব্যয়াদিকোর মধ্যে পড়িতে হয়।
এতদ্ব্যতীত তাহাদের শুচিবায়ু-নিবন্ধন সাংসা-
রিক পিড়ার বিচ্ছেদ না থাকায়, চিকিৎসা-
ব্যাপদেশেও অনেক অর্থব্যয় আবশ্যক হইয়া
পড়ে। এই সমস্ত অকারণ ব্যয়-বাহুল্যে
হস্তান্তর্য্য গৃহস্থামী যে জর্জরিত হইয়া পড়েন,
তাহাতে আর সংশয় কি?

এইরূপ শুচিবায়ুগুণ্ডা নারীর অপ্রিয় দৃষ্টান্ত
উল্লেখপূর্বক মার্জিতরূচি পাঠক-পাঠিকা-
গণের দৈর্ঘ্যচ্যুতি-সম্পাদন করিতে চাহি না।
যাহা হউক, শুচিবায়ুগুণ্ডা নারী নিজেও
সুখী নয়, পরকেও সুখী করিতে পারে
না। তাহারা সংসারে একটা অসম্ভব
শুচিত্তার আদর্শ পালন করিতে যাইয়া সম্পূর্ণ-
ভাবে বিফল হয়, এবং তন্নিবন্ধন মনে একটা
বিষম অসন্তোষভাব পোষণ করে; এবং বারং-
বার বস্ত্র-শয্যাাদি প্রাক্কলন ও জলাবগাহনরূপ
অকারণ পরিশ্রমসাধ্য ও বাহ্যভঙ্কর কর্ম
বীকার করিয়া শীঘ্রই ভগ্নবাহ্য হইয়া পড়ে,
এবং সংসারকে স্বমতে চালিত করিতে গিয়া

পথে পথে তাহাতে পীড়াদি নানারূপ অশান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। সর্বদাই একটা অসন্তোষভাব ও স্বাস্থ্যহানির প্রকৃত তাহার মতিগতি স্থির থাকে না; এই প্রকৃত সে প্রায়ই ক্রোধশীলা, ষিটুখিটে ও কর্কশভাষিনী হইয়া সকলের অপ্রিয়ভাবেই জীবন অতিবাহিত করে। শুচিতা ভাল। দৈহিক ও মানসিক শুচিতার ফলে মানব ধর্মপথে অগ্রসর হয়। কিন্তু যে শুচিতার মূলে ধর্ম অবজ্ঞাত, সন্তানের অপালন, স্বামি-শুশ্রূষার অভাব, রক্ষণীয় শরীরের পাতন, সেই বাহ্য শুচিতার অতিরিক্ত পালন-চেষ্টায় অন্তঃশুচিতার বিষয় রণ প্রভৃতি অধর্ম দ্বারা তাহার প্রকৃত ধর্ম ভাব বিদূরিত হয়। কাজেই ধর্মহীন শুচিতা-জ্ঞান ও পাকে চক্রে মনমুগ্ধাদি অন্তর্ভুক্ত হইয়া কুপমণ্ডলের মত অবিরত সময়গাপন তাহার ঘণিত অন্তর্ভুক্তিকেই সূচিত করে, সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় শুচিবায়ুগুণ্তা নারীকে সংসারের কণ্টকস্বরূপ বলিলে ক্ষতি কি?

পরিশেষে বলিয়া, এই শুচিবায়ু নারীগণ প্রায় স্বকীয়া জননীর নিকট হইতেই প্রাপ্ত

হইয়া থাকে। অতিশৈশব হইতে শুচিবায়ুগুণ্তা জননীদেবর কার্যপরম্পরায় দৃষ্টিয়া তাহার উচ্চাভে এতই অভ্যস্ত হয় যে, ক্রমশঃ সেগুলি তাহাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। তখন বিবিধ চেষ্টাতেও সে অভ্যাস অপসারিত করা যায় না। তাই স্ত্রীসমাজকে এই বায়ু হইতে রক্ষা করিতে হইলে জননীগণের ইহার অল্পপযোগিতা সর্ব প্রথমে উপলব্ধি করা প্রয়োজনীয়।

আমাদিগের দেশের স্ত্রীজাতি এই সাক্ষিময় এবং সংসারের সর্বথা অশান্তিকর কুপমণ্ডল হইয়া ব্যাপ্তা থাকিলে, জীবনের সম্মার্গ অবলম্বনের অবকাশ পাইবে কখন? এবং স্বকীয় সম্বানদিগকে সুপথে চালাইবেন নী বা কিরূপে? আর জননীদিগের এই শুচিবায়ুদোষে যদি শত শত সন্তান অপালনহেতু অকালমৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে সমাজের পুষ্টি-সাধনও সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। এবং মানবসমাজের উন্নতি শক্তিস্বরূপা স্ত্রীজাতির উন্নতির উপর সর্বদা নির্ভর করে বলিয়া, নারীগণের মধ্যে এই দোষের বাহুল্যে জাতীয় উন্নতিও সম্ভাব্য নহে।

ঐতিবৃত্তি বিচারক ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ ।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-নির্বাচন।—রায় নীতানাথ রায় বাহাদুরের স্থলে সার দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী মহাশয় ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য নির্বাচিত হওয়ার ভাল হইয়াছে। কারণ, ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয় আইনের আলোচনা হইবে। সার দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী মহাশয় এই বিষয়ে তুমৎবা দিতে পারিবেন, আমরা এইরূপ আশা করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর ড্যান্সেলন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের

য়েজিষ্টার মিঃ হারটগ ঢাকা-বিষবিদ্যালয়ের
ডাইস চান্সেলর নিযুক্ত হইয়াছেন।

**ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার
উত্তীর্ণ বৃত্তি-প্রাপ্ত বালিকা-
গণ।**—নিম্নলিখিত বালিকাগণ এ-বৎসর
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি-প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২০. ঢাকার বৃত্তি।

সাবিত্রী দত্ত, ইডেন বালিকা হাইস্কুল,
ঢাকা। (ইনি অষ্টাচ্চ ছাত্রদিগের সহিত
সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই বৃত্তি লাভ করিয়া-
ছেন।)

মহিলাবৃত্তি—২০.

নিরঞ্জন কুমারী বৈরাগী-ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা।

১৫. ঢাকা বৃত্তি।

সুদীরা, বহু ডায়োসেনসন কলেজ; কপিকা
গুপ্ত, বিজাময়ী হাইস্কুল মৈমনসিংহ; উবালা
দত্ত, ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা; শোভাঙ্গী ঘোষ,
ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা; শান্তিময়ী দে; ডায়ো-
সেনসন কলেজ; অপর্ণা সান্ন্যাল, ব্রহ্মবালিকা
শিকালয়।

১০. দশ টাকা বৃত্তি।

আশালতা দাসগুপ্তা, ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা;
শান্তিবালা সেন, ব্রাহ্মবালিকা; হেমলতা বহু-
ঐ; বাবী ঠাকুর—ডায়োসেনসন; বীণাপাণি
সিংহ, ব্রহ্মবালিকা; প্রকৃতি গুপ্তা—ঐ;
কনকলতা চাট্টাঙ্গি—ইউনাইটেড মিশনারী
হাইস্কুল; সুরচি কুমারী দাসগুপ্তা—ঐ;
জলিকা ভানু—ডায়োসেনসন কলেজ।

১১১, নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত
শ্রীমুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত কর্তৃক, ৩২ নং এক্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

માસિક-પત્રિકા ।
 ૭ મથાલો । ૮ ની ।

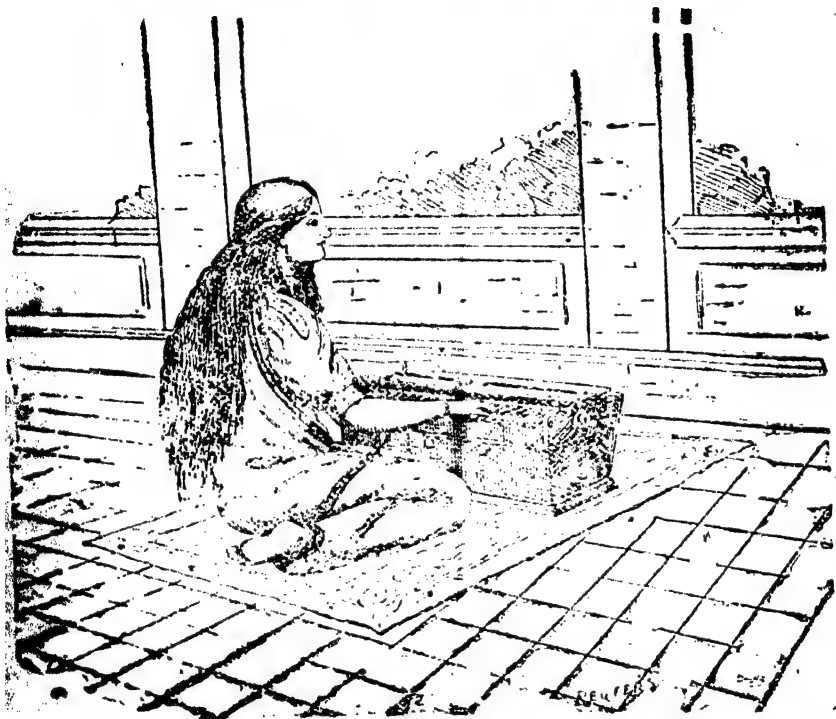
ଆବଣ, ୧୭୧୭—ଅପ୍ରେଲ, ୧୯୧୦ ।

॥३॥

সকল মান (কবিতা)	দরশণ	...
বীণা-শিকার (উপন্যাস)	স্বামী শৈলবালা সোমভাষা সর্বস্বতী	১০৮
পলক (কবিতা)	ঈশ্বরক প্রভুসুন্দর ভট্টাচার্য	১০৯
কপালী	বিশ্বক অরেন্দ্রমোহন দত্ত বি এল	১১০
স্মৃতি (কবিতা)	শ্রীমত অরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১১১
ভুলনাশি (গানের প্রবর্তিকা)	স্বামী বোতিনী সেনগুপ্তা	১১২
আতঙ্ক (কবিতা)	স্বামী চাকরীলা মিত্র	১১৩
গান (কবিতা)	ঈশ্বরক অরেন্দ্রমোহন দত্ত	১১৪
অকথ্য (কবিতা)	...	১১৫
বিশ্ব ভাষার	স্বামী ম. ক. রায় চৌধুরী	১১৬
উদ্যানভাষা (সমালোচনা)	অধ্যাপক ঈশ্বর ভক্তির অরেন্দ্রনাথ	১১৭
সাময়িক প্রবন্ধ	দামদুর্গ প্রম. এ. পি. এট. ডি.	১১৮

ডোরার্কিনের হারমোনিয়ম ।

বাজারে জিনিসের মত নয় ।



বাস্তব হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড—মূল্য ২০/- ও ২৪/- টাকা ।

২ সেট রিড মূল্য ৩০/-, ৪০/-, ৪৫/-, ৫০/- হইতে ১৫০/- টাকা পর্যন্ত

ফোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬/-, ৫৫/-, ৭০/-, ৭৫/-, ও ৯০/- টাকা ।

বেহালা—মূল্য ৫/-, ১০/-, ১৫/-, ও ২৫/- হইতে ৩০০/- টাকা পর্যন্ত ।

সেতার—মূল্য ১০/-, ১৫/-, ২০/-, ২৫/- ও ৩০/- টাকা ।

এস্‌ম্যান—মূল্য ১২/-, ১৫/-, ১৮/-, ২০/- ও ২৫/- টাকা ।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয় ।

ডোরার্কিন এণ্ড সন,

৪৫ ডোরার্কিন স্টোর, লালবাগী, কলিকাতা ।

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 684.

August, 1920.

“কন্যায় যং পাস্তদীয়া যিহ্মদীয়াতিযন্নতঃ ।”

কঙ্কাকোও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে ।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত ।

৫৭ বর্ষ ।	}	শ্রাবণ, ১৩২৭ । আগষ্ট, ১৯২০ ।	}	১২শ কল্প ।
৬৮৪ সংখ্যা ।				১ম ভাগ ।

সফল দান ।

কোমল তব প্রীতির ডোরে

বেঁধেছ এই কঠিন প্রাণ ;

নিলাজ শঠ কপট মোরে

সাজে কি এত প্রণয়-মান !

বচনে তব অমিয়-ধারা,

সোহাগ-মাথা নয়ন-তারি,

অকূল প্রেমে করিতে হারা

কত না তব চাতুরী ভান ।

নিলাজ শঠ কপট মোরে

সাজে কি এত প্রণয়-মান !

শোধিব কিসে তোমার ঋণ,

আমি যে সখা, অতীব দীন ;

সকল হিয়া তোমায়ে দিয়া

সফল কবে হইবে দান ?

ভূষিত মম অলস আঁখি,

হাসিবে কবে আবেশে থাকি,

চরণ-রাগে পরাগ মাখি

জীবন গাবে অমর গান !

দরবেশ :

লীনার শিক্ষা ।

(উপন্যাস)

(২)

উভয়ে টেশনে আসিয়া ‘প্ৰাটফরমের’ এক প্রান্তে একটা বেকির উপর বসিলেন । লীনার হাত হইতে খবরের কাগজখানা লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে ভাঁজ করিয়া, লীনাকে বাতাস করিতে করিতে পাস’ন এ-দিক ও-দিক্ চাহিয়া মুহূৰ্ত্তে বলিলেন, “আপনাকে অত্যন্ত নিস্তেজ বোধ হচ্ছে, একটু চায়ের চট্টা দেখে নাকি ?”

সবিনয়ে লীনা বলিল, “দুগ্ধবান, ট্রেনের আর আট দশ মিনিট মাত্র বিলম্ব, এইটুকু সময় শাস্ত হয়ে বিশ্রাম করলেই অস্থ হব । দেখুন দেখুন, ও-দিকের প্ৰাটফরমে ঐ যে মহিলাটি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, উনি কে বলতে পারেন ? ওঁকে প্রায়ই ওখানে দেখি ।”

পাস’ন নির্দিষ্ট মহিলাটির দিকে চোখ কিয়াইয়া কুচুকাইয়া গভীর মুখে বলিলেন, “উনি কোন একটা থিয়েটারের অভিনেত্রী ছিলেন । শুনেছি, এখন উনি ‘ভবঘুরের’ জীবন যাপন করছেন ।”

কথাটা বলিয়াই পাস’ন বই খুলিয়া, চোখের সামনে তুলিয়া ধরিলেন । অগত্যা লীনা চুপ করিয়া গেল । পাস’ন বই পড়িতে পড়িতেই লীনাকে বাতাস করিতে লাগিলেন । লীনা শ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া, একান্ত মনোযোগে সেই মহিলাটিকে দেখিতে লাগিল ।

মহিলাটির আকৃতি বেশ লম্বা চওড়া । বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইতে পঁচিশ ছাব্বিশ,

যাহা হউক একটা কিছু হইতে পারে । প্রচুর স্বাস্থ্যপুষ্ঠি নিটোল সুগোল; মুখের উজ্জল গোলাপী রং দেখিলে হঠাৎ তাঁহাকে খাটি ইংরেজকন্ডা বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু পিঠের উপর দোলায়মান কুচকুচে কালো চুলের বিহুনি এবং চোখের কালো ভাঁজ হইতে তাঁহার বর্ণসংকরত্বের প্রমাণ ধরা পড়িতেছে । মেয়েটির পরণে গোলাপী রং এর ঘাগরা ও জামা, তাহার উপর বন্ধ হইতে আপাদ-লগ্নিত শাদা লেশের Apron বা বস্ত্রক্ষণী ; পায়ে বাহারে সৌখীন চট জুতা । মাথায় টুপি বা ভেল কিছুই ছিল না । মেয়েটি অত্যন্ত গর্মিত ভঙ্গীতে প্ৰাটফরমের উপর পায়চারি করিয়া বেড়াইতে-ছিলেন । হাতে জলন্ত সিগার । মাঝে মাঝে এ-দিক্ ও-দিক্ গরু-দুগ্ধ কটাক্ষ হানিতে হানিতে তিনি সিগারে প্রচণ্ড টান মারিতে-ছিলেন । দুই প্ৰাটফরমে ট্রেনের প্রতীক্ষায় অনেকগুলি দেশীয় লোক বসিয়াছিল । তাহারা অবাধ হইয়া হাঁ করিয়া মেয়েটিকে,—কেহবা মেয়েটির আচরণ দেখিতেছিল ।

অজ্ঞাতেই লীনার চোখে বিস্ময় এবং অসহিষ্ণুতার চিহ্ন ঘনাইয়া উঠিল।—হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বিরক্ত স্বরে সে বলিয়া ফেলিল, “কি অদ্ভুত !”

পাস’ন চমকিয়া বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, “কি সে ?”

লীনা ভিতরে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।—ওই প্ৰাটফরম তরা লোকগুলো ভীত কোকু-

হলে বাহার সগর্ভ বিচরণ-ভঙ্গী ও সিগারেট-
ভঙ্গলীলা দেখিতেছে, সে যে তাহারই মত
একজন ফিরিজী-যুবতী, সে-তথ্যটা হঠাৎ
মনে উদয় হইয়া এক মুহূর্তে লীনার আশা-
ভিমানের কঠোর লজ্জার কশাবাত করিল।
লীনা ঘমিয়া গেল। পার্সন যতই উচ্চ-
শ্রেণীর সম্ভ্রম্য ভদ্রমহিলা হউন,—তবু
তিনি খাটি ইংরাজকস্তা; সে-পার্শ্ব্য-বোধটা
লীনার অত্যন্ত রূঢ় ভাবে স্মরণ হইল। এই
পার্সনের কাছে নিজের স্বজাতি একটি
ফিরিজী-কন্যার আচরণ-কৃতির ফল অকপটে
প্রকাশ করিবার অপমান-দুঃখ লীনা কিছু-
তেই সহ করিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু অস-
তর্ক হইয়া কথার স্মরণপাত যখন করিয়া
ফেলিয়াছে, তখন যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ
একটা কিছু দেওয়া চাই!.....মাথা চুল-
কাইবার ছলে টুপিটা খুলিয়া ফেলিয়া, একটু
ইতস্তম্ভতঃ করিয়া লীনা মুহূর্তে বলিল, “কি
অতজ-বর্কর, এ দেশের ঐ অসভ্য মুখগুলি!
জানোয়ারের মত নিলজ্জ বর্কর দৃষ্টিতে
চোরে আছে!”

পার্সন চাহিয়া দেখিলেন; উদাসভাবে
একটু হাসিয়া বলিলেন, “নিতান্তই রূপার
পাত্র ওরা! নারীজাতি-সম্বন্ধে ওদের
শিষ্টাচার-বোধটা খুব চমৎকার স্মরণ!”—

পার্সন নিজের টুপিটা টানিয়া কপাল
পর্যন্ত নামাইয়া দিয়া বইটা চোখের সামনে
তুলিয়া ধরিলেন। পরক্ষণেই কি একটা
কথা মনে পড়ায়,—হঠাৎ চোখের সামনে
হইতে বইখানা সরাইয়া লীনার মুখ-পানে
চাহিয়া দ্বিধা হাজে বলিলেন, “তবে একটা
স্ববিধা আছে। সভ্যসমাজের কেতা-দ্রুত,

আলাপোৎসুক বন্ধুদের বিরক্তিকর আলাপ-
চেষ্টার চেয়ে ওদের নীরব-অশিষ্টতা ঢের
বেশী নিরাপদ! বিলাত থেকে ভারতবর্ষে
আসবার সময়, জাহাজে গোটাকতক—
অসহ্য-শিষ্টাচারী সহযাত্রীর ব্যবহারে আমাদের
এত বেশী উত্থাপ্ত হয়ে উঠতে হয়েছিল
যে, আমাদের সঙ্গিনী একটি ভদ্রমহিলা
শেষে বেত্র-ব্যবহার করে তাহাদের বান্ধ-
রামীর উপদ্রব থামাতে বাধ্য করে-
ছিলেন!”—কথাটা শেষ করিয়াই পার্সন
গ্লান হাজে বইয়ের দিকে চোখ ফিরাইলেন।
ঊহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

লীনার মুখও গম্ভীর হইয়া গেল। সে
একটু চূপ করিয়া থাকিয়া ক্ষুভ বরে বলিল,
“অকপট অসভ্যতাই বলুন, আর কপট-
সভ্যতাই বলুন, দুই-ই মানুষের অন্তর্নিহিত
একই বর্করতার বিধা-বিশ্মুরিত পরিচয়।—
এক-ই শ্রেণীর, একই সামগ্রী!

দৃঢ়তরে পার্সন বলিলেন, “নিশ্চয়ই!—
পাশবিক বর্করতা, ইউরোপের পোষাক পরেই
আত্মক, আমেরিকার পোষাক পরেই আত্মক,
আর এশিয়ার পোষাক পরেই আত্মক,—
মানুষের অনিষ্ট কর্তৃক, সকল বর্করতার
শক্তিই সমান! বাইরের হিসাব থেকে আত্মক,
উনিশ বিশ গণনা করি, আর বাই করি,—
পৃথিবী অত্যাচার-পীড়িতা হচ্ছেন কিন্তু একই
সমান ওজনে!”—

লীনা গুম্ব হইয়া গেল। অনেক দিনের
জানা, অনেক জনের সম্বন্ধীয় অনেক চিন্তা
তাহার মনের উপর ডেউ খেলিয়া গেল। সে
চূপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

ইংলেন্ডের রাজ্যের চকল-কোলাহল চারি

বিক্ সুধরিত করিয়া তুলিল,—“ঐ গাড়ী আসিতেছে।”

হুইকনে চকিত-নয়নে দূর মাঠের দিকে তাকাইলেন, সভাই ট্রেন ছুটিয়া আসিতেছে! স্বচ্ছ আনন্দোজ্জ্বল নীল চক্ষু-দুইটি লীনার মুখের উপর স্থাপন করিয়া পাস'ন প্রসন্ন-হাস্তে বলিলেন, “এইবার বন্ধু-দম্পতীর শুভ-সন্মিলন ব্যাগারকে আনন্দ-সঙ্গীতে অভিনন্দিত করে দেওয়া আমার উচিত! কিন্তু অত্যন্ত জুগ হয়ে গেছে,—আমি অমৃতপ্ত হচ্ছি—।”

পাস'নের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া লীনা সর্কোতুক উৎসাহোচ্ছল-কণ্ঠে বলিল, “যে-হেতু এসব ক্ষেত্রে গাইবার উপযুক্ত একটা গানও আপনার জানা নাই!—কেমন, ঠিক নয়? পাস'ন, এসব অনাবশ্যক উপসর্গকে আপনি যতই নির্দয় তাক্ষীল্যে নির্মমভাবে অবহেলা করে চলুন, কিন্তু—”

পাস'ন বাস্তবাবে বেশি ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, “হাঁ হাঁ ঐ পর্য্যন্তই থাক! ‘মম’—এই মমতাটির উপর মায়া ছাড়াই নির্মমতা। সেটা সহিতে আমি রাজী আছি, কিন্তু পৃথিবী শুদ্ধ মাছের হাঙ্গি-কামায় আমি স্বার্থপর উদাস্ত অবলম্বন করে নির্দয় হয়ে যাব, এতটা সহনশক্তি আমার নাই। মাপ করুন, লীনা, আগামী বারে বন্ধু-দম্পতীর মিলন-উৎসবে আমি গান শিখে প্রস্তুত হয়ে থাকুব, আপনাদের অবাচ্ করে দেবার জন্যে দস্তর মত চেষ্টা করব!—”

“আচ্ছা, খুব ভাল! আমি তা হলে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করি।—ঐ যে আমার বামী!” প্রাটকরমে আগমন-নীল ঝৈলের একটা জানালার কাঁকে

অস্পষ্টদৃশ্য একটি চুকট-খারী পরিচিত মুখ দেখিতে পাইয়া, লীনা কথা বলিতে বলিতেই ব্যগ্র ও উৎফুল্ল ভাবে উঠিয়া দাড়াইল।

ট্রেন প্র্যাটকরমে থামিতেই, সৌধীন ছাঁটের উজ্জ্বল সবুজ-রঙের-পোষাক-পর্যায়, হৃন্দর-কান্তিশালী, খাঁটি ইংরেজযুবা-পিকক্ সাহেব দুয়ার খুলিয়া নামিলেন। চাকরদের গাড়ী হইতে তাঁহার ভৃত্য পোষাকের ব্যাগ ও শিকারের বন্দুক প্রভৃতি ছোট খাট কতকগুলো মালপত্র নামাইয়া একটা কুলীর মাথায় চাপাইয়া, দূর হইতেই প্রভু ও প্রভু-পত্নীর উদ্দেশে নীরবে অভিবাদন করিয়া, বাসার দিকে চলিল। পিকক্ একশ বিরানব্বই মাইল-দূরবর্তী.....শহরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের যোগ্য বিরাট গাভীর্ষ্যপূর্ণমুখে আগ্রসর হইয়া, পত্নী ও পত্নীবন্ধু পাস'নের সহিত কেতাছরুত শিষ্টাচার-বিনিময়পর্ক সমাধা করিলেন।

উত্তেজনা-চাকল্যে লীনার হৃর্সল বুক ক্রত স্পন্দিত হইতেছিল। আবেগের উচ্ছ্বাসে ব্যগ্র কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, “আমার মার্সী কেমন আছে, বেচারী মার্সী?”

পাস'নের চোখ আড়াল করিবার জন্য চট্ করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া, লীনার মুখের দিকে চাহিয়া পিকক্ তীব্র ত্রুটি করিলেন! লীনার মাথা ঘুরিয়া গেল,—ভয়ানক স্বপ্নিও ভীষণ বেগে স্পন্দন জুড়িয়া দিল! লীনা কাতরভাবে চোখ নামাইল। পিকক্ সে দিকে ক্রক্ষেপ করিলেন না, ভ্রমাবশেষ চুকটটা ঠোট হইতে নামাইয়া, একটানে প্র্যাটকরমের বাহিরে ফেলিয়া দিয়া, ঘাড় সোজা করিয়া, প্রবল উদাস-গভীর কণ্ঠে বলিলেন, “ভালই

আছে, তার সঙ্গে অতটা ব্যস্ত না হ'লেও চলে।”

লীনা মরমে মরিয়া গেল! এই প্রচণ্ড রাশভারী মহাশয় স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী হইবার যোগ্যতা যে লীনার এতটুকুও নাই, সেটা লীনা খুব জানিত। নিজের জ্ঞান-জ্ঞান লইয়া তর্ক-প্রতিবাদে বিরোধ বাধাইতে লীনা ভয় পাইত। কাজেই অকাতর সহিষ্ণুতার নিঃশব্দে স্বামীর যত কিছু উগ্র বিরক্তিকর আচরণ তাহা পরিপাক করা ভিন্ন তাহার পতি ছিল না। ঘনিষ্ঠ পরিচিত পুরুষ-বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ লীনার অগাধ ধৈর্য্যতা আদর্শ পাতিত্বের লক্ষণ বলিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভ্রুয়ংক্রম মুখরিত করিতেন, কেহ বা শুদ্ধ গভীর থাকিতেন। মহিলা-বন্ধুরা প্রকাশ্যে নীরব থাকিতেন, কিন্তু আড়ালে স্বামীর অভ্যাস-সংশোধনে উদ্যোগীতার জন্য লীনাকে কর্তব্যপরাজ্জ্বল্য পত্নী বলিয়া নিন্দা করিতেন। অধ্যাত্মগুণা লীনার কাণে মোটেই পৌছাইবার পথ পাইত না, কিন্তু স্বাধ্যাত্মগুণা পৌছাইত। খুব প্রবলরূপেই নিজের সহিষ্ণুতা-সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড আত্মপ্রসাদ-গর্ভও যে লীনার অন্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন না ছিল,—তাহা নয়! কিন্তু স্বামীর দত্ত উদ্ভূত ব্যবহারের ধাক্কায় লীনার সে গর্বের দশা মাঝে মাঝে বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত।

অজিও তাহাই দাঁড়াইল। বিশেষ করিয়া কুমারী বন্ধু—অল্পপরিচিতা পাস'নের সামনে এই রূপ বাক্যগুণা যে কিছুতেই আদর্শ দাম্পত্যপ্রেমের পরিচায়ক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারা যাইবে না, সেই কোভটাই তাহার অন্তরে বেশী বাঞ্জিল। কিন্তু কিল

খাইয়া, কিল চুরি না করিলে, তাহা নিষ্ঠুররূপে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। কাঁথাই নিরুৎসাহ, মান মুখের বিবর্ণতা যথাসাধ্য গোপন করিবার জন্য জোর করিয়া মুখের উপর খানিকটা শুক হাসি টানিয়া কম্পিতস্বরে লীনা বলিল, “না, না, অস্থির হই নি, তুমি ভুল বুঝ্ছ—।”

রূক্ষভাবে ক্রকুটি করিয়া পিককু বলিলেন, “আমি ভুল বুঝ্ছি!—” কথাটা বলিয়াই পিককু কি ভাবিয়া কে জানে কণ্ঠস্বর সংযত করিলেন; পাস'নের দিকে চাহিয়া বক্রহাস্তে বলিলেন, “জানেন মিস্ পাস'ন, ছুফল অন্তঃ-করণ মেয়েদের মত মিথ্যাবাদী জীব আর ছনিয়ায় নাই!—”

পাস'ন ভালমন্দ কোন উত্তর দিলেন না। শুধু হঠাৎ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে লীনার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, সে মুখ গভীর লজ্জা-বেদনায় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে! পাস'ন প্রশংসা সম্পূর্ণরূপে চাপা দিয়া সংযত স্বরে বলিলেন, “এখানকার ভিড়ে লীনা অসুস্থতা বোধ কর্ছেন, বাড়ী যাওয়া যাক, চলুন।”

“চলুন”—বলিয়া পিককু ডান হাতটা পিছনে ঘুরাইয়া বাঁ-হাতে গোফে তা লাগাইতে লাগাইতে পা বাড়াইলেন। লীনার হাত ধরিয়া পাস'ন অগ্রসর হইলেন।

তাহারা দশ পা চলিতে না চলিতে ঘণ্টা বাজিয়া, বাঁশী ফুকরাইয়া ট্রেণ প্রাটফরম ছাড়িয়া, দূর মাঠের দিকে উৎসর্গ হইল। প্রাটফরম-ঘরের মাঝের ব্যবধান ঘুটিল। ও-দিকের প্রাটফরমের দিকে চোখ পড়িতেই পিককু হঠাৎ একটা ছোট ঠোঙর খাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।—ঠিক তাহাদের সোজাহুজি ও-প্রাটফরমে তখন সেই কিরিক

সুবতী পাড়াইয়া ছিলেন। পিকক্ দারুণ বিষম-
পূর্ণ চোখে অবাক হইয়া তাঁহাকে দেখিতে
লাগিলেন। লীনা ও পাস'ন যে তাঁহার
সঙ্গেই রহিয়াছে, সে-কথা তিনি যেন মুহূর্তের
অন্ত সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়া গেলেন।

লীনা অন্তমনস্ক ভাবে মাথা হেঁট করিয়া
চলিতেছিল; পিককের আচরণ লক্ষ্য করিল
না; কিন্তু পাস'ন সকলই লক্ষ্য করিলেন।
চকিতে দৃষ্টি তুলিয়া তিনি ফিরিজী-সুবতীর
দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, তিনি ক্র ক্রকিত
করিয়া অস্বাভাবিক বিবেচনা-ভরা চোখে
তাঁহাদের দিকেই চাহিয়া আছেন! পাস'ন
আশ্চর্যঘটিত হইয়া গেলেন।

হঠাৎ পাস'নের দিকে চোখ পড়িতেই,
পিকক্ চোরের মত সম্ভ্রান্তভাবে চোখ নামাইয়া
জত হাঁটিতে স্তব্ধ করিলেন। দুই মুহূর্ত পরে,
ঘাড় বাঁকাইয়া কাঁঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন,
“মারদীর খবরের জন্ত তুমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত ছুটে
না এলেই ভাল কর্তে, লীনা! বাংলা
পনের মিনিটের পথ, আমি ত এখনি সেখানে
গিয়ে পৌছিলাম। কেন কষ্ট করে এলে?”

স্বামীর সময় সম্ভাষণে লীনার মনের ভার
অনেকটা লঘু হইয়া গেল। ক্রান্ত-মলিন মুখে
একটু ক্ষুণ্ণ হাঁসি ফুটাইয়া মধুর স্বরে উত্তর
দিল, “ওধু মারদীর খবরের জন্ত নয়, আমার
বৈজ্ঞানিক ভ্রমণটা শেষ করবার দরকারও
ছিল।”

পাস'নের শব্দা হইল, এই বুঝি পুত্র-
সেহবাকুলা লীনার আত্মগোপন-চেষ্টার
হৃৎকলতা লইয়া যি: পিকক্ আবার রক্তমুগ্ধি
ধরিয়া কথিয়া উঠেন! পাস'ন ইতঃপূর্বে
পিকক্কে দুই একবারের বেশী দেখেন নাই,

এবং সে সময় পত্নীর উপর পিককের ব্যবহার
খুব সময় অনুগ্রহপূর্ণ-ই দেখিয়াছিলেন; কিন্তু
তাঁহার মাঝেই সম্বন্ধের কথা লইয়া লীনা
কখনও একটু কাতরতা প্রকাশ করিলেই
পিকক্ যে কিরূপ মর্শ্বাস্তিক-বিরক্ত হইয়া
উঠিতেন, সেটুকুও পাস'ন লক্ষ্য করিয়া-
ছিলেন। আজ পিককের মেজাজটা গোড়া
হইতেই পাস'ন নেহাৎ একটু অস্বাভাবিক
‘গরম’ টের পাইতেছিলেন। তার উপর
আবার সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ-স্বত্র!
পাস'ন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পিককের মুখ-পানে
চাহিলেন,—এই স্বক্ হইয়া বুঝি!

কিন্তু পিকক্ কোন সাড়া শব্দ দিলেন
না। লীনার কৈকিয়ৎ তাঁহার কাণে ঢুকিল
কি না, বলা শব্দ, কিন্তু তিনি আর লীনার
দিকে দৃকপাত করিলেন না, অত্যন্ত উন্মনা
ভাবে, চারিদিক চাহিতে চাহিতে চলিলেন।
পিককের আকস্মিক অনমনস্কতার ঔৎসাহে
লীনা বেচারী বেকসুর খালাস পাইল দেখিয়া
পাস'ন একদিকে যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া
বাঁচিলেন, অল্প দিকে তেমনি একটা অদ্ভুত
বিষয়ও অনুভব করিলেন,—গুপ্ত অন্তরে,
খুব সন্দোপনে!

(৩)

ষ্টেশনের বাহিরে, লাল স্কর্কি চালা পথ
ধরিয়া তিনজনে বাংলোর দিকে চলিলেন।
তিনজনেই নীরব। কিছু দূর আসিয়া একটা
চৌ মাথার মোড়ে পৌছিয়া পাস'ন ডাইনের
রাস্তার দিকে চাহিয়া, হঠাৎ ব্যস্তভাবে বিদায়-
সম্ভাষণ করিয়া, লীনার হাত ছাড়িয়া সেই
রাস্তার দিকে চলিলেন। লীনা বিস্মিত হইয়া
বলিল, “কোথায়?” চলিতে চলিতেই, খুব

ফিরাইয়া পাস'ন সিঁধ হাতে উত্তর দিলেন,
“মাগ করুন, কিছু মনে করবেন না, ঐ ছেলে-
গুলির সঙ্গে একটু দসিাবৃত্তি করতে চন্দ্রম,
ওরা ভয়ানক মারামারি শুরু করেছে। আপ-
নারা এগিয়ে যান। আমার যেতে দেবী হবে
কোন হয়।”

ডাইনের গলি-রাস্তার শেষ সীমায় হুইটি
ভিখারী বালক কি একটা টুকরা খাবার
লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি জুড়িয়াছিল।
বড়ট ছোটকে ভূমে ফেলিয়া দিয়া খাবার
ছিনাইয়া লইয়া মুখে পুরিয়া দিল, ছোট
ধুলার উপর গড়াগড়ি দিয়া আকুল
কান্নার অস্থির হইয়া উঠিল। পাস'ন
হাঁ হাঁ করিয়া, ছুটিয়া গিয়া হুইজনের মাঝে
পড়িলেন,—বড়টির কাণ ধরিয়া বেশ একটা
মোলায়েম পাক লাগাইয়া, ভৎসনা-বচন
ঝাড়িতে ঝাড়িতে ছোটটির হাত ধরিয়া টানিয়া
তুলিলেন। নিকটেই একটা খাবারের
দোকান ছিল; পাস'নের ইচ্ছিতে দোকানদার
একটা চৌড়ায় করিয়া কিছু খাবার আনিয়া
ছেলেটির হাতে দিল। পাস'ন দোকানদারের
প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া কমালে করিয়া ছেলেটির
হাত মুখের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতেই—
ছেলেটি সমস্ত শোকের কান্না ভুলিয়া তৎক্ষণাৎ
ধুলার উপরই খাবারের চৌড়া নামাইয়া, বসিয়া
পড়িয়া, হুইহাতে খাবার তুলিয়া ব্যাকুল আগ্রহে
মুখে পুরিতে শুরু করিয়া দিল। তাহার কান্না-
ভরা মুখ আনন্দের হাসিতে ভরিয়া উঠিল।—
পাস'ন সম্বন্ধে তাহার কোকড়ানো চুল-ভরা
কক্ষ মাথাটার উপর হাত ব্লাইয়া দিতে দিতে
প্রায় দৃষ্টিতে, খাওয়া দেখিতে লাগিলেন। বড়
ডাই নিশ্চিহ্নরূপে তখন গা ঢাকা দিয়াছে।

ও-দিকে পিকক্ একটা চুকট ধরাইবার
জন্ত পথের অন্য পাশে দেয়ালের দিকে মুখ
ফিরাইয়া, দেশালাইয়ে কাঠি ঠুকিতেছিলেন।
লীনা একটু দাঁড়াইবার স্বযোগ পাইয়া,
একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া, পাস'নের ‘দসিাবৃত্তি’
দেখিতে লাগিল। বুদ্ধিতের আগ্রহে
ছেলেটির খাওয়া দেখিতে দেখিতে লীনার
মনে পড়িয়া গেল—নিজের ছেলের কথা।
করুণ-বাখায় লীনার মন ভরিয়া গেল। আহা,
মার-কোল-হার্য কচি-শিশু মারপি! খাজীনের
বুকে কত অপরাধের স্নেহ-কন্মা থাকিতে পারে
সে, সেই ছোট শিশুর অসংখ্য ছোট উপদ্রব,
অজস্র সেবা-প্রয়োজনীয়তার তার সম্বন্ধে বহন
করিতে পারে? খাজীরা কত মনোবোণ
তাহার উপর রাখিতে পারে? সেও হয় ত ঐ
গরীব বাছার মত ধুলার উপর হইতে বা তা
জিনিষ কুড়াইয়া মুখে পুরে! আহা—হাঁ, কত
অযত্নই না জানি, তার হইয়া থাকে, হয়!

লীনার চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।
নীরব কাতর দৃষ্টিতে ভিখারী বালকের দিকে
সে চাহিয়াই রহিল।

চুকট ধরাইয়া পিকক্ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া
বলিলেন,—“কই, তিনি কোথায় গেলেন?
চমকিয়া লীনা বলিল, “কে পাস'ন?—
তিনি—?” লীনা বলিতে গিয়া সভয়ে থামিল।
সদাশয় নামীর স্তম্ভের মহান্ মহামুভবতার
পরিচয় জানিতে কিছুই লীনার বেশী বাকী
নাই। পৃথিবীর অনেক কিছু ভালকে শাদা-
চোখে দেখিবার বা সরলভাবে ভালবাসিবার
কমতা তাহার কিছুমাত্র না থাকিলেও, পয়ের
অহুষ্ঠিত সকল কিছু ব্যাপারকে নিজের খান-
খেনালী ইচ্ছা, খুসী, ভেদের উপর নিরঙ্কুশ

প্রত্যাপে বিচ্ছেদের দৃষ্টিতে দেখিতে এবং অন্ধ
বিচারে অসম্বোধে যুগ্ম প্রকাশ করিতে
উহার কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না। তিথারীর
হেলে লইয়া পাসনের এই বাড়াবাড়ি, পিকক্
বে কিছুমাত্র সন্তোষের দৃষ্টিতে দেখিবেন না,
তাহাতে একবিন্দুও সন্দেহ ছিল না। লীনা
পাসনের পাগ্লামো সাফ্ চাপিয়া লইবার
জন্ত তাড়াতাড়ি গলির মোড় ছাড়িয়া
আগাইয়া চলিতে শুরু দিয়া ঢোক গিলিয়া,
সংক্ষেপে বলিল, “তিনি এই দিক্ দিয়ে
বেড়াতে বেড়াতে গেলেন।”

“এই দিকে!”—বলিয়া কুঁচকাইয়া
পিকক্ কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়া
এ-দিক্ ও-দিক্ তাকাইয়া থামিয়া গেলেন।
সন্ধ্যা ও পিছন হইতে অনেকগুলি ইতর-
জন্ত পথিক আসিতেছিল। তাহাদের খাতিরে
সে এসল ছাড়িয়া, কেতা-মফিক সভ্যতার
প্রমাণ দেখাইবার জন্ত, বাধা-দস্তুর সাহায্যের
বুলি আওড়াইয়া লীনার দিকে গম্ভীর চালে
তিনি হাত বাড়াইলেন। দুইজনে নীরবে
চলিলেন।

কিছু দূরে আসিয়া একটা পাঁচিল-ঘেরা
প্রকাণ্ড হাতার মধ্যে দুইটি ছোট ছোট
অনুস্ত বাংলো দেখিতে পাওয়া গেল। বাংলো-
দুইটির একটার লীনার আড্ডা, অপরটার
মিশনারী মেম-দুইজন থাকিতেন।

পাঁচিলের ফটক পার হইয়া হাতায় ঢুকিয়া
লীনা প্রান্তি-বিবশকণ্ঠে বলিল, “এইবার ভারী
ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। আধ ঘণ্টা-টাক্
চুপ-চাপ পড়ে জিরিয়ে না নিলে আর তোমার
সঙ্গে কথা কহিতে পারব না, মাপ করো।
কুমি তা খেয়ে ততক্ষণ চুপট নিয়ে বোসো,

আমি ওরূপ খেয়ে শোবার ঘরে চলুম।—ঠিক
আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসব।”

অনাবশ্যক বিরক্তি-আঁজ-ভরা তাক্কীল্যের
স্বরে পিকক্ বলিলেন, “বেশ তো, যাও না।
কে তোমায় বারণ করছে?”

লীনা নীরবে একবার শুধু স্বামীর মূখ-
পানে চাহিল, কোন কথা বলিল না; মাথা
হেঁট করিয়া শ্রান্ত স্থলিত চরণে বাংলোর বারে-
ডায় উঠিয়া, মুহূর্তের জন্ত একটু ইতস্ততঃ
করিয়া কণ্ঠস্বরে খুব জোর ঢালিয়া হঠাৎ
বলিয়া উঠিল, “চল, চায়ের টেবিলেই বসা
যাক! রোজ একলা চা খাওয়ার কষ্ট সহিতে
হয়, আজ সুযোগ ছাড়লে বোকামো হবে।
কি বল অর্থাৎ?” স্বামীর মুখ-পানে চাহিয়া
লীনা সহজভাবে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল।

পিকক্ অবিচলিত গাম্ভীর্যে বলিলেন,
“পাঁচ মিনিট অন্তর মত পরিবর্তন তোমার
চিরদিনের অভ্যাস, সেটা খুব জানি; সেই
জন্তেই তোমায় প্রেরণ দিই না।”

লঘুহাস্তে লীনা বলিল, “বড় দার্শনিকের
লক্ষণই তাই! ‘ভদ্রস্রাকের এক কথা’-
প্রবাদ তাঁদের কাছে খাটে না, জানো তো?
.....আমি, আমার ওষধের শিশি চায়ের
টেবিলে দিয়ে যাও।”

প্রভু-দম্পতির আগমনে, কুঠির খানসামা,
বারুচ্চি ও আদা-দুইজন তটস্থ হইয়া সেলাম
দিয়া ছুটাছুটি করিয়া নিজ নিজ কাঞ্চে
লাগিল।

দুইজনে আসিয়া ড্রিং রুমে ঢুকিলেন।
লীনার ঔষধের মাশ ও শিশি লইয়া আদা
পরমুহূর্তে ক্ষুদ্রপবে ঘরে ঢুকিল। লীনা
টেবিলের একটু দূরে একটা খোলা জানালায়

সন্মানে চেয়ার লইয়া বসিয়াছিল,—বোধ হয় হাওয়া পাইবার অভিপ্রায়ে ; পিক্ টেবিলের উপর কুহুয়ে ডর দিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া ক্রকুটি-বন্ধনয়নে টেবিলের উপরকার জলন্ত সেকের আলোটোর দিকে চাহিয়াছিলেন। হুইলেনেই নীরব নিখুদ।

• আয়া লীনার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে অল্প দূর দিয়া লীনার কুঠির চাকর 'বয়' চায়ের সরঞ্জামে সাজানো টে লইয়া ঘরে ঢুকিল। টেবিলের উপর টে নামাইয়া, বাড় ফিরাইয়া প্রস্থ পূর্ণ দৃষ্টিতে সে লীনার দিকে চাহিল,—চা কি সে-ই পরিবেশন করিবে ?

মাসের ঔষধ মুখে ঢালিতে উত্ততা লীনা হাত নাড়িয়া নীরব ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল। পিক্ চোখ ফিরাইয়া লীনার নিষেধ ইঙ্গিত দেখিয়া মুহূর্তে ক্রুদ্ধ হইতে গাঞ্জিয়া উঠিলেন,—“চাল্ তুই চা।”

উগ্রগন্ধ-ভরা, কটুবাদ ঔষধ মুখে ঢালিয়া লীনা গিলিতে ভুলিয়া গেল ; নিম্পলক-নয়নে বামীর দিকে কণ্ঠে চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে অন্তরিকে চোখ ফিরাইল। কষ্টে ঔষধটা গলাধঃকরণ করিয়া, আয়ার হাতে ৩ মাস ফিরাইয়া দিয়া, সে তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। আয়া চলিয়া গেল।

'বয়' ধন্যমত খাইয়া চট পট্ কিপ্র হস্তে কাঁধে গুছাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু মুহূর্ত-পরেই পিক্ আবাত, কি ভাবিয়া কে জানে, টেচাইয়া উঠিলেন,—“পুর হতুট, পাজী! তোকে চা করতে হবে না।” সঙ্গে সঙ্গে ঘড়-ঘড়-শব্দে চেয়ার সরাইয়া নিজেও উঠিয়া পড়িলেন ; ক্ষতপদে বাহিরে গিয়া চাঁকায় করিয়া

নিজের অহুচর ভৃত্যকে ডাকিলেন, “জুয়ন্ জুয়ন্।”

ষ্টেশন হইতে মোট ঘাড় বহিরা কুঠিতে পৌছিয়া জুয়ন্ সেইমাত্র হা-তপা ধুইয়া বাবুর্জিখানায় তামাক খাইতে ঢুকিয়াছে। প্রভুর চাঁকায় তটস্থ হইয়া উজ্জ্বলসে নোড়িয়া আসিল। প্রভু তাহার কান ধরিয়া এক ঝাঁকুনি লাগাইয়া ঘরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, “কাহা হো রাঞ্চেল, জলদি টা বানো।”

আদর্শ ভাল মাহুঘীর সহিত নিঃশব্দে কর্ণের জালা পরিপাক করিয়া, ভৃত্য নিরন্তরে ঘরে ঢুকিল। বয় তখন অন্তরিকের দ্বারের পর্দার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়া ভীতিলান মুখে চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ;—আর লীনা দাঁতে ঠোট চালিয়া জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া উদ্যম-তরঙ্গ দৃষ্টিতে বাহিরের অন্ধকার-ভরা অগণ্য দেখতেছে। গৃহ নিঃশব্দ।

‘জী-পট’ হইতে পেয়ালা-হুইটায় চা ঢালিয়া জুয়ন্ প্রভুর দিকে এক পায় সরাইয়া দিয়া জ্যাম্ বিষ্ট কেচ্ ভরা পায়টা সম্বোধনে প্রভুর ডান দিক্ হইতে বা দিকে ঠেলিয়া আনিতে আনিতে লীনার দিকে চাহিয়া সম্মানে বলিল, “যেন সা’নু।”

লীনা মুগ্ধ ফিরাইয়া চাহিল। চায়ের তৃষ্ণা যে তখন তাহার কর্ণ হইতে একেবারেই চলিয়া গিয়াছে, সে-সত্যটা মুখ দৃষ্টিয়া বলিবার প্রচণ্ড ইচ্ছা সত্ত্বেও বলিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। ভৃত্য চা লইয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিতে উদ্বৃত্ত দেখিয়া বলিল, “ধাক্, আমি টেবিলেই থাকি, তুমি যেতে পারো।”

টেবিলের কাছে লীনার জড় চেয়ার সরাইয়া দিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। লীনা উঠিয়া গিয়া চেয়ারে বসিল। কিন্তু চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়া এক চুমুক গ্রহণ করিয়াই বুঝিল, উহা তাহার পক্ষে অসহ-কড়া! বিনা-বাক্যে পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া, একটা বিছুট মুখে লইয়া কম্পিত হস্তে চামচে জ্যাম্ তুলিতে লাগিল।

পিকক্ ঘাড় শুষ্কিয়া খাইতে খাইতে, হঠাৎ সবেগে মুখ তুলিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন “আচ্ছা মিস্ পার্সন যে হঠাৎ আমা-
দের ছেড়ে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন? মিষ্টার ডব্লুসনের কুঠিতে নিশ্চয়?”

প্রশ্নটা কিছু দৃষ্য নয়, কিন্তু বামীর প্রশ্নের ভীতিতে হঠাৎ লীনা ভয়কর চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত-কাল তাহার কথা বাহির হইল না, তাহার পূর্ব-পাণ্ডিত্য মুখে জড়িত স্বরে সে বলিল, “ডব্লুসনের কুঠি? না, না,—কৃষক-পল্লীতে বোধ হয়—।”

পি। কৃষক-পল্লী? কের মিথ্যে কথা? কক্ষণো না;—এ দিকেই ডব্লুসনের কুঠির রাস্তা—

লী। হাঁ, তা ঠিক, কিন্তু মিসেস্ ক্লাউডেন্ কি মিঃ ডব্লুসন কেউ তো আজ কুঠিতে নাই—।

লীনার ক্রীণ কণ্ঠস্বরকে ডুবাইয়া সশব্দে জ্বতা চুঁকিয়া কঠোর গর্জনে পিকক্ বলিলেন, “নেই? আবার মিথ্যে দিয়ে পার্সনকে ঢাকবার চেষ্টা? ঘোর মিথ্যাবাদী তুমি! আচ্ছা, চল্লম্ আমি, দেখি তারা কেমন কুঠিতে নেই!”

লাফাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, ক্রমাগত হাত মুছিতে মুছিতে, টুপিটা বগলে চাপিয়া পিকক্ তীরবেগে বাহির হইলেন। লীনা হতবুদ্ধি বিহ্বলের মত বসিয়া রহিল।

[ক্রমশঃ]

ক্রীশেলবালা ঘোষণায়া ।

“পত্রিকা।”

(১)

আমি ওগো চলি কেবল চলি—

কোন দেশেতে ঘরখানি মোর
পদ্মা তাহার দেয় না ত কেউ বলি।
সকাল থেকে কেবল হেঁটে হেঁটে,
সারা দিনটা যায় গো আমার কেটে,
রাস্তা যে হায়, জুরায় নাক’ তবু—
জান্ত বেহ পড়তে থাকে টলি।
—তবু আমি চলি কেবল চলি।—

(২)

সকল চলা করি আমার শেষ,
না জানি কোন শুভক্ষেণে মিলিবে মোর দেশ।
প্রিয়া আমার সোহাগ-ভরে
তুলে নিবে হাতটী ধরে,
পুত্র-কন্যা দিবে আমার
সারা অক ছেঁরে—
—কেবল চুমো খেয়ে।

সকল দুঃখ-স্বপ্নের মাঝে
তাদের বাঁশী কানে বাজে,
আঁধার হিরা' পরে আমার
বুলায় স্বপ্ন-তুলি,
—তাই ত আমি চলি!—

(৩)

বর্ষা আসে বজ্রা মাথায় করি,
ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লেগে
নয়-দেহ উঠে গো খরহরি!—

আকাশ ভেঙ্গে নামতে থাকে জল—

ভিজ্জে ভিজ্জে হিম হয়ে যাই,
নাইক আমার নাই কিছু দয়স!
পথের কান্দা পায়ে মাখি,
আঁধার ঠেলে চলতে থাকি,
দরদী কেউ নাইক হেথা—

কারে এসব বলি!

বিজ্ঞান-পথে চলি কেবল চলি!—

(৪)

এমনি করে কাটিয়ে দেছি

কত গ্রীষ্ম কত শীতের দিন!

পায়ের তলায় ফোঁকা পড়ে
তবু আমি চলি বিরাম-হীন!
বসন্তের ওই পাখীর গানে
মনটা আমার কোথায় টানে!
না জানি কোন্ মায়া-হরিণ
নিচ্ছে আমায় ছলি!

—আমি ওগো চলি কেবল চলি!—

(৫)

কবে আমার নামবে বোকা
লাঘব হবে ভার—

ঠিকানা নাই তার!
কোন্ অজানা পুরের পানে
ছুটি কেলব উদ্যোগ প্রাণে!
হয় ত ওগো হবে আমার
চলাই কেবল সার!

পাখীরা সব ফিরে নীড়ে,

বাতাস আজি বহে ধীরে—

শ্রান্ত-দেহে অন্ত-পারে

মৃত্যু পড়ে চলি—

—তবু আমি চলি কেবল চলি!—

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য ।

জগদী ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)।

* বখত ন পাইউ কাদিয়া—কাজিরাও সে মাহ্ না কোই=কেহই সে ঋতু, সে মাস
সময় নিরূপণ করিতে পারেন্ নাই। যি জানেন্ না।
লিখন লেখ কোরাণ—বাহারা কোরাণের প্রস্ন। তবে কে জানে, কখন সেই নিরা-
লেখা লিখিরাছেন। কার ব্রহ্ম এই সাকার জগতের সৃষ্টি করিলেন্ ?

তিথি বার ন যোগী জার্নৈ=যোগী ব্যক্তি-উত্তর। যা করতা সিরঠিকউ সাজে—
রাও সে তিথি সে বার জানেন না। কতী যিনি এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়া সাজাইরাছেন।

আপে জ্ঞানে সেই=তিনিই আপনি জানেন, কোন সময় তিনি আপনাকে এই জগদ্রূপে সাজাইয়াছেন।

কিব করি আখা—এমন মহান্ পরমেশ্বরের কথা ক্ষুদ্র মানুষ কি বলিবে? কিব সালাহী—সেই মহান্ পুরুষের স্তুতি করিবার মানুষের কি শক্তি আছে? কিউ বরণী—কি শক্তি আছে যে তাঁহার বর্ণনা করিব? কিব জানা—কি জ্ঞান আছে যে তাঁহাকে জানিতে পারিব? যথা প্রতি—‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অশ্রাপ্য মনসা সহ’—যাঁহাকে মন এবং বাক্য জানিতে না পারিয়া প্রত্যাবর্তন করে।

নানক—নানক বলিতেছেন। আধনি সজ্জেকা আঠে=তাঁহার কথা এক জনের নিকট শুনিয়া আর একজন বলে, এইরূপ পরোক জানই চলিয়া আসিতেছে। ইক হ ইক, সিয়ারা—এর দ্বারা কাকার নিকট আর এক শাস্ত্রকার শুনিয়া তাঁহার বাখ্যা করেন, অর্থাৎ একজনের নিকট হইতে আর একজনের জ্ঞানের উৎপত্তি।

বড্ডা সাহিব—সেই প্রভু মহান্। বড্ডী নাউ—তাঁহার নাম মহান্। কীতা যাকা হোটে=যাঁহারই এই সৃষ্টি।

নানক—নানক বলিতেছেন। যেকো—যাঁহার। আপো জ্ঞানে=অহংজ্ঞান আছে। অগৈ গরা ন মোটে—সে ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে পারে না।

তাৎপর্য্য—ভগবান্কে ভক্তি করিতে না পারিলে, তীর্থসেবা, তপস্যা, দয়া, দান,—এ সকল কিছুই দ্বারা মানুষ তরিতে পারে না; আবার হৃদয়ে ভক্তি পোষণ করিয়া ইহাদের যে কোনও একটি

অল্পমাত্র অবলম্বন করিলেই ভগবান্কে লাভ করা যায়। সেই মহান্ পুরুষ জিগ্গাষাতীত হইয়াও সন্তুষ্ট।—সন্তুষ্ট ভাবে না দেখিলে ভক্তি লাভ হয় না। শাস্ত্রকারেরা যদি নিঃস্বর্ণ ব্রহ্মের বিচার করিতে চেষ্টা করেন, সজ্জন ব্রহ্ম কি-প্রকারে আপনাকে জগদ্রূপে প্রকাশ করিলেন—তাঁহার বিচার করিতে যান, তাঁহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে; কারণ, নিঃস্বর্ণ ব্রহ্মের বিষয় ক্ষুদ্র মানব কি বলিবে? সন্তুষ্ট ব্রহ্মের ধারণা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এই পথ ব্যতীত ভক্তিলাভ হয় না। অহংভাব পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়কে ভক্তিতে মাখাইয়া সেই সন্তুষ্ট ব্রহ্মের ভাবে আপনাকে ডুবাইতে হইবে।

পাতাল পাতাল লখ, আগাশ আগাশ। উড়ক উড়ক ডালি থকে বেদ কহনি ইক বাত ॥ সহস আঠারহ কহনি কতেবা, অমলু ইক ধাত ॥ লেখা হোই তো লিখিই, লেখি হোই বিনাশ ॥ নানক, বড়া আসিটৈ, আপে জ্ঞানে আপ ॥

[পাতাল পাতাল লখ=লক্ষ লক্ষ পাতাল তাঁহার সৃষ্ট। সৃষ্টির অনন্তর দেখাইতেছেন। আগাশ আগাশ=আকাশেও অনন্ত লোক সৃষ্টি করিয়াছেন।

উড়ক উড়ক ডালি=উড়ক অর্থে অন্ত। ডালি অর্থে খুঁজিয়া। ঋষিমুনিগণ তাঁহার সৃষ্টির অন্ত খুঁজিতে খুঁজিতে। থকে=ক্লান্ত হইয়া যায়। বেদ কহনি ইক বাত=বেদও সেই এক কথা বলে!—সত্য জ্ঞানমনস্তত্ত্ব ব্রহ্ম =ব্রহ্ম সত্যরূপ, জ্ঞানরূপ এবং অনন্তরূপ।

সহস আঠারহ কহনি কতেবা—অষ্টাদশ পুরাণ এবং সহস সহস পুস্তকও এই কথাই

বলিয়া থাকে। অসলু ইক ধাত=এই অনন্ত
সৃষ্টির মধ্যে সেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত-
স্বরূপ ব্রহ্মই সার পদার্থ। লেখা হোই তো
লিখিই=অনন্ত সৃষ্টির বিষয় লেখা যদি সম্ভব
হইত, তাহা হইলে লেখা হইত। লেখি হোই
বিনাশ—সৃষ্টি-সংখ্যা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে,
অর্থাৎ তাহার সংখ্যা নাই, অর্থাৎ সৃষ্টি অনন্ত।

নানক বড়া আদিটের=নানক বলিতেছেন,
তাহাকেই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়।
আপে জাঠৈ আপু=আপনার সৃষ্টির বিষয়
তিনিই আপনি জানেন।]

অর্থ।—লক্ষ লক্ষ পাতাল তাহার সৃষ্টি;
আকাশেও অনন্ত লোক তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।
ঋষি মুনিগণ তাহার অস্ত্র খুঁজিতে খুঁজিতে
ক্লান্ত হইয়া যান। অষ্টাদশ পুরাণ এবং সহস্র
সহস্র ধর্ম-পুস্তক এই কথাই বলে যে, অনন্ত
সৃষ্টির মধ্যে সেই ব্রহ্মই সার পদার্থ। অনন্ত
সৃষ্টির বিষয় লেখা সম্ভব হইলে লেখা যাইত,
কিন্তু সংখ্যা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ তাহার
সংখ্যা নাই। নানক বলিতেছেন, তাহাকেই
সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়। আপনার
সৃষ্টির বিষয় তিনি আপনিই জানেন।

২৩

সালাহী সালাহি এতী সুরতি ন পাইয়া।
নদীয়া অটৈ বাহ্ পবহি সমুন্দ জানিয়হি॥
সমুন্দ সাহ সুলতান গিরহা সেতী মালদন।
কীড়ি তুলি ন হোবনী, যে তিস মহেন
বিসয়হি॥

[সালাহী=স্তুতি পাইবার যোগ্য যে
পরমেশ্বর। সালাহি=স্তুতি করিব। এতী—
এত। সুরতি=প্রেম। ন পাইয়া=নাই; অর্থাৎ;
কোথায় পাই? যিনি স্তুতি পাইবার যোগ্য

এমন পরমেশ্বরের স্তুতি করিব, সে প্রেম-
কোথায়? নদীয়া অটৈ বাহ্ পবহি সমুন্দ—
নদী-সকল বহিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে। ন
জানিয়হি=কিন্তু সমুদ্র যে কত বৃহৎ, নদী-
সকল তাহা জানে না। মনুষ্য সেই মহান
আত্মার মধ্যে বাস করিতেছে, কিন্তু জানে না
যে সেই ব্রহ্ম কিরূপ অপরিমেয়! যে তিস
মহেন বিসয়হি—যে সাধক সেই পরমেশ্বরের
মন হইতে বিস্মৃত হয় না, অর্থাৎ তাহার স্তুতি
প্রেম করে। সমুন্দ সাহ সুলতান=গাহার
নিকট সমুদ্রায় রাজা মহারাজ। গিরহা সেতী—
রাজপ্রাসাদাদিহিত। মালদন=ধন-সম্পত্তি।
কীড়ি তুলি ন হোবনী=কীটের তুল্যও বোধ
হয় না; অর্থাৎ কীট অপেক্ষাও তুচ্ছ বলিয়া
মনে হয়।]

তাৎপর্য্যঃ—স্তুতি পাইবার যোগ্য যে পর-
মেশ্বর, তাহার স্তুতি করিব, এমন প্রেম
কোথায়? নদী-সকল সমুদ্রে গিয়া পড়িত
হয়, কিন্তু তাহারা কি জানে যে সমুদ্র কি মহৎ
বস্তু! যদি কোনও সাধক ভাগ্যগুণে তাহার
স্তুতি প্রেম লাভ করে ও তাহাকে মন হইতে
বিস্মৃত না হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট
রাজা, মহারাজ এবং তাহাদিগের রাজপ্রাসাদ
ও ধনসম্পত্তি কীট হইতে ক্ষুদ্রতর কীটের
স্তায় তুচ্ছ মনে হয়।

২৪

অন্ত ন সিকতী, কহনি ন অন্ত।
অন্ত ন করণৈ, দেনি ন অন্ত॥
অন্ত ন বেপনি, স্তননি ন অন্ত।
অন্ত ন জাপৈ, কিয়া মনি অন্ত॥
অন্ত ন জাপৈ, কীতা আকার।
অন্ত ন জাপৈ পারাবার॥

অন্ত কারণি কেতে বিল লাহি।

তাকে অন্ত ন পারে যাহি।

এহ অন্ত ন জাটন কোই।

বহতা কহিয়ে বহতা হোই।

বড় ডা সাহিব উচা খাউ।

উচে উপরি উচা নাউ।

এ বড় উচা হোইব কোই।

তিস উচে কউ জাটন সোই।

যে বড় আপি জাটন আপি আপি।

নানক, নদরী করমী দাতি।

[অন্ত ন সিকতী—পরমেশ্বরের গুণগানের

অন্ত নাই।

কহনি ন অন্ত=তাহার কথা বলিয়া শেষ
হয় না।

অন্ত ন করণে=তাহার কার্যের অন্ত
নাই।

দেনি ন অন্ত=তাহার দানের অন্ত নাই।

অন্ত ন বেধনি= তাহার দৃষ্টির অন্ত নাই।

শুননি ন অন্ত=তাহার শ্রবণের অন্ত নাই
যথা গীতায়—

“সৰ্ব্বতঃ পানিপানন্তং সৰ্বতোকিশিরোমু-
খম্। সৰ্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সৰ্ব্বমাবৃত্য
ভিষ্ঠতি।” সৰ্বত্র তাহার হস্ত, সৰ্বত্র তাহার
পদ, সৰ্বত্র তাহার নেত্র, সৰ্বত্র তাহার
মস্তক, সৰ্বত্র তাহার মুখ, সৰ্বত্র তাহার শ্রবণ;
অনন্ত স্থান ব্যাপিয়া সেই বস্তুর বিরাজমান
আছেন।

অন্ত ন জাটন=অন্ত জানা যায় না।

কিয়া মনি অন্ত=সেই পরমেশ্বরের অভি-
প্রায় কি? অন্ত ন জাটন=অন্ত জানা যায়
না। কীভা আকার=কি প্রকারে তিনি
যাৱাশক্তি-দ্বারা অগৎ সৃষ্টি করেন। অন্ত ন

জাটন=অন্ত জানা যায় না। পার্শ্বাবার=
সেই পরাবার অর্থাৎ আদ্যন্তহীন পুরুষের।

অন্ত কারণ কেতে বিললাহি=অন্ত
কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই বলিয়া
কত কত মূনিঋষি ব্যাকুল হইয়া থাকেন।

তাকে অন্ত ন পারে যাহি=তাহার অন্ত
পাওয়া যায় না।

এহ অন্ত ন জাটন কোই=এই অনন্ত
পুরুষের অন্ত কেহ জানে না।

বহতা কহিয়ে বহতা হোই=যদি তাহার
কথা অনেক বলা যায়, তাহা হইলেও
অনেক বলিবার বাকি থাকে।

বড় ডা সাহিব উচা খাউ=তিনি মহান্
দেহতা, তাহার স্থান অতিশয় উচ্চে। উচে
উপরি উচা নাউ=তাহার নাম (অর্থাৎ
ওঙ্কার) উচ্চ হইতেও উচ্চ। এ বড় উচা
হোইব কোই=যদি কেহ তাহার জ্ঞান বড়
হয়। তিস উচে কউ জাটন সোই=তবে
ত সে সেই মহান্ পরমেশ্বরকে জানিতে
পারে।

যে বড় আপি জাটন আপি আপি=
তিনি যে মহান্ পরমেশ্বর, তিনি আপ-
নাকে আপনাই জানেন। নানক, নদরী
করমী দাতি=নানক বলিতেছেন, সেই
পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টিতে এবং সাধকের
সুভকর্ষ-অনুযায়ী তিনি আপনাকে জানিবার
শক্তি সাধককে দেন।]

তাৎপর্য্য :—সেই পরমেশ্বরের গুণ-
গানের অন্ত নাই, তাহার কথা বলিয়া শেষ
হয় না। অনন্ত তাহার কার্য, অনন্ত তাহার
দান, অনন্ত তাহার দৃষ্টি, অনন্ত তাহার
শ্রবণ। তাহার ইচ্ছার অন্ত কেহ জানে না।

তাহার সৃষ্টির অন্ত কেহ জানে না ; তিনি আত্মতরঙ্গীন পুরুষ। কত ঋষি-মুনি “অন্ত কোথা - তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর” বলিয়া ব্যাকুল। তাঁহার কথা যত বলিবে, তত আরও বলিতে বাকি থাকিবে। তিনি মহান্ দেবতা। তাঁহার নাম উচ্চ হইতেও উচ্চ। তাঁহার সমান কেহ হইতে পারে না ; স্মরণ্য তাঁহাকে কি প্রকারে জানিবে? নানক বলিতেছেন, তাঁহার রূপাদৃষ্টি হইলে এবং সাধকের পুণ্যফলে, ভগবান্ আপনাকে জানিবার শক্তি সাধককে দেন ; তাহা হইলেই সাধক তাঁহাকে জানিতে পারে।

২৫

বহতা করম লিখিয়া ন বাই।
বড়া দাতা তিল ন তমাই।
কেতে মংগহি যোধ অপার।
কেতি অগণত নাই বিচার।
কেতে খপি তুটহি বেকার।
কেতে লৈ লৈ মুকর পাহি।
কেতে মুরথ খাহি খাহি।
কেতিয়া দুখ ভুখ সদমার।
এহিতি দাত তেরি দাতার।
বন্দি খালাসী ভাণৈ হোই।
হোর আখি ন সেকৈ কোই।
যে কো খাইকু আখনি পাই।
উহ জাটন যেতিয়া মুহি খাই।
আপে জাটন আপে দেই।
আখহি সেভি কেই কেই।
বিস্মে বধমে দিকতি সালাহ্।
নানক পাতসাহী পাত সাহ।

[বহতা করম=ভগবানের অনন্ত রূপ।

লিখিয়া ন বাই=লিখিয়া শেষ হয় না।

বড়া দাতা=মহান্ দাতা। তিল ন তমাই=তাঁহাতে তিলমাত্র তমঃ বা অহংকার নাই যে “এত দিতেছি।”

কেতিয়া মংগহি যোধ অপার=কত যোদ্ধা কতই বাসনা করিয়া তোমার নিকট চাহিতেছে। কেতি অগণত নাই বিচার=সংসারের ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুত্র, প্রভৃতি কত কত ব্যক্তি চাহিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই এবং ইয়ত্তাও করা যায় না।

কেতে খপি তুটহি বেকার=কত ব্যক্তি রিপূর বণবস্ত্রী হইয়া রূপা জীবন হারাইতেছে। কেতে লৈ লৈ মুকর পাহি=কত ব্যক্তি লই-তেছে, আবার অস্বীকার করিতেছে।

কেতে মুরথ খাহি খাহি=কত কত মুখ কেবল খাইয়াই গাইতেছে। কেতিয়া দুখ ভুখ সদমার=কত কত দুঃখী ব্যক্তি আবার ক্ষুধাতে মৃতপ্রায় হইতেছে।

এহিতি দাত তেরি দাতার=হে প্রভো। মাগুষের যে এই সকল দুঃখ, ইহাও তোমার দান ; কারণ, কর্মফল-প্রদাতা তুমিই।

বন্দি খালাসী ভাণৈ হোই=বন্দন এবং মোক্ষ তোমারই ইচ্ছায় হইয়া থাকে। হোর আখি ন সেকৈ কোই=আরও যেকত তোমার দান, তাহা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না।

যে কো খাইকু আখনি পাই=যে তাঁহার দান পাইয়া অস্বীকার করে। উহ জাটন যেতিয়া মুহি খাই=সে জানিবে, তাহার মুখে কিরূপ আঘাত লাগে। আপে জাটন আপে দেই=তিনি আপনাই জানেন বাহা তিনি দিতেছেন। আখহি সেভি কেই কেই=কেহ কেহ তাহাও বলিয়া থাকেন।

বিস্ময়ো বথসে নিকৃতি সালাহ—বাঁহার
প্রতি তিনি রূপা করিয়া প্রশংসা এবং স্তুতি
প্রদান করেন।

নানক,পাতসাহী পাত সাহ=নানক বলি-
তেছেন, তিনিই রাজরাজেশ্বর হ'ন।]

অর্থ :—ভগবানের অনন্ত রূপা লিখিয়া
শেষ হয় না। মহান্ দাতা, তিলমাত্র
তঁাহাতে অহঙ্কার নাই যে, 'এত দিতেছি।'
কত কত যোদ্ধা কতই বাসনা করিয়া তোমার
নিকট প্রার্থনা করিতেছে। সংসারের ধন-
রত্ন-স্রোত-পুত্রাদি কত কত ব্যক্তি চাহিতেছে,
তঁাহার ইচ্ছা নাই। কত ব্যক্তি ভগবানের
নিকট পাইতেছে আবার তাহা অস্বীকার
করিতেছে। কত কত মুখ কেবল খাইয়াই
বাইতেছে। আবার কত কত ব্যক্তি ক্ষুধাতে
মৃতপ্রায় হইতেছে। হে প্রভো! যাহাদের
যে এই সকল হৃৎ, ইহাও তোমার দান;
কারণ, কর্তৃফল-প্রদাতা তুমিই। বন্ধন এবং
মোক তোমারই ইচ্ছায় হইয়া থাকে। আরও
যে কত তোমার দান, তাহা বলিয়া কেহ
শেষ করিতে পারে না। যে তঁাহার দান
পাইয়া অস্বীকার করে, সে জানিতে পারিবে
তঁাহার মুখে কিরূপ আঘাত লাগে। তিনি
আপনিই জানেন, যাহা তিনি দিতেছেন।
কেহ কেহ তঁাহার দানের কথা কিছু কিছু
বলিয়া থাকেন। বাঁহার প্রতি তিনি রূপা
করিয়া প্রশংসা ও স্তুতি প্রদান করেন, নানক
বলিতেছেন, তিনিই রাজরাজেশ্বর হ'ন।

২৬

অমূল গুণ অমূল ব্যাপার।

অমূল বাপারিয়ে অমূল তত্ত্বার।

অমূল আবহি অমূল লৈ বাহি।

অমূল তাই অমূল সমাহি ॥

অমূল ধর্ম অমূল দিবাণু।

অমূল তুলু অমূল পরবাণু ॥

অমূল বথ শিসু অমূল নিশাহু।

অমূল কর্ম অমূল ফুরমাণু ॥

অমুলো অমূল আসিয়া ন যাই।

আসি আসি রহে লিবালায় ॥

আখহি বেদ পাঠ পুরাণ।

আখহি পঢ়হি করহি বখ্যান ॥

আখহি বরমে আখহি ইন্দ।

আখহি গোপী তে গোবিন্দ ॥

আখহি ঈশ্বর আখহি সিদ্ধ।

আখহি কেতে কেতে বুদ্ধ ॥

আসহি দানব আখহি দেব।

আখহি হরি নর মুনিজন সেব।

কেতে আখহি আখন পাহি।

কেতে কহি কহি উঠি উঠি যাহি ॥

এতে কেতে হোর করহি।

তা আখি ন সকহি কেই কেই ॥

যে বড়ু তাবৈ তে বড়ু হোই।

নানক জাঠন সাচা সোই ॥

যে কো আখৈ বোলু বিগাডু।

তা লিসিউ দির গাবার গাবাক ॥

অর্থ। সেই পরমেশ্বরের দয়া প্রভৃতি গুণ
অলৌকিক এবং সৃষ্টি-প্রলয়াদি ব্যাপারও
অলৌকিক। তঁাহার নামের ব্যাপারি অর্থাৎ
ভক্তজন অলৌকিক, এবং ভক্তজনের হরি-
নামের ভাণ্ডারও অলৌকিক। জীব-উদ্ধারের
জন্ত তঁাহার ভক্তজনের সংসারে আসা অলৌ-
কিক। তঁাহার ভক্তগণ এই সংসার হইতে
ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম-রূপ অমূল্য পদার্থ লইয়া

যান। ভগবানের প্রতি প্রেম অমূল্য বস্তু; এই প্রেম-দ্বারা অমূল্য সমাধি লাভ হয়। বেদ প্রভৃতিতে তিনি অমূল্য ধর্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আবার আমাদের উদ্ধারের জন্য অমূল্য আচাৰ্য্য ও ন্যায়গণের সহিত মিলাইয়াছেন। সেই আচাৰ্য্যগণের অমূল্য বুদ্ধিরূপ তুলাযন্ত্রে অমূল্য নিৰ্ণয় করিয়া যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহাও অমূল্য। আচাৰ্য্যগণ শিষ্যকে অমূল্য বস্তু লাভ করাইয়াছেন। তাঁহাদের চিহ্ন অলৌকিক। তাঁহাদের কার্য্য অলৌকিক। তাঁহাদের আদেশও অলৌকিক। মহাত্মাদের ব্যাপার সকলই অলৌকিক; তাহা বিবৃত করা যায় না। তাঁহারা ভগবানের গুণ গাহিতে গাহিতে প্রেমে নিমগ্ন হইয়া যান। বেদ আপনাদের মঙ্গল-দ্বারা এবং পুরাণ ইতিহাস-দ্বারা ভগবানের স্তুতি করিতেছে। সাধকগণ বেদ-পুরাণ পাঠ করিয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া ভগবানের স্তুতি করিতেছেন। ব্রহ্মা ও ইন্দ্র সেই পরমেশ্বরের স্তুতি করিতেছেন। গোবিন্দের গোপ-গোপিনীগণ তাঁহারই স্তুতি করিতেছেন। শিব তাঁহার

স্তুতি করেন; শিব মুনিন্দ্র তাঁহারই স্তুতি গান করেন। কত কত বৃদ্ধ তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন। দেবতা এবং দানবগণ তাঁহারই স্তুতি করেন। দেবতা, মল্লিকা, মুনী এবং উপাসকগণ তাঁহারই স্তুতি করেন। কত কত ব্যক্তি এখন তাঁহার স্তুতি করিতেছে এবং কত কত ব্যক্তি ভবিষ্যতে তাঁহার স্তুতি করিবেন। কত কত সাধক তাঁহার স্তুতি করিয়া উত্তম সোকে চলাইয়া গিয়াছেন। কত লোক তাঁহার স্তুতি করিয়াছে এবং কত অসংখ্য লোক তাঁহার স্তুতি করিবে। কিন্তু তাঁহার স্তুতির অন্ত কেহ করিতে পারিবে না। যত অধিক তাঁহার স্তুতি করা হইবে, তিনি তাহা হইতেও মহত্তর হন। নানক বলিতেছেন, সেই সত্য-স্বরূপ নিজেই নিজের স্তুতির অর্থ জানেন। যদি কেহ বলে যে, তাঁহার স্তুতির অন্ত সে জানে, এমন কথা তাঁহার অনিষ্টেরই মূল। যে তাঁহার মহিমার অন্ত নিৰ্ণয় করিতে যায়, তাঁহার বুদ্ধি মর্গ হইতেও মর্গতরের দ্বারা।

(ক্রমশঃ)

ঐজ্ঞানেশ্বরমোহন দত্ত।

পুনি।

যে সুর ঝুঁ, বাজিয়েছিলে
সান্নিধ্য
সে সুর আজি এটো নিখিলে
সজোপনে—
ফুটায় চাকু চাদের হাসি,
ফুটায় ওগো কদম-রাশি,
জাগায় কথা—‘ভালবাসি’
হৃদয়-মনে !

হাওয়ায় তব নিশাস মিলে
করম-মাথা,
অথরে শ্রাম-কদম মিলে
চির হাঁকা !
বিচিত্র হে, গোপন থাকি'
বাঁধবে প্রাণে স্তবের রাশী ?
পাগলা হয়ে ছুঁইব না-কি
গহন বনে ?
ঐশ্বর্য্যস্বনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঝুলন-গীতি ।

ঝুলাবনী সারঙ্গ—দাদরা ।

আভীর-বধু, আভীর-বালা,

ছলবি আয় !

আপ্নি কালা নাগরদোলা

আজ দোলায় !

শাউণ-ঘন গগন ঘিরে-

থাকেই যদি, ভাবিস্ কি রে—

নাচ্ছে শিখী পেখম ধরে

তমাল-ছায় !

• মন্দির বায় অধীর করে,

কদম কেয়া সুবাস হরে—

কাণুর বেণু মোহন সুরে

মন মাতায় ॥

রচয়িতা—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ।

আস্থায়ী ।

II । রা নাঃ -রঃ । না পা -া I না নাঃ -সঃ । সা সা -া I
আ ভা র ব ধু • আ ভী র বা লা •

I । নাঃ -রঃ সা । পা -া -া } I
ছ ল বি আ য •

I । মাঃ -পঃ মা । রা সা -া I রা মা -পা । না সা -া I
আ প্ নি কা লা • না গ র দো লা •

I । নাঃ -রঃ না । সা -া -া } II
আ জ দো লা য •

অন্তরা ।

II { মা পা -া | না না -া I মা মাঃ -রঃ | না মা -া I
মা ও ন ঘ ন . গ গ ন ঘি রে .

I না মাঃ -রঃ | মা রা -া I মা রাঃ -মঃ | না পা -া I
ধা কে ই ষ দি . ভা বি ন কি রে .

I { মাঃ -ঃ পা | না পা -া I মা পা -মা | রা রা -া I
না চ্ ছে শি থী . পে থ ন ধ রে .

I মা রা -না | মা -া -া II
ত মা ল ছা য .

সংকারী ।

II { মা রাঃ -ঃ | না মা -া I পা নাঃ -ঃ | মা রা -া I
ম দি র বা য . অ ধী র ক রে .

I মা রাঃ -ঃ | মা পা -া I মা রাঃ -মঃ | রা মা -া I
ক দ ম কে রা . অ বা স হ রে .

I { মা পাঃ -ঃ | না মা -া I রা মাঃ -রঃ | মা মা -া I
কা গু র বে গু . মো হ ন শু রে .

I নাঃ -মঃ না | পা -া -া III
ম ন মা তা য .

জাহাজ-ডুবিলি।

(৪)

বৈশাখের মধ্যাহ্ন। রৌদ্রতপ্তা ধরণী ঝাঁঝী করিতেছিল। দূর বৃক্ষরাজি হইতে ঘুঘুর ককণ কণ্ঠধর শ্রুত হইতেছিল। মাঝে মাঝে এক একটা কাক “কা কা”-রবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে আনন্দমত্ত ভাবে হাঁ করিয়া গৃহপ্রাচীরে বা বৃক্ষশাখায় আশ্রয় লইতেছিল। উচ্চ বৃক্ষশাখায় বসিয়া চাতক ‘ফটিক জল’ ‘ফটিক জল’ বলিয়া ককণকণ্ঠে আঠনান করিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু নির্দয় জলধর তাহার পিপাসা-নিবৃত্তির কোন ব্যবস্থাই করিল না! জগতের নিয়মই এই। ভিক্ষুর কাতর প্রার্থনায় ধনী বদির হইয়া থাকে। ধনীর দ্বারে কেবল ‘দাঁও’ ‘দাঁও’ করা বাতুলতামাত্র। এ সময়ে পল্লী-পথে লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ। দৈবাৎ দুই একটা হুস্ত বালক আম-তলায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল, এবং চিল ছুড়িয়া কাঁচা আম পাড়িয়া ভক্ষণ করিতেছিল; আবার পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া শেষে হাতা-হাতি পর্যাণ্ড করিতেছিল। যে হারিয়া গেল সে কাঁদিতে কাঁদিতে “বাড়া গিয়ে মাকে বলে দিইগে” বলিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া গ্রহান করিতেছিল। এই সময়ে আমাদের অমরকুমার একথানা ‘শোকা’র উপর অর্জনায়িত অবস্থায় বসিয়া ছিলেন। তাহার পার্শ্বে বসিয়া আশালতা একথানা রম্যবংশ পাঠ করিতেছিল। অমরকুমার নিবিষ্টাচক্ষে তাহা স্তব্ধিত হইলেন, এবং যেখানে যেখানে বাধিয়া বাইতেছিল, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া আশালতাকে বুঝাইয়া দিতে-

ছিলেন। ঐশ্বর্য্যতিশয়া-হেতু কক্ষের বাতায়ন-গুলি সমস্তই বন্ধ করিয়া সিন্ধু খস্পলের আবরণে কক্ষটি বেশ সিন্ধু ছিল। বারান্দায় বসিয়া জনৈক ভৃত্য টানাপাখার দড়ী ধরিয়া পাখা টানিতেছিল। মাঝে মাঝে অমরকুমার অগম্যমানে কি চিন্তাও করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাহার প্রিয়ভৃত্য কানাই কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া আনত হইয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল। অমরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রে, খবর কি?”

কা। আজ্ঞে বাইরে একজন লোক এসে আপনাকে খুঁজ্চে।

অ। আমাকে?

কা। আজ্ঞে হ্যাঁ!

অ। কি রকম লোক? - ভদ্রলোক?

কানাই একবার উপর দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, “আজ্ঞে তা আমি বলতে পারব না!”

অমরকুমার হাসিয়া বলিলেন, “বলতে পারবি না কি রে?”

কানাই বলিল, “তা আমি কেমন করে বলবো?”

আশালতা হাসিতে হাসিতে বলিল, “তুই দেখে এলি, তুই বলতে পারবি না, ত’ কি আমি বলব? - ভদ্র লোক কি, ছোট লোক এটা আর চিনিম্ না?”

কানাই বলিল, “মাগো, তাকে দেখে চেনা আমার বাবারও সাধ্য নেই!”

কানাইয়ের হাত মুখ নাড়া দেখিয়া আশালতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

অমরকুমার সহাস্যে বলিলেন, “কেন বল দেখি?”

কানাই পূর্ববৎ ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল, “কি দেখে চিনব, বলুন? চেহারা? —পোষাক? না কথার? গায়ের রংটা তো তার আমার চেয়েও একপোঁচ কাল বার্নিশ করা, চোখ ছোটো রাঙ্গা জবার মতন টুক টুক কছে, মাথার চুলগুলো আংল সহিসের মতন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বড় বড় মুলোর মতন দাঁত। চিম্ড়ে হাড়গুলো জির জির করছে। মুখময় বসন্তের দাগ। এই তো গেল চেহারা। তারপর পোষাক। —গায়ে একটা আধময়লা জামা, কাপড়খানা কালো চিরকুট; উড়ুনি-খানা কিছু ধপ ধপে ফর্সা; পায়ে এককোড়া ছেঁড়া শতেক তালি দেওয়া জুতোও আছে। বাবু বুক ফুলিয়ে মস মস করে বৈটকখানার বসে পড়ল! আমি তো প্রথমে মনে করেছিলুম, ব্লি, পাগল ফাগল হবে! তারপর তার কথা শুনেই তো আকৈল গুড়ম! ব্যাটা যেন লাটসাহেব! চেয়ারে বসে মুকুবিব-আনা চালে আপনার নাম করে বেরে-বাড়ীতে আছে?” আমি বল্লুম, “আগে হ্যাঁ, আছেন!” উত্তর হল, তাকে একবার ডেকে দে! সেই হুকুম নিয়েই ত ছুটে আসছি, এখন আপনাই বিবেচনা করুন, সে কি রকম লোক?”

অমরকুমার হাসিয়া বলিলেন, “ব্যাটা আমার গোপাল ভাঁড়! হাসিয়ে হাসিয়ে মারলে! দেখি, লোকটা কে এল, কি বলে।” বলিয়া তিনি বহিষ্কৃতিতে চলিয়া গেলেন; গিয়া দেখিলেন কানায়ের বর্ণিত

লোকটা ভদ্র লোক কি না অমরকুমারই চিনিতে সমর্থ নহেন। তিনি যুগ্মকাল শুরু হইয়া রহিলেন। কি বলিয়া তিনি লোকটিকে সম্বোধন করিবেন, তাহা হঠাৎ খুজিয়া পাইলেন না। তিনি কিং-কর্ডব্য-বিমুঢ় হইয়া কক্ষমধ্যে নিকাগুভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আগন্তুকই আগে কথা কহিল। সে তাহার করণ কণ্ঠস্বর স্বাভাৱ্য নম্র করিয়া বলিল, “আপনিই কি জমীদার উপেন্দ্র-কিশোরবাবুর পালক পুল অমর কুমার?” এই শিষ্টাচার-রহিত নীতিবিরুদ্ধ প্রথম আলাপে অমরকুমার কিছু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি সে-ভাবে প্রকাশ না করিয়া কেবলমাত্র বলিলেন, “হ্যাঁ। আগন্তুক একখানা চেয়ার দেখাইয়া বলিল, “বসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।” অমরকুমার কোড়ুহলা-ক্রান্ত হইয়া তাহার নির্দেশ মত চেয়ারে বসিয়া সন্ধ্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আগন্তুক পকেট হইতে একখানা সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া একটা বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ দেখাইয়া বলিল, “আপনিই কি এই বিজ্ঞাপন দিযেছিলেন?” অমরকুমার বলিলেন, “হ্যাঁ।” আগন্তুক কাগজখানা পাট করিয়া পূর্ববৎ পকেটে রাখিয়া বলিল, “আমিই সেই উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে অমরকুমার।”

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া অমরকুমার বলিয়া উঠিলেন, “বলেন কি!”

আগন্তুক দৃঢ়স্বরে বলিল, “হ্যাঁ। আশ্চর্য্য হচ্ছেন যে?”

অমরকুমার নিম্নেক সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, “আপনা সঙ্গে আমার তো কোন

দিন চাকুর্য পরিচয় নেই, কাজেই আমি আপনাকে চিনি না। আপনি যে তাঁর ছেলে, তাঁর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতে পারলেই আমরা সন্তুষ্ট হব।”

আগন্তুক দক্ষিণ পদের পাতুকা খুলিয়া পাতাভূমী গণিয়া অমরকুমারকে দেখাইয়া বলিল, “এই দেখুন প্রথম নিদর্শন—আমার পায়ে ছ’টা আঙ্গুল—”

অমরকুমার বলিলেন, “একটু অপেক্ষা করুন, জেঠা-ম’শাইকে ডেকে পাঠাই আসে।”

বিরক্ত হইয়া আগন্তুক বলিল, “আঃ—বিষয় তো তুমি দখল কোচ্ছ! বোঝাপড়া তো তোমার সঙ্গে হবে। তা জেঠামশাইকে আবার কেন? জেঠামশাইটে আবার কে?”

অমরকুমার বলিলেন, “জেঠামশাই হচ্ছেন দেওয়ান। সকল বিষয়ে তিনিই হচ্ছেন কর্তা, আমি তাঁর আজ্ঞাবহমাত্র।” এই বলিয়া অমরকুমার কানাইকে ডাকিয়া রাধাগোবিন্দবাবুকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। কিছু পরে রাধাগোবিন্দবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাধাগোবিন্দবাবুকে দেখিয়া অমরকুমার বলিলেন, “জেঠামশাই, ইনিই হচ্ছেন আজিমগঞ্জের জমিদারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।”

রাধাগোবিন্দবাবু তাঁহার কোটের পকেট হইতে চশমা-জোড়টা বাহির করিয়া বসনাগ্রজ্ঞাপ দ্বারা তাহা মুছিয়া চক্ষে পরিয়া ভাল করিয়া আগন্তুকের মুখখানা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া গভীরভাবে বলিলেন, “এর চৌদ্দ পুরুষেও কেউ উপেন্দ্রকিশোর বোসের বংশে জন্মায় নি।”

কুহু হইয়া আগন্তুক বলিল, “তুমি

চাকর, চাকরের মতন থাক। বোঝাপড়া তোমার সঙ্গে নয়।” আগন্তুকের কথা শুনিয়া অমরকুমার লজ্জার সঙ্কট হইয়া পড়িলেন। ঠাহাকে তিনি পিতার জায় সম্মান করিয়া থাকেন, উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্ররূপী আগন্তুক যে আগমনমাত্রে তাঁহাকে এরূপ অবমাননা করিতেছেন, তাহাতে অমরকুমার দুঃখিত হইলেন। রাধাগোবিন্দবাবু যুহু হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, আমি চাকর বটে, তবে তোমার বাপের নয়।” অমরকুমারকে দেখাইয়া বলিলেন, “এঁর বাপের।”

অমরকুমার মস্তক নত করিয়া কক্ষতলে দৃষ্ট-স্থাপন করিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন। আগন্তুক ক্রোধে গর্জিতে গর্জিতে বলিল, “আচ্ছা, বেখা যাবে কাঁ’র বাপের! আমার বাপের খেয়ে বুড়িয়ে গেছ, আজ আমার শ্রদ্ধতা কর্তৃত্ব এলে! যে বিষয় ষাচ্ছে তার কাছে বুঝে নেব। তুমি মধ্যস্থতা করবার কে?”

অমরকুমার বাধা দিয়া বলিলেন, “অনর্থক মানী লোককে অপমানিত করবেন না। বিষয় বুঝে নিতে হলে, ওঁর কাছ থেকেই নিতে হবে। আমি ত বদুখ, আমি কিছুই জানি না।”

আগন্তুক পূর্ববৎ ক্রোধে গর্জিতে গর্জিতে বলিল, “আচ্ছা বেশ! বিষয় ছেড়ে না দাও, আদালত খোলা আছে।”

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “বেশ, সেই পথই দেখ।”

তেমনি ভাবেই গর্জিতে গর্জিতে আগন্তুক বলিল, “এতদিন কাঁকি দিয়ে বিষয় ভোগ করে বুক বেড়ে গেছে কি-না! তাই ছাড়তে মন কেমন করছে, এখন! নয়?”

অমরকুমার তাহাকে শাস্ত করিবার বলিলেন, “আপনি অস্বাস্থ্য বলছেন। বিষয়ে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নেই! তা যদি থাকত, তা হ’লে আর আমি ইচ্ছা করে ডেকে বিষয় দিতে চাইতুম না। আমি যে তাঁর পুত্র নই তা তিনি ঘুণাকরেও কোনও দিন কারও কাছে প্রকাশ করেন নি। আমি কোনও বিশ্বস্তপুত্রে অবগত হই যে, আমি তাঁর ঔরস-জাত পুত্র নই; তাঁর পুত্র শৈশবে অপহৃত হয়েছেন। তিনি পুরস্কৃত বিদ্যুত হ’বার জন্যে আমাকে প্রতিপালন ক’রে আমাকেই সর্বস্ব দিয়ে বান্। আমিই মনঃস্থ করেছি, যদি তাঁর ঔরসজাত পুত্রকে পাওয়া যায়, তাহলে তাঁকে সর্বস্ব দিয়ে যাব। আপনি যে প্রকৃতই তাঁর পুত্র, তাঁর সম্ভোগজনক প্রমাণ দিন, নইলে অমনি মুখের কথা বলছি ত হবে না।”

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “অমর, তুমি কৈপেছ? এই চোরাডু অস্বাস্থ্য বঁটে, কালো ভূতটা উপেক্ষাকিশোরবাবুর ছেলে!! সত্যই যদি তুমি উপেক্ষাকিশোরবাবুর ছেলে না হও, তা হলে তাঁর যে ছেলে ছিল, সে ছেলে ঠিক তোমারই অনুরূপ। তোমারই মতন অমনি ঢলঢলে মুখের উপর তার উজ্জ্বল ছ’টা চোখ ছিল। সে তো আর হ’মাসের ছেলে হারায় নি? তাকে সাত বছরের দেখেছি। তোমারই মত আকৃতির সৌসাদৃশ্য বলে আমরা কোন দিন বুঝতে পারি নি, এবং এখন পর্যন্ত বুঝতে পারি না যে, তুমি সত্যিই সে অমর নও। এ তোমার একটা খেরাল। এ একটা প্রায়েলিকা বলে আমার মনে হচ্ছে। আমার এতখানি বেয়স হ’ল, মাথার চুল পাকল, এমন রক্ত আমি জীবনে কখনও শুনি নি। বাই

হোক, তা বলে এই চোরাডু লোকটাকে তুমি উপেক্ষাকিশোরবাবুর ছেলে মনে করো না।”

অমরকুমার জনান্তিকে রাধাগোবিন্দবাবুকে বলিলেন, “জ্যোতীশ শাহ, দুঃখ-দৈন্তের মধ্যে পড়লে মানুষের আকৃতি ত খারাপ হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া বসন্তরোগ মানুষের সৌন্দর্যকে একেবারে নষ্ট করে দেয়। আর লেপা-পড়া না শিশে নীচ সংসর্গে বাস করলেও ত ভদ্রলোকের প্রকৃতি নীচভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব।”

রাধাগোবিন্দবাবু অমরকুমারের কথার কোনও উত্তর না দিয়া আগন্তুককে বলিলেন, “আচ্ছা বাপু, তুমি যে উপেক্ষাকিশোরবাবুর ছেলে, তার প্রমাণ দেখাও।”

আগ। কি প্রমাণ দিতে হবে, বল।
জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর দিচ্ছি।

রাধা। উপেক্ষাবাবুর ছেলে চুরি গেছে—
সে তো আজ পচিশ বছরের কথা, এতদিন তুমি আস নি কেন?

আগ। বাড়ীর ঠিকানা ভুলে গেছলুম।

রাধা। তার পর বিজ্ঞাপনটা দেখে বুঝি মনে পড়ে গেল?

রাধাগোবিন্দবাবুর প্রেরণাক্ষে আগন্তুক ক্রোধে গর্জিয়া উঠিল, “ঠাট্টা কচ্ছ কি? আমি যখন এখান থেকে গেছলুম, তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ, সে-সব কথা কি আর মনে থাকে!

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “তবে হঠাৎ আজ কি করে মনে পড়ল?”

আগন্তুক অপেক্ষাকৃত নম্রভাবে বলিল, “কাগজে আমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা রয়েছে, দেখেই সব মনে পড়ে গেল।”

রাধা। এতদিন কোথায় ছিলে?

আগ। তার কি আর ঠিক আছে? আমি পনেরো বোল বছর পর্যন্ত চোরদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিচি। তারা আমাকে এক দণ্ডের জন্তেও ছেড়ে দিত না। সর্বদা চোখে চোখে রাখত। চাকরদের মতন খাটিয়ে নিত। তার পর অনেক ক'রে একদিন জ্বাংগ পেয়ে আমি পালিয়ে আসি।

রাধা। পালিয়ে যখন এলে, তখন কোথায় থাকতে?

আগ। তার কি ঠিক আছে? পথে ঘাটে গাছতলার খেঁচানে হোক পড়ে থাকতুম, ভিক্ষে করে খেতুম। তারপর কুলিগিরি মুটেগিরি পর্যন্ত করেছি।

অমরনাথের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি লমবেদনার স্বরে বলিয়া ফেলিলেন, “আহা!”

রাধা। তুমি হঠাৎ নিকদ্দেশই বা হলে কেন?

আগ। আঃ আমার কপাল! আমাকে চোরে চুরি করে নিয়ে গেছিল, আমি কি আর সাধ করে গেছলুম?

রাধা। কেন তোমাকে চোরে চুরি করে নিয়ে গেছিল?

আগ। আমার গলায় খুব দামী একছড়া হীরের হার ছিল কি-না, সেই লোভে। আমি যখন বাবার সঙ্গে নোয়াখালিতে যাই, সে-কথা আমার বেশ মনে আছে, তখন জো আর আমি নিতান্ত কচি থোকা নই। আমার বয়স তখন সাত বছরের। আমার একটা বুড়ো চাকর ছিল, সেটার নাম শঙ্কর। তার সঙ্গে আমি রোজ বেড়াতে যেতুম। তার পর হ'ল কি না, একদিন ইয়ে যে—

অমরকুমার জনান্তিকে রাধাগোবিন্দ-বাবুকে বলিলেন, “তবে জোঠামশাই, এ সত্যিই তাঁর ছেলে। এই যে শঙ্করের কথা বলছে। আমি তো শঙ্করের কোন কথা বিজ্ঞাপনে লিখি নি।”

রাধাগোবিন্দ বাবু বলিলেন, “চূপ কর না, শোন না কি বলে!”

আগন্তুক বক্র দৃষ্টিতে একবার উভয়ের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শেষ করিল—
“আমার গলায় সেই হার দেখে দুটো চোরের খুব লোভ হয়। হার চুরি করবার জন্তে তারা তর্কে তর্কে ফিরতো। আমাদের পেছনে পেছনে ঘুরত। কিন্তু বুড়ো শঙ্কর আমাকে এমন ভাবে আগলে নিয়ে বেড়াতে যে তারা কিছুতেই আমার গলা থেকে হার নিতে পারত না। তারপর হল কি, একদিন ইয়ে যে,—আমরা বেড়াতে বেড়াতে সহর ছাড়িয়ে মাঠে গিয়ে পড়লুম। মাঠে একটা মস্ত পদ্মপুকুর ছিল। আমি ছেলে-বেলায় পদ্মপুকুর বড় ভাল বাসতুম। বুড়োকে বলতেই বুড়ো আমাকে পুকুরের পাড়ে দাঁড় করিয়ে জলের ধারে গিয়ে একটা বাস দিয়ে পদ্মফুলের একটা দল টেনে আনবার চেষ্টা করতে লাগল। আর সেই অবসরে কোথা থেকে চোর-দুটো এসে আমাকে কোলে করে নিয়ে ছুটে পালাতে লাগল। আমি বুড়োকে ডেকে চিৎকার করে কেঁদে উঠলুম। তারা আমার মুখে একটা কপাল চাপা দিয়ে ধরলে, বাস! আমি অমনি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। আর আমার কিছুই মনে নেই। এখন বুঝতে পাচ্ছি, সে-কমালে ‘ক্রোরোফরম’ সাধানো ছিল।”

করিয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “তার পর কি হ’ল?”

আগ। তারা আমাকে নিয়ে কত জায়গায় বেড়াতে লাগল; কখন খুব বনের ভিতর থাকতো, কখনও ভাঙ্গা পড়ো বাড়ীতে আমাকে লুকিয়ে রাখত; আমি খুব কাঁদতুম বাবার কাছে পৌঁছে দিতে বলতুম। কাঁদলে পরে তারা আমাকে কেটে ফেলবে বলে ভয় দেখাতো। আমি যখন গোল সতের বছরের ছলুম তখন তারা একটা সন্ন্যাসীর কাছে বেচে কেলে। সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে ঘেন হাপ ছেড়ে বাচলুম। একদিন সন্ন্যাসী আমাকে এক জায়গায় বসিয়ে ভিক্ষে করতে গেল, আর আমি সেই অবসরে চম্পট দিলুম।

রাধা। তোমার গলার সে হার কি হ’ল!

আগ। তা’ বলতে পারি না। বোধ হয়, যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম, তারা খুলে নিয়েছিল।

রাধা। যখন পালিয়ে এলে, তখন পুলিশের আশ্রয় নিলে না কেন? তখন উপেন্দ্রকিশোরবাবুও বেঁচে ছিলেন। পুলিশের কাছে সব খুলে বললেই পুলিশের লোক তোমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যেত, চোরও এত দিন ধরা পড়ত।”

পুলিশের নাম শুনিয়া আগন্তুক চমকাইয়া উঠল; বলিল, “ও,—বাগ রে! আমি তখন ছেলেমানুষ, তত সাহস কি আমার তখন ছিল? তা ছাড়া পুলিশের লোকের কাছে গেলে পরসার দরকার! আমি ভাকড়া-পর্য্যন্তিকিরি, পরসার কোথায় পাবো?

রাধা। আজিমগঞ্জের ভূমিদারের ছেলের পরসার অতাব হোত না। উপেন্দ্রকিশোর-

বাবুর ছেলে বলে পরিচয় দিলে পুলিশের লোক তোমাকে যত্ন করে এখানে নিয়ে আসত।

আগন্তুক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “ঐ যে বল্লম, তত বুদ্ধি কি আমার তখন হয়েছিল?”

অমরকুমার এত ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। এখন বলিলেন, “সে কথা ঠিক! মানুষের অন্ন বয়সে বুদ্ধিরও অন্নতা থাকে।”

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “আচ্ছা, তোমার সে বুড়ো চাকরটার কি হ’ল, জান?”

আগ। না, আমাকে তারা চুরি করে নিয়ে এল। বুড়োর কি হ’ল তা আমি কেমন ক’রে জানব?

রাধা। আচ্ছা, যারা তোমাকে চুরি করে নিয়ে গেছে, তাদের দেখলে চিন্তে পারবে?

আগন্তুক আবার যেন চমকিয়া উঠিল; আমতা আমতা করিয়া বলিল, “এখন? এখন তাদের কোথায় দেখতে পা’ব?”

রাধা। যদি কণা বলছি। যদি দেখতে পাও, তা হলে চিন্তে পার কি?

অভিতবরে আগন্তুক বলিল, “তা বোধ হয়, পারি; বোধ হয় পারি না।”

রাধাগোবিন্দ বাবু বলিলেন, “বোধ হয় পারি, বোধ হয় পারি না—কি-রকম কথা? তুমি ত অনেক দিন তাদের সঙ্গে ছিলে; তারা অবশ্যই তোমার বেশ চেনা হয়ে গেছে।”

আগ। তা হলেও আমি অনেক দিন তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি, এখন আর কেমন করে—কেমন করে চিন্তে পারব?

রাধাগোবিন্দবাবু ও অমরকুমার কক্ষ-
দ্বরে গিয়া অনেক কণ ধরিয়া পরামর্শ করিতে
লাগিলেন। আগন্তুক যে উপেন্দ্রকিশোর-
বাবুর পুত্র সে-বিষয়ে অমর কুমারের মনে
আর কোনও সন্দেহ রহিল না। রাধা-
গোবিন্দবাবু কিছু হির করিতে না পারিয়া
“আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি”
বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছু পরে
তিনি উকিল চন্দ্রশেখরবাবুকে সঙ্গে করিয়া
আনিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়ে
কার্খোপলক্ষে ডাটেকটিভ বিজ্ঞানকুমারবাবুও
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রশেখরবাবু
অতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, বহুদর্শী উকিল। তিনি
আসিয়া আগন্তুককে অনেক কথা জিজ্ঞাসা
করিলেন, অনেক ছেরা করিলেন, আগন্তুক
সকল কথাই ঠিক ঠিক উত্তর দিল। কিন্তু
বিজ্ঞানকুমারবাবু একটা কথাও বলিলেন না।
তিনি কেবল কথাগুলি শুনিতে ছিলে। চন্দ্র-
শেখরবাবু অমরকুমারকে অন্তরালে ডাকিয়া
লইয়া গিয়া বলিলেন, “লোকটার প্রতি কি
তোমার কোনও সন্দেহ হয়?”

অমরকুমার বলিলেন, “না, আমার তো
কোনও সন্দেহ হয় না। লোকটা ত সকল
কথারই ঠিক ঠিক উত্তর দিয়াছে। তবে
চোঁরা কথার যদি বলেন, সেটা সম্বোধে
আকৃতি ও প্রকৃতি সবই বিকৃত হইতে পারে।

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “আমার কিন্তু
মনে হয়, লোকটা পাকা জুয়োচোর। কোন
রকম করে একথা শুনে সংগ্রহ করেছে—
বিজ্ঞানবাবু কি বলেন?”

বিজ্ঞানকুমার অতিবিনীত ভাবে বলি-
লেন, “আজ্ঞে, আপনাদের বিজ্ঞ বহুদর্শী বিশ্লেষণ

ব্যক্তি, আপনাদের চেয়ে আমার কি বিবেচনা
শক্তি বেশী!

চন্দ্রশেখরবাবু অমরকুমারের দিকে
চাহিয়া বলিলেন, “খাই বল বাপু, রাবণের
রাঙ্কই বানরে লুঠ করবে! এ যদিও সেই
উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে হয় আগাগোড়া
অসংসদে বাস করে এর গুণ যা হয়েছে,
তা ওর কথাবার্তা আর চোঁরা দেখেই
বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু তুমি যা করে
কেলেছ তার তো আর কোনোও উপায়
নাই! যে রকম চোঁরা চোঁরা কথা বলছে,
এ যদি এখন আদালতের আশ্রয় নেয়, তা হলে
ওই জিত হবে দেখতে পাচ্ছি। তাড়াতাড়ি
তোমার বিজ্ঞাপনটা দেওয়া ভাল হয় নি।”

যাহা হউক সকলে মিলিয়া বাতায়বাদের
পর আগন্তুককে উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্র
বলিয়াই বিবেচিত করিলেন। অমরকুমার
তখন তাহাকে সাদরে বাটীর মধ্যে লইয়া
গেলেন। চন্দ্রশেখরবাবু এবং বিজ্ঞানবাবু
চলিয়া গেলেন। রাত্রিতে আহাতিদির
পর অমরকুমার আগন্তুকের সহিত বহুক্ষণ
ধরিয়া বৈষয়িক কথাবার্তা এবং গল্প গুজব
করিতে লাগিলেন; শেষে বলিলেন, “এত
দিন পরে আপনাকে দেখে বড় সুখী হলাম।
আপনার সম্পত্তি আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে
আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কাল আমি এখান
থেকে চলে যাব।”

আগন্তুক কহিল, “না না, যাবে কেন।
খাই হোক, আমার বাপ তো তোমাকে
এতদিন খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছে
তোমায় একটা বিলি আমি করে দোষ
থাক না তুমি। খাই হোক তুমি সম্পর্কে আমার

এক রকম ভাই হচ্ছে। তাঁরি ছেলে ত পড়া শিখেছ, তবে আর তোমার ভাবনা
আমি, এতটা অধ্যর্থ আমি কর্বে। কি?"
না।"

মুহু হাসিয়া অমরকুমার বলিলেন, আপ-
নার অহুগ্রহে মুগ্ধ হলাম। কিন্তু তার কোনও
দরকার নেই আমার মহামুভব প্রতীপালক
আমাকে যা ছ' কলম লেখাপড়া শিখিয়েছেন,
তার দ্বারা আমার যা হোক করে চলে
যাবে।

মাথা নাড়িয়া আগন্তুক বলিল "হ্যাঁ, স্যা,
তা বটে! তা বটে! তুমি অনেক লেখা-

অমরকুমার নিম্ন শয়ন-কক্ষে শয়ন
করিতে আসিলেন। মনটা কিছু চিন্তাযুক্ত,
কিন্তু প্রসন্ন! তাঁহার মনে হইতে লাগিল
তাঁহার মস্তক হইতে যেন একটা গুরু কণ্ঠ-
বোর বোঝা অপস্থত হইয়া গেল। চিন্তিত
এই ভ্রম যে, কাল এখান হইতে বাহির হইয়া
কোথায় যাইবেন, কেমন করিয়া একটা চাকরি
বাকরি ঘুটাইয়া লইবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা
নাই। (ক্রমশঃ)

ঐচাকরীলা মিত্র।

গান।

যখন যাহা পাস্ রে দান,
নিস্ রে ও মন! অবিচারে;
যা আছে তোর ভাগ্যে লেখা,
খণ্ডিতে তা' কেউ না পারে!

তুই রে ছিলি রাজার ছেলে,
সিংহাসনের অধিকারী,
ধন্য হ'ত বিশ্বভুবন
পেলে রে তোর রূপাবারি!

আজ রে সব হেলায় ছেড়ে
দাঁড়ালি তুই সবার দ্বারে,
সাজে কি তোর মানাভিমান,
নাই-ক জোর আর ত কারে'!

আপন ভাবে আপনি চল,
গুরে পাগল! সৃষ্টিছাড়া!
বান্দন যদি টুটেই থাকে,
ফেলিস্ নে রে অশ্রুধারা!

সুখের স্বাধ অনেক পেলে,
হুগথে এবার পরণ কবু;
ফুলের মালা আসলি ফেলে,
বস্ত্র নয় মাথায় ধবু।

সকল কিছু ছ' দণ্ডেরি,
মিলাবে সব অন্ধকারে,—
ভাবনা তবে কিসের তরে?—
ভুব দে মন! কাল-পাথারে!
ঐজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

একখানি পত্র।

কলিকাতা

৩১/৩/২০

কল্যাণীয়ে!

তুমি আমাকে মাতৃস্থানীয়া মনে করে মন খুলে প্রাণের কথাগুলি লিখেছ, তা'তে আমার কত আনন্দ হইয়াছে! তোমার তাতে প্রগল্ভতা হয়েছে মনে করিতেছ কেন? তোমরা যদি সত্যই মনে কর, আমার বিশ্বাস-ভক্তি-লাভ হইতেছে, তবে তো আমাকে আরও বেশী করে মন খুলে তোমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী করে নেওয়া উচিত।

তবে দেখ, লাক্ষসমাজ-আমাদের কত বড় একটা উচ্চ জিনিষ দিয়াছেন! পরব্রহ্মের রূপায় ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইয়া আমরা শিক্ষা, স্বাধীনতা, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি অনেক সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি; আবার আত্মার অমরত্ব ও পরলোকে উজ্জ্বল বিশ্বাস লাভ করিলাম। বাল্যকাল হইতে 'মৃত্যু' একটা ভয়ানক ব্যাপার—এ-কথা শুনে শুনে মৃত্যুর করাল ছুঁই মনের সম্মুখে আগিত; কিন্তু ঈশ্বর-প্রসাদে অশানের ভিতর দিয়া গমন করিয়া মৃত্যু যে প্রকৃতই অমৃতের সোপান, সেই বিশ্বাস লাভ করিলাম। আমার প্রিয়—জীবন্ত, চিরন্তন, অক্ষয় ও অবিনাশী। অশান তাহাকে বিনাশ বা ধ্বংস করিতে পারে না, এবং তিনি আমার অতি-নিকটে নিত্যকাল থাকিবেন ও রয়েছেন।

প্রিয়তম পুত্রকে অশানে বিসর্জন দিয়া আবার যখন ভগবৎ-করুণায় তাঁকে সত্য চিরন্তন, জীবন্ত, চিরময় সত্তারূপে বুকের

অতিনিকটে পেলাম, তখন সেই পাওয়ার পর-লোক আমার নিকট জাগ্রৎ হইল। এই জাগরণে সন্তানের সঙ্গে নিত্যযোগ আরম্ভ হইল। যোগে যোগ ক্রমশই বিস্তৃত হইতেছে। আজ স্বামীর সঙ্গেও সেই শুদ্ধযোগে যুক্ত থাকিয়া বীতশোক ও বিগতক্লেশ হইতেছি; এবং আপনি আপনার স্থখে তৃপ্ত না থাকিয়া ক্লিপ্তপে দীন ভগিনীদিগের নিকট এই শুদ্ধসমাচার ব্যক্ত করিতে পারি, তজ্জন্ত ভগবৎ করুণা ভিক্ষা করিতেছি।

কল্যাণীয়ে! তোমরাও যোগের পথ ধরিয়াছ। তোমাদের সম্বন্ধে আমি খুব আশাবিত্ত আছি। তোমাদের ব্যাকুল ক্রন্দন নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে না। আরো শ্রদ্ধা দেও, আরো পবিত্র ও সুন্দর হও। আরো অকপট শুদ্ধ হৃদয়ে তিনি পুত্র হইতেও প্রিয় হইয়া সময়ে প্রকাশ পাইবেন। তাহাকে ডাক, দেখিবে, দরাময় ঈশ্বরের প্রসাদে যথাসময়ে যথাবিধানে শ্রিয়ের দ্বারা সুরক্ষিত সন্তান কত সুন্দর হইয়া স্বর্গের বার্তা লইয়া তোমাদের হৃদয় আলোকিত করিয়া দিয়া যাইবেন। এখন যে একাকিদের ক্লেশ অসহনীয় হইতেছে, তাহা চলিয়া যাইবে, হারাণের ক্লেশ ঘুচিয়া গিয়া এমন নিশ্চিত ভাব, এমন জীবন্ত সত্তার আবির্ভাব—এমন পূণ্য-প্রেমের শুদ্ধ পরশ লাভ হইবে, যাহা “বলিতে বচন হারে, কে বাখানে ভায় রে।”

আহা, শোকতাপিত জনকে আর কে এমন করে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও আনন্দ দিতে পারে? ঈশ্বর করুন তোমাদের এই নিশ্চিত শান্তি লাভ হউক।

ভদ্রাকাঙ্ক্ষিনী
তোমার মামীমা।

বিশ্ব-জাগরণ।

আজ একি অমূল্যভূতি! যে ধারে নয়ন মেলি, দেখি বিশ্ব জাগ্রৎ,—সর্বত্রই জাগরণের পালা। তবে আমি কি কেবল সুপ্ত এ জাগরণের মাঝে? হে চিরস্থম্বর! তোমার সৌন্দর্য্য নয়ন মেলে দেখি, কিন্তু তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না কেন? ওই তো জাগরণের সাড়া—ঐ যে প্রভাতে নবোদিত রবির অংশুর বিকাশ—তাহা তোমার জাগরণে জাগ্রৎ; ঐ যে বিহগের কাকলীধ্বনির বন্দনাগীতি প্রভাতী-রাগে, তাহাও তোমার জাগরণের সঙ্গীত; ঐ যে পুষ্পনিচয় শাখা-পরে সকল অঞ্জলি তোমাকে প্রদান করে, সেও জাগ্রৎ; ঐ যে পবন গতিশীল হইয়া কোন্ অজ্ঞাতপুরে বহে যায়, সেও জাগ্রৎ; ঐ যে উষ্মমালা বারিধি-বক্ষে নানা ভকীতে জ্বীড়া করে, সেও জাগ্রৎ; আর ঐ যে সাদ্ধা তিমিরে ধূসরিতা ধরণী, সেও জাগ্রৎ; নিশীথে তারকার দামে সজ্জিত গগন-পালায় চক্ৰমার দীপ্তি, তাহাও জাগরণের পরিচায়ক। আমার নয়ন মুদিত নাই, ভাষা মুখর, শ্রুতি উন্মুক্ত, তবে কেন আমি জাগ্রৎ নই? কোথায় জাগ্রৎ আমি! তোমার বাহ সৌন্দর্য্য দেখি মাত্র! ভিতরের সত্তার বোধ নাই কেন? নবোদিত রবির অংশুতে যে তোমার রূপের বিকাশ, বিহগের গীতিতে তোমার উদ্দেশ্যের স্তুতি, কই সে ভাষা তো বুঝি না! কুহমে তোমারই কোমলতার প্রকাশ, তাহাও দেখি না; পবন নিরন্তর যে তোমার বার্তাবহ—অজানা পুরের দুত, তাহাও জানি না; তরঙ্গতরঙ্গের ধ্বনিতে

তোমার গৌরব প্রতিশব্দে উচ্চাতির হইতেছে, তাহাও ত শুনিতে পাই না! তারকার দাম যে তোমারই মন্দিরের দীপাবলি, চন্দ্রিকার আভা যে তোমারই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল কাছির ভাতি—তাহাও জানি না! তবে কেমন করিয়া জাগ্রৎ আমি? তোমার যোগ কোথায়, তাই জানি না। হে মোর দেবতা, তবে যুগর ভাষাকে নীরব কর, শব্দ-শক্তিহীন করে বধির কর, নয়ন নিমৌলিত কর, স্পন্দন-চেতনা-রহিত কর, তবে যদি আমি জাগ্রিত হই! আমার সকল অঙ্গ জাগ্রৎ থাকিতেও যখন আমি সুপ্ত, তখন তাহাদিগকে সুপ্ত করে আমাকে জাগ্রৎ কর।

* * * *

আজ আমি জাগ্রৎ! হে কমা, আজ কেন আমি জাগ্রৎ, তাহা আমি জানি না। আজ যে আমি সকল-বয়ন-হীন, শোকাঘাতে হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্ন, সে পুলকবীণা আর বাজে না, নয়নের অশ্রুজল সারমাত্রি, নায়ার কোন আকর্ষণ নাহি, তাই এ জাগরণ। কি মোহের স্রুতি!—আজ মরণে জীবন! জীবনে মরণ পেয়েও তো কিছুই হয় নাই, আজ কল্প-মুক্তিতে শোকের মদোন্মত্ত তোমার ভিতরের সৌম্য কাছির বিকাশ দেখে আমি জাগ্রিত! হে বরেন্দ্র, আজ তোমায় বরণ করিতে সমর্থ। সকল আসন্ন-সজ্জিত হৃদয়-মন্দিরে, "ভক্তি-পাদ্য-অর্ঘ্য গ্রহণ করে অশ্রু চন্দন-রসে অভিষিক্ত হও। ওগো এমনি করে কি জাগ্রিত কর—সকল হৃদয়-তন্ত্রীকে অবশ কর তোমার জীবন-বীণা এমনি করে বাজাও

না-কি? সংসারের প্রচণ্ড মিথ্যার মধ্যে
হারানো নিজেকে সুখি থেকে এমন করে
কি তোমার সত্যোক্তে জাগাও? তোমার
ছবি সারা বিধে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তোমার

মিলনের ছায়া!—এই তো জাগরণ। আমার
জীবনবীণা তোমার দান। আমি জাগ্রৎ হয়ে
তোমার গীত গাই।—প্রকৃতি প্রোতা হয়ে
ছন্দে তাল দিক।

শ্রীমণিকা রায় চৌধুরী।

উদ্যানলতা।*

শিবেশ্বর একজন দীন গৃহস্থ। সর্বপ্রকার
কুসংস্কার বর্জন করা এবং সম্পূর্ণ নব্য চর্চা
সমস্ত চাল-চলন দোরস্ত করে তোলা, এইটাই
হচ্ছে তাঁর প্রধান বাধ্য। তাঁর মা কিন্তু একে-
বারে সেকেলে ধরনের। ছেলের চাল-চলন
ধরন-ধারণ নিয়ে প্রায়ই মায়ে ছেলেতে একটু
খিটি মিটি চলত। অনেক চেষ্টায়ও মা
ছেলের চাল-চলন শোধরাতে পারেন নাই।
কারণ, শিবেশ্বর ছিলেন একজন ভারি গোড়া
ধরনের সংস্কারক। কোনও কুসংস্কারকে তিনি
কোনও মতেই আমল দিতেন না এবং
যেমনটি বুঝতেন ঠিক তেমনিটাই করে যেতেন;
মায়ের বাধার বড় কিছু ফল হত না। শিবে-
শ্বরের স্ত্রী অল্পবয়সেই মুক্তি নামে একটা মেয়ে
রেখে মারা যান। এই মেয়ের শিক্ষা নিয়ে মা
মোকদ্দাসেবী ও শিবেশ্বরের সঙ্গে প্রায়ই মতের
অমিল হত। শিবেশ্বর যতই মেয়েকে 'বোড়িং'এ
দিয়ে সম্পূর্ণ নব্য ধরণে তৈয়ের করতে লাগ-
লেন, এবং মেয়ের বয়স বাড়া সঙ্গেও তার
বিবাহ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে লাগ-
লেন, তাঁর মাও ততই মেয়ের বিবাহের

সুনিপত্তির জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।
ইতিমধ্যে শিবেশ্বরের একটা ছেলে পোষবার
সম্মত হল। তিনি তাঁর চাকরকে দিয়ে একটা
ছেলে সংগ্রহ করিয়ে এনে তাকে রীতিমত স্কুল
কলেজে পড়িয়ে মানুষ করে তুলতে লাগলেন।
মুক্তি প্রায়ই 'বোড়িং'এ থাকত, কিন্তু মায়ে
মায়ে সে প্রায়ই বাড়ীতে আসত এবং সেই
উপলক্ষে ক্রমশঃ ঐ 'জ্যোতি'-ছেলেটির সঙ্গে
তার বেশ পরিচয় জন্মে উঠল। জ্যোতি
প্রায়ই মুক্তিকে নানা আমোদ প্রমোদে লগ্ন
দিত। দুজনের মধ্যে তুচ্ছ মান অভিমানের
ঝগড়া-ঝাটিও যে না হত, তা নয়। দু'জনেরই
মন এত স্বচ্ছ, সরল, উজ্জল ও আনন্দ প্রবণ
ছিল যে, এই মেশামেশির মধ্যে একটা নির্দোষ
সোহাদা ছাড়া আর যে কোনও যৌবনহীন
ভাবের কোনও যায়গা ছিল, এমনটি মনে করু-
বার কোনও কারণ ছিল না। জ্যোতির সঙ্গী
ছিল ধীরেন; এই ধীরেন পিতৃভালয়ের ঝিক্
দিয়া মোকদ্দাসেবীর সহিত সম্পর্কিত ছিলেন।
মোকদ্দাসেবীর ইচ্ছা ছিল যে এই ছেলেটির
সঙ্গে মুক্তির বিবাহ দেন। ধীরেন যখন
মুক্তির সহিত পরিচিত হল, তখন তাহারও মনে
মুক্তিকে পাওয়ার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠল,
এবং সে শিবেশ্বরের সঙ্গে নানা বাহান্নায়

* একখানি উপন্যাস, শ্রীমোকদ্দাসেবী ও
শ্রীমোকদ্দাসেবী প্রণীত। ২১০০-১ কর্ণওয়ালিস
স্ট্রিট, কলিকাতা।—মূল্য ২৬ হই টাকা।

বনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করতে লাগল। ইতিমধ্যে জ্যোতিকে শিবেশ্বর বিলাত পাঠালেন। জ্যোতিকে জাহাজে বিদায় দেওয়ার প্রবল উত্তেজনায় মুক্তির চিরদিনের সৌহার্দ্যটুকু তার আচ্ছাদন সরিক্তে ফেলে দিয়ে মুক্তির যুবতী-হৃদয়ের কাছে তাকে তার আপন রূপে প্রকাশ করল। তারপর থেকে ধীরেন অনেকবার মুক্তির মন বোঝবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাধা পেয়ে ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে মোক্ষদা-দেবী একবার একাকী তাঁর পিত্রালয়ে গু-গ্রামে যান। মুক্তির তখনও বিয়ে হয় নি,—এ সংবাদটা সেই পাঁড়াগায়ে একেবারে যেন দাবানল জ্বালিয়ে দিল। মোক্ষদাদেবীর ভাই, মোক্ষদাদেবীর অমুখের ভান করে মুক্তিকে কলিকাতা বোডিং থেকে একেবারে পাঁড়াগায়ে নিয়ে হাজির করল। শিবেশ্বরের তখন স্বাস্থ্যসঙ্করে সিমলা শৈলে। মোক্ষদা

দেবী ও তাঁর ভাই, যার সঙ্গে মুক্তির সখ্য হির করেছিলেন, সে হচ্ছে সেই ধীরেন। গায়ে হলুদের কাপড় পরাবার সময় মুক্তিকে জানতে দেওয়া হল কোন এক হাবলার (ধীরেনের নাম) সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

সে শুনেই দরজায় খিল দিল, এবং কোনও এক সুযোগে সকলের অজ্ঞাতে রেল ষ্টেশনের অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। পথে ধীরেনের সঙ্গে দেখা। মুক্তির জানা ছিল না যে, ধীরেনই তাঁর বিবাহপাত্র হাবলা। তাই সে ধীরেনকেই আশ্রয় করিয়া কলিকাতা রওনা হইল। ধীরেনের মন নানা সন্দেহে চলিতেছিল, তবে ষ্টেশনে এসে জ্যোতির অজ্ঞাই মুক্তি অপেক্ষা করে আছে, এ কথা মুক্তির মুখে শুনে, তাঁর আপন কামনার বার্থতা স্পষ্টই বৃদ্ধিতে পারল। (ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

বিলাতে নারীশিক্ষা-সম্বন্ধ।—লণ্ডন-নগরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলাগণ একটি আন্তর্জাতিক মহিলাসম্মেলন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সম্মেলন ব্রিটন, মার্কিন যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং অপর নানা রাজ্যের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য নারীদিগের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীকরণে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্যে অতিমহৎ।

বিমানপোতে বেগমসাহেবা।—সম্প্রতি চাকার পরলোকগত নবাবসার আগান উল্লাহ

পত্নী ও কল্যাণ কতিপয় যুরোপীয় মহিলাসহ বিমানপোতে আরোহণ করিয়া বিমান ভ্রমণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের কাঠ-প্রদর্শনীতে ভারতের কাঠ।—ভারতবর্ষ হইতে একশত প্রকার কাঠ ইংলণ্ডের কাঠ-প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল; তথাকার লোকে ভারতের কাঠ-সম্পদ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন। শুকলা ভারতের ঐশ্বর্য্য-সম্পদের তুলনা হয় না। কিন্তু তথাপি দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর হৃদয় বোড়ে না, ইহাই দুঃখ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিল্প-প্রদর্শনী।—আগামী

১৯২৭ সালে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের
সহায়তায় লণ্ডন-নগরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের
শিল্পসম্পদ প্রদর্শনের নিমিত্ত এক মেলা খোলা
হইবে। সাম্রাজ্যের সকল দেশ হইতে শিল্প
জ্ঞান প্রেরিত হইবে। এইরূপ শুনা যাইতেছে
যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই প্রদর্শনীর আয়ো-
জনের নিমিত্ত ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিতে
অনুরোধ করিবেন। নানা দেশ হইতে ও
নানা লোকের নিকট হইতে ৭৪ লক্ষ টাকা
পাওয়া যাইবে। যুবরাজ এই প্রদর্শনী কমিটির
সভাপতি হইবেন।

✓ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত
বালিকা।—নিম্নলিখিত বালিকাগণ ইন্টার-
মিডিয়েট পরীক্ষায় ২০ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত
হইয়াছে—

✓ শান্তিপ্রভা দাসগুপ্তা, বেথুন কলেজ।
জরিন ঘোষ, বেথুন কলেজ। সুধা রায়চৌধুরী,
ডাওসেনসন কলেজ। দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়, ডাও-
সেনসন কলেজ। যোশেফাইন নরেনহা,
লোরেটে হাউস। রেণুকা দাসগুপ্তা, বেথুন
কলেজ। স্কিনা মুখোপাধ্যায়, ডাওসেনসন কলেজ।
উষাময়ী সেন—বেথুন কলেজ। উষাশ্রুতি
মিশ্র, বেথুন কলেজ। রেণুকা মজুমদার,
ডাওসেনসন কলেজ কমলা। বসু, লোরেটে
হাউস। স্বর্ণকুমারী গুহ, বেথুন কলেজ। রমা
কুন্ডি, ডাওসেনসন কলেজ।

যুবরাজের ট্রেনপতন।—পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার
ত্রিষ্টাউনের সমীপবর্তী বানবেরী-নামক
স্থানে ইংলণ্ডের যুবরাজের ট্রেন লাইন-চূত
হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় যুবরাজের
কোন আঘাত লাগে নাই। তিনি অক্ষতদেহে
জান্নালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বি-এ পরীক্ষার ফল।—নিম্নলিখিত মহিলা-
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ
হইয়াছেন—

ইংরাজী অনার্স।

দ্বিতীয় বিভাগ।

- ১। বেগমমুলতানা মজিদুজ্জাদা—
ডাওসেনসন কলেজ
- ২। নলিনীবালা রুদ্র—ডাওসেনসন কলেজ
- ৩। লতিকা মুখার্জি—বেথুন কলেজ
- ৪। গ্রাভিস মেরী স্টেটউই—প্রাইভেট
- ৫। জন আকামা—ডাওসেনসন কলেজ
- ৬। গ্যারেট কনটনস—প্রাইভেট
- ৭। ডরোথি থাইরিণী হামিলটন
- ৮। কোহেন ফ্লোরা

✓ বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ।

- ১। সুধমা বন্দ্যোপাধ্যায়—বেথুন কলেজ
- ২। অরুণা বেঙ্গ বড়ুয়া—ডাওসেনসন কলেজ
- ৩। ললিতা বসু—
- ৪। ডালোথী গাভিস—প্রাইভেট
- ৫। আশা দত্ত—বেথুন
- ৬। বেলা ঘোষ "
- ৭। বীণা রায় চৌধুরী—ডাওসেনসন কলেজ
- ৮। রাইট জেসি "

পাশ লিষ্ট।

- ১। ডলি চাক্রলতা ব্যানার্জি—ডাওসেনসন
- ২। কেথেলিন বেরী—প্রাইভেট
- ৩। রাজবালা বড়ুয়া—ডাওসেনসন
- ৪। লাবণ্যলতা দাস—প্রাইভেট
- ৫। হিরণবালা দে—
- ৬। ডাঃ ডুলি ল্যারিয়ান—ডাওসেনসন
- ৭। নলিনী ঘোষ—প্রাইভেট
- ৮। হিলদাশেলা বাজুদ—ডাওসেনসন
- ৯। স্মৃতি মজুমদার—বেথুন কলেজ
- ১০। লতিকা রায় "
- ১১। লীলা রায়—প্রাইভেট
- ১২। সুবালা রায়—বেথুন
- ১৩। বিনোদিনী সারদা—ডাওসেনসন

৫৮ নম্বর

বামাবোঝিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্তৃক প্রবর্তিত।

ভাঙ্গা, ১৩২৭—সেপ্টেম্বর, ১৯১০।

সূচী

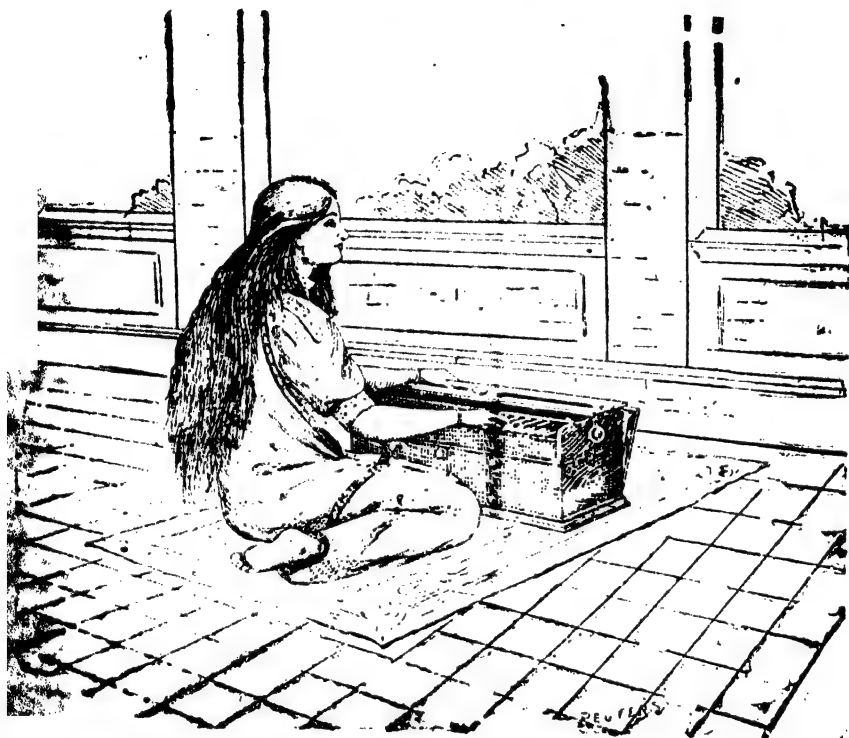
১। শৈশব-স্মৃতি	শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র বড়াল, বি-এ	১২২
২। রূপছন্দ	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত বি-এ	১৩০
৩। ক্ষণমান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শ্রুতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৩৬
৪। জাহাঙ্গীর-উদ্দিন (উপক্ৰাস)	শ্রীমতী চাকরীলা মিত্র	১৩৬
৫। গানের আবলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেন ভূপা	১৪৮
৬। লীনার শিক্ষা (উপক্ৰাস)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী	১৪৯
৭। লোকমান্য তিলক-মহাবাহু	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	১৪৯
৮। উদ্যানলতা (সমালোচনা)	শ্রীযুক্ত শ্রুতেন্দ্রনাথ দাস এম-এ, বি, এড্‌স-ডি	১৪৯
৯। বরষা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূক্ত বিনোদ	১৪৯
১০। নিবেদন (কবিতা)	শ্রীমতী মর্মান্বলা দেবী	১৪৯
১১। নদি-পৈকতে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র বড়াল	১৪৯
১২। সাময়িক সংবাদ	...	১৪৯

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৮/০, অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ১৮/০

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ১০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়াক নৈর হারমোনিয়ম।

বাজারে জিনিসের মত নয়।



বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট বিড মূল্য ২০০, ২২৪ টাকা।

২ সেট বিড মূল্য ৩০০, ৪০০, ৪৫০, ৫০০ হইতে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত

ফোর্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৩০, ৪৫০, ৭০০, ৭৫০, ৯২০ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫০, ১০০, ১৫০, ২২৫ হইতে ৩০০ টাকা পর্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০ ও ৩০০ টাকা।

এস্প্রাঙ্গ—মূল্য ১২০, ১৫০, ১৮০, ২০০ ও ২৫০ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়াকিন এণ্ড সন,

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 685.

September, 1920.

“কন্যায় বঁ দাস্তলীয়া মিন্দুখীমানিমরনঃ”

কল্পাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে ।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত ।

৫৮ বর্ষ ৬৮৫ সংখ্যা ।	} তাদ্র, ১৩২৭ । সেপ্টেম্বর, ১৯২০ ।	{ ১২শ কল্প । ১ম ভাগ ।
-------------------------	------------------------------------	--------------------------

শৈশব-স্মৃতি—

(ভৈরবী—কাণ্ডালি)

- ১। শৈশব খেলা কত
নদীকূলে অবিরত
আজি ঘোর সমীরণে
পড়িছে মনে !
- প্রথম প্রভাতে উঠে
শিশির-ছিটানো মাঠে
বাইতাম্ ছুটে ছুটে,
পড়িছে মনে !
- ২। ভুল কূলে কূলে
বাইত বুলে' বুলে',
বিহ্বল হলে হলে
গাতিত সে গান্ ;
- তটিনী তান কূলে
বয়ে' যেত কল্লোলে,
রহিতাম্ বসি কূলে,
পড়িছে মনে !
- ৩। কুড়ারে বকুল
গাথিতাম্ মালা,
আনন্দে আকুল
সাজাতেম্ ডালা ;
- রাখাল ছেলের দলে
বসিয়া তরুতলে
কত গান গাথিতাম্,
পড়িছে মনে !
- ৪। কখনো বা রাখালের
ভনিতাম্ বাশরী—
খেলাধুলা প্রভাতের
দকলি পদস্রি
- ভড়া'য়ে গলে গলে
কত গানে—কত ভলে
গুরু-পানে কিরিতাম্,
পড়িছে মনে !

৫। সে প্রভাত আর কত

আসে না জীবনে,—

সে অনন্ত হারালাম

কে জানে কোন্ কবে!

কোথা সে হাসি গান,

কোথা সে খোলা প্রাণ,

সুখ-দিন অবসান,

পড়িছে মনে !

৬। আজিকে আবার

গাথিতে চাই গান,

ভয় এ বীণায়

তুলিতে চাই তান !

সে সুর উঠিবে কি ?

সে ফুল ফুটিবে কি ?

তবু সাধিব প্রাণপণে

করেছি মনে ॥

ত্রিনিশ্বলচন্দ্র বড়াল।

জপজী !

২৭

সো ঘর কেহা সো ঘর কেহা যিত বহ সৰ্ব

সমালে।

বাঁজে নাদ অনেক অসংখ্য কেতে বাবণ হারে।

কেতে রাগ পরিসিউ কহিয়ন, কেতে গাবণ

হারে।

গাবহি তু-ধন পৌণ পাণী বৈসন্তর গাটৈ

রাজা ধরম-দুয়ারে ॥

গাবহি চিত-গুপতি লিখ জানহি লিখ নিখ

ধর্ম-বিচারে।

গাবহি ঈশ্বর বরমা দেবী সোহন সদা সব্বারে ॥

গাবহি ঈশ্ব ইন্দ্রাপন খৌ দেবতা আনয় নালে।

গাবহি সিদ্ধ সমাধি অন্মর গাবন সাধ বিচারে ॥

গাবন ষষ্ঠী সতী সংতোষী গাবহি বির কবারে।

গাবন পংড়িত পড়ন ঋষীশর যুগ যুগ বেদা

নালে ॥

গাবহি মোহনীর মনমোহন সুরগা মহ-

পয়ালে।

গাবন রতন উপারে তেরে অঠমঠ তীরথ-

নালে ॥

গাবহি যোধ মহাবল সুরা গাবহি খানি চারে।

গাবহি থণ্ড মংডল বরভংজ কর কর রথে

ধারে ॥

সেই তুধনো গাবহি যো তুধ ভাবন রতে

তেরে ভগত রসালে ॥

হোর কেতে গাবন সে মৈ চিত ন আবন

নানক ক্যা বিচারে ॥

সোই সোই সদা সচ সাহিব সাচা সাচী নাই।

হৈ ভি হোসী যাইন যাসি রচনা যিন রচাই ॥

রংগী রংগী ভাতি কর কর যিনসি মায়া যিন

উপাই।

কর কর বেখে কিতা আপনা যিবতি সদা

বড়ুয়াই ॥

যো তিস ভাটৈ সোই করসি জুফন ন করনা

যাই।

শে পাতসাহ সাহা পাতি সাহিবু নানক

রহনা রজাই ॥

অর্থঃ—হে প্রভো ! তোমার সে দরবার

কিরূপ, তোমার গৃহ কিরূপ, যেখানে বসিয়া

তুমি সকলকে রক্ষা করিতেছ। কত অসংখ্য মাললিক বান্দ্য তোমার দ্বারে বাজিতেছে, কত প্রেমিক ও ভক্ত তোমার বান্দ্য কর হইয়াছেন! কত রাগ-রাগিণীরূপ পরীগণ তোমার স্তুতিগান করিতেছে, কত কত ভক্ত তোমার গান করিতেছেন! বায়ু, জল, অগ্নি তোমার গুণগান করিতেছে; ধর্মরাজ তোমার দ্বারে স্তুতিগান করিতেছেন। চিত্রগুপ্ত তোমার গুণগান করিতেছেন, এবং তোমার গুণ পুনঃ পুনঃ লিখিয়া ধর্মের বিচার করিতেছেন। হে প্রভো! মহাদেব, ব্রহ্মা ও মহাশক্তি নিরন্তর তোমার গুণগান করিয়া শোভিত হইয়াছেন। ইজ্ঞ ইজ্ঞাসনে বসিয়া দেবতা-গণের সঙ্গে তোমারই স্তুতিগান করিতেছেন। সিদ্ধগণ সমাধি-অবস্থাতে তোমারই গুণগান করেন, সাধকগণ তোমারই প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। ষষ্ঠী সন্ন্যাসিগণ এবং সত্যবাদী ও সন্তোষী সাধকগণ ও কঠিন বীরগণ তোমারই গুণগান করিয়া থাকেন। পণ্ডিত ও অধিগণ যুগে যুগে বেদ-হস্তে তোমারই মতিমা গান করেন। মোহিনী অপ্সরাগণ স্বর্গ, মর্ত ও পাতালে তোমারই স্তুতিগান করেন। তোমার সৃষ্ট রত্ন-সকল এবং আটঘড়ী তাঁর তোমারই মহিমা গান করে। হ্রস্ববীর মহাবল যোদ্ধগণ এবং অন্ত্যজ, জেবজ, খেদজ ও উত্তীক্ষ এই চারিপ্রকার জীবগণ তোমারই গুণগান করেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজাতি গন্ধর্বগণ তোমার গুণ গান করিয়া তোমাকে জন্মের ধারণ করিয়া রাখে।

হে প্রভু! সেই তোমার গান করিতে পারে, যে তোমার ভাবনায় রত এবং তোমার ভক্তিতে পরিতুষ্ট। নানক বলিতেছেন,

আরও যে কত কত গায়ক তোমার মহিমা-ছেন, তাহার কি ইচ্ছা? কবী বাত? তিনিই চিরন্তন সত্য প্রভু, তাহার নাম সত্য। তিনি আছেন, তিনি থাকিবেন; তিনি কোথাও যান নাই বা যাইবেন না; তিনি এই সংসারের রচনা করিয়াছেন। তিনি আপনার মায়াদ্বারা কত প্রকার রঙ্গের কত কত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন! তিনি আপনি সৃষ্টি করিয়া আপনিই দেখেন; আপনার মতিমা তিনি আপনিই জানেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন; তাহার প্রতি কেহ জব্দ চালাইতে পারে না। নানক বলিতেছেন, তিনি রাজার রাজা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। হে সাধক! তাহাকে প্রীতি কর।

২৮

মুখা সংতোষ সরমু পত্ন কোলি ধ্যানকি
করহি বিতুতি।

খিখা কালু কুয়ারী কাইয়া, যুগতি ডাঙা
পরতীতি।

আই পংখী সগল জমাতী, মনজীতে মগজীতু।
আদেস্ত তিসে আদেস্ত, আদি অনীল অনাদি
অনাহতি যুগ যুগ একো বেস্ত।

অর্থ :—তিনিই যথার্থ যোগী, যিনি সন্তোষ এবং লজ্জার মুদ্রা কর্ণে পরিয়াছেন, যিনি প্রতিষ্ঠার কোলা ধারণ করিয়াছেন, এবং ধ্যানের বিতুতি মাখিয়াছেন; যিনি কালকে পরিয়াছেন, শরীরকে প্রস্ফুট করিয়াছেন, এবং বৃত্তি ও বিশ্বাসের দণ্ড ধারণ করিয়াছেন। সেই যোগী ভক্তির পথ প্রাপ্ত হন, এবং দয়া প্রভৃতি গুণদ্বারা সর্বল ভাবে উপর আদিপত্ন বিস্তার করেন, এবং মনকে জয় করা হেতু সমস্ত অগৎকে তিনি জয়

করেন। আমি সেই আদিপুরুষ ভগবানকে
বার বার বন্দনা করি। তিনি সকলের আদি,
তিনি নির্মল, তিনি অনাদি পুরুষ, তিনি নাশ-
রহিত। যুগে যুগে তাঁহার একই বেশ।

২২

ভুগতি জাহ্নু দয়া ভাংভারন ঘটি ঘটি বাজহি
নাদ।

আগি নাথু; নাথী সভ থাকি, ঋষি সিধি
অবরাসদ।

সংযোগ বিরোধ ছহকার চলাবৈ হি লেখে
আবহি ভাগ।

আদেশে তিসে আদেশে।

আদি অনিল অনাদি অনাহতি যুগ যুগ
একো বেত্ত।

অর্থ :—তিনিই বার্থ ঘোণী, যিনি জ্ঞানকে
ধায়া করিয়াছেন, দধাকে ভাঙারী করিয়া-
ছেন, এবং বাহার অন্তরে প্রতি পলে পলে
ভগবানের নাম-গান হইতেছে। সেই ভগবান
সকলের স্বামী। তিনি আপনার মায়ায়
সকলকে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণ
কড়ি, সিঁড়ি, সকল অবস্থার আদ এহণ করেন,
কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। তিনি মাহুকের কন্দা-
জ্বারে সংযোগ ও বিরোধ করাইতেছেন এবং
বাহার বেরগ প্রাক্তনকন্দ সেইরূপ ফলভোগ
করাইতেছেন। আমি সেই আদি-পুরুষকে
বন্দনা করি। তিনি সকলের আদি; তিনি
নির্মল, তিনি অনাদি পুরুষ, তিনি নাশ-
রহিত; যুগে যুগে তাঁহার একই বেশ।

৩০

একা মাই ভুগতি বিরাই তিন চেলৈ পরবাহু।

* একামাই—যথা গীতা ১৪শ অ, ৩য়
শ্লোক।

একু সংসারী একু ভাংভারী ইকু লারে দিবাহু ॥
বিব তিসু ভাবৈ তিবৈ চলাবৈ, বিব হোবৈ
সুরমাণু।

উহ বৈ থৈ তনা নদরি ন আবৈ বহতা এহ-
বিভাহু ॥

আদেশে তিসে আদেশে।

আদি অনিল অনাদি অনাহতি যুগ যুগ
একো বেত্ত ॥

ব্রহ্ম-শক্তির সহিত মায়াশক্তি যুক্ত হইয়া
তিনটী শ্রেষ্ঠ সন্তান প্রসব করিলেন। তন্মধ্যে
ব্রহ্মা সংসারী অর্থাৎ সৃষ্টি করিলেন; বিষ্ণু
ভাঙারী অর্থাৎ পালন করিতেছেন; এবং
মহাশিব প্রলয় করিয়া দেন। তিনি যেমন
ইচ্ছা করেন, জগৎকে সেইরূপ চালান;
যেমন তাঁহার আদেশ, সেইরূপই হয়। তিনি
দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখে না;
ইহাই অতিশয় আশ্চর্য ব্যাপার। আমি
সেই আদিপুরুষকে বন্দনা করি। তিনি
সকলের আদি, তিনি নির্মল; তিনি অনাদি-
পুরুষ; তিনি নাশ-রহিত; যুগে যুগে তাঁহার
একই বেশ ॥

৩১

আসহু লোই লোই ভাংভার।

যো কিছু পায় একোবার।

করি করি বৈ থৈ সিরজন হাক।

নানক সচেকি সাচিকার।

আদেশে তিসু আদেশে।

আদি অনিল অনাদি অনাহতি যুগ
যুগ একো বেত্ত ॥

অর্থ :—সমস্ত জগৎ তাঁহার আসন; সমস্ত
জগৎ তাঁহার ভাঙার। বাহার বাহা প্রারদ্ধ
একবার স্থির করিয়া দিয়াছেন। সেই সৃষ্টি-

কর্তা আপনার সৃষ্টি আপনাই দেখিতেছেন।
নানক বলিতেছেন, সেই সত্যস্বরূপের সত্য
ব্যাপার। আমি সেই আদি-পুরুষকে বন্দনা
করি। তিনি সকলের আদি, তিনি নির্মল,
তিনি অনাদি-পুরুষ, তিনি নাশরহিত; যুগে
যুগে তাঁহার একই বেশ ॥

৩২

ইকছ জিভো লখ হোহি লখ হোবহি লখ বিশ।
লখ লখু গেডা আখিয়হি একু নামু জগদীশ ॥
এতু রাহি পতি পবডিয়া চড়িঠৈ হোয় একীশ।
গুনি নালী আকাশকী কীট আই রীস।
নানক নদরি পাইয়ে কুড়ী কুড়ৈ টীস ॥

অর্থ :—মানুষের এক জিহ্বা যদি লক্ষ হয়,
আবার লক্ষ জিহ্বা যদি বিশ লক্ষ হয়, এবং
সেই বিশ লক্ষ জিহ্বার দ্বারা যদি লক্ষ লক্ষ
বার ভগবানের নাম লওয়া যায়, তাহা হইলেই
অর্থাৎ সেই পথ-ও সিঁড়ি-দ্বারা গমন করিলেই
ভগবানের দর্শন-লাভ হইতে পারে। আকা-
শের পক্ষীকে উড়িতে দেখিয়া কীটেরও সেই-
রূপ উড়িতে ইচ্ছা হয়। নানক বলিতেছেন,
ভগবানের রূপাদৃষ্টি হইলেই সে অবস্থা-লাভ
হইতে পারে; মিথ্যা বাক্য-বিত্তাসে কিছু
হয় না।

৩৩

আখনি জোরু চুপৈ নহ জোর।
জোর ন মংগনি দেনি নহ জোর ॥
জোর ন জীবহু মরণি ন জোর।
জোর ন রাজি মালি মনি সোর ॥
জোর ন সুরতি জ্ঞানি বিচারি।
জোর ন যুগতি ছুটৈ সংসার ॥
বিসু হাখি জোর করি বৈথে সোয়।
নানক উত্তম নীচ ন কোয় ॥

অর্থ :—কথা বলিবার শক্তি বা মৌন
হইবার শক্তি মানুষের নাই। প্রাধনা করি-
বার বা দান করিবার শক্তিও তাহার নাই।
মানুষের জীবিত থাকিবার বা মরিবার শক্তি
নাই। স্বাভাবিকের শক্তি মানুষের নাই,
এবং সঙ্কল্প করিবার শক্তিও তাহার নাই।
বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিচারের শক্তি মানুষের নাই।
সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার, কোন প্রকার
যুক্তি করিবার সামর্থ্যও মানুষের নাই। যে
তাঁহার নিকট হাত জোড় করিতে পারে, সেই
তাঁহাকে দেখিতে পায়। নানক বলিতেছেন,
উত্তম বা নীচ বলিয়া কিছু নাই, কর্ম্মাচসারেই
উচ্চ বা নীচ বলা হয়।

৩৪

রাতী রুতী থিতি বার, পবন পানী
অগনী পাতাল।
তিস বিচি ধরতী আপি রথি ধর্ম্মশাল ॥
তিহু বিচি জীয় যুগতি কে রংগ ॥
তিনকে নাম অনেক অনংত।
কর্ম্মী কর্ম্মী হোয় বিচার ॥
সচা আপি সচা দরবার ॥
তিথে সোহনি পংচ পরবাণ ॥
নদরী করমি পটৈ নিশান ॥
কচ পকাই উঠৈ পাট ॥
নানক গইয়া জাটৈ যাহ ॥

অর্থ :—রাত্রি, ঋতু, তিথি, বার, পবন,
জল, অগ্নি এবং পাতাল ভগবান্ সৃষ্টি করিয়া
তাঁহার মধ্যস্থলে পৃথিবীকে ধর্ম্মশালার ভাৱ
করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পৃথিবীতে আবার
ভগবান্ নিজশক্তিতে কত প্রকারের জীব-সৃষ্টি
করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সকল জীবের নাম
ও প্রকার অনন্ত। তিনি আপনাই জীবের

কর্মের বিচার করিতেছেন। তিনি সত্য-
ব্রহ্ম, তাঁহার সত্য দরবার। তাঁহার দরবারে
পঞ্চ অর্থাৎ সাধুগণ প্রতিষ্ঠিত ও শোভিত
হয়েন। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পতিত হইলে
সাধক কৃতার্থ হইয়া যান। তাঁহার দরবারে
কাঁচা সাধক পাকা হইয়া যান। নানক বলি-
তেছেন, তাঁহার নিকট যাইলে, কর্ম কাটিয়া
যায়।

৩৫

ধর্ম-খণ্ডকা এহো ধর্ম ।

জ্ঞান-খণ্ডকা আখহু কর্ম ॥

কেতে পবন পানী বৈসন্তর, কেতে

কান মহেশ ।

কেতে বরমে ঘাভতি ঘড়িমহি রূপ

রংগকে বেশ ।

কেতিয়া কর্ম ভূমি মের কেতে কেতে

ধু উপদেশ ।

কেতে ইন্দ চন্দ্র সুর কেতে, কেতে

মংডল দেশ ॥

কেতে সিন্ধ বুদ্ধ নাথ কেতে কেতে

দেবী বেশ ।

কেতে দেব দানব, মুনি কেতে, কেতে

রতন সমুদ্র ॥

কেতিয়া থানি কেতিয়া বাণী, কেতে

পাত নরিংগ ।

কেতিয়া সুরতি সেবক কেতে নানক

অন্ত ন অন্ত ॥

অর্থ :—ধর্মক্ষেত্ররূপ যে এই পৃথিবী,
ইহাই ধর্মার্থ অর্জনের স্থান। জ্ঞান-কাণ্ডের
অর্থ এখন বলিবেন। ভগবানের সৃষ্টির
মধ্যে কত পবন, কত জল, কত অগ্নি, কত
কানাই কত মহেশ, কত কত ব্রহ্মা কত কত

রূপ রঙ্গ ও বেশের কত কত সৃষ্টি করিয়াছেন।
কত কত কর্মভূমি, কত কত মেরুপর্বত,
কত কত প্রবতারা এবং কত কত আচার্য্যের
সৃষ্টি করিয়াছেন। কত ইন্দ্র, কত চন্দ্র, কত
সূর্য্য, কত মণ্ডল, এবং কত দেশের সৃষ্টি
হইয়াছে। কত সিন্ধ, কত বুদ্ধ, কত নাথ
যোগী, কত দেবী রহিয়াছেন। কতই
দেবতা ও দানব, কতই মুনি, কতই রত্নসমুদ্র।
কত জাতি, কত ভাষা, কত প্রজাপালক
নরেন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কতই শ্রুতি,
কতই সাধক! নানক বলিতেছেন, সেই
অনন্তের কার্য্যের অন্ত নাই।

৩৬

জ্ঞান-খণ্ড মহি জ্ঞান প্রচংড়ু ।

তিথে নাদ বিনোদ কোত অনংহু ॥

সরম খণ্ডকী বাণীরূপু ।

তিথে ঘাভডি ঘড়িউ কহতু অমুপু ॥

তাকিয়া গলী কথিয়া ন যাহি ।

যে কো কই পিছু পছুতার ॥

তিথে ঘড়িউ সুরতি মতি মনি বুধি ।

তিথে ঘড়িউ সুরা সিদ্ধাকি হুধি ॥

অর্থ :—জ্ঞান-মার্গ-মধ্যে ভগবদ্-জ্ঞানই
শ্রেষ্ঠ। এই পথে ওঁকার, নাদ, প্রেমভক্তি ও
শ্রেষ্ঠ আনন্দ প্রদান করে। এই ব্রহ্মানন্দস্থ
বাণীরূপে ভক্ত-হৃদয় হইতে বাহির হইয়া
জগতের সুখদায়ক হয়। ভক্ত হৃদয়ে ভগবৎ-
প্রেমের হিলোল বহিতে থাকে। ভক্তহৃদয়ে
যে ব্যাপার হয়, তাহা কথায় প্রকাশ করা
যায় না। যদি কেহ বলিবার চেষ্টা করে,
তাহা হইলে সে পশ্চাৎ অহুতাপ করে।
ভক্তহৃদয়ে শ্রুতিবাক্য নিয়ত বিরাজ করে
এবং তাঁহার সমস্ত বুদ্ধি ভগবানে লীন হয়।

তিনি হ্র ও সিদ্ধগণের জায় ভূত-ভবিষ্যতের
জ্ঞান লাভ করেন।

কর্ম-খণ্ডকী বাণী জোর।

তিথৈ হোক ন কোই হোক ॥

তিথৈ যোধ মহাবল হ্র।

তিন মহি রামু রাহিয়া ভরপুর ॥

তিথৈ সীতো সীতা মাহিমা মাহি।

তাকে রূপ ন কখনে যাহি ॥

না ওহ মরহি ন ঠাগে যাহি।

যিনকৈ রামুবসৈ মনমাহি ॥

তিথৈ ভক্ত বসৈহি লোয়।

করহি অনংহু সচা মনি সোই ॥

সচি খণ্ড বসৈ নিরংকার।

করি করি বৈথে নদরি নিহাল ॥

তিথৈ খণ্ড মণ্ডল বরভণ্ড।

যে কো কৈথে ত অংত ন অংত ॥

তিথৈ লোয় লোয় আকার।

যিব যিব হুকমু জিইব তিবকার ॥

বৈথে বিগটৈ করি বিচার।

নানক কখনা করড়া সার।

অর্থঃ—এই কর্মভূমিরূপ মনুষ্যলোকে
বাহার প্রতি ভগবানের রূপাদৃষ্টি হইয়াছে,
তাহার বাণী অতি প্রবল। সেখানে ভগবৎ-
নাম বাতীত আর কিছুই নাই। তাঁহাকে
ভক্তি-বৈরাগ্যরূপ যোদ্ধা সর্বদা রক্ষা করেন।
তাহার মধ্যে রাম পূর্ণরূপে বিবাজ করেন।
তাহার হৃদয়ে শাস্ত্ররূপ সীতা আপনার
মহিমা প্রকাশ করেন। তাহার বিবরণ
কথায় প্রকাশ করা যায় না। তিনি মরেন
না, তিনি কাহারও দ্বারা প্রভাবিত হ'ন
না। বাহার হৃদয়ে রাম নিরন্তর বাস করেন,
তাহার হৃদয়ে ভক্তগণের দর্শনলাভ হয়।

সেই সদাশ্রী ভক্ত আপনার আনন্দে আপনি
মগ্ন থাকেন। ভক্তজনের গুহ হৃদয়ে
নিরাকার পরমেশ্বর বাস করেন। তিনি
ভক্তের গুহ হৃদয় দেখিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ
করেন। সেই ভক্ত-হৃদয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড
প্রকাশ পায়। ভক্তের হৃদয়ের অবস্থা যদি
কেহ প্রকাশ করিতে চায়, তাহা হইলে
তাহার অস্ত্র পায় না। ভক্ত হৃদয়ে কত কত
লোক কত কত সৃষ্টির দর্শন হয়। যেমন
প্রভুর আত্মা হয়, ভক্ত সেই মত কাঁধা
করেন। ভক্তের কাঁধা দেখিয়া ভগবান্
হাসেন, এবং বিচার করিয়া তাঁহাকে উত্তম
ফল দেন। নানক বলিতেছেন, কথায় ভক্তি
হয় না, ভগবৎ রূপায় যখন বাসনার মূল
উৎপাটিত হয়, তখনই ভক্তি প্রকাশ পায়।

৫৮

যতু পাহারা ধীরযু হুনিয়ার।

অহরনি মতি বেছ হাণিয়ার ॥

ভউখলা অগ্নি তপতউ।

ভংজ ভাউ অমৃত তিতু ঢালি ॥

বডিউ সব হু সচি টক্‌মাল।

যিনকো নদরি করমু তিনকার ॥

নানক নদরি নদরি নিহাল ॥

অর্থঃ—সংযমরূপ ভাটিতে ধের্গা স্বর্ণকার,
সুমতি-লৌহগুণে, বেদ কাড়ড়ী দ্বারা ভয়-
ভাপবে, তপস্করূপ অগ্নি জালিয়া ভাবনারূপ
পাত্রে, গুরু উপদেশরূপ অমৃত ঢালিতেছে।
হে সাধক, অহরহঃ ভগবানের নাম সৎসঙ্গরূপ
টাকশালে লইতে থাক। বাহার প্রতি
ভগবানের রূপাদৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কাঁধা
এই প্রকার। নানক বলিতেছেন, এমন
সাধকের দৃষ্টিতেই মানুষ কৃতার্থ হয় ॥

শ্লোক ।

পবন গুরু, পানী পিতা, মাতা ধরতি মহত ।
 নিবস রাত ছই দাই দায়া খেল সগল জগত ॥
 চংগাইয়া বুরিয়াইয়া রাটে ধরম হছর ।
 করমী আপো আপনি কে নেড়ে কে দূর ॥
 বিনি নাম ধায়া গায়ে মসকত দাল ।
 নানক তে মুখ উজলে কোত ছুটি নাল ॥

জগুজী-সাহিব সম্পূর্ণম ॥

অর্থ:—পবন গুরু, জল পিতা, এই
 মহৎ পৃথিবী মাতা । নিবস এবং রাত্রি

পালক এবং পালিকা ; ইহা লইয়া সমস্ত জগৎ
 খেলিতেছে । ধর্ম সেই ভগবানের সম্মুখে
 মাহুকের সংকর্ম এবং অসংকর্ম দেখাই-
 তেছেন । কর্ম্মানুসারে কেহ ভগবানের
 নিকটে, কেহ বা দূরে । যে নাম মনে রাখে,
 কষ্ট দূর করিয়া ভগবানের গৃহে যায় । নানক
 বলিতেছেন, সেই সাধকের মুখ উজ্জ্বল হয়
 এবং সেই সঙ্গে কত ব্যক্তি তারিয়া যায় ॥

জগুজী সম্পূর্ণ ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত ।

কণমান ।

বইল আজি সুরের হাওয়া
 মাধব-সাঁথে,
 নয়ন-চাকু কুসুম-কলি
 মেল্‌ল না যে ?
 নিবিড় চাপা অশ্রু-ভাষে
 বাদল কি গো ঘনিরে আসে ?
 গাছের পাতা মোরার মাথা
 কানন-মাথে !

চারণা কেন চন্দ্র-বঁধু
 নিমের আড়ে ?
 কানন-দেবী বীণার কেন
 সুর না ছাড়ে ?
 হ'ল যে গান পাশুরার বেলা
 অস্ত্রে এল সুরের ভেলা !
 আজকে কেন ভুবন হেন
 নীরব লাজে !
 শ্রীহৃৎকেননাথ চট্টোপাধ্যায় ।

জাহাজ-ভুনি ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

“কাকীমা ! তোমরা না-কি আমাদের
 ছেড়ে চলে যাবে গা ?” পরদিন প্রভাতে
 স্নানাগোবিন্দ-বাবুর দামশবরীয়া পোজী নীলিমা
 জানিয়া ছই হতে আশালতার কঠবেটন
 করিয়া অশ্রু-বিহীন স্বরে কম্পিত গুণ্ডে পূর্বোক্ত

বাক্য উচ্চারণ করিল । সরলা বালিকার
 মেহতরা ক্ষুদ্র হৃদয়খানি আশালতা বৃক্ষ
 কর্পণের মত দেখিতে পাইতেছিলেন । বলিতে
 গেলে বালিকা একাধারে আশালতার শিষা,
 সখী, সাজনী—সবই ছিল । বালিকার সহিত
 ভাবী বিচ্ছেদের চিন্তা আশালতার অন্তরকেও

ব্যবিত করিয়া তুলিতেছিল। আশালতা অশ্রু-
সংবরণ করিয়া সম্মুখে দুই হস্তে নীলিমার
মুখখানি তুলিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছাইয়া
অশ্রুবিন্ধু কেশগুচ্ছ সরাইতে সরাইতে
বলিল, “কে বল্লো মা?” নীলিমা বলিল,
“কেন! দাদাবাবু।” আশালতা নীরব।
নীলিমা আবার দুই হস্তে আশালতার দক্ষিণ
হস্তখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “সত্যি যাবে
কাকীমা? কেন যাবে বল না?”

আ। তোমার কাকাবাবুর ইচ্ছে হয়েছে
মা!

নী। এমন ইচ্ছে কেন হল, কাকিমা!
লোকে বৃষ্টি, নিজের ঘরদোর ছেড়ে চলে
যায়? কাকাবাবুর এ কেমন ইচ্ছে, কাকীমা?
তুমি বারণ কর না, কাকীমা!

ঠিক এই সময় অমরকুমার সেখানে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মন
প্রকৃত, মুখমণ্ডল সহাস্য, গতি ধীর-প্রশান্ত!
তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় না যে, তাঁহার
অন্তরে কিছুমাত্র চিন্তা আছে। নীলিমা
আবার দুইহস্তে আশালতার কণ্ঠ বেঁটন
করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, “কেন যাবে
কাকীমা! বল না? আবার কবে আসবে?”
ইত্যবসরে অমরকুমার নিকটে আসিয়া
বলিলেন, “পাগলি বলে কি?” আশালতা
বলিল, “বাড়ীঘর ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছ কেন?
আবার কবে আসবে?—সেই কথা নীলিমা
জিজ্ঞাসা কচ্ছে। নীলিমার পৃষ্ঠদেশে স্নেহের
হস্ত বুলাইয়া দিয়া অমর কুমার বলিলেন,
“তোমার বিয়ের সময় আসব রে পাগলি!”
নীলিমা বলিল, “কাকাবাবু যেন আমাদের
ছেলেমানুষ পেয়েছেন! আমার সঙ্গে ও ঠাট্টা!

অমরকুমার আবার পূর্ববৎ হাস্ত করিয়া
বলিলেন, “ওরে বাস রে! কে বল্লো তোক
ছেলেমানুষ মনে কচ্ছি! তুই যে আমাদের
মা, বুড়ী হয়ে গেছিস; সে-কথা কি আমরা
ভুলতে পারি!” অভিমানে নীলিমার চক্ষুস্বয়
সজল হইয়া উঠিল; অভিমান-ভরে বলিল,
“আমাদের জন্তে মন কেমন কচ্ছে না
কাকীমা?”

উপেক্ষকিশোর-বাবুর পুষ্প উপস্থিত
হইয়াছেন এবং অমরকুমার চলিয়া যাইতেছেন,
এ-কথাটা মুহূর্ত্ত-মধ্যে ঝড়ের মতন গ্রামময়
রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এ-সংবাদে সকলেই
দুঃখিত এবং ব্যথিত হইয়া উঠিল। অমর-
কুমারের গুণে সকলেই মুগ্ধ ছিল। প্রতিবেশী,
বন্ধু, প্রজা, পরিচিত, অপরিচিত, সকলে
দলে দলে আসিয়া অমরকুমারের সহিত
সাক্ষাৎকার করিতে লাগিল। অমরকুমার
যেন কিছু লজ্জিত ও বিব্রত হইয়া পড়িতে
লাগিলেন। তাঁহার মনটাও যেন কিছু
চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। আবাগ্যের
পরিচিত গ্রাম, বন্ধু, সব ত্যাগ করিয়া যাইতে
হইবে। তখনো আর এ জীবনে কাহারও
সহিত সাক্ষাৎকার ঘটবে না! হয়তো
কেন? নিশ্চয়ই না! জয়ের মত আজিম-
গঞ্জের সহিত সন্ধা চুকিয়া গেল। আর তিনি
কিসের জন্য আজিমগঞ্জে আসিবেন?
দরিদ্র প্রভাগণ অশ্রু-ভারাক্রান্ত কণ্ঠধরে
করছোড়ে বলিতে লাগিল, “আমাদের
দেবতা, আমাদের মা-বাপ্ আজ আমাদের
ছেড়ে চলেন! আমাদের দশা কি হবে?
বিপদে পড়লে কা’র কাছে যাব? কা’র
কাছে হুণ জানাব? কে আমাদের দয়া

কবুবে ? ইত্যাদি—” তাহাদের সেই মৰ্ম-
স্পর্শিনী কাতরতায় অমরকুমারের চক্ষুও শুক
রহিল না। তাঁহার স্রুত্ব হৃদয়-ধারে কে
বে নম্র করাবাত করিতে লাগিল। অমর-
কুমারের তক্ত দীন প্রজাগণ তাহাদের সাধ্য-
মত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ‘নজর’ লইয়া আসিয়া
অমরকুমারের পায়ের কাছে রাখিয়া ভুমিষ্ঠ
হইয়া প্রণাম করিয়া করষোড়ে বলিল, “হজুর,
গরিবের মা-বাপ, হজুর আমাদের ছেড়ে
বাচ্ছেন, আর হজুরকে দেখা আমাদের
ভাগ্যে কখনও ঘটেবে না, তাই আজ আমরা
হজুরকে কিছু নজর দিতে এসেছি। দয়া করে
নিতে হবে।”

অমরকুমার মিষ্ট বাক্যে তাহাদের সম্বল
করিয়া বলিলেন, “তোমাদের ও ‘নজর’ আর
আমার কোনও অধিকার নেই। তোমাদের
অনুন্ন বনিব এসেছেন, তোমাদের ‘এ নজর’
এখন তাঁরই প্রাপ্য।”

তাহারা এক বাক্যে সকলে বলিয়া উঠিল,
“তাঁর প্রাপ্য তিনি বুঝে নেবেন। এ আমরা
হজুরকে দিতে এসেছি, হজুরকে নিতে হবে।”

কিন্তু অমরকুমার কিছুতেই তাহা গ্রহণ
করিতে সম্মত হইলেন না। ইজ্রপ্রস্থাদি-
পতি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্যুতপণে পরাজিত
হইয়া দুষ্টাধমকে সর্বস্ব দান করিয়া যখন
ঘনে গমন করিয়াছিলেন, রাজ্যমধ্যে তখন
যেমন একটা গভীর মর্শভেদী হাণ্কার-ধ্বনি
উখিত হইয়াছিল, অমরকুমারের প্রস্থানেও
দেশ-মধ্যে তেমনিই একটা গভীর হাহাকার,
মর্শভেদী উচ্ছ্বাস সমুখিত হইল। সকলের
মুখেই শোনা বাইতে লাগিল, “এমন জমিদার
আর হবে না।”

অমরকুমারের জন্ম দেশের লোক যে
এরূপ উতলা হইয়া উঠিবে, অমরকুমার পূর্বে
এতটা বুঝিতে পারেন নাই। এখন অবস্থা
দেখিয়া তাঁহার অন্তরও অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া
উঠিতে লাগিল। যত শীঘ্র পারেন, এস্থান
ত্যাগ করিয়া বাইবার জন্ত তিনি সংকল্প
করিলেন। এ-দৃশ্য যতই দেখিবেন ততই
মন খারাপ হইয়া যাইবে। প্রজাবর্গ চলিয়া
বাইবার পর অমরকুমার অন্দর-মধ্যে প্রবেশ
করিয়া তাড়া-তাড়ি চারিটি ভাত খাইয়া
আশালতাকে বলিলেন, “শীগগির প্রস্তুত
হয়ে নেও। এখনি বেকতে হবে। দেড়
টার ট্রেনে কলিকাতা রওনা হব।”

আশালতা বলিল, “আমি প্রস্তুত হয়েই
আছি। যখনই বলবে তখনই বেরুব।” অমর-
কুমার আশালতার মুখের দিকে চাহিয়া
একান্ত নির্ভীকার ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“এ-সব ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে,
আশা ?”

আশালতা সগর্বে উত্তর করিল, “কষ্ট ?
কিসের কষ্ট ? ভূমি যেখানে থাক্বে সেই
আমার অমরভূবন, কুঁড়েতে থাক্লেও
অট্টালিকা ! এ পরের ধনে পোকারি-গিরিতে
কাজ কি আমার ! তবে কষ্ট যদি হয়,
তোমার ! আজন্ম স্নেহে প্রেতিপালিত হয়েছি,
এখন সাধারণ লোকের মতন খেটে খেতে
হবে।”

অমরকুমার আশালতার চিবুক ধরিয়া
সহাস্তে বলিলেন, “আশা যার সজিনী, তাঁর
আবার কষ্ট কিসের ?”

রাধাগোবিন্দ-বাবু এবং তাহার জী
মহাশয়া আসিয়া উভয়কে আত্মীয়ের উপযুক্ত

খেঁটে উপদেশ দিলেন এবং যখন বেখানে থাকিবেন, সর্বদা সংবাদ দিতে বলিলেন। অমরকুমারও সম্মতি জানাইলেন। আশালতা গায়ের মূল্যবান গহনা সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া রিভের মত বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। আশালতাকে তদবস্থায় দেখিয়া মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হা বৌ-মা, গয়না-টয়না সব কি হল?” আশালতা বলিল, “সব লোহার সিঁদুক ভুলে রেখেছি মা! কোথায় থাকব তার ঠিক নেই, গয়না সঙ্গে রেখে কি করব?”

“আ বোকা মেয়ে! এখানে থাকলে কি আর পাবে কিছু, বাছা? গয়না তোমার! ও গায়ের গয়নাতে ত’ কারও অধিকার নেই।” এই বলিয়া মহামায়া লোহার সিঁদুকের চাবিটা আশালতার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া আশালতার গহনাগুলি বাস্তব-সম্মত আশালতার ট্র্যাঙ্কে পুরিয়া দিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া অমরকুমার বলিলেন, “ও কচ্ছেন কি জেঠাই-মা! ও সকলে কোন দরকার নেই!” রাখাগোবিন্দ-বাবু বলিলেন, “অমর, তুমি ছেলেমানুষ, বুঝতে পাচ্ছ না বাবা! সংসারে অর্থ নইলে মানুষের এক দণ্ডও চলে না; গয়নাগুলো সঙ্গে রাখলে ঢের উপকারে লাগবে।”

অমরকুমার বলিলেন, “কিন্তু অত দামি গয়না সঙ্গে রাখলে পথে বিপদেরই সম্ভাবনা। তাক্স-চেয়ে ওগুলো আপনার কাছে রেখে দিন, দরকার হলে চেয়ে পাঠাব।”

রাখাগোবিন্দবাবু সম্মত হইলেন। আশালতা তাহার পিতৃদত্ত একটা ধূল ট্র্যাঙ্কে তাহার নিজের ও অমরকুমারের কিছু কিছু

বস্ত্রাদি লইল এবং আর একটা ট্র্যাঙ্কে অমরকুমারের প্রিয়পাঠ্য পুস্তকগুলি লইল। কোচম্যান্ গাড়ী জুতিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। নীলিমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছিল। বালিকার সেই নীরব যোদনে আশালতার চক্ষুধরও আর্দ্র হইল। তিনি নীলিমাকে প্রবোধ দিবেন কি, নিজেই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কথা কহিতে গেলেই যন্ত্রে নিবারণিত অশ্রুধারা সনেগে প্রবাহিত হইয়া কপোল বাহিয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতে লাগিল। অমর-বিদায়ের করুণ দৃশ্যটি উপস্থিত জনমণ্ডলীর সকলের হৃদয়কেই উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিল। অমরকুমার ও আশালতা রাখাগোবিন্দবাবু ও মহামায়া প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহামায়া অকলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে অমর-কুমার ও আশালতাকে অজস্র আশিস-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, “রাম বনে গেছিলেন; চৌদ বছর পরে ফিরে এসেছিলেন। তুমি কি আর কখনও ফিরে আসবে না, বাবা? তবুও কি আর কখনও আমাদের সে-দিন ফিরে দেবেন না?” কানাই তাহার মৃগাইটা গায়ে আঁটিয়া উড়ানখানা তাহার উপর ফেলিয়া একটা ছোট পুঁটুলির মধ্যে তাহার জিনিষপত্রগুলি পুরিয়া, পুঁটুলীটা হাতে করিয়া গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কানাইকে তদবস্থায় দেখিয়া অমরকুমার কিছু চিন্তিত হইলেন; বলিলেন, “কিরে, তুই কোথায় বাবি?” কানাই অগ্নান বদনে বলিল, “কেন, আপনি বেখানে যাবেন?”

অ। আমি যেখানে যাব ? আমি কোথায় যাব তার কিছু স্থিরতা আছে কি ?

কা। তা' যেখানেই হোক, একটা আরগার বেতে হবে ত আপনাকে ! যেখানে যাবেন, আমিও সেইখানে যাব ।

অ। আমার সঙ্গে কোথায় যাবি রে পাগল ! আমি ও সমুদ্রে গা ভাসান দিয়েছি ।

কা। আমিও তাই । যেখানেই থাকুন না কেন, আপনার একটা চাকর চাই ত ! একটা চাকর না হলে ত আপনার চলবে না । আমি আপনার সব কাজ করব, বাসন মাজব, হাটবাজার করব । আপনার কাজ করব, সব করব ।”

অমরকুমার মুহ হাসিয়া বলিলেন, “তাতে করবি জানি, কিন্তু আমার যে অবস্থা, এ অবস্থায় চাকর সঙ্গে করে নিয়ে বেড়ালো লোকে যে আমার পায়ে ধুলো দেবে !” কানাই উত্তেজিত স্বরে হাত-মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, “হা ধুলো দেবে ! ধুলো দিলেই হল ! আমি ও-সব শুন্ব না ; আমাকে নিয়ে যেতেই হবে । না নিয়ে গেলে কাজ করবে কে ? মা' ঠাকরুন্নিজে বাসন মাজবে নাকি ? আর তা ছাড়া আমি ও খোটা-মুখের কাছে চাকরী করতে পার্কি না ।”

অমরকুমার যখন বালক, উপেন্দ্র কিশোর-বাবু তখন কানাইকে অমরকুমারের ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন । কানাই ও তখন বালক ; অমরের প্রায় সমবয়স্ক ! বালাকালে কানাই অমরকুমারের সেবা করিত, যখন বাবা মরকার হইত, সেই কাজই করিত ; সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইত, আবার খেলাও করিত । ছোটো ছোট লুকো-চুরি, ঘুড়ি ওড়ানো, আবার

সময় সময় অমরকুমারের ঘোড়ার রাস ধরিত। সহিসের কার্যও সে করিত । তাহার পর অমরকুমার একটু বড় হইলে যখন স্কুলে ভর্তি হইলেন, কানাই তখন দুই বেলা তাহার বই স্নেট বহিয়া সঙ্গে যাই । কখনও কখনও লুকাইয়া অমরের পরিত্যক্ত প্রথম ভাগখানা পড়িত, স্নেটে আকা বাঁকা অক্ষরে ‘অ’ ‘আ’ লিখিতে চেষ্টা করিত । অমরকুমার এক একদিন তাহা দেখিয়া অতি আগ্রহসহকারে তাহার শিক্ষকতা করিতে নিযুক্ত হইতেন । অমরকুমারের গৃহ-শিক্ষক আসিলে অমর কানাইকে ডাকিয়া তাহাকে পড়া দিতে বলিতেন । অমরকুমারের যত্নে কানাই তৃতীয় ভাগ, শিশুবোধ প্রভৃতি শেষ করিয়া কেলিয়া-ছিল । লেখা পড়া জানিত বলিয়া ভৃত্য-মহলে তাহার বেশ একটু পশার জমিয়াছিল । অমরকুমার তাহার অকৃত্রিম প্রজ্ঞা দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন । আর কানাই আবাল্য অমরকুমারের সংশ্রবে থাকিয়া তাঁহাকে যেরূপ প্রজ্ঞা-ভক্তি করিত, সেইরূপ আবার দ্রুত ছেলের মত আবার করিতেও ছাড়িত না, আবশ্যক মত চোট-পাট জবাব করিতেও ভয় করিত না । অমরকুমার কিন্তু ইহাতে রাগ না করিয়া একটা আমোদ অল্পভব করিতেন । তিনিও মাঝে মাঝে কানাইকে লইয়া রহস্য করিতেন । সেই পূর্ব অধিকার-বলেই কানাই আজ অমরকুমারের বিনা অনুমতিতে অমরকুমারের সঙ্গে বাইবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল । কানাই, অমরের প্রিয়ভৃত্য কানাই ‘নাছোড়বান্দা’ । কানাইয়ের এরূপ ভাব দেখিয়া অমরকুমার কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন । কানাইকে ছাড়িয়া বাইতে

উহার মন কেমন করিতে লাগিল। অথচ কানাই সঙ্গে থাকিলে বুক ফুলাইয়া লোকের কাছে অমরকুমারের সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিবে। অমরকুমার কানায়ের প্রকৃতি ভালরকমই জানেন। তিনি কিন্তু তাহা আদৌ চাহেন না। বিশেষতঃ এ অবস্থায় উহাকে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইবে। কানাই কাছে থাকিলে, সে কাহার কাছে যে কি বলিয়া বসিবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। সেইজন্য তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু এমন সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। সেই ভিটেতেই বিজনকুমার-বাবু অমরকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে বা বিদায় দিতে সেই সময় সেই স্থানে আসিয়া দূর হইতে প্রভু-ভৃত্যের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি কানাইকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কি বলিলেন। তাহাতে কানাই তাহার পুঁটুলিটা গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া মাভূমি আনত হইয়া অমর কুমার ও আশালতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, “আপনারা তবে আশুন, আমি আর বাব না।”

হঠাৎ কানাইয়ের মত-পরিবর্তন দেখিয়া আশা ও অমরকুমার ব্যর্থ হইয়া নাই বিস্মিত হইলেন; কিন্তু নিশ্চিন্ত হইলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বহু লোক পদব্রজে টেলপ পর্বত সঙ্কে সঙ্কে চলিল। অমরকুমারের অভাবে আজিমগঞ্জ লুণ্ঠ্যন্তে গভীর তমসাজ্বর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

(৬)

উহার অরুণ আলোকে ধরণী উদ্ভাসিত।

রজনীর তিমিররাশি বিনাশ করিয়া পূর্বাধিকে নবীন অরুণ সমুদ্রিত। স্রোতোধিতা ধরিত্রী যেন নবতীব্র লাভ করিল। পাছে পাছে পাখা কুলায় পারত্যাগ করিয়া পক্ষ্মে গান ধরিল। রাখাল বালকগণ পাত্কা খাইয়া গাড়ী-বংস লইয়া মাঠের অভিমুখে চলিল। বাপ্পীয় শব্দট বেলা দেড়টা হইতে সমস্ত রজনী ছুটিয়া ছুটিয়া, প্রভাতে হাবড়া টেবনে উপস্থিত হইয়া ক্রান্ত ভাবে বিশ্রাম করিতে লাগিল। অমরকুমার ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং আশালতাকে লইয়া উপস্থিত তাহার একজন সহচায়া বন্ধুর আশ্রয়ে যাইবেন, মনঃস্থ করিলেন; তাবিলেন, দুই একদিন বন্ধুর গৃহে থাকিয়া একটা বাসা ঠিক করিয়া লইবেন। যথাসময়ে অমরকুমার বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। বন্ধুর সস্ত্রীক অমরকুমারকে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে, তিনি সংক্ষেপে তাহার কাহিনী বিবৃত করিলেন। শুদ্ধ তাহাতে ব্যথিত হইলেন না, বরং বিরক্ত হইলেন। যাহার অর্থ আছে সে অসৎ হইলেও সৎ, মূর্থ হইলেও পণ্ডিত, নীচ হইলেও উচ্চ; তাহার যতই দোষ থাকুক না কেন, অর্থ তাহার সকল দোষ ক্ষালন করিয়া দেয়। আর যে অভাগা লক্ষীর রূপালাভে বঞ্চিত, অগতে সে সকল প্রকার দোষের আকর। সে বিদ্বান হইলেও মূর্থ, সৎ হইলেও অসৎ, তাহার কুল, শীল, বংশ, মর্যাদা কিছুই তাহাকে সংসারে মান-সম্মান আদর-যত্ন দিতে পারে না। অর্থ-হীন ব্যক্তি আত্মীয়-বন্ধ, এমন কি মাতা-পিতা এবং নিজের সন্তান-সন্ততির নিকটেও অবজ্ঞার

হইয়া থাকে। অমরকুমারের বন্ধুটি তাঁহার কোনও বিশেষ আবশ্যক আছে বলিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। অমরকুমার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি চুপ্চাপে হইলেন না। সংসারের হালচাল তাঁহার নিকটে অজ্ঞাত ছিল না। বন্ধুটির ব্যবহার দর্শনে তিনি মনে মনে একটু হাসিলেন। আশালতাকে একটা আশ্রয়ে কিছুকণ না রাখিয়া তিনি একটা বাসা-টাসার বন্দোবস্ত করিতে পারেন না। কাজেই, তিনি আশালতাকে বন্ধুর বাটীতে বসাইয়া নিজে বাসার অহুসন্ধানে বাতির হইলেন। ভূতপূর্ব আজিমগঞ্জাধিপতির অঙ্ক-শায়িনী আজ পরের বাটীতে অনাদৃত ভাবে বসিয়া আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভক্তপত্নীতে দরিদ্র ভদ্রলোকদিগের সহিত একজু বাস করিবেন, মনঃস্থ করিয়া অমরকুমার সেইরূপ বাটী খুঁজিতে লাগিলেন। কেন না, এ অবস্থায় কলিকাতায় একা একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করা সহজসাধ্য নয়। সমস্ত দিন সহরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ-গলি সে-গলি করিয়া, অনেক কষ্টে তিনি এইরূপ একটা বাড়ীর অহুসন্ধান পাইলেন। দেখিয়া শুনিয়া বাড়ীর যে দুইটি ঘর খালি ছিল, অমরকুমার মাসিক দশ টাকা হিসাবে সেই দুইটি কক্ষ ভাড়া করিলেন। একটা ঘিতে লম্বা-ঘর, অপরটি নীচে রন্ধনের কক্ষ।

বাড়ী, ঠিক করিয়া অমরকুমার আশালতাকে বন্ধুগৃহ হইতে লইয়া আসিলেন। অমরকুমারের বিদায়কালে বন্ধুটি সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত করিবার অবসর পাইলেন না। অমরকুমার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,

বন্ধু গৃহে নাই। অমরকুমার ভৃত্যকে বলিলেন, “তোমার বাবু এলে তাঁকে আমার ধন্তবাদ জানিয়ে বোল, তাঁর দ্বারায় আমার বখেটে উপকার হয়েছে। সমস্ত দিন তাঁর একটা ঘর জোড়া করে রেখে তাঁর বড়ই অস্থবিধা করেছি, তার জন্তে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।”

‘খার্ড ক্লাস’ গাড়ীর লাল-রংয়ের শীর্ষকায় অস্থিপঞ্জরসার অধিনী-নন্দনবয় বন্ বন্ শব্দে যথাসক্তি ছুটিতে ছুটিতে সন্ধ্যার পর অমরকুমার ও আশালতাকে তাঁহাদের নব-নির্ম্মাচিত বাসায় পৌছাইয়া দিল। অমরকুমার আশালতা ও ট্র্যাঙ্ক দুইটাকে নামাইয়া লইয়া গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিলেন। দুইটা তরুণ যুবক আসিয়া অমরকুমারের ট্র্যাঙ্ক-দুইটি বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। অমরকুমার লাক্ষ্যত হইয়া বাস্তবাবে বলিলেন, “ওকি ম’শায়! থাক থাক, আপনারা আবার কষ্ট ক’রে ও-গুলো বইছেন কেন? আমি নিয়ে যাচ্ছি।” একজন হাসিয়া বলিল, “বাবু! আপনি একলা এই ভারি ভারি ট্র্যাঙ্কগুলো নিয়ে যাবেন কি করে?”

বাড়ীটিতে অনেকগুলি ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া বাস করেন। আশালতার আগমন-সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র মহিলাগণ অগ্রসর হইয়া চিরপরিচিতের জ্ঞান আশালতাকে আদর-যত্নের সহিত অন্তর-মধ্যে লইয়া গেল। গৃহে প্রবেশমাত্র বাটীস্থ ছোট ছোট ছেলেরা সকলে আশালতাকে ঘেরিয়া ফেলিল, এবং অল্পকণ-মধ্যেই তাহাদের আশালতার সহিত বেশ সন্দ্বীতি হইয়া গেল। কোন বালক ‘কাকীমা’, কেহ ‘মাসীমা’, কেহ বা

‘বউ দিদি’, বলিয়া আশালতার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ফেলিয়া বেশ আপনার জন করিয়া লইল। একজন রমণী আশালতাকে কলের ঘর দেখাইয়া দিয়া কাপড় কাচিতে বলিল। আর একজন তাঁহাদের আমি-ত্বকে সেই রাজির মত তাঁহাদের নিকটে থাইবার জন্ত অহরোধ করিল; বলিল, “দিদি, আজকে এই নতুন আসছে, আজকের রাতটায় আমাদের কাছেই বা’ হোক খুন্ কুঁড়ো খেতে হবে, নইলে ছাড়ব না। কাল তখন সকাল বেলায় দেখে শুনে হাট-বাজার করে নিয়ে হাঁড়ী কেড়ে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে নিও।”

সেই সকল দরিদ্র ভদ্রগৃহস্থ-পরিবারের অকপট প্রীতি আশালতার নিকটে বড়ই মধুর বোধ হইল। অমরকুমার একটা ঘুবকের সাহায্যে ট্র্যাক্স-হুইটা ও বিছানা-পত্র, যৎ-সামান্য সঙ্গে বাহা ছিল, সমস্ত উপরে তুলিয়া আনিলেন। ঘুবকটি ঝিকে ডাকিয়া অমরকুমারের ঘরটি মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইতে আদেশ করিল। বাড়ীতে একটা মাত্র ঝি আছে, সেই সকলের বাসন মাঝিয়া রান্নাঘর ধুইয়া দিয়া থাকে। সকলে মিলিয়া যাহার যেমন কাজ তদনু-রূপ মাহিনা দিয়া থাকেন। ঝি জল আনিয়া আদেশ-মত অমরকুমারের ঘরখানি বেশ করিয়া ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু, জল-খাবার এনে দোব কি?” অমরকুমারের তখন মনে পড়িয়া গেল, আজ তাঁহাদের সমস্ত দিন আহার হয় নাই। এতক্ষণ চিন্তায় পরিশ্রমে উৎকর্ষায় তিনি আহারের বিষয় একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। ঝিের হাতে একটা টাকা

দিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ, নিয়ে এস কিছু। আজ সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয়নি।” ঝি আশ্চর্য হইয়া বলিল, “জ্যা? সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয় নি? বাড়ী থেকে খাওয়া পাওয়া করে বেরোন নি বুঝি?”

অমরকুমার বলিলেন, “না, কাল ছপুয়-বেলায় খেয়ে বেরিয়েছিলুম। আজ সকালে এসে পৌঁছেছি। তারপর এই সমস্ত দিন বাড়ী খুঁজতেই কেটে গেল।”

“আহা! আপনার বাড়ী বুঝি অনেক দূরে? এখানে বুঝি কেউ আপনার জন নেই? আতা, সমস্ত দিন ভাত পেতে পড়েনি গা! কি বেয়া!” বলিয়া ঝি তাড়াতাড়ি প্রস্থানোন্মত হইল। তাহার পর আবার ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কতকের জলখাবার আনব? কি আনব?” অমর বলিলেন, “গা হোক দেখে শুনে কিছু নিয়ে এস গে।”

ঝি চলিয়া গেল। অমরকুমারের সখী ঘুবকী অমরকুমারের ঘরটা শুছাইয়া বিছানা পাতিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দিল। অমরকুমার হাত-মুখ ধুইয়া আনিয়া দেখিলেন, সমস্ত কাজই ঠইয়া গিয়াছে। অমরকুমার সঙ্গে বলিলেন, “এ কচ্ছেন কি? বিছানা-টিছান এখন করে নেওয়া যেত, আপনি কেন এর কষ্ট কচ্ছেন?” ঘুবকী সহায়ে উত্তর করিলেন “আপনি আজ আমাদের গৃহের অতিথি আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি যাই চারটি ভাতের যোগাড় দেখি গে।”

অমরকুমার বলিলেন, “আবার তা কেন? আজকের রাতটা জল টল খেয়ে কাটানো যেত এখন?”

“বাড়ীতে মানুষ থাকতে কি তা’ হয়।

বলিয়া যুবক সম্বর তাঁহার মাতার নিকটে আসিয়া বলিল, ‘মা আজ যে ভক্তলোকটি এসেছেন, ঠুঁদের আজ সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি, ঠুঁদের জন্তে চারটি চাল নাও । আমি বলে এসেছি, ঠুঁরা আজ এইখানে থাকেন ।’

জননী উত্তর করিলেন, “ঠুঁদের জন্তে যে শিবুর মা রান্না কচ্ছে ।”

কি জল খাবার আনিয়া দিল । অমরকুমার কিছু জলযোগ করিলেন । যুবক তাঁহাদের খাওয়াইতে না পারিয়া কিছু ক্ষুধা মনে চলিয়া গেল । ক্রমশঃ রাত্রি হইল । বাবুরা সকলে ক্রমে ক্রমে একে একে আফিস হইতে প্রত্যাগত হইতে লাগিলেন । বাড়ীর সকল ভাড়াটিয়া-গুলিই আফিসের কর্মচারী । কেহ বৃদ্ধ, কেহ প্রৌঢ়, কেহ যুবক । সকলেই সুপরিবারে বাস করেন । আবার বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়ের উপরুক্ত পুত্রও আছেন ; কেহ স্ত্রুল, কেহ কলেজে অধ্যয়ন করেন । বাহিরে বসিবার জন্য একটা বড় বৈঠকখানা ঘর আছে । একে একে বাবুরা সকলে সেইখানে সমবেত হইতে লাগিলেন । দিবসের শ্রমাপনোদনের জন্য কেহ তাস, কেহ পাশা, কেহ বা দাবা বঞ্চে লইয়া বসিলেন । আবার কেহ কেহ বা বাটার বহির্দেশে রকের উপর বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, অথবা গল্প জুড়িয়া দিলেন । লোকগুলি সকলেই বেশ অমায়িক, গুরুবিরহিত, সদালাপী । আজ তাঁহাদের একজন নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া সকলেই বেশ আলাপ-পরিচয় করিয়া লইলেন । অমরকুমার বলিলেন, তিনি বিদেশী, চাকরি-বাকরির আশাতেই কলিকাতায় আসিয়াছেন, এবং বাড়ীতে আর

কেহ আত্মীয় না থাকিতে বাধ্য হইয়া ব্রীকে সঙ্গে লইয়া আসিতে হইয়াছে । একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, “পড়া-শুনো কতদূর পর্যন্ত হয়েছে আপনার ? পাশ-টাস কিছু করেছেন কি ?”

বিনীত ভাবে অমরকুমার উত্তর করিলেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যা হোক ক’রে এম-এটা পর্যন্ত উঠেছি ।” একজন বিছানার উপরে সজোরে একটা মুষ্টাঘাত করিয়া সহাস্তে বলিয়া উঠিলেন, “তবে ত কেজা মেরেই দিচ্ছেন । আপনার আবার চাকরীর ভাবনা কি ! যেখানে যাবেন, সেইখানেই আপনাকে লুকে নেবে ।”

রাত্রি দশটা বাজিল । ক্রমে বাবুরা আহাৰাদি সম্পন্ন করিয়া লহলেন । বাহার পত্নী আশালতা ও অমরকুমারকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তিনি অতিসমাদরের সহিত অমরকুমারকে সঙ্গে করিয়া গৃহ-মধ্যে আনিয়া আহাৰ করাইলেন । অমরকুমার ও আশালতার সহিত সকলেরই বেশ সন্ডাব হইয়া গেল ।

অমরকুমারকে বিদ্যানু আনিয়া ছেলেদের দল প্রায়ই তাঁহার নিকটে নিজেদের পাঠ্য-বিষয় বুঝিয়া লইতে লাগিল । কেহ তাঁহাকে বলে, “অমর দা, এটা কি বলে দিন না ।” কেহ বলে, অমর কাকা, এর অর্থ কি ? ইত্যাদি ।” এইরূপে সকলে তাঁহাকে কেহ দাদা, কেহ কাকা বলিয়া সম্বন্ধ পাতাইয়া আপনার মন করিয়া তুলিয়াছিল । অমরকুমার এবং আশালতা এই গৃহস্থ ভ্রূপরিবারদ্বিগের সহিত বাস করিয়া এক অপূর্ব স্বস্তি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । নিজেদের অবস্থা স্বরণ করিয়া

দাশালভার বনে পড়িয়া বাইত কানীয়া-
দাসের সেই শ্রীবৎস-রাজের উপাখ্যান। রাজ্য-
ধন পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ শ্রীবৎস যেমন
কঠুরিয়া-ভবনে আশ্রয়গোপন করিয়া সতীক
বাস করিতেছিলেন, অমরকুমারও সেইরূপ
খেছার বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া
সাধারণ ভাবে সাধারণের সঙ্গে বাস
করিতেছেন।

চাকরীর অস্ত্র অমরকুমার চেষ্টা করিতে
লাগিলেন। কিন্তু এম এ, পাশ বলিয়া কেহ
তাঁহাকে লুফিয়া ত লইলই না, বরং অনেক-
স্থলে তাঁহাকে হাত্তাঙ্গপ হইতে হইল। অনেক
চেষ্টার পরে বহুকষ্টে অমরকুমার একটা
'মার্কেট আফিসে' পঁচিশ টাকা মাসিক বেতনে
কেরানীগিরির পদ প্রাপ্ত হইলেন। আপাততঃ
অমরকুমার সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই গ্রহণ করিলেন।
সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বেলা নয়টার
সময় ভাত খাইয়া তিনি আফিসে বাইতেন;
পাঁচটার গৃহে ফিরিতেন। দিনগুলি বেশ এক-
রকম কাটিয়া বাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে
রাধাগোবিন্দবাবুর আদেশ-মত অমরকুমার
তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন।—

শ্রীচরণকমলেন্দু।

কোঠা-মহাশয়! শুনিয়া সুখী হইবেন,
আমি এখানে একটা মার্কেট আফিসে মাসিক
পঁচিশ টাকা বেতনে চাকরি করিতেছি।
আপনাদের শ্রীচরণের আশীর্বাদে আমরা
বেশ আছি কোন অভাবই জানিতে পারি নি।
আমি দেখিতেছি, মানুষ নিজের ভঃগ-কষ্ট,
নিজের বৈত সে নিজেই টানিয়া আনে।
'এটা না হলে আমার চলবে না', 'ওটা না
থাকলে বড় কষ্ট হবে', এইরূপ কল্পনাই

মানুষকে যন্ত্রণা দেয়। 'এটা চাই', 'ওটা
চাই' এই বাসনাই মানুষের অভাবের
সৃষ্টি করে থাকে। তখন অনর্থক মাসে
মাসে কত টাকাই না নষ্ট করেছি! বুঝা
কতকগুলো দাস-দাসী খাটাইয়াছি। কল্পনায়
অভাবের সৃষ্টি করিয়া রাশি রাশি অর্থব্যয়
করিয়াছি। আর আজ এই পঁচিশটা টাকা-
তেই আমার বেশ চলিয়া যাইতেছে। এই
পঁচিশ টাকাতাই আমাদের সমস্ত ব্যয় সঙ্কলান
হইয়া যাইতেছে। অথচ কোন কষ্টই
আমাদের নাই। আপনি আমার ভক্তি-
পূর্ণ প্রণাম জানিবেন। পুণ্ডরীক মাফু-
সমা কোঠাইনাকে আমার ভক্তিপূর্ণ অল্প
প্রণাম জানাইবেন। নীলমাকে স্নেহাশীর্বাদ
দিবেন। ইতি—

প্রণত

আপনার অমর।

যথাসময়ে পত্র রাধাগোবিন্দ-বাবুর হস্ত-
গত হইল। বলা বাহুল্য, পত্র পাঠ করিয়া
রাধা গোবিন্দবাবু মোটেই সুখী হইলেন না;
তৎপরিবর্তে অশ্রুমোচন করিলেন। "যে
অমরের সামান্য একজন ভৃত্য মাসে পঁচিশ
টাকা বা ততোধিক টাকা বেতন পাইত,
আজ সেট অমর কিনা নিজে একটা স্তম্ভ-
গরি আফিসে পঁচিশ টাকা মাহিনায় চাকরি
করিতেছেন। হা ভগবান্, শেষে কি অমরের
অদৃষ্টে এই লিখে ছিলো! ধন্ত নিরতি! কিন্তু
অমরের সহিত্যতাকে শত ধন্তবাদ। আফিসে
সাধারণের তায় হাড়া-ভাল্লা খাটুনি খাটিয়া
পঁচিশটি টাকা পাইয়াই তিনি সন্তুষ্ট! স্বাধি
আর কাহাকে বলে! ইহারই নাম অধি! এত
অমরের খেছাকৃত দৈন্ত। বিপুল সম্পত্তি

বেচ্ছার পরকে বিতরণ করিয়া দিয়া নিজে হারিজোর বোকা মাথায় বহন করিতেছেন। ইত্যাদি।”—তিনি বলিতে লাগিলেন।

(৭)

একদিন অমরকুমার আফিস হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া একপানা সংবাদপত্র ক্রয় করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে ডিটেকটিভ বিজনকুমার। তেমন সময়ে বিজনকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বিজনকুমার অমরকে দেখিয়া সচাসো বলিয়া উঠিলেন, “কি অমরবাবু যে? এমন সময় এখানে দাঁড়িয়ে কেন?”

অমরকুমার ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমি যে এই আফিসে কাজ করছি।” বিজনবাবু বলিলেন “হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছিলাম বটে, দেওয়ান্দার মুখে। তিনি এর অস্ত্রে একদিন হুংখ করছিলেন। আমার অভট্টা স্বরণ ছিল না। মাগ্‌কুবেন! যাই হোক, আপনার সঙ্গে আর যে কখনও দেখা হবে, সে ভরসা ছিল না। আপনাকে বেখে বড় আফ্লাদ হোল।

অ। কবে এলেন এখানে? কোন দরকারে এসেছেন কি?

বি। হ্যাঁ, একটা জিনিষপত্র কেনবার একটু দরকার ছিল।

অমরকুমার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “অমরবাবুকে ত যাই হোক পাওয়া গেল; কিন্তু শহরের হত্যাকারীদের ত কোস সাজসজ্জান পাওয়া গেল না।”

বিজনকুমার একবার অমরকুমারের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন, “ঠিক, কই আর পাওয়া গেল!” কথায় কথায়

উভয়েই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে বহবাঙ্গারের মোড়ের মাথায় উপস্থিত হইলে অমরকুমার যথারীতি অভিবাदन করিয়া বাসার অভিমুখে চলিলেন। বিজনকুমার অমরকুমারের নিকট কাগজখানা চাহিয়া লইয়া টামে উঠিয়া তাহা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছু পরেই শিয়ালদহের মোড়ে নামিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে একটা সরু গলির ভিতর তিনি ঢুকিয়া পড়িলেন; দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, দুইজন লোক পরস্পর সাম্না সাম্নি দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে কথা কহিতেছে। গলির ভিতরটার গালালোক নিতান্ত বিরল ছিল। সেই অস্পষ্ট আলোকে বিজনবাবু লোক-দুইটাকে ভাল দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহাদের কথা-বার্ত্তা শুনিবার জন্য তাঁহার মনে কেমন একটা কৌতূহল হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। সে গলির ভিতর লোক-চলাচল খুব কম। বিজনকুমার অল্পক্ষণ সেখানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার নিজেদের কথায় মত্ত ছিল। বিজনবাবুকে কেহ বড় একটা লক্ষ্য করিল না। এক ব্যক্তি বলিল, “ভবিষ্যতে যে এমন ধারা ঘটবে তাকি আর তখন জানতুম! তাহলে কি আর সে ছেলের টাকে হাতছাড়া করি! সে থাকলে এখন আমাদের মুঠোর ভিতর থাকত।” অপর ব্যক্তি বলিল, “মুঠোর থাকত কি, মুঠোর ভিতর আমাদেরই পুত্তো, তা ঠিক আছে কি। সে না থাকতেই বরং মজল হয়েছে। বুঝতে পাচ্ছি না। তুইও যেমন! সে থাকলে আমাদের বুড়ো আতুল দেখাতো।”

প্রথম ব্যক্তি। তা'বাই হোক, এখন ত' অনেক কষ্টে এক ব্যাটাকে ছোটানো গেছে। দেখা যাক নশীবে কি আছে! ছোঁড়া কোন রকমে না ঘেবড়ে যার!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বেশ দৃঢ়তার সহিত বলিল, "তার জন্তে ভাবিস নি। সে ঘাবড়াবার লোক নয়। এই দেখ্ না কোন দিন আমাদের নে-মন্তর-পন্তর আসে এই! শ্রামটাদকে তুই সাধারণ লোক মনে করিস নি। সে তোকে আমাদেরও এক হাটে বেচে আর একহাটে কিনে নিয়ে আসতে পারে সে বিষয়ে নিশ্চিত থাক্। এতদিন গিয়ে সে গদীতে গিয়ে বসেছে, তা দেখিস।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "কিন্তু আমাদের তা হলে কোন খপর দিলে না কেন?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "কোথায় আমাদের খপর দেবে? আমরা তো আর এক যায়গায় স্থির নেই! কথা তো ছেল, আমরাই গিয়ে খপর নোব।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "তবে চ, কাল পরশু নাগাদ এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যাক্। দেখা যাক্ কি হল।"

লোক-দুইটি ফিরিল। বিজনকুমার ও তাড়াতাড়ি তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া একটা চুকটে অগ্নি-সংযোগপূর্বক টানিতে টানিতে বেশ সন্তোষভভাবে বলিলেন, "ও মশয়!

শিয়াল-দা, ঘাব কেন কইতে পারেন? আমি আজ কলকাতার নুতন্ আস্‌সি, পথ-ঘাট চিন্তার পারি না। অহুগ্রহ কইয়া দ্যাচারে দ্যান্!"

জুজু হইয়া তাহারা বলিল, "আরে মর! শালার কথা শোন! আমরা কি তোর বাবার চাকর নাকি, যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব? শালা কচিথোকা! পথ হারিয়ে ফেলচেন্।" বলিয়া তাহারা হন্থন করিয়া চলিয়া গেল। তাহারা যখন একটা গ্যাস-স্তম্ভের নিকটবর্তী হইল, সেই অবসরে বিজনকুমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের পথ দেখিয়া লইলেন, এবং "ও মোশয় চটেন ক্যান? চটেন ক্যান? দয়া কইয়া ক'য়ে দান না, কোন্ পথে যাব? আপনারা বার্মা মইন্ কলকাতায় আছেন, পথঘাট চিন্তার পারেন্।" ইত্যাদি বলিতেই তাহাদের অহুসরণ করিতে লাগিলেন। লোক-দুইজন কিছুক্ষণ সোজা পথে চলিয়া তাহার তাহার পর আঁকা-বাঁকা পথ ধরিল। এ-গলি সে-গলি করিয়া হঠাৎ কোন্ গলির মধ্যে তাহারা ঢুকিয়া পড়িল, বিজনকুমার আর তাহাদের দেখিতে পাইলেন না। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর চিন্তিতাঙ্গত্ব করণে নিজের কার্যে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রীতাক্ষশীলা মিত্র।

গানের স্বরলিপি।

ভীষ্মপল্লী—ভরতঙ্গ।

কখন হাসি, কখন কাদি,
কখন গাই গান,
ঠিকানা তার নাইকো কিছু,
দয়াল ভগবান!
আপন মনে খেয়াল মত
আপন ধ্যানে আপনি রত,—
কোথায় আলো, কোথায় কোথা,
চায় না ফিরে প্রাণ!
দয়াল ভগবান!
একলা আমি বিশাল ভবে
‘দয়দী’ কেহ নাই,—
জুড়াতে মোর হৃদয়খানি
পাই নি কণা ঠাই!
ভাবনা তায় নাইকো তবু
খেয়ালি! তুমি আমার প্রভু,
খেয়ালে তব জনম মম,
খেয়ালে অবসান!
দয়াল ভগবান!

রচনা—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্ত।

আহ্বায়ী।

H { জা মা মা | পা পা । | মা জা জা | রা সা । ।
ক খ ন হা সি . ক খ ন কা দি .

I গা সা জা | মা মা । | পা -া -া | -মা -জা -া ।
ক খ ন গা ই . গা . ন . . .

১' . ১' .
I -১ -১ পা | পা পা মমা I পা -পা গা | ১ ধা পা I
• • ঠি কা না তার না হ কো • কি ছ

১' . ১' .
I পধা -পা মা | -জা জা মা I পা -১ -১ | ১ ১ ১ II
দ• • রা ল ভ গ বা • ন • • •

১ম অন্তরা।

১' . ১' .
II { ১ ১ পা | জাজা জা মা I পা না -১ | না সা ১ I
• • আ পন ম নে ধে রা ল ম ভ •

১' . ১' .
I ১ ১ সা | ননা সা জরী I সা -না না | সা সা ১ I
• • আ পন ধা নে• আ প্ নি র ভ •

১' . ১' .
I ১ ১ পা | সর্সা রী রী I ১ সা গগা | ১ ধা পা I
• • কো ধায় আ লো • আ ধার • কো ধা

১' . ১' .
I মা -পা না | ১ না না I সা -১ -১ | ১ ১ ১ I
চা হ্ না • কি রে আ • গ • • •

১' . ১' .
I পধা -পা মা | -জা জা মা I পা -১ -১ | ১ ১ ১ II
দ• • রা ল ভ গ বা • ন • • •

২য় অন্তরা।

১' . ১' .
II { ১ ১ পপা | পা জা মা I পা না -১ | না সা ১ I
• • এক লা আ মি বি লা ল ভ বে •

১' . ১' .
I ১ ১ সর্সা | জা -রা -১ I ১ সা না | সা -১ -১ I
• • 'দর' রা • • • কে হ না • হ

I ১' সী সী | সী রী -১ | সী গা -১ | ধা পা -১ I
• জু ড়া তে বো র জু দ র ধা নি •

I ১' মা পা মা | -জা জা মা I পা -১ -১ | ১ ১ ১ } II
পা ই নি • ক গা ঠা • ই • • •

৩য় অন্তরা ।

II ১' ১ ১ মমা | পা জা -মা I পা না না | সী সী -১ I
• • তাব না তা য না ই কো ত বু •

I ১' সী জী জী | -রী সী সী I না নাঃ -সঃ | সী সী -১ I
ধে যা লি • তু মি আ মা র প্র জু •

I ১' ১ ১ পসী সী | সী সী ১ | ১' গা সী গা | ধা পা ১ I
• ধো লে ত ব • জ ন ম ম ম •

I ১' মা পা জা | ১ জা মা | পা -১ -১ | ১ ১ ১ } I
ধে যা লে • অ ব সা • ন • • •

I ১' পধা -পা মা | -জা জা মা I পা -১ -১ | ১ ১ ১ } II
দ • • রা ল ত গ বা • ন • • •

লীনার শিক্ষা।

(৪)

আট দশ মিনিট সময় যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিল, লীনার কিছুই বুঝিবার শক্তি রহিল না। হঠাৎ এক সময় দুই কাণের পাশে দুই বিভিন্ন কঠোর আছান-ধ্বনি এক সঙ্গে শুনিতে পাইয়া, আত্ম-বিস্মিতা লীনার ভিতর অজ্ঞাতেই আত্ম-সংবরণ-চেষ্টার একটা মুক্ ব্যাকুলতা ঘনাইয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গেই অপরিসীম বিস্ময়ের সহিত সে অমুত্তব করিল, তাহার চোখের সামনে হইতে পৃথিবীর সমস্ত আলো অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, এবং মাথাটাও ঠিক চিরান্ত্যস্ত নিয়ম-মত ঘাড়ের উপর সোজা হইয়া নাই; সে যেন দেহের সঙ্গে বগড়া করিয়া কোন এক চনি-রীক্ষা ব্যবধানের অঙ্কে ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া, একটা প্রচণ্ড কঠোর অবলম্বনের অঙ্কে আত্ম-নির্ভর করিয়া ক্রান্তিভরে ধুকিতেছে।

লীনা সঙ্গেরে মাথাটা টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। মাথা আবার সেই কঠিন অবলম্বনের অঙ্কেই সশব্দে ঠক্‌ করিয়া আছড়াইয়া পড়িল। নিজের মাথাটার পর্য্যন্ত এই অভাবনীর অবাধ্যতা দেখিয়া ভয়ে লীনার বুদ্ধি-তত্ত্ব লোপ পাইল!—হায়, হায়,—পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই,—এমন কি নিজের দেহেন্দ্রিয়গুলা পর্য্যন্ত তাহার বিকছে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল! তবে আর সে কাহাকে কি বলিবে? লীনা হতাশ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল!

“যেম সা’ব যেম সা’ব!”—বলিতে বলিতে আঁচা পিছন হইতে পিঠের উপর

ঝুকিয়া পড়িয়া, সবদে লীনাকে টানিয়া টেবিলের উপর হইতে তাহার মাথাটা তুলিয়া চেয়ারে সোজা করিয়া তাহাকে বসাইতে গেলে, সামনে টেবিলের উপরকার উজ্জল আলোর তীব্রচ্ছটা চোখে পড়িতেই লীনা যন্ত্রণাজড়িত কণ্ঠে বলিল, “কমাও, কমাও, চোখ গেল।”

‘বয়’ পালশেই দাঁড়াইয়াছিল, চট্‌ করিয়া আলোটা তুলিয়া, অন্তরিক্তে একটা টেবিলের উপর রাখিতে গিয়া, অসাবধানে একটা ছোট ‘টিপার’ সশব্দে উর্টাইয়া ফেলিল! আকস্মিক শব্দ-অভিঘাত দুর্বল প্রবেশজিহ্বের উপর বড় বেনী জোরে বাজিল।—আহত-স্বরে লীনা বলিল, “কাণ গেল রে বয়, উঃ তোরাই আমায় হত্যা করিল!”

প্রৌঢ়া মাত্রাজী খুঁটান আঁচাটি বহুদিন হইতে লীনার সঙ্গে ঘুরিতেছে, সেবা-শুশ্রূষা ও সময়োচিত কর্তব্য নির্ধারণে বুদ্ধি খাটাইতে, তাহার হাড় পাকিয়া গিয়াছে। বালক ভৃত্যটিকে নীরব ইঙ্গিতে স্থির থাকিতে উপদেশ দিয়া, সাবধানে স্ককোশলে লীনার হাতা দেহটি চেয়ার হইতে সবদে নিজের বুকে তুলিয়া পাশের ঘরে বহিয়া লইয়া গিয়া সে লীনাকে শয্যায় ফেলিল। অত আঁচাটি তখন রান্না-ভাঁড়ারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল। লীনার আকস্মিক অসুস্থতার খবর পাইয়া সেও ছুটিয়া আসিল। হইজনে ‘মেলিং সন্ট’, বরফ, ‘আইস-ব্যাগ’, দুধ, ব্র্যাতি লইয়া সাময়িক শুশ্রূষা নিযুক্ত হইল। চাকরেরা বাহিরে জমা হইয়া চুপি চুপি

জটলা পাকাইয়া সশকতিতে সময় কাটাইতে লাগিল ।

ঘণ্টা-ছুই পরে ক্ষতচরণে পিকক্ কুঠিতে ঢুকিয়া, সটান ‘ড্রিং রুম’ আসিয়া একটা কৌচের উপর সশব্দে ধড়াস করিয়া শুইলেন । তাহার বাপ-প্রাশ্নে তখনও উত্তেজনার স্বভাবহিতেছে, মুখ লাল, কপাল দিয়া বাম করিতেছে । চাকরেরা ছুটিয়া আসিয়া, জ্বরারের পদ্যর আড়ালে দাঁড়াইল, কিন্তু মিনিট-দশেক প্রভুর কোন সাড়া-শব্দই পাওয়া গেল না । অগত্যা অভাগা জুন্ননকে ‘মরিয়া’ হইয়া সামনে আসিতে হইল, এবং সম্মুখে জানাইতে হইল, ‘বাথরুম’ তাহার স্নানের বন্দোবস্ত সমস্তই ঠিক করা আছে, এবং পোষাক বদলাইয়া রাজ্যের আহারে বসিবার নির্দিষ্ট সময়টা উপস্থিত হইতে আর বেহী দেবী নাই ।

পিকক্ সবেগে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া আসিলেন, মেঝের ম্যাটিংএর উপর সজোরে জুতা ঠুকিয়া, রক্ত চক্রে কঠোর গর্জনে বলিলেন, “কে তোকে অনাবশ্যক মধ্যাহ্নভোজনে পাঠালে ?”

সত্তরে পিছু ছাটিয়া ভৃত্য অভিভূত কণ্ঠে উত্তর দিল, “কেউ না হজুর, আপনার ঘড়ি—রে—বাঁধা সময় আমি জানি ।—”

উত্তরটা হজুরের মোটেই মনঃপূত হইল না;—তিনি এই ব্যাপারে বাহার নাম চাহিতেছিলেন, তাহার নামটা সম্পূর্ণ উল্লেখ থাকিয়া যায় দেখিয়া, নিজেই কষ্টস্বরে স্পষ্ট-বাক্যে জ্ঞপাইলেন,—“মেম সা’ব ?”

প্রভুপত্নীর সম্মুখে প্রভুর মনের ভাবটা মাঝে মাঝে যে বিষম বক্র হইয়া উঠে,—সে

তথ্যটা ভৃত্যদের বিশেষরূপে জানা ছিল । কারণ, পত্নীর উপর যথেষ্ট প্রতিহিংসা তুলিবার প্রকৃষ্ট উপায় যে ভৃত্যদের সামনে পত্নীর প্রতি অসম্মানসূচক ব্যবহার করা, এবং তাহাতেই যে তাহার স্বামিদের পৌরুষ ও ভজ্ঞত্বের মহিমা খুব চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠে—এ সম্বন্ধে পিককের কোন দ্বিধা, কোন দ্বন্দ্বই অন্তরে ছিল না; অন্ততঃ বাহিরের ব্যবহারে তাহা নিরঙ্কুশ সত্যরূপে প্রকাশ পাইত । কাজেই পুরাতন ভৃত্যরা প্রভুকে চটিতে দেখিলেই প্রভুপত্নীর সম্মুখে সতর্ক হইয়া কথা বলিত ।

জুন্নান ভিতরে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন এবং ভীত হইয়া উঠিলেও, বাহিরে দৈর্ঘ্য বজায় রাখিয়া স্পষ্ট স্বরে বলিল, “না হজুর, চায়ের টেবিলেই তাঁর মুছার উপক্রম—।” জুন্নান ঢোক গিলিয়া কথাটা সামলাইয়া লইল; বিনা প্রশ্নে কোন সংবাদ জ্ঞাপন প্রভু যে সময় সময় মোটেই সহ্য করিতে পারেন না, এবং অস্বাচিত ভাবে এ সব তাহাকে জানাইতে বাওরা, তাহার মত ক্ষুদ্রপ্রাণ ভৃত্যের পক্ষে যে যথেষ্ট বিপজ্জনক,—ছুই ভয়ই তাহার মনে পড়িল ! কথাটা উল্টাইয়া লইয়া জন্তে বলিল, “তিনি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন ।”

সন্দিগ্ধ জুর কটাক্ষে ভৃত্যের মুখ-পানে চাহিয়া পিকক্ দাঁতে দাঁত পিষিয়া অকথা গালি উচ্চারণ করিয়া জানাইলেন, কালই তাহাকে পুলিশের হাতে দিবেন, অথবা জেলে পুরিবেন ! কথার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উঠিয়া গেলেন ।

দৈনিক অভ্যাস-মত রাজ্যের স্নান সারিয়া পোষাক বদলাইয়া পিকক্ যখন আহারের

টেবিলে উপস্থিত হইলেন, তখন লীনা উঠিয়াছে। অডি-কলোনে ভিজানে ক্রমাল কপালে বাধিয়া, টেবিলের পাশে একটা চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া শুষ্ক বিষন্ন মুখে সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পিকক্ তাঁহার কড়া-গাভীয়া অবিকৃত বজায় রাখিয়া, নীরবে চেয়ার লইলেন। আহার আরম্ভ হইল, দুইজনেই নীরব।

খানিকটা সময় গভীর নিশ্চিন্ততা বোধে ঘুমাইয়া লীনার অবসাদ-গ্রাসিত বদন তখন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু অসময়ে ঘুম ও অতৃপ্ত নিদ্রার আলসো, শরীর ক্রিষ্ণ অস্থি বোধ হইতেছিল। একান্ত অনিচ্ছা ও ক্ষুধাহীনতা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র নিছক ভয়ের খাতিরে সে উঠিয়া আসিয়া আহারের টেবিলে বসিয়াছিল। গুরুপাক খাদ্যের ভিশ্ণুলা সে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইতেই পিকক্ বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়া পরিবেশনকারী ভৃত্যকে বলিলেন, “সবরদার নিয়ে যেতে পাবি না, সব রেখে যা।”

লীনা বিনা প্রতিবাদে নতশিরে ডিস্ টানিয়া লইল, কিন্তু মর্মান্তিক ক্ষোভে তাহার চোখে জল আসিতেছিল।—যে খাদ্য তাহার পাকস্থলীতে সহিবে না, সে খাদ্যও স্বামীর ক্রুদ্ধ হৃদয়ের ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলাধঃকরণ করিতে হইবে! নিজের আহারের উপর পর্য্যন্ত তাহার এতটুকু স্বাধীনতা নাই। এমনই প্রচণ্ড কঠোর মমতার অত্যাচার তাহাকে নির্জ্বাধে সহিয়া চলিতে হইবে!

কিন্তু ভিতরে যত রাগই নিঃশব্দে উদ্ভাপে ফুটিতে থাকুক, দাস-দাসীদের সামনে কেলে-

হারী ধরা পড়িবার ভয়ে লীনা নিঃশব্দেই আত্মদমন করিয়া রহিল। সমস্ত খাবারই মুখে বিয়ের মত তিক্ত বিষাদ বোধ হইতেছিল, তবুও গাথের জ্বরে সমস্ত গলাধঃকরণ করিতে হইল; কিন্তু কোন ডিশ্ই নিঃশেষে উজাড় করিয়া যাগের প্রদাত্ত বজায় রাখিবার ক্ষমতা তাহার কুলাইল না। যতটা খাইল, তার ঢের বেশী ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হইল।

পরিবেশনকারী টেবিলের পাশ দিয়া দ্বিতীয় বার ঘুরিয়া যাইবার সময়, লীনা মুচ-স্বরে তাহাকে বলিল, “মালদতের সেই আমটা নিয়ে এস।”

দুইটা পোড়িলের পেটে ‘আম সাওয়াইয়া’ আনিয়া ভৃত্য টেবিলে দিল। কিন্তু সে পিছন ফিরিতে না ফিরিতে চক্ষের নিমিষে অমের পাড় তুলিয়া পিকক্ সশব্দে মেঝের উপর আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিলেন। পাড়-দুইটা শতকুচি হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল! ভৃত্য হতবুদ্ধি নির্ঝাক্! লীনা চুপ!

যেন কিছুই হয় নাই, এমন ভাবে পিকক্ বেশ নিরুদ্ভিগ্ চিত্তে আহার করিয়া যাইতে লাগিলেন। লীনা বেশ জানিল, ইহার পর, সে একটু মাত্র অদৈর্ঘ্য বা অস্থিরতা প্রকাশ করিলেই, আহার্যসামগ্রী-সমেত টেবিলটারও মেঝের উপর উন্টা হইয়া পড়িবার একান্ত সম্ভাবনা! বিনাবাক্যে মাথা নীচু করিয়া সে টেবিলের উপর আহার্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

পিককের খাওয়া শেষ হইলে এক স্বেদেই দুইজনে টেবিল ছাড়িয়া উঠিলেন। দুইজনেই নীরব। (ক্রমশঃ)

লোকমাণ্ড তিলক-মহারাজ ।

(১)

একি শুনি আজ কুসংবাদ,
তিলক নাই, ভারতময় !
কে মুছিল তিলক ভারত-ভালে,
কে বা সে পামর নিষ্ঠুর হায় !

(২)

ভারতের রত্ন বহুদিন হ'তে
অলেছিল কি সুন্দর ভারত-শিরে !
আহা কে হরিল সে অমূল্য নিধি ?—
নাহি তার দয়া হৃদয়ে কি রে ?

(৩)

কে নিবালে সে দীপ ? হুর্জন কেমন !
বারেক ভাবিলে না ভারত তরে ?
আধার ভারত,—বিবাদ-কলিমা
ছাইল আজিকে ভারত-নরে !

(৪)

ভারত-তিলক গৌরব-নিশান
শোভেছিল এতদিন উজ্জলি দিক;
কে তুলিল তারে শোভাহীন করি
ভারতেরে হায় ! তাহারে দিক !

(৫)

ভারতের কণ্ঠ-হার তিলক সুন্দর,
কোন দস্যু তায় হরিল হায় !
শোভাহীন ভারত হইল এখন,
সুর্কের সৌন্দর্য্য নাহি-ক তায় !

(৬)

ভারত-হৃদয়-পদ্ম মকরন্দ তারা
কে ছিঁড়িল আজ নিষ্ঠুর করে ;
কে রে সে পামর নাহিক বিচার,
বারেক ভাবিল না ভারত তরে ?

দ. (১)

ভারতের প্রিয় ভারতের প্রাণ
কে বধিল হায় তিলকে আজ ?
ওরে রে দাক্ষণ নিষ্ঠুর শমন
তোর শিরে আজ পড়ুক বাজ !

(৮)

এই ছিল মনে রে দাক্ষণ বিধি,
হরিলি তিলকে পাষণ্ড হয়ে,
ভাবিলি না মনে তুই একবার,
কি হল রে তোরা তাহারে লয়ে !

(৯)

ছিল যে তিলক গুণের আধার
দেশমাণ্ড সেই আদর্শ নর ;
তাহারে লইয়া কাঁদালি ভারতে !
ভাবিত না সেই আপন পর ।

(১০)

সে যে দেশতরে ভাবিত সত্যত,
দেশদুখে প্রাণ দেছিল ঢেলে,
কত নর নারী পূজিত তাহারে,
তাহারে কোথায় দিলি রে ফেলে ?

(১১)

তাহারে দেখিত দেবতা সমান ;
পরশিতে পেলে চরণ তার,
সার্বক ভাবিত জীবন সকল ।
এমন পুরুষ কোথায় আর !

(১২)

অস্তরে বাহিরে ছিল না হুঁতাব,
ধার্মিক পবিত্র সরল প্রাণ,
সে যে কণ্ঠবীর, কণ্ঠের পর্বত,
কণ্ঠে বেড়েছিল তাহার মান ।

(১৩)

ব্রহ্মচারী ঋষি মহাত্মা তিলক,
সত্যের সম্মান রাখিত মনে ;
তাহার মতন হবে কি রে আর
ভারতে বাঁধিতে আপন প্রাণে !

(১৪)

ছিল রে সাধনা কর্তব্য-পালন,
সুখ্যাতি অখ্যাতি ছিল না ভয় ;
মেঘের গর্জনে, অশনি-পতন
জানিত না কভু কাহারে বয় !

(১৫)

অটল অচল প্রতিজ্ঞা তাহার
বীরের বিক্রমে পালন হ'ত ;
জীবনের ভয় ছিল না তাহার,
করাগার-বাস কুহুম মত !

(১৬)

হেন সুসন্তান ভারত-মাতার
হবে কিরে আর কখন হবে ?
ভুলি ক্ষুধা তৃষ্ণা দেশের কারণ
দেশের চিন্তায় মাতিয়া রবে ?

(১৭)

খোল খোল দ্বার স্বর্গের এবার
যাবেন তিলক স্বর্ণ-রথে ;
গাও রে অঙ্গরী, যতেক করিরা
চামর ঢুলাও তাঁহার পথে ।

(১৮)

পুল্পমালা তাঁরে পরাও আদরে
চন্দন-তিলক তিলকে দাও ;
করিয়া বরণ তাঁহারে যতনে
স্বর্গের ভিতরে তুলিয়া লও !

(১৯)

জাল ধূপ-ধূনা, মাদ্রলিক বীণা
কাঁসর প্রভৃতি বাজাও আজ !
ওই দেশ দেশ ভারত-সুহৃদ
যাইছেন অর্পে তিলক-স্মারক ।

(২০)

গাও সিদ্ধনীরে, মহীধর-চূড়ে,
পবন-হিল্লোলে, কুহুম-বনে ;
কল্লোলিনি গাও তিলকের নাম,
গাও রে প্রকৃতি অমল্য ধনে !

(২১)

গাও যুবা বৃদ্ধ নর নারী যত,
ভারতমাতার তিলক-নাম ;
যে নামে তরঙ্গ ছুটিবে হৃদয়ে,
পাইবে সবাই অমর ধাম ।

(২২)

মরে নি তিলক, আছে'রে বাঁচিয়া ;
স্থল দেহ তার গিয়াছে চলে !
কীর্্তি তার হেথা রহিবে বাঁচিয়া,
কর্তব্যের পথ দিবেক বলে ।

(২৩)

তিলকের মূর্তি প্রতি ঘরে ঘরে
গড়িয়া ভারত পূজ রে তার ;
হেন বীর-পূজা বল না আশ্রয়
কার ভাগ্যে কেবা কোথায় পায় ?

(২৪)

মারাত্মা-ব্রাহ্মণ ত্যাগের মুরতি,
কা'র না ভকতি তাঁকার প্রতি ?
কর প্রণিপাত ভারত-সন্তান
রাখিয়া হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি ।

ঐত্বনমোহন ঘোষ ।

উদ্যানলতা।*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কলিকাতায় একা ধীরেনের সঙ্গে আসাতে, মুক্তিও ধীরেনকে নিয়ে নানা কথার পাক জড়িয়ে উঠতে লাগল। শৈল-প্রত্যাগত শিবেশ্বর যখন সকল গোলমাল মিটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায় ধীরেনের সঙ্গে মুক্তির বিয়ের কথা পাড়বার চেষ্টা করেন, তখন ধীরেনের মুখে শোনেন যে মুক্তি জ্যোতির বাগদত্তা। সেই রাত্রেই জ্যোতির রওনা হওয়ার টেগী-গ্রাম এসে পৌঁছিল। কিন্তু এর উপাখ্যানের দিক দিয়ে এ বইয়ের তেমন কোনও বিশেষত্ব নেই। একে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না। উপন্যাসে সাধারণতঃ একটা বাঁধা কেন্দ্র থাকে, সেটিকে উদ্দেশ্য করে সমস্ত ঘটনাগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হয়ে গড়ে উঠতে থাকে। এই কেন্দ্রীভূত ঘটনটিকে সার্থক করে তোলাই অন্য সমস্ত ঘটনার উদ্দেশ্য; এই কেন্দ্রীভূত ঘটনার অগ্রপরীক্ষাতে প্রত্যেক নাটকীয় চরিত্রকে ঘাটাই করান হয়। প্রত্যেক নাটকীয় চরিত্র এমন করিয়া আঁকা চাই যাতে তাদের ঘাতপ্রতিঘাতে, কিম্বা তাদের ঘাতপ্রতিঘাতের অহুকুলতায় মূল আধিকারিক ঘটনাটি সম্ভব হয়ে ওঠে। এ বইখানিতে দে-রকম কোনও মূল ঘটনা নেই, সে জন্য ইহাকে উপন্যাস বলতে ইচ্ছা করি না। আবার ইহাকে ঠিক ছোট গল্পও বলা চলে না, কারণ ছোট গল্পের একটা

প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, তাতে কোনও ঘটনা সংঘটন করা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সেখানে প্রধান কথাই হচ্ছে কোন গুঁড় মর্ম-বেদনাকে, কি কবির বিশেষ কোন মর্ম-কথা বা অহুতৃতিকে কোনও ঘটনার দ্বারা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। নানা চরিত্রের বাহুল্য সেখানে তেমন জায়গা পায় না, কিন্তু একটা গভীর মর্মকথা কবি-হৃদয়ের কুহুম-দোরকটিকে শুধু অগ্রভাগে জীবন্ত বিধা করিয়া দেয় মাত্র। সমস্ত গল্পটির আশ্রয় বেধনা এক জায়গায় সংহত হয়ে একটি বিশেষ দোরভকে বাহির করিয়া আনে। যেখানে যেখানে তার যে কোনও বিশেষত্ব আছে, সে সমস্তগুলিই দেই একটি বিশেষ বেদনাকে অভিব্যক্ত করবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, এবং সেইটিকে ফোটাতে পারলেই সে গল্পের কাজ শেষ হয়ে যায়। আনাদের এ বই-খানির মধ্যে কিন্তু ঠিক তেমন কোনও মূল বেদনা বা স্থায়ী ভাব খুঁজে পাই না। এমন কি সাধারণতঃ অনেক গল্পেই যেমন একটা Crux বা সন্ধি থাকে যেখানে এসে সমস্ত কাব্যের ঘটনাটা তোলপাড় খেয়ে উঠে একটা বিশেষ আশঙ্কা বা উত্তেজনার সৃষ্টি করে, এখানে তেমন কিছু দেখতে পাই না। হাবলার সঙ্গে অশিক্ষিতা ও নবী-সংস্কারসম্পন্ন মুক্তির বিবাহের আয়োজনটা খানিকটা কৌতুকই জমাইয়া তোলে। কিন্তু কোনও উত্তেজনার সৃষ্টি করে না, কারণ, হাবলা ক'আব পাড়াগায়ে হাবলা বা গ্যাংলা

* - একখানি উপন্যাস, ত্রিশাঙ্গী দেবী ও জিনীতা দেবী প্রণীত।—মূল্য ২ টাকা।

প্রবাসী-কার্যালয়,

২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

নয়। সে হচ্ছে মুক্তির প্রণয়লুক ধীরেন। তাব-
লার সঙ্গে বিয়েটা যদি হয়ে যেত, তাতে আমা-
দের মনে একটুও আঘাত পেত না। বয়ঃ
কৌতুকটা আরও জমে উঠত। আর তা

ছাড়া ধীরেন বেচারার ক্ষত আমার একটু
দুঃখও হে না হয়, তা নয়। ঐ রকম একট
ফাঁকে ধীরেন বেচারার সঙ্গে যদি মুক্তির
বিয়েটা হয়ে যেত, সে মন্দ কি হোত।

(জমশঃ)

বরষায়।

আকাশ ভরিয়া যায়
ঘন-বিষাদের ছায়,
নহে দীপ্ত আলোকের হাসি,
বায়ুর ব্যাকুল স্বরে
কি বেদনা ব্যক্ত করে!

নীরধারে বরে অশ্রাশি!
কম্পমান তরু লতা
জানায় মরম-বাথা,
নীরব সে হরষ কুঞ্জন,
তরু জীব সংগোপনে
লইয়া আশ্রয় কোণে
জানায় কি অন্তর-পীড়ন!

এ বিষাদ বক্ষে ধরে
তটিনী আবেগ-ভরে
মন প্রাণ সব অরপিয়া,
ধাইছে সাগর-পানে
শ্রেষ-গদগদ তানে,
নিরাশ্র জীবন হেরিয়া।

গৈরিক বসন পরি'
যোগিনীর রূপ ধরি,
হে তটিনী! আত্মহারা হ'য়ে
কারো পানে না চাহিয়া,
কারো বাধা না মানিয়া,
মিশিতে সাগরে যাও ব'য়ে;

এই ঘন ছায়া যবে
আর না পৌড়িতে পবে,
স্বপ্নহাসি উদবে আবার,
সাগরে কি যাবে তুলি?
না না, কুপস্বনি তুলি,
কুমি ত ছুটিবে অনিবার!
কিন্তু আমি অভাজন
বিষয়-বিশৃঙ্খল,
ক্রান্ত যবে দুদিনের ভরে,—
স্বপ্নহাসি নিবে যায়,
পঙ্ক বায়ু বাথা পায়,
আশালতা কেঁপে উঠে ভরে।

উঠে না আনন্দ-তান,
কে বলি করুণ গান,
অশ্রুনায়ে ভরে যায় দিগ্ধি,
জীবন-শক্তি যায়
পুকাইতে নিরাশ্রায়,
অন্ধকার উঠে দেখা ফুটি'—

ব্যাকুল হৃদয়ে হেরি—
কোথা নাথ,—কোথা হরি!
আলসন না পাইয়া আর,
হে তটিনী! তোমা' প্রায়
আবেগে ছুটিয়া যায়
তারি পানে হৃদয় আমার!

কিন্তু যবে তুখ টুটে
আলকের হাসি ফুটে,

কল্পোলিনি! কহিব কি কথা?

কোহমন্ত পুনঃ মন
সুখে হয় নিমগন,

ভুলে যায় নাথের বারতা!

শ্রীভবভূতি বিজ্ঞারত।

নিবেদন।

১

দেব! একি এ যাতনা।

এই অন্ধ কারাবাসে, দিন রাত রুদ্ধ-বাসে

একাকী হৃদয়-ভরা বহি যে বেদনা!

দিনান্তেও একটুকু জুড়াতে এ শ্রান্ত বুক

অভাষার নাহি কোথা একটু সীমানা!

২

এই তো অগত-ভরা সকলে রয়েছে যারা,

কেহ হাসে, কেহ কাঁদে—করে খেলা ধূলা;

মোর শুধু অহরহঃ একি আলা হর্ষিবহ!—

ধূমাকীর্ণ গুপ্ত বহি বন্ধ-মাঝে ঢালা!

৩

ছঃখে যবে ফাটে বুক, বলি কারে একটুকু

নামাব ছঃখের বোঝা ভাবি মনে মনে,

বুক হ'তে শিখা উঠি, কণ্ঠ-পথে বসে রুপি;

দাক্ষণ যাতনা-আলা বেজে ওঠে প্রাণে!

৪

একি শাস্তি, হে ভবেশ! তোমার এ পুণ্যদেশ

অভাগ্যর ভাগ্যে কেন শুধু কারাবাস?

নাহি সঙ্গী নাহি সখা, একটু আশার রেখা!—

শুধু বাথ, শুধু আলা, শুধু মর্মেচ্ছাস!

৫

স্বপনে নাহি-ক জল, চরণে নাহি-ক বল,

মৃতকে পর্জিত-সম শুক বোঝা চাপা,

পর্যাপ্ত দাক্ষণ আলা, রাত-দিন পথ-চলা—

শ্রাস্তি নাই ক্লান্ত প্রাণে কিবা নিশা-দিবা!

৬

কবে এ পথের শেষ, ফুরাবে এ মরু-দেশ,

নিতিবে প্রাণের বহি—রাবণের চিত্তা,

লোকেরে দেখাতে মুখ-ফাটিবে না পোড়া বুক,

ঘুচে যাবে এ দুর্নীম—‘অভাগ’ ‘অনাথ’!

৭

আমার যে রবি শশী, তাও যেন ভরা মসী,

আমার এ বায়ু যেন শুধু নিরাকার,

আমার এ দেহ যেন গড়িয়াছে ভিন্ন কোন,

আমার এ গৃহ যেন আঁধার গহ্বর!

৮

আমি কি তোমার রাজ্যে, বঞ্চিত সকল কার্যে?

যে অগাধ দয়্যারানি বর্ষে উচ্চ নীচে,

তাতেও বঞ্চিত আমি? কেন করুণার স্বামী!

কেন বহি এত শাস্তি কোন গুরু কাজে?

৯

তুমি তো অনাথ-বন্ধ, অগাধ-করুণা-সিদ্ধ,

পালী তালী সবে ডাকে তোমারে দয়াল!

তোমার মধুর নাম, শরিলেও অবিরাম

হে প্রভু হবেনা ছিন্ন দৃঢ় কর্ণজাল?

১০

তোমার সুখের ধরা, মমতা-অমিয়-ভরা;

আমি শুধু কিরে বাব শূন্য রিক্ত হাতে?

আমারি এ মর্মেচ্ছাস, বন্ধোভেদী দীর্ঘশ্বাস

রবে ব্যাপ্ত নিশি দিন ধরার ধূলাতে?

১১

এ শুক্ল মর্ষের বোঝা বেদনার ভার ?

(আত্ম)

ব্যথিত তাপিত প্রাণ, কে চরণে

শ্রান্ত দেহ ক্রান্ত আঁধি, হে প্রভু,

দিবে স্থান,

কোথায় রাখি

কে ঘুচাবে নয়নের চির অন্ধকার ?

ঐমতী ননীবালা দেবী ।

নদী-সৈকতে

(ঐআনন্দ আচার্য্য অবলম্বনে)

১। প্রভাত-বেলা পুষ্পবনে

৪। তরুণ কবি কুণ্ডলনে

পুষ্প চন্নি' সযতনে,

বাঁশী বাজায় আপন মনে,

দিনের বেলা গাঁথি মালা

দিনের পেয়া শেষ করি'

সাঁঝে তোমায় দেব বলে' !

ঘাটে লাগে খেয়া-তরী !

২। সন্ধ্যা-ছায়া নেমে আসে,

৫। সেই সে পরম মধুর স্বপ্নে

গগন-কোলে তারা ভাসে,

খুসী হয়ে জাগি মনে,

শিশুরা সব কোলাহলে

পরিষে দেব মালাখানি

গৃহে ফেরে দলে দলে !

চরণ-ছা'টি বন্ধে 'টানি' !

৩। স্বর্ণ-রেণু তুলি' পথে

৬। আকাশ ভোবে জ্যোৎস্নালোকে,

ধেয় ফেরে গোষ্ঠ হ'তে,

বজ্রা জাগে দরার বৃকে !

আনন্দেরি কলকলে

চেয়ে থাকি কখন আস,

কুলায়-পানে পাখী চলে ।

মালা নিয়ে মধুর হাস ॥

ঐনিখিলচন্দ্র বড়াল ।

সাময়িক সংবাদ ।

১। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা-কারিণী মহিলা চিকিৎসক।—বঙ্গদেশের সেনিটারী কমিশনের ডাক্তার বোর্ডলি এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের বালিকাবিদ্যালয়-সমূহের ছাত্রীদিগের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার নিমিত্ত একজন মেডিকেল

ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হইবেন। এই পদের প্রারম্ভ-বেতন মাসিক ২৫০ টাকা। ৩০ টাকা করিয়া বাড়িয়া এই মাসিক বেতন ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। এই পদে মেডিকেল কলেজের উপাধি-প্রাপ্তা মহিলারা নিযুক্ত হইবেন। পদপ্রার্থিনীদিগকে কলি-

কাতা রাইটার বিলুপ্তি বন্ধের স্বাস্থ্য-কমিশনার-মহোদয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

স্বাস্থ্যপরীক্ষাকারিণী পরিদর্শিকা-নিয়োগের ফলে এদেশের বালিকাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে দেশের যে কল্যাণ সাধিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২। লর্ড সন্তোজ প্রসন্ন সিংহ মহাশয় বেহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গবর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন; এই সংবাদ গত ১১ই আগষ্ট এখানে আসিয়াছে।

৩। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবাসীদিগকে জানাইয়াছেন যে অষ্ট্রেলিয়া পরিলম্বণ করিয়া যুবরাজ ক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; হতরাং তিনি এবংসর ভারতবর্ষে আসিতে পারিবেন না। যুবরাজের পরিবর্তে তাঁহার পুত্রতাত ডিউক অব কন্ট ভারতবর্ষে আগমন করিবেন।

৪। গত ৩-শে জুলাই শনিবার রাত্রি ১২টা ৪০ মিনিটের সময় ভারতের অকৃত্রিম ও অকপট সেবক স্বদেশাশুরাগী মহামায়া বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয় সমগ্র দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

৫। কাশীর আয়ুর্কেন্দ-সম্মিলনী কলেজ হইতে এবার তিনটা বাঙ্গালী মেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ‘আয়ুর্কেন্দশাস্ত্রী’ উপাধি পাইয়াছেন।

ভ্রমসংশোধন।

আষাঢ়-সংখ্যার ‘তুচিবায়ু’-প্রবন্ধে ২৪ পৃঃ ১ম কলাম ১ পংক্তিতে

“শয্যার চাদর...মত পড়িয়া থাকে।”—
এইস্থলে

“শয্যার চাদর ও বস্ত্রাবরণগুলি সর্বদাই কোনও বা কোন অগোচ্য-বাপদেশে প্রক্ষালনীয় হওয়ায়, সেগুলিকে প্রায়ই শয্যা হইতে উন্মোচন করিয়া রাখা হয়। ফলে আবরণহীন কণ্ঠাতল যেন মৃতের শয্যার মত পড়িয়া থাকে।” হইবে।

৬। ক্যান্টনের চীনা জীলোকেরা ২০ লক্ষ টাকা মূলধনের এক দেয়াশালাইয়ের কারখানা স্থাপন করিবে মনঃস্থ করিয়াছেন এই কারখানায় জীলোকেরাই দিয়াশালাই প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা জীলোকেরাই বিক্রয় করিবেন।

৭। বিলাতে পাশ করা ধাত্রীর সংখ্যা নব্বই হাজার।

৮। ১৮৬৯ অব্দে পেশোয়ারে ১০৪ নং “রয়ালমেন্টার ফিউজিনিয়ার্স”-নামক সৈন্য দলের মধ্যে ভয়ানক ওলাউটার প্রকোপ হয় কাশ্মীরের পত্নী মিসেস ওয়েবার হারিশ সেই রোগীদিগের অক্লান্ত সেবায সকলকে মুক্ত করিয়াছিলেন। মিসেস হারিশ পথ্য প্রস্তুত করিয়া গীত গাহিয়া ও নানা উপায়ে সৈন্যদের মন প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতেন। রোগ হইতে মুক্ত হইয়া সেই সকল সৈনিকের মিসেস হারিশকে ভিক্টোরিয়া ক্রসের অবিকল একটা নকল, নকল করিয়া উপহার প্রদান করেন। জীলোকদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম “ভিক্টোরিয়া ক্রস” প্রাপ্ত হন। এক্ষণে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, আকাশ পোত-সম্বন্ধীয় সাহসিক কার্যের জন্য “ভিক্টোরিয়া ক্রস”-নামক মহাসম্মানিত পদক জী-পুরুষ সকলকেই প্রদান করা যাইতে পারিবে।

৯। গত ৬ই আগষ্ট ময়রভঞ্জ মহারাজের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

এতদ্বির ঐ প্রবন্ধে কতকগুলি মুদ্রাকর-প্রবাদ আছে। যথা “কর্তব্যাপদেশে” (২০ পৃঃ ১ম কলাম শেষ লাইন) “কর্তব্যাবাপদেশে” হইবে, “অন্তঃস্থ-প্রত্যাশী” (২৩ পৃঃ ২য় কলাম, ২১ পংক্তি) স্থলে “জনন্তঃস্থ-প্রত্যাশী”, “প্রাকলন” (২৪ পৃঃ ২য় কলাম, ২২ পংক্তি) স্থানে “প্রকালন”, “জননীদেবর” (২৫ পৃঃ ২য় কলাম, ২য় পংক্তি) স্থানে “জননীদেবীর” ও “সন্তাবপর” (শেষ লাইন) স্থানে “সন্তাব-পর” হইবে।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও

ঐযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক, ৩২ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

১৮ বর্ষ

বামাবোবিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্তৃক প্রবর্তিত।

আশ্বিন, ১৩২৭—অক্টোবর, ১৯২০।

সূচী

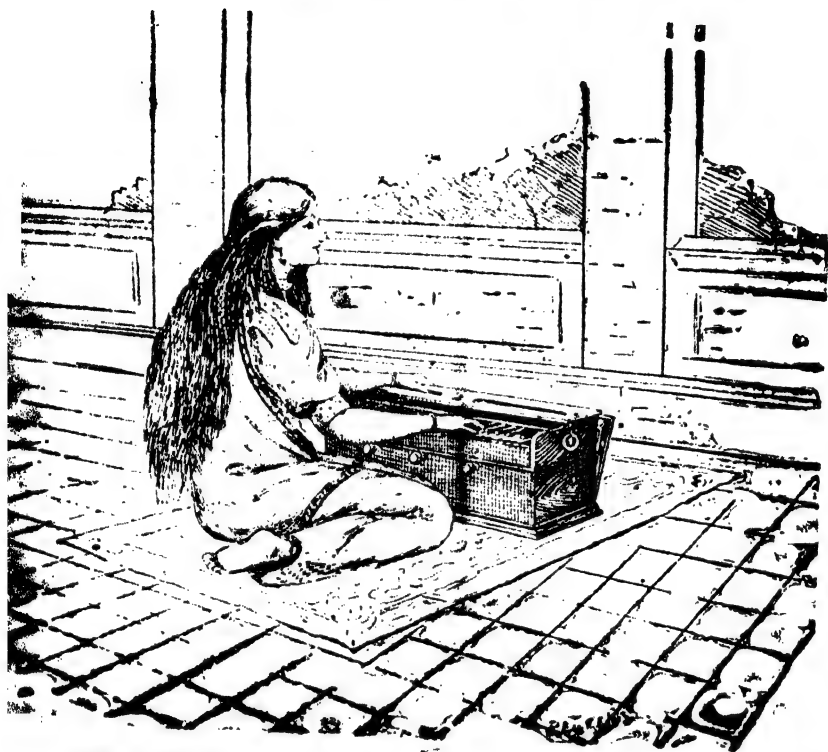
১। গান	শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল	...	১৬৪
২। হিন্দুর তীর্থ-নিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	...	১৬২
৩। আগমনী (গান ও স্বরলিপি)	শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এ	...	১৬৪
৪। লীনার শিক্ষা (উপন্যাস)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষকামা সরস্বতী	...	১৬৮
৫। প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	...	১৭৭
৬। জাহাজ-ভূবি (উপন্যাস)	শ্রীমতী চাক্রাণীলা মিত্র	...	১৭৭
৭। আশে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত হুগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১৮৫
৮। সমাজে নারী কাজ	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	...	১৮৫
৯। আকাজকা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন	...	১৮৫
১০। পুস্তক-সমালোচনা :—			
(ক) সাতনদী	১৮৮
(খ) উদ্যানলতা	শ্রীযুক্ত হুগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, বি-এ, পি, এইচ-ডি	...	১৯০

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৮/০ ; অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ১৮/০ ;

পত্রিকার সংখ্যার মূল্য ১০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোরাকিনের হারমোনিয়ম।

বাজারে জিনিসের মত নয়।



• বাস্তব হারমোনিয়ম—

১ সেট রিজ মূল্য ২০, ও ২৪ টাকা।

২ সেট রিজ মূল্য ৩০, ৪০, ৪৫, ৫০, হইতে ১৫০ টাকা পর্যন্ত।

কোডিং অরগেন—মূল্য ৩৬, ৪৫, ১০, ১৫, ও ২০ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫, ১০, ১৫, ও ২৫ হইতে ৩০ টাকা পর্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০, ১৫, ২০, ২৫ ও ৩০ টাকা।

এস্বাজ—মূল্য ১২, ১৫, ১৮, ২০ ও ২৫ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোরাকিন এণ্ড সন,

৮১ নং ডালহাউসি কোয়ার্টার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 68.6

October, 1920.

“কন্যায়র্থে দাসত্বলীয়া যিস্তথীয়াতিযন্নতঃ ।”

কন্তাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে ।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত ।

৫৮ বর্ষ ।	}	আশ্বিন, ১৩২৭ । অক্টোবর, ১৯২০ ।	}	১২শ কল্প ।
৬৮৬ সংখ্যা ।				১ম ভাগ ।

গান ।

(রাগ—পঞ্চম একতারা ।)

আকাশে বাতাসে আলোকে পুলকে

উৎসব এ কি ভুলোকময় !

মুগ্ধের কলি—শুগ্ধের অলি,

ঝকঝরে শ্রীমা, পিক কুহরয় !

প্রভাতে অরুণ ঢালিল কিরণ

মেলিয়া তাহার আঁচল হিরণ ;

শশী তারা রাতে, দীপ লয়ে হাতে

আরতি আলিল গগন-ময় !

এ-ভবের নাটে, কত দিনে রাতে

কত খেলা হ'ল জীবনময়—

কত হুখে হুখে—কত শোকে তাপে

ফুরাল এ স্বপ্ন-লীলাভিনয় !

সকলি তাঁহার করুণা-আশিস,

তিনি চির-রাজা করুণাময় !

তাঁরে লয়ে বুকে, এস হাসি-মুখে,

গাই হুখে হুখে তাঁরি জয় জয় ॥

ত্রিনির্দলচন্দ্র বড়াল ।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন হিন্দুদিগের—বিশেষতঃ বৈষ্ণব-দিগের—অতিপবিত্র তীর্থ। এখানে বাল্মীকী-গণের সংখ্যা অধিক। বাল্মীকীর কৃষ্ণ-ভক্ত; সুতরাং এখানে বাল্মীকীর সংখ্যা অধিক হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বৃন্দাবন যমুনার তীরে অবস্থিত। বৃন্দা হইতে বৃন্দাবন-নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বৃন্দা ও তুলসীতে পার্থক্য নাই। বিষ্ণুপুরাণ মতে বৃন্দা হইতে তুলসীর জন্ম হয়। জন্ম-বৃত্তান্ত এইরূপ :—

জলন্ধর-নামে এক রাক্ষস ইন্দ্রপদ-প্রাপ্তির বাসনার ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাস্ত হইয়া শিবের শরণাগত হন। শরণাগত ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য শিব স্বয়ং জলন্ধরের সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন। ঐ রাক্ষসের বিন্দা-নামী পতিব্রতা এক পত্নী ছিল। শিবের সহিত জলন্ধরের যুদ্ধ হইলে, বিন্দা পতির আশ্রয়ার্থ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তপস্তা করিতে লাগিলেন। তপস্তার ফলে কোন রকমে জলন্ধরের বধ হয় না দেখিয়া দেব-তারাও ভয়ে বিষ্ণুর শরণাগত হন। বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া, বৃন্দার তপোভঙ্গ করিবার জন্য তাঁহার কর গ্রহণ করিলেন। বিন্দার তপোভঙ্গ হইবামাত্রই জলন্ধর শিবের হস্তে নিহত হইল। পতির নিধন-বার্ত্তা-শ্রবণে শোকার্ত্ত-হৃদয়ে বিন্দা বিষ্ণুর প্রতি শাপ-প্রদানে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু সতয়ে বিন্দাকে সাত্বনা করিয়া কহিলেন—“তুমি জলন্ধরের সহিত সহযুগা হও; তোমার ভয়ে যে বৃক্ষ জন্মিবে, তাহা আমার স্বরূপ হইবে;—

ঐ বৃক্ষকে পূজা করিলে, আমার তুষ্টি জন্মিবে। তোমার ভয়ে তুলসী, খাজী, পলাশ ও অশ্বথ এই চারি প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।” পতিব্রতা বিন্দার পবিত্র দেহ অধানে ভস্মীভূত হইলে, সেই চিতা-ভস্মেই, বিষ্ণুর আশীর্বাদে, উক্ত চারিটা বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। বিন্দার দেহভস্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, তুলসীকে বিন্দাজি-নামেও অভিহিত করা হয়।

বৃন্দাবন, মথুরার সহিত পাকা রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত। রেল-পথেও বৃন্দাবন যাওয়া চলে। পাকা রাস্তায় যাইতে হইলে মধ্যে জয়সিংপুর এবং অহলিয়াগঞ্জ পড়িয়া থাকে। অর্দ্ধেক রাস্তার একটা বৃহৎ খাত আছে; সেতুর দ্বারা তাহা পার হইতে হয়। ১৮২০ সংবতে সেতুটা মাধোজি সিন্ধিয়ার কত্মা বালা বাই-দ্বারা নির্মিত হয়। সরিকটে একটা সান-বাধান পুকুরিণী অবস্থিত। ১৮৭২ খৃঃ দিল্লী-নিবাসী লালাকিশনলাল নামে জনৈক মহাজন এই পুকুরিণীটা খনন করান। রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পুরাতন রাস্তাটা যমুনার নিকট দিয়াই গিয়াছিল। বৃন্দাবনের বাহিরে প্রথম দুই মাইল পর্যন্ত এই রাস্তার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুই পাখোঁ পাদপত্রেরী এবং অনেকগুলি সুবৃহৎ হুম্মাবনী রাস্তাটার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহা-দিগের প্রথমটা একটা বৃহৎ উদ্যান। বাগানটা ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। গুজরাট-দেশবাসী কুশাল নামে জনৈক খনাঢ্য শেঠ ইহার

নির্মিত। ইহারই নির্মিত একটা হুন্দর মন্দির মথুরাতে দেখা যায়। রাস্তার বিপরীত দিকে একটু দূরেই একটা হুন্দর বোয়ালী অবস্থিত। বাদালায় বোয়ালীকে বৃহৎ কূপ বলে। উক্ত কূপের সোপানাবলীর সংখ্যা ৫৭টি। সিঁড়িগুলি লাল প্রস্তরের দ্বারা নির্মিত। ইন্দোরের সুপ্রসিদ্ধা রানী অহল্যা-বাই উক্ত বোয়ালীর খননকর্তা। কিছু দূরে অজুর-নামক গ্রামে ভাতরক্ষ নামে একটা মন্দির আছে। ইহাতে “বিহারী জী”র বিগ্রহ বিরাজিত। ইহার বিপরীত দিকে শেঠদিগের উদ্যান। মধ্যস্থলে যে স্থান অবস্থিত, তাহাতে কাষ্ঠিকী পূর্ণিমায় ভাত-মেলা হইয়া থাকে। এই সময়ে কটকের উপরে যে-সকল উচ্চপদস্থ দর্শক থাকেন, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। এক দিবস কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে বাটা হইতে বহির্গত হইবার সময় সঙ্গে আহার্যাদ্রব্য কিছুই লয়েন নাই বলিয়া এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ভাত যাক্সা করিয়া ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই মেলাটা সেই ঘটনার স্মারক।

বর্তমান সময়ে বৃন্দাবনের মিউনিসিপালিটির সীমানার অন্তর্গত এক সহস্র মন্দির আছে। ভিন্ন ভিন্ন বরাদ্দ ব্যক্তির দ্বারা ৩২টি ঘাট নির্মিত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে ছইটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। একটীর নাম ব্রহ্মকুণ্ড এবং অপরটীর নাম গোবিন্দকুণ্ড। প্রথমটা শেঠের মন্দিরের পশ্চাৎদিকে অবস্থিত; পরন্তু তাহা ভগ্নদশাশ্রয়। শেঠোক্তটী মথুরার রাস্তার সন্নিকটে। পূর্বে ইহা একটা সামান্ত পুষ্করিণী ছিল; কিন্তু ১৮৭৫খৃঃ বঙ্গদেশের অঃপাঠী রাজসাহী-প্রদেশের নিবাসিনী শানশীগঞ্জীমতী

কালীহুন্দরী চৌধুরাণী মহোদয়ার অহু-কম্পায় ত্রিশ সহস্র মুদ্রার ব্যয়ে কুণ্ডটির চতু-স্পার্শ্ব এবং সোপানাবলী পাকা গাঁথুনির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। তৃতীয় পুষ্করিণীটা কেওয়ার-বনে অবস্থিত। কুণ্ডটা অশ্বখ, ধূমুর এবং কদম্ব-বৃক্ষদ্বারা নিবেদিত। মদনমোহনের মন্দিরে যাইতে হইলে যে স্থান হইতে বাঁকিতে হয়, সেই স্থানে কুণ্ডটা অবস্থিত। বনযাত্রাকালে এই স্থানটিতে আসিয়া থাকিতে হয়। দাবানল-বিষয়ে এই স্থানটা সম্বন্ধীভূত, যদিও কিংবদ-ন্তীটা নদীর পরপারে ভ্রমবশেই শুনা যায়। এখানে দাবানল-বিহারীর মন্দির অবস্থিত। এখানকার গোসাঁই নিহারক বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভূক্ত। বনের সংলগ্নীকৃত একটি উদ্যান আছে। ইহার চতুর্দিক প্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত। উদ্যানটা টিহরী রাজার সম্পত্তি, কিন্তু তথাকার জল অত্যন্ত পারাপ বলিয়া উদ্যানটা বহুদিন হইল পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানে ময়ূর ও বানর দলে দলে দোঁপিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের সেবার জন্য কোটা ও ভরতপুরের রাজা টাকা জমা দিয়াছেন। এখানে প্রায় ৫০টা সত্র আছে। গরীব লোকে এখানে ভিক্ষা পাইয়া থাকে। সহরের লোক-সমষ্টির সংখ্যা ২১০০০, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈরাগী এবং বৈষ্ণবদিগের সংখ্যা প্রায় দেড় ভাগ। মুসলমান-রাজত্বকালে মুসলমানগণ বৃন্দাবনের নাম মিটাইয়া মুমিনাবাদ নাম দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে-চেষ্টা ফলুবতী হয় নাই। বৃন্দাবনে মুসলমানের সংখ্যা অতীব কম। প্রায় ৫০ ঘর মুসলমানের বসতি দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাও সহরের বহি-র্ভাগে—ভিতরে নহে।

মন্দির-রাজী।

বুন্দাবনে সর্বপ্রথমে যে মন্দির নির্মিত হয়, তাহা বুন্দাদেবীর। কিন্তু এখন তাহার কোন নিদর্শন নাই। জনশ্রুতি এইরূপ যে, তাহা সেবাকুঞ্জে গঠিত হয়। সেবাকুঞ্জটি এখন প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। এই উদ্যানের মধ্যে রাসমণ্ডল অবস্থিত এবং তাহার সন্নিকটে একটি সরোবর আছে। বুন্দাদেবীর মন্দিরের প্রখ্যাতি যখন দিগ্বিদগত ব্যাপিরা পড়িল, তখন ১৫৭৩খৃঃ সম্রাট আকবর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গোসাই-গণকে দেখা দিতে রাজি হন। সম্রাটের চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া নিধুবনে লইয়া যাওয়া হয়। জনশ্রুতি এইরূপ যে, উক্ত স্থানে সম্রাট দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া স্থানটির পবিত্রতা উপলব্ধি করেন। সমবেত রাজস্ব-মণ্ডলী যখন উক্ত স্থানে মন্দিররাজী নির্মাণের বাসনা প্রকটিত করেন, সম্রাট তখন তাহাতেই সায় দেন। সম্রাটের আগমনকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্ত চারিটি মন্দির নির্মিত হয়। সেগুলির নাম—(১) গোবিন্দ দেব, (২) গোপীনাথ, (৩) যুগলকিশোর এবং (৪) মদনমোহন। এতদ্ব্যতীত সর্ব-প্রথমটাই সর্বাপেক্ষা দেখিতে সুন্দর। বৃক্ষ প্রদেশে, বোধ হয়, এমন সুন্দর মন্দির আর নির্মিত হয় নাই। উক্ত প্রদেশ-মধ্যে হিন্দু শিল্পের ইহাই আশ্চর্য্যজনক প্রমাণ বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। পুষ্ট জমিবার ১৬৪৭ বঙ্গাব্দ পূর্বে এই মন্দির রূপ ও সনাতনের মতানুসারে জয়পুরের রাজা মানসিংহ-দ্বারা নিৰ্ম্মিত হয়। ঐরাজ্যবিরে ভয়ে মন্দিরের বিগ্রহটিকে জয়পুরে লইয়া যাওয়া হয়। তদবধি মন্দিরের সংস্কার-

কার্য্য আর হয় নাই। সুতরাং তাহা ক্রমশঃ ভগ্নদশাশ্রয় হয়। গ্রাউন্স-সাহেব যখন যথুরার কলেটর ছিলেন, তখন তিনি মন্দিরের ভগ্নাবস্থা গভর্ণমেন্টের কর্ণগোচর করান। এই সময়ে জয়পুরের মহারাজ মানসিংহ-সংস্কারের জন্ত পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলে, মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রদত্ত মুদ্রা যথেষ্ট না হওয়াতে অচিরে তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়। ১৮৭৫খৃঃ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাট Sir John Strachey সাহেব ৩৮,৩৬৫ টাকা প্রদান করেন এবং তদ্বারা মন্দিরের রীতিমত সংস্কারকার্য্য সমাধা হয়। মন্দিরের সরবরাহের জন্ত গ্রাম অর্পিত আছে বটে, কিন্তু তাহা অতিসামান্ত। জয়পুরে এবং আলোয়ারে মোটে একটি মাত্র গ্রাম আছে। বুন্দাবনের সম্পত্তি ক্রমশঃ অল্প হইয়া আসিয়াছে; তবে স্থলের বিষয় এই যে, প্রতিবৎসর প্রায় ২০ সহস্র মুদ্রা ব্যাক্তিদিগের নিকট হইতে পাওয়া যায়। মন্দিরের সংস্কারের ভার এখন সরকারী পাবলিক ওয়ার্কসের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

মদনমোহনের মন্দিরটি কালীমর্দনের উচ্চ টীলায় অবস্থিত। সাধারণতঃ লোকে কালীমর্দনকে কালীমর্দ-বাট বলে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, পঞ্জাবের অন্তঃপাতী মুলতান-নামক সহরের অধিবাসী রামদাস নামে জনৈক ক্ষত্রিয় সওদাগর, বাণিজ্য বস্ত্তে পূর্ণ একবাণী তরী আরোহণ করিয়া আগ্রা যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ কালীমর্দনের চড়ায় নৌকা লাগিয়া যাওয়াতে তরী আর হটিল না। তিন দিবস বৃথা চেষ্টার পর তিনি বৈব-সাহাব্যের প্রায়সী হইয়া হুঃশাসনশরীতোপরি আরোহণপূর্বক

সনাতনের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। সনাতনের নিকট মদনমোহনের বিগ্রহ ছিল। তিনি তাঁহাকে উক্ত দেবতার আরাধনা করিতে পরামর্শ দেন। রামদাসের স্তবও সমাপ্ত হইল; অমনি, নৌকাও জলে ভাসিতে লাগিল। আগ্রায় যাইয়া তিনি সমস্ত বাণিজ্য-দ্রব্যাদি-বিক্রয় করিয়া ধন আনয়নপূর্বক সনাতনের হস্তে দেন এবং তদ্বারা একটি মন্দির নির্মাণ করিতে প্রার্থনা করেন। মন্দির নির্মিত হইল। ১৮৭৫খৃঃ খ্রীস্ট সাহেব মন্দিরটা সর্বাঙ্গসুন্দর করেন। সনাতনের নিকট মদনমোহনের যে বিগ্রহ ছিল, তাহা এখন করোউলিতে আছে।

মদনমোহনের মন্দিরে প্রথমে বঙ্গভাষায় ও পরে নাগরী অক্ষরে নিম্নলিখিত শ্লোক কোদিত দেখা যায় :—

হর ইব গুরুবংশো যংপিতা রামচন্দ্রো

শুনিমণিরিব পুত্রো যন্ত রাধাবসন্তঃ ।

অকৃতহরুতরাশিঃ ত্রিগুণানন্দনামা

ব্যথিতবিধবদেয়ান্দ্রিং নন্দনুনোঃ ॥

মন্দিরের আয় ১০, ১০০ টাকা; তন্মধ্যে ৮ হাজার টাকা দর্শকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাকী সমর্পিত সম্পত্তি হইতে উঠিয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণে ইহার একটা শাখা আছে।

রাজা গোপাল সিংহ স্বীয় শ্রালকের নিকট হইতে মদনমোহনের বিগ্রহ লইয়া করোউলিতে স্থাপন করেন এবং রামকিশোর

গোসাঁইকে সেবাইতে নিযুক্ত করেন। গোসাঁই ঠাকুরের বাটী মূর্শিদাবাদ এবং তিনি বাঙ্গালি। বিগ্রহ-সেবার জন্ত ২৭ হাজার টাকার বার্ষিক আয়ের ইহার জমিদারী আছে। দিনে সাতবার করিয়া দেবতার ভোগ হয়; তন্মধ্যে দুইবার রাজভোগ। মধ্যাহ্ন এবং শয়নকালই রাজভোগের সময়। মধ্যে যে পাঁচবার ভোগ দেওয়া হয়, তাহাতে সামাজ্য মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়া থাকে। এই পাঁচবারের নাম—(১) মঙ্গল আরতি [প্রহায়ে]; (২) দুপ [বেলা ৯ টার সময়]; (৩) শ্রদ্ধার [বেলা ১১ টার সময়]; (৪) পুনরায় দুপ [৩ টার সময়] এবং (৫) সন্ধ্যা আরতি [গোদুলির সময়ে]।

হরদাস-নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধু প্রণীত ভক্তমালা-নামক গ্রন্থে মদনমোহনের মন্দির-সম্বন্ধে এক অদ্ভুত বিবরণ আছে। আকবরের রাজত্বকালে ইনি সাদুল্লার আমীন (শাসন-কর্তা) ছিলেন এবং উক্ত মন্দিরে তিনি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া রাজকোষ নিঃশেষ করিয়া ফেলেন। তখন তহবিলের ভিত্তর তিনি প্রস্তর ভরিয়া দিল্লিতে প্রেরণ করেন। রাজকণ্ঠচারীরা যখন তহবীল উদ্ঘাটন করেন, তখন প্রস্তর দেখিইয়াই অবাক হন। একদা অদ্ভুত কাহিনী আকবরের কোষাগার টোডারমলও বিশ্বাস করেন নাই। বলা বাত্বেয়, সাধু কারাগারে পেরিত হইলেন। কিন্তু ভগবান তাঁহাকে ছলিলেন না। সাধুর নৃক্তির জন্ত আকবর স্বপ্নে দেবাদেশ পান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রমন্তকুমারী দেবী ।

আগমনী ।

ললিত মিশ্র—একতালা ।

ওগো আনন্দময়ী জননী,— বহু দিন পরে জননী
চরণে তোমার প্রণমি ! এসেছ দীনের দ্বারে,—
তব প্রেম মুখে চাহিয়া,
লও হৃদয়ের পূজা-উপহার
যাব হৃদে গান গাহিয়া ; ভক্তি-কুসুম-হারে ?
বিপদ আপদ হুঃখ ক্রেশ—
কোন বাধা নাহি গণি !

ধাক গেহ আলো করিয়া—
যেয়ো না যেয়ো না সরিয়া,—
প্রেমে গানে প্রাণ ভরিয়া—

বিতর প্রসাদ জননী !!

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াণ, বি-এল্ । স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ।

আহায়া

II { সা সা সা । সাসা -সমা যা । মপা গা পা । মা গা সা ।
ও গো আ ন . . ন্ দ ময়ী জ ন নী . . .

I না না না । সা সা সা । -া সা রা । সনা -দপা -মগা } I
চ র গে তো মা র . প্র ন মি

অস্তুরা ।

II { দা দা দা । দা দা দা । -া না না । সা -া -া I
ত ব প্রে ম হু থে . চা হি যা . .

I আ আ -া । আ আ সাসা । -া না না । সা -া -া } I
যা ব . হু থে গান . গা হি দা . .

I সা সা সা । সা সা সা । নাঃ -ঃ দা । -া পা পা I
বি প দ্ আ প দ্ হুঃ খ ক্রে . শ .

২' ৩ • ১
I মা মা মা। মা -া মা। পা গা -পা। মগা -ঝা -মা II
কো ন বা ধা • না হি গ • নি • • •

সঝারী।

২' ৩ • ১
II সা সা সঝা। মা মা মা। গা পা মা। -া -া -া I
ব হু দি • ন প রে ঙ ন নী • • •

২' ৩ • ১
I মা মা মা। মা মা পা। গপা মা -া। -া -া -া I
এ সে ছ দী নে র ঘা • রে

২' ৩ • ১
I গগা া ঝা। ঝা গা গা। ঝা ঝা ঝা। ঝা সা -া I
লঙ • জ দ য়ে র পু জা উ প হা ব

২' ৩ • ১
I সা -মা মা। মা মা পা। গপা -া মা। -মগমা গপাসা -া I
ভ ক্ তি কু স্ব ম হা • • রে • • • • •

আভোগ।

২' ৩ • ১
I দা দা দা। দা দা দা। -া না না। মী -া -া I
ধা ক গে হ ঝা লো • ক রি যা • •

২' ৩ • ১
I ঝা ঝা ঝা। ঝা ঝা মা। -া না না। মী -া -া I
ঘে ঘো না দে ঘো না • ম রি যা • •

I সা সা সা। সা সা সা। না না না। -া -পা I
প্র মে গা নে প্রা ন ভ রি যা • • •

২' ৩ • ১
I মা মা মা। মা যা -া। পা গা পা। মগা -ঝা -মা II
বি ত র প্র দা • দ জ ন নী • • •

লীনান্ন শিক্ষা ।

(পূর্ন প্রকাশিতের পর)

(৫)

শয়নকক্ষে লীনাকে পোষাক বদলাইয়া শোয়াইতে আসিয়া প্রোটা আয়া বিষম ব্যাকুল দৃষ্টিতে বারংবার লীনার মুখপানে চাহিতে লাগিল; কিন্তু সেই রক্তহীন শুষ্ক শুভ্র মুখের উপর নীল পেল্লিলের পরিষ্কার লাগ-টানার মত গোটাকতক শিরার অস্বাভাবিক ফোতি ছাড়া আর কিছুই সে দেখিতে পাইল না। বিদায় লইবার সময় আয়া কুণ্ঠিতমুখে বলিল, “আজ আপনার শরীর ভাল নাই, যদি রাতে হঠাৎ দরকার হয়, আমরা পাশের কামরায় থাকব কি ?”

লীনা অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল—“না, দরকার নাই। তোমরা ছাদের কামরায় যেমন থাক, তেমনি থাকো পে।—”

আয়া প্রতিবাদের ইচ্ছায় ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া, লীনা বিরক্তস্বরে বলিল, —“ঐ ঘুপ্সী ছোট ঘরের মধ্যে হাওয়ার সম্পর্কমাত্র নাই। ওর ভেতর তোমরা আজ থেকে, কাল অস্থখ বাধিযে বোনো, তারপর আমরা দেখ্বে কে? তোমাদের অস্থখ মানেই,—আমার বিপদ বাড়ানো। যাও,—আমার তাক্ক কোর না।”

আয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। লীনা আলো কমাইয়া, বিছানায় শুইল; আডট-কাঠ হঃরা, পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, অন্তঃপর তাহার কর্তব্য কি।

লীনার শয়নকক্ষের অন্ত পাশে লাইব্রেরী ঘর। পিকক্ যখন আসিতেন, সেই ঘরেই শুইতেন। আজও আহারের পর তিনি সটান সেই ঘরে ঢুকিয়া চুপুট ও বই লইয়া বসিয়াছেন। আহারের পরই ঘুমান তাঁহার অভ্যাস ছিল না; ঘণ্টাখানেক এই সব লইয়া জাগিয়া থাকিতেন। লীনার অভ্যাস অনভ্যাস বলিয়া কোন কিছুই বাধাবাদি নিষম ছিল না;—বতকণ শরীরের লুহিত, ততকণ সে বেড়াইয়া, বসিয়া, গল্প-শুজব করিয়া পড়িয়া শুনিয়া সময় কাটাইত; শরীর ক্লান্তিভারে অবসন্ন হইলেই সে আসিয়া শয্যা লইত।

আজ লীনার শরীর ভাল ছিল না, মনও যথেষ্ট অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার মনে পড়িতে লাগিল, স্বামীর সহিত গোপনে মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য অনেকগুলো প্রয়োজনীয় কথা তাহার আছে। সেগুলো শেষ না করিলে রাতে যে লীনার ঘুম হইবে না, এমন নয়,—কিন্তু সে অগ্রিয় প্রসঙ্গ লইয়া দিনের আলোয়, চাকর-বাকরদের চোখের সামনে আলোচনা করিবার সাহস তাহার নাই। অদৈর্ঘ্য উদ্যমপ্রকৃতি স্বামী চটিয়া উঠিয়া সকলের সামনেই তাহাকে ইতরভাবে অপমান করিবেন।—ইচ্ছা কবিয়া সে লাজ্জনা ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? এই গোপনতার স্বযোগে সে অপমান গোপনে সহিয়া লইবার স্বপ্নর অবসর।—কারণ, কথাগুলো বলিতেই হইবে, এবং অপমান সহিতেও সে বাধ্য।

লীনার মাথা ঘামিতে লাগিল। জোর করিয়া বিছানা হইতে অবসর শরীরটা টানিয়া তুলিয়া, চটিটা পায়ে দিয়া একটা হাক শাল গারে জড়াইয়া ধীরে ধীরে লাইবেরী-ঘরে বাইবার দুয়ারটার কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইল। 'জোর-শ্রীং'-জাঁটা দুয়ারটা সজোরে টানিয়া খুলিবার জন্ত পিতলের হাণ্ডেলটা চাপিয়া ধরিয়া সহসা লীনার হাত-পা হইতে শেষে মাথা পর্যন্ত থন্ থন্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ এমন একটা অভাবনীয় আতঙ্ক-ব্যথা উদ্ভাবনবেগে আসিয়া সজোরে তাহার হৃৎপিণ্ডটা মুচড়াইয়া ধরিল যে মুহূর্তের জন্ত লীনার ঘেন খাসবন্ধ হইয়া গেল! প্রাণহীন মৃতের মত মুহূর্তকাল নিশ্চেষ্ট স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, লীনার অজ্ঞাতেই তাহার দিখিল মুষ্টি হাণ্ডেলটা ছাড়িয়া দিল। মৃতের মত আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, লীনা ধীরে ধীরে ফিরিল। চটি খুলিয়া খালি পায়ে সেই ম্যাটিং করা মেঝের উপর ধীরে ধীরে পা-চারি করিতে করিতে, সে এই আকস্মিক উত্তেজনটা নিঃশব্দে সামলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কাটিল। ক্রেশবহ চিন্তার স্বপ্নে আপন-হারা লীনা হঠাৎ এক সময় শব্দ শুনিয়া চমকিয়া বুলিল, পাশের ঘরে আমি এঁবার চেয়ার ছাড়িয়া, পোষাক বদলাইয়া শয্যায় বাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। মুহূর্তকাল একটার পর একটা কাণে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। লীনা হির হইয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়ভাবে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিতে লাগিল। আর বেশী দেরী করা তো চলিবে

না! দুয়ারের কাছে সরিয়া আসিয়া, হাণ্ডেলটা টানিয়া দুয়ার একটু ফাক করিয়া নিম্নস্বরে লীনা বলিল, "আমি আসিতে পারি?"

পিককু তখন আলো নিবাইয়া শয্যায় শুইয়াছেন। মশারীর ভিতর হইতেই তিক্ত-স্বরে বলিলেন, "প্রয়োজন?"

গলা ঝাড়িয়া লীনা স্পষ্টস্বরে বলিল, "কতকগুলো দরকারী কথা আছে।"

বিরক্তির সহিত আঁখিয়া উত্তর হইল— "এসো।"

মৃতের মত ক্ষণিকের জন্ত চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বেদনাক্রান্ত মুহূর্ত নিঃশ্বাস ছাড়িয়া লীনা ঘরে ঢুকিল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া সাবধানে চেয়ার টেবিলের ধাক্কা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া মশারী-ফেলা খাটের শিয়রে পাতা 'আর্ম চেয়ার'টা দখল করিয়া পা-জুটাইয়া সে বসিল। খালি পায়ে চলা-ফেরা করার জন্ত অনেকক্ষণ হইতেই পা-জুটটার শীত বোধ হইতেছিল; অজমনা থাকার লীনা এতক্ষণ তাহা টের পায় নাই। এবার পরম শালে মুড়িয়া পা-জুটাকে একটু আরাম দিতে গিয়া সে দেখিল, দুই চরণই বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে!—সমস্ত রক্ত মাথার চড়িয়া, দুর্বল মস্তককে পীড়ন জরুর করিয়াছে! কিন্তু নিজের শারীরিক ব্যর্থতার দিকে মনোযোগ দিবার মত লীনা মনের অবস্থা তখন মোটেই ছিল না। পা-জুটাইটা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া, গরম করিতে করিতে, মুহূর্তস্বরে সে বলিল, "আমি যা বলতে চাই, দয়া করে সেগুলো মন দিয়ে শুনে সঠিক জবাব দেবে?"

কড়া গাভীঘোর সঙ্গে পিকক্ উত্তর দিলেন—“অত ভূমিকা আড়ম্বরের দরকার থাকে তো, উঠে যাও, মিছে তাক কর না।”

দাঁতে চোঁট কামড়াইয়া দ্বিৎ তীব্রস্বরে লীনা বলিল, “আমি আহোরাত্রই তো তোমায় মিছে তাক করছি; তবু এই ঘুমের সময় অতিরিক্ত জালাতন করতে বাধ্য হচ্ছি, উপায় নাই বলে।—মাপ করো।”

পি। কি বলবার আছে ছাই, বল শীঘ্রী।—

লী। সংক্ষেপেই বলছি। প্রথম কথা, পাসর্ন কোথায় গেছেন, কি বৃত্তান্ত, সে খোজ নেবার জন্ত অমন ভাবে ছুটে যাওয়ার আবশ্যকতা তোমার কি?”

কষ্ট গর্জনে উত্তর হইল—“খুসী আমার।

লী। হুসংবাদ! তোমার যথেষ্ট খুসীর চরণে আশ্রয় বলি দিবে চলবার জন্ত আমি আজীবন বাধ্য, কিন্তু পাসর্ন কুমারী সন্ন্যাসিনী,—আমাদের অল্প দিনের পরিচিত প্রবাসের বন্ধু মাত্র। তাঁর আচরণ-সম্বন্ধে কোন ঘৃণিত সন্দেহ প্রকাশ করবার কি অধিকার তোমার আছে, জানতে চাই।—

অধৈর্য্যস্বরে উত্তর হইল—“তুমি অতিশয় সর্গীক্ষণশীল নারী, অত্যন্ত নীচমনা—”

বাধ্য দিয়া লীনা বলিল, “তথ্যাত্ত, কিন্তু পরম উদারচরিত্র, উচ্চ-মনা ভদ্রলোক তুমি, তুমি সর্গীক্ষণ করে সভা বল দেখি,—পাসর্নের সম্বন্ধে তুমি মনে মনে যে নীচ ধারণা পোষণ করছ, সেটা কোন্ উচ্চতর, কোন্ ভদ্রতার বোঝাই দিবে?”

পিকক্ কিংকর্ণ চূপ করিয়া কি ভাবিলেন,

তারপর সহসা কর্ণস্বর নরম করিয়া উত্তর দিলেন—“তুমি কি বেচ্ছায় নিজের অপমানকে ডেকে আনতে চাও?”

শান্ত স্থির কণ্ঠে লীনা উত্তর দিল—“তোমার কাছে আমার সম্মানের মূল্য কতটুকু, সেটা তোমার স্ত্রী হ'বার পর থেকে হাড়ে হাড়ে জেনে নিয়েছি। আজ এখানে তুমি নূতন করে কি অপমানের তর আমায় দেখাতে চাও? নিজের মান-মর্যাদা নিয়ে তোমার কাছে মানের কান্না আমি কাঁদতে আসি নি; আমি এসেছি পাসর্ন-সম্বন্ধে প্রশ্ন নিয়ে।—”

খুব ঠাণ্ডাস্বরে পিকক্ উত্তর দিলেন—“কাল সকালে চায়ের টেবিলে সে-কথার আলোচনা হবে, আমি সমস্ত তোমার বুদ্ধিতে দেব। আজ যাও, ট্রেনের ঝাঁকুণীতে আজ আমার শরীর ক্লান্ত হয়ে রয়েছে, ঘুমুতে দাও।”

লীনা দুই মুহূর্তের জন্ত চূপ করিয়া থাকিয়া ধীরে বলিল, “এর পর আমার উঠে যাওয়াই উচিত, কিন্তু তা আমি যেতে পারছি নে, মাপ করো। পাসর্নের প্রতি তোমার এ-ব্যবহারের কারণ কি, সেটা আজ রাজেই আমি জানতে চাই।—”

পিকক্ খানিকটা ভাবিয়া উত্তর দিলেন—“আমার ব্যবহারের কারণ আমি পাসর্নের কাছেই খুলে বলব, সেটা তোমার জ্ঞানবার কোন দরকার নাই।”

লীনার চিন্তা অগিয়া উঠিল। সে সক্রোধে বলিল, “কোন দরকার নাই? বাঃ! আমার সাম্মানে তুমি একজন নিরপরাধ ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে অবধা অপমানসূচক বাক্য উচ্চারণ

করবে, আর আমি নিশ্চীনের মত তাই দেখব? তোমার অজ্ঞায় আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করবার দরকার আমার নাই,— কিন্তু যিনি এর বিন্দু-বিসর্গও জানেন না, সেই পাসনের কাছে তুমি ছুটবে তোমার হীন ধারণার কৈফিয়ৎ দিতে?—কথাটা মুখে আনতে তোমার লজ্জা হোল না?”

তাছল্লীর ঘরে পিকক্ বলিলেন, “মিছে বক্বক্ কোর না! পাসন এর বিন্দু-বিসর্গ জানেন না! তুমি আন্যোপাস্ত সব খবরই তো রাখো! ডবসনের কুঠিতে পাসনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, সেটা জানো?”

আতঙ্কিত হইয়া লীনা বলিল, “কি? সত্যি তুমি ডবসনের কুঠি পর্যন্ত গেছলে তা হলে?”

পরম ঔদাস্যের সহিত উত্তর হইল—“হাঁ, তাতে হয়েছে কি?”

ধামিয়া, নিজেকে সামলাইবার জন্য একটু দম লইয়া, লীনা বলিল, “হয় নি কিছু, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তুমি সে-সময় হঠাৎ ডবসনের কুঠিতে পাসনকে খুঁজতে গেছলে, সে রহস্তটাও গোপন রাখো নি, আশা করি?”

নিরঙ্কুশ দার্ঢ্য-সহকারে উত্তর হইল,—“না তা তো রাব্বি নি! আমি তোমাদের মত কুজ্জি ভদ্রতার চরুণে দাসখৎ লিখে ‘পেটে এক মুখে এক’ ব্যবহার মোটেই ভালবাসি নে। আমার মনে যে সংশয় জেগেছিল, আমি হাতে হাতে পরিষ্কার প্রমাণ নিয়ে সেটার স্পষ্ট ধীমাংসা শেষ করে নেওয়াই পছন্দ করি।”

লী। পাসনকে কি জানিয়ে দিয়েছ যে, তুমি তাঁর সম্বন্ধে একটি ঘৃণিত সম্বোধ-কল্পনার অধীর হয়েই হঠাৎ ডবসনের বাড়ীতে তাঁকে খুঁজতে গেছলে?”

“হ্যাঁ তা বলেছি বাই কি, তা’তে তোমার কি?”

লীনা হতবুদ্ধির মত খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, “সেখানে গিয়ে তোমার সম্বোধের অহুঙ্ক প্রমাণ কি দেখলে? পাসন কি ডবসন-সাহেব বা অন্য কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে আপত্তিকর নিভৃত-আলাপে নিমুক্ত ছিলেন?”

কোন উত্তর না দিয়া পিকক্ পাশ ফিরিয়া গইলেন। লীনা উত্তর-প্রত্যাশায় মিনিট-পাঁচেক ব্যথ উৎকর্ষায় অপেক্ষা করিয়া পুনশ্চ বলিল, “উত্তর দাও, পাসনকে সেখানে কি অবস্থায় দেখলে? ডবসন কুঠিতে ছিলেন?”

কোন উত্তর নাই। লীনা আবার খানিকটা অপেক্ষা করিয়া বলিল, “কথামুলা শুনে পাচ্ছ?”

পিকক্ নীরব। লীনা খানিকটা নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিল, “আমার প্রশ্নগুলার উত্তর পাব না?”

পিকক্ নিরুত্তর। যথেষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া লীনা উঠিয়া দাঁড়াইল; তীব্রবরে বলিল, “সন্মান্তরার মধ্যাদা-বস্তের আড়ালে যে ইতরামি লুকানো থাকে, সেই ইতরামিকেই আমি জগতের চরম প্রগাঠ বস্তু বলে মনে করি। তোমার বতাব-সংশোধনের জন্য আমি প্রাণ-পণে বতটুকু চেষ্টা কর্তে চেয়েছি, সে চেষ্টা আমার প্রাণান্তিক লালনের কারণ হয়েই

দাঁড়াচ্ছে, দেখছি! তুমি অন্ধ জেদের বশে আমার মনের উপর যে বিষ ঢালতে শুরু করেছ, সে-বিষে আমার সমস্ত প্রকৃতি আগাগোড়া বিধ্বস্ত—বিকৃত হয়ে যেতে বসেছে! তুমি ধাক্কা দিয়ে দিয়ে, ক্রমশঃ আমার যেখানে নামিয়ে নিয়ে চলেছ, জেনে রেখো সেখান থেকে, তোমার ওপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রাখবার শক্তি আর আমার মোটেই থাকবে না।”

হুয়ারের কাছে গিয়া লীনা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। অদিকতর কঠিন কণ্ঠে বলিল, “তোমার নির্লজ্জ অভদ্রতার অত্যাচার আমি নিশ্চয়ই সহ্য করে চলেছি, কিন্তু এই নীরব সহিষ্ণুতার সঙ্গে আমার বিবেক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে, বুকের ভিতর ঘণার দিকার দিনের দিন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে—”

লীনার কথা শেষ হইতে না হইতে, হঠাৎ পিক্‌মশারী পুলিশ ল্যাফাইয়া পড়িয়া লীনার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও লীনার দুই হাত ধরিয়া সবেগে ঝাঁকানী দিয়া উগ্র-কণ্ঠে বলিলেন, “তুমি আমার স্ত্রী কি না আমি জানতে চাই।”

লীনা স্তম্ভিত হইয়া গেল! সেই অন্ধ-কারের ভিতর দিয়াই স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে আঁধারের গাঢ় আবরণ ভেদ করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না;—অনুভব করিল, শুধু যেন, স্বামীর চন্দ্রবেশ ধরিয়া তাহার সামনে এক হৃদয় দানবের ছায়ামূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে! কিয়ৎক্ষণ নির্বাক থাকিয়া শুককণ্ঠে লীনা বলিল, “এ প্রশ্নের অর্থ কি? আজ স্ত্রীর অহুচিত ভাবে অগ্রসর-রক্ত সত্য তোমার

মুখের ওপর প্রকাশ করেছে বলে, সেই অপরাধের কৈফিয়ৎ চাও?”

উত্তেজিত স্বরে পিক্‌ বলিলেন, “হাঁ তাই। মনে আছে কি,—গির্জার বিবাহের সময় তুমি শপথ করে স্বামীর সমস্ত আদেশ পালনের বাধ্যতা স্বীকার করেছ? মনে আছে সে অঙ্গীকার?”

লীনা উত্তর দিল—“হাঁ, আছে, খুব আছে, কিন্তু স্বামীর ভুলকে সংশোধন করবার অধিকার,—স্বামীর অত্যাচার-উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্ধ একগুয়েমির প্রতিবাদ করবার অধিকার, সকল-স্ত্রীরই আছে”—

লীনার কথা শেষ হইতে না হইতে পিক্‌ অপরিমিত ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন—“কখনই না! স্বামীর ওপর কোন কর্তৃত্ব করবার কোন অধিকার কোন স্ত্রীর কিছুমার নাই! স্বামীর ওপর সেরকম কর্তৃত্ব-পরিচালনের চেষ্টা যে স্ত্রী করে, সে স্ত্রী-নামের অযোগ্য।

লীনা খুব শাস্ত্রবরে উত্তর দিল—“সর্বাস্বঃ-করণে স্বীকার করছি,—ভ্রায়পরাণে সুযোগ্য স্বামীর মর্যাদা লঙ্ঘন করে যে স্ত্রী অত্যাচার-ভাবে কর্তৃত্ব-পরিচালনের চেষ্টা করে, সে স্ত্রী একান্ত হতভাগিনী! কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখো দেখি, তোমার ওপর সেরকম কর্তৃত্ব-পরিচালনের চেষ্টা আমি কখনো করেছি কি? তোমার মর্যাদা লঙ্ঘনের ভয়ে, এতদিন তোমার সমস্ত শ্রায়-অন্যায় আমি নিশ্চয়-ধৈর্য্যে সহ্য করি নি কি? ভেবেছিলাম, তোমার সমস্ত ক্রটি তুমি নিজেই একদিন সংশোধন করুতে সচেষ্ট হবে; কিন্তু তোমার ভেতর সে চেষ্টা আপনা থেকে কিছুতেই

জাগল না;—তোমার অত্যাচার-প্রবৃত্তি দিনে দিনে বেড়েই উঠছে, তুমি নিজের ভয়ঙ্কর মর্যাদা পর্য্যন্ত ভুলে যেতে বসেছ! তোমার—”

“চুপ করে থাক, চলে যাও,—”
শিক্ ক্রোধ তরে ঘরের দিকে আঙুল দেখাইলেন। লীনা কম্পিতচরণে অগ্নিসর হইয়া, নিজের অজ্ঞাতেই শুককণ্ঠে চিরাত্যন্ত বুলী উচ্চারণ করিল—“শুভ রাত্রি।” পর-মুহূর্ত্তেই সে ঘুমারের আড়ালে অদৃশ হইয়া গেল।—

(৬)

পরদিন সকালে লীনার বগন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা প্রায় ন’টা। বিছানা হইতেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া, বিরক্তি-মানি-জড়িত স্বরে লীনা আয়াকে ডাকিল। আয়া ঘুমারের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল; ত্রস্তে ঘরে ঢুকিল। লীনা ঘড়ির দিকে ঈসারা করিয়া বলিল, “এত বেলা পর্য্যন্ত আমার ঘুম ভাঙাও নি কেন?”

আয়া বলিল, “সাহেব বাবণ করে গেছেন।”

লী। বাবণ করে গেছেন? কোথায় তিনি?

আয়া। শীকারে বেরিয়েছেন।

• লী। কখন?

আ। ঠিক সাড়ে ছ’টায়।

লী। প্রাতরাশ সেরে গেছেন?

আ। হাঁ।

লী। সঙ্গে বেয়ারা কেউ গেছে?
কখন?

আ। না, তিনি কাউকে সঙ্গে নেন নি।

লীনা উঠিয়া বসিল; গুম্ হইয়া খানিকটা কি তাবিল, তারপর বিরক্তির সহিত বলিল, “তোমরা এত বেলা পর্য্যন্ত আমার ঘুমুতে নিরে ভাল কর নি; আমার শরীর বড় অবসাদগ্রস্ত বোধ হচ্ছে।”

আয়া সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া বিম্বিত দৃষ্টিতে ঘন ঘন লীনার চোখের দিকে এবং মাথার বালিশটার দিকে চাহিতে লাগিল। লীনা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, “কি দেখছ?”

আয়া কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, “আপনার চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে, মাথার বালিশ-টাও ভিজ়ে দেখছি, রাত্রে কোন দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদেছিলেন বোধ হয়।”

দুঃস্বপ্ন দেখিয়া নয়, আগ্রহ অবস্থাতেই যতক্ষণ না ঘুম আসিয়াছিল, ততক্ষণ অনর্গল অশ্রুশ্রোত যে তাহার ইচ্ছার বিকল্পেই নিঃশব্দে চোখ দিয়া করিয়াছিল, সে কথা লীনার মনে পড়িল। আয়ার প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া, কাথিয়া-স্তরে মন দিল।

প্রাতরাশের অন্ত লীনা টেবিলে বসিতেছে, এমন সময় বেয়ারা আসিয়া খবর দিল, “ছোট মিশনারী মেমসাহেব পার্সন আসিয়াছেন।” গত রাত্রির কথাগুলো তখন লীনা মনে মনে তোলা পাড়া করিতেছিল। পার্সনের আগমন-সংবাদে হঠাৎ তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন ছিন্ন হইয়া গেল। কপেক শুক থাকিয়া ক্রিষ্ট স্বরে বলিল, “সেলাম দাও।”

মুহূর্ত্ত-পরেই সন্মানন্দময়ী পার্সন প্রায়

হাস্তোজ্জ্বল মুখে ধরে ঢুকিয়া ‘সুপ্রভাত’-সস্তা-
বণ করিয়া বলিলেন, “আজ রবিবার আপ-
নাকে গির্জায় ধরে নিয়ে যাবার জন্ত এসেছি,
চলুন।”

লীনা চমকুত হইয়া গেল। এ কি
ব্যাপার! তবে কি পিককু কাল রাত্রে
লীনাকে সব মিথ্যা বলিয়াছেন? পাস’নের
প্রতি তাঁহার ভ্রাতাচার-শ্রুত ব্যবহারটা তবে
সম্পূর্ণই মিথ্যা কথা! নিশ্চয়!.....তাঁহাই
তো হওয়া সম্ভব। সত্যই পিককু কিছু
কেপিয়া উঠেন নাই, যে পাস’নের মত একজন
সজ্ঞাত পদস্থা ভদ্রমহিলাকে অকারণে অথবা
অপমান করিবেন! যাক, ধন্তবাদ দেখরকে,
বাঁচা গেল!

অগত চিন্তাকে সবলে এক পাশে ঠেলিয়া
রাখিয়া, তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার টানিয়া
পাস’নকে বসিতে দিয়া লীনা স্মিতমুখে বলিল,
“বহন, বহন,—আজ রবিবার? কিছু
খোঁসল নাই! গাধার মত পড়ে পড়ে এমন
ঘুমিয়েছি যে, বেলা ছপুয়ে খুম ভেঙে উঠলুম
আজ। কি-চাকরগুলিও আমার ভেগ্ন সব
তালেবর হাঁসিয়ার! কেউ ঘুমটা ভাঙিয়ে
দেয় নাই, কি অত্যাশ বলুন দেখি?.....যাক,
এক কাপ চা চলুক এখন, কি বলুন?”

“খুব, খুব! বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা চা হলেই
চলবে,—বিলক্ষণ! আমি নিজে চা টেলে
নিছি, দাঁড়ান, দাঁড়ান!—আপনি ততক্ষণ
নিজের পাঁওয়াটা হুক করে বিন্। মিস্ নীল
গির্জায় চলে গেছেন,—আমাদের বেশী দেরী
করা হবে না।”

হুইকনে চা-পান ও কিঞ্চিৎ ভোজন আরম্ভ
করিলেন।—আজ-বাজে হুই চারিটা কথা

কহিতে কহিতে পাস’ন অলক্ষ্যে লীনার মুখের
দিকে বার-কয়েক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া হঠাৎ এক-
সময় হাসিমুখে বলিলেন, “আপনি আবার
সেই মুদ্রাটি হয়ে যেতে শুরু করলেন যে!
মার্সীর জন্তে ভারী উত্তলা হয়ে উঠেছেন নহ?
এ আপনার অত্যন্ত অত্যাশ। আচ্ছা, কেন অত
ভাবেন, বলুন দেখি?”

পাস’নের স্নেহভরা অহুমোগের স্বর শুনিয়া
লীনা চমকিয়া উঠিল! বিস্মিত নহেন চাহিয়া
বলিল, “না, না,—কে বলে সে কথা? বাস্তবিক
মার্সীর জন্তে আমি কিছু মন খারাপ
করি নি।—মনে বৃথা অশান্তি এনেকি করব
বলুন? আমার কাছ ছাড়া হয়ে না থাকলে,
যখন তারও শরীরের মঙ্গল নাই, আমারও
জীবনের কল্যাণ নাই, তখন দুর্বল মনের
অত্যাশ দাবীকে সজোরে অগ্রাহ্য করাই
উচিত। তবে কি জানেন পাস’ন,—” হঠাৎ
লীনার চোখ অশ্রুসঞ্জল হইয়া উঠিল; অত
দিকে চাহিয়া ঢোক গিলিয়া আত্মদঃখের
করিয়া কৃষ্ণ-করণ কণ্ঠে বলিল,—“আর কিছু
নয়, সময় সময় বড় মনটা পারাপ হয়ে যায় যে,
নিজের অসুখের জন্ত আমি আশা মিটিয়ে
ছেলেটির উপর মায়ের কর্তব্য-পালন কিছুই
করতে পারি নি। সে হ’বার পর থেকেই
নিজের শরীর নিয়ে এমন বিরক্ত-বিরত হয়ে
থাকতে হোল যে, বড় কষ্ট হয় পাস’ন, বড় কষ্ট
হয়,—তার আদর আব্দার হাসি খুসীতে
আমি একদিনের জন্ত প্রাণভরে আনন্দ করতে
পারি নি। ইদানীং ‘দামাল’ হয়ে উঠেছিল,
কাছে এলেই ছোটোপাটি করে উৎপাত জুড়ে
দিত, আমার ভারী জ্বালাতন-বোধ হোত;
অনেক সময় সামান্য দোষেই আমি অসহিষ্ণু

হয়ে, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে কড়া শাসন করে বসতুম্! এখন, সেগুলো মনে পড়লে বড় অসুস্থতা বোধ হয়, সময় সময় মন ভারী অস্থির হয়ে ওঠে।....”

পার্সন বাধা দিয়া সাধনা-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, “যেতে দেন, যেতে দেন। নিজের শরীর ভাল না থাকলে অনেক মানুষই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুকিটে রাগী হয়ে ওঠে। ও তো একটা সাধারণ নিয়মই আছে। ওর জন্তে কেন হুঃখিত হন? আপনি ভাল হয়ে ফিরে যান, সন্তানের ওপর মার কঠব্য পালন করার পরিপূর্ণ সুযোগ পাবেন। এখন এরকম নিম্নলিখিত অসুস্থতাপে মনকে মিছামিছি জুঁক করলে, আপনার শরীরের উন্নতির ব্যাঘাত হবে।—ভুলে যান, ও-সব চিন্তা ছেড়ে দেন। সন্তোষই সকল সুখের মূল, এটা জানেন তে? কেন মিছে কতকগুলো অধীতিকর চিন্তা নিয়ে নিজেকে কষ্ট-পীড়িত করেন? ওতে যে আপনার স্বামীকেও অসুখী করা হয়।—হয় না কি?”

পার্সন জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে লীনার মুখের দিকে সাগ্রহে তাকাইলেন। লীনা বিষাদ-ভরে ম্লান হাসি হাসিল; কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, হঠাৎ সান্নিধ্যসে জোর গলায় বলিয়া উঠিল, “আপনি বিয়ে করেন নি, বেশ করেছেন পার্সন। বেশ আছেন আপনি! আপনার মত পবিত্র স্বভাব অবিবাহিত নয়-নারীর মুখের দিকে তাকালে, আমার অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ হয়। বেশ আছেন আপনারা। আপনি ধরবার বিয়ে করবেন না!”

সহসা অপরিণীত কোঁক্ক-উচ্চালে পার্সন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—“বাহবা, বাহবা,

বাঃ! এই ত চাই! চক্ষিণ-ঘটা পার হয় নি, আপনার মুখে কাল এক মত শুনেছি, আজ এখন! মিসেস ক্রাউডেনকে এই নিয়ে রাগিয়ে দিতে আমার বেশ মজা লাগে—ওর ছোট ভাইটি,—অর্থাৎ মিঃ ডবলস্, তারে-বাড়া স্মৃতিবাজ মাহু!—ভুলোকেই কেন নেশা নেই, শুধু এক চিত্রবিজ্ঞা তাঁকে ঘোল আনা দখল করে রেখেছে। ও মানুষের বিবেচনা করার আশা ইহজন্মের মত শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের উৎকট-মমতা তা বলে তো তাঁকে রেহাই দেবে না। চট্ট-পট্ট তাঁর আইবুড়ো নাম খণ্ডে দেবার ক্ষম্তে বিবাহিত বন্ধুর দল ‘মোরখা’ হয়ে উঠেছেন মিসেস ক্রাউডেন ভয়ানক চটে যান! কিছুতে যখন পেরে ওঠেন না, তখন আমার কাছে অভিযোগ করুতে ছুটে আসেন, ডবলস্ বেচারী চেসে আঁকুল হন।—

পার্সনের অনর্গল উচ্ছৃঙ্খিত বক্তৃতায় বাধা দিয়া হঠাৎ ব্যস্তভাবে লীনা বলিল, “আচ্ছা মিসেস ক্রাউডেনেরা পৌছে কোন ‘তার’ করেছেন কি? ওর স্বামী কেমন আছেন? আপনি কাল সন্ধ্যা বেলা তাঁদের কুঠিতে গেছিলেন, নহ?”

কথাটা শেষ করিয়াই লীনা উৎকর্ষাব্যায় দৃষ্টিতে চকিতের মত পার্সনের মুখপানে চাহিল। এতক্ষণ কোন ছুতায় ডবলসনের কৃষ্টির নামটা সে মুখ আনিতে পারিষ্ঠেছিল না, এবার একটু প্রযোগ পাইতেই, তিক্তবাদ কটু ঔষধ-গেলার মত করিয়া কথাটা বলিয়াই, ক্ষণপরে বিকৃত বিবর্ণ মুখে, টেবিলের তলায় হেঁট হইয়া কি যেন একটা জিনিস খুঁজিতে লাগিল; পার্সনের মুখের দিকে চাহিয়া

প্রশ্নের উত্তর শুনিতে তাহার শক্তি
রহিল না ।

পার্সন স্বাভাবিক প্রশ্নসমূহের সহিত স্নিগ্ধ
কণ্ঠে বলিলেন, “হঁ, মা চলে গেছেন, মামা
চলে গেছেন, বাগিকা ক্লাউডেন-কল্লা একা
প্ৰবর্ণেশের কাছে রয়েছে, তাই বেচারীর খোঁজ
নিতে গেছলুম্ । মি: পিকক্‌ও খানিক পরে
সেখানে গিয়ে হাজির । উনি ভবসনকে খুঁজতে
গিয়েছিলেন ।”

লীনার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া গেল ।
মুহূর্তের জন্য নির্ঝাঁক থাকিয়া, হেঁট হইয়া
নিজের পায়ের মোজাটা অকারণ ব্যস্ততার
টানিয়া সোজা করিতে করিতে, ক্ষতনিঃশ্বাসে
অজিতকণ্ঠে বলিল, “তারপর ? ভবসন কুঠিতে
নাই শুনে কি বলেন ?”

একান্ত মনোযোগে উপস্থাপরি চায়ে চুমুক
দিতে দিতে, পার্সন খুব সংক্ষপেই বলিলেন,
“বিশেষ কিছু নয় ।”

লীনা আশ্বাসমন করিতে পারিল না ;
কিন্তু উত্তেজনার আবেগে, সহসা অধীরকণ্ঠে
বলিল, “কিছুই নয় ? আপনার সঙ্গেও কোন
কথা হোল না ?”

চারের কাপ নামাইয়া, ক্রমাগত মুখ
মুছিতে মুছিতে পার্সন একটু হাসিয়া বলিলেন,
“সামান্যই ।”

পরক্ষণেই চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া
কমালু ঘুরাইয়া, কপালে বাতাস দিতে দিতে
বলিলেন, “উ: বড় গরম, আর ঘরের ভিতর
টিক্তে পারা যাচ্ছে না ; চলুন, রাস্তার বেরিয়ে
পড়া যাক, এবার ! আপনি পোষাকটা বদলে
নিউ, আমি ততক্ষণ বাইরের বারাতার বসি ।”

পার্সন প্রস্থানোন্মত্ত হইলেন । লীনা

অস্থির ভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, উৎকর্ষ-
ব্যাকুল স্বরে বলিল, “দাঁড়ান দাঁড়ান, আর,
একটু আমার অনধিকার চর্চার অপরাধ
মাফ করুন ! আপনার সঙ্গে কি কথাটা হোল,
আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?”

পার্সন চোকাঠের কাছে গিয়া ফিরিয়া
দাঁড়াইলেন ; তীক্ষ্ণ-অহুসজ্জিত দৃষ্টিতে লীনার
মুখপানে চাহিয়া প্রশ্নসমূহে স্মিতহাস্তে
বলিলেন, “আপনি যে এই প্রশ্নটা করবার
জন্যে বিশেষ ব্যস্ত আছেন, সে আমি আগেই
টের পেয়েছি, সেই জন্যেই তাড়াতাড়ি চম্পট
লাগাচ্ছিলুম্ । যেতে দেন, যেতে দেন, ওদয়
যাচ্ছে কথা নিয়ে মাথা ঘামানো পণ্ডিত্রম !
মি: পিককের মেজাজ কাল মোটে ভাল
ছিল না, তার ওপর কুঠিতে ফিরে আপনার
সঙ্গেও বোধ হয় কিছু চটাচটি হয়ে থাকবে ?
রোখের মাথার বদ্ধ যদি আমার কিছু
অর্থহীন কথা শুনিয়া থাকেন, তার জন্যে
আমার কোন আপশোষ নাই । আপনাকে
আমি অমুরোধ করছি, ওর জন্যে আপনি
কিছুমাত্র হুঃখিত হবেন না । যান, পোষাক-
কামরাগ যান, দেয়ী করবেন না ।”

পার্সন হাসিমুখে চলিয়া গেলেন । লীনা
মুহমান নির্ঝাঁগু ভাবে টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইয়া
রহিল । ব্যাপারটা কি কতদূর ঘটয়াছে,
তাহা সে কিছুই হুনিশ্চিত রূপে জানিতে
পারিল না ; কিন্তু একটা কিছু যে ঘটয়াছে,
তার কোন সংশয় নাই, এবং পার্সন সেটাকে
যত জোরেই হাসিয়া উপেক্ষা করুন, সেটা যে
সেব্রপ ভাবে উপেক্ষণীয় মোটেই নয়, সে-
বিষয়ে লীনার লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না ।
পার্সন উদার-হৃদয়া, শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, তিনি

বন্ধু-প্রীতির অহরোধে এই অপ্রীতিকর বন্ধনটা স্বীকার করিতে হইতহে, ততক্ষণ ব্যাপারটা নির্বিবাদে চাপা দিতে চান, কিন্তু সে রূপ উদাসীন থাকাও উচিত নয়। দীতে ঠোট চাপিয়া আঁধার-ভরা মুখে লীনা পোষাক-কামরার দিকে চলিল।
(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

প্রার্থনা।

পতিতপাবন তুমি শুনেছি, দয়াল !
কৈদে কৈদে কাটাইব আর কত কাল ?—
বুঝিতে পারি না কিছ্ ! হের পাপে তাপে
নিদাক্ষণ নিয়তির ঘোর অভিশাপে
ছরবহ হইয়াছে জীবন আমার,
নিভিয়াছে জীবনের সকল আশার
সকল আলোক নাথ ! পারি না ত আর
ডুবিতে এমন করে—বহিতে অপার

মরম-বেদনা হায় ! পতিতপাবন !
তুমি দাও দয়া করে পতিতে পরণ
রাতুল চরণতলে ! মুছে দাও আঁপি
তোমা'রি কমলকরে ! অনাথ একাকী
নহি দেব, তুমি আছ চিরসাপী হয়ে—
বুঝাইয়া দাও আজি অদৌর জদয়ে !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

জাহাজ-ডুবি।

(পূর্ণ প্রকাশিতের পর)

(৮)

আজিমগঞ্জের বাটীতে আজ মতোৎসব।
আজিমগঞ্জের নূতন জমীদার বহুদিন যাবৎ
হুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি লাভ
করিয়াছেন, এতহুপলক্ষে তিনি একটা মহা-
ভোজের আয়োজন করিয়াছেন।

পৈতৃক-সম্পত্তি লাভ করিয়া অবধি তিনি
হুঃখ-কষ্টে অর্থব্যয় করিতেছেন; নাচ, তামাসা,
বাগান-পাটিতে ইয়ারের দল লইয়া অজস্র

অর্থ উড়াইতেছেন। মোসাহেবের দলও
একটা ভাল-রকম ছুটিয়া গিয়াছে। তাহার
সকলে একবাক্যে সম্মতেরে বলিতেছে, “হ্যা,
একেই ত’ বলি জমীদার ! আগেকার পে-
ছুতটা কি আবার জমীদার ছিল না কি !
না জান্তো আমোদ কর্তে, না জান্তো
অর্ণের সহায় কর্তে। কোথাকার কোন্ একটা
হুঃখী কান্ধালের ছেলে এতবড় জমীদারিটা
হাতে পেয়েছিল ! সে কি আর বাবার জয়ে

আমোদ কা'কে বলে, তা জানতো? পৃথিবীতে
জন্মে যদি একদিনের জন্যে একটু ক্ষুধাই
না কর্বি, তবে ভগবান্ তোকে টাকা
দিয়েছেন কেন? আর এ বৃদ্ধো দেওয়ান-
বেটাও জুটেছিল তেমনি! আমাদের কি
এ-সীমানায় মাথা গলাতে দিত। আমরা
যেন ওদের কাছে মাগুব বলেই গণ্য ছিলাম
না।" পারিষদবর্গের এতাদৃশ চাটুবাক্যে
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জমীদার-বাহাদুর তাঁহার
বৃহৎ দস্তগুলি পরিস্ফুট করিয়া হাঃ হাঃ
হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিতেন। বৃদ্ধ রাধা-
গোরিন্দবাবু কার্য্য-পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।
তাঁহার স্থানে হারাদন-ও পুরাণ-নামক কোথা
হইতে দুইটি বন্ধু জুটিয়াছিল। নূতন জমীদারের
সমস্ত বিষয়-কার্য্য তাঁহারাই পর্থাবক্ষণ
করিতেন। একে একে পুরাতন কর্ম্মচারিবৃন্দ
এবং দাসদাসী সকলেই কার্য্য পরিত্যাগ
করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের
স্থানে হারাদন ও পুরাণ নিজ নিজ মনোনীত
ব্যক্তিকে নিযোজিত করিতেছিলেন। তাহা-
দিগের নিষ্ঠুর অত্যাচারে দেশবাসী প্রমাদ
গণিল। উপেন্দ্রকিশোরবাবুর সমস্ত মহলের
প্রাকগণ সম্বলিত হইয়া উঠিল। নির্ঘাতনের
সীমা রহিল না। অনেকে পর-ভিতা পরিত্যাগ
করিয়া উপেন্দ্রবাবুর এলাকা ছাড়িয়া
গ্রীষ্ম লইয়া পলায়ন করিল। কেবল অটল
কানাই। অমরকুমারের প্রিয়ভৃত্য কানাই
—যে কানাই একদিন “অমন খোঁটা-মুখের
কাছে কাজ করিতে পারব না” বলিয়া বাঁকিয়া
যদিয়াছিল—সেই কানাই এখন নূতন জমী-
দারের দাসদাস। যে একদিন বৃদ্ধ ফুসাইয়া
অমরকুমারের বশ-কর্ত্তন করিয়া বেড়াইত,

সে এখন অগ্নানবদনে অমরকুমারের নিন্দা-
বাদ করিয়া নূতন মনিবের মনোহা-সাধনে
প্রয়াস পাইতেছে, এবং নূতন মনিবের লাখিটা
ঘুসিটা, চড়টা চাপড়টা, এবং টাকাটা সিকিটাও
অগ্নানবদনে পরিপাক করিতেছে। ক্রমশঃ
সে নূতন মনিবেরও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে।
সর্বদা প্রভুর ছায়ায় ভ্রায় সে সঙ্গে সঙ্গে
থাকে। ক্রমশঃ এমন হইয়াছে যে, কানাই
না হইলে জমীদারের এক দণ্ডও চলে না।

ভোজ্য দিব্য মানস করিয়া আজ জমীদার-
বাবু ঘটা করিয়া মঞ্চে বসিয়াছেন। কলিকাতা
হইতে বিখ্যাত নর্ত্তকী আসিয়াছে, নাচ হইবে।
উপেন্দ্রকিশোরবাবুর বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গণ
হৃদয়-কারুকার্য্য-যচিত বৃহৎ চত্রেতে
আচ্ছাদিত করা হইয়াছে। তাহার স্থানে
বহুশাখাবিশিষ্ট ঝাড় বুলিতেছে। রাত্রি
নয়টা। বৃহৎ প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ। গ্রামস্থ
হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকল ভিন্ন লোককেই
নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-
দিগের জন্ত চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর
কেদারা স্থাপিত হইয়াছে। নিমন্ত্রিত
ব্যক্তিগণ তারকামণ্ডলীর ভ্রায় নব জমীদারের
চতুষ্পার্শ্বে ঘেরিয়া সেই চেয়ারগুলি অধিকৃত
করিয়া নির্বিঘ্নচিত্তে গান শুনিতেছেন। আর
সেই আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত আসরের লতা-
গুপ্প-সমল্লত কার্পেটের উপর সালকারা,
সুবেশা, সুকণ্ঠী নর্ত্তকী সুন্দর সলমা-চুম্বিক
কারুকার্য্যমণ্ডিত ওড়নাতে শোভিত, লাবণ্য-
বিকসিত নিজ সুকোমল গলিত দেহ-বস্ত্রী
দোলাইয়া নাচিয়া, নাচিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, উঠিয়া
বসিয়া মধুর স্বরতানে বীণা-নিকণবৎ মধুর
কণ্ঠে গাহিতেছে। নূতন জমীদারের নূতন

ভ্রাতার দলও নূতন পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া তন্ময় আঁটিয়া আসন্ন-মধ্যে স্থবাসিত তাম্বুল ও চুর্কট বিতরণ করিতেছিল। হারাদন ও পরাগ মাঝে মাঝে স্বহস্তে রজতপাত্রে করিয়া আতর, গোলাপ-পুষ্প ও পুষ্পমালা লইয়া এ-ধার ও-ধার ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এবং তাহাদের ইচ্ছামত ব্যক্তিকে তাহা বিতরণ করিয়া সম্মানিত করিতেছিল। উৎসবের কিছু-মাত্র ক্রটি হয় নাই। অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তিও ব্যস্ত করিল যে, আজিমগঞ্জের জমীদার-বাটীতে এমন নাচগানের ধুম কখনিকালেও হয় নাই। শ্রোতৃগণের বিশেষ অজুগোষে নর্তকী একটা চণ্ডীদাসের পদ গাহিল—

জনম অবধি হাম রূপ নিরখিত,
নয়ন না তিরপিত ভেল!
লাখ লাখ যুগ হিয়ে পর রাখিত
তবু হিয়ে জুড়ন গেল।

ইয়ারের দল ঘন ঘন মাথানোড়া, হাততালি এবং বাহবা দিতে লাগিল। ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইলে নর্তকী গান বন্ধ করিয়া। তাহার পারিশ্রমিক এবং উপস্কৃত পারি-তোষিক লইয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যথানিয়মে জাতিনির্বিশেষে স্থানে স্থানে ভোজনে বসিয়া গেলেন। চর্যা-চোষা লেঙ্ক পেয় নানাবিধ খাদ্যেরই আয়োজন হইয়াছিল। সকলেই পবিত্রপু হইয়া ভোজন সমাধা করিলেন।

আহারান্তে সকলে একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আসন্ন-মধ্যে কেবল স্বয়ং জমীদার এবং তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হারা-ধন ও পরাগ, এই ত্রিমূর্তি বিরাজ করিতে লাগিলেন। অবসর বুঝিয়া কানাইলাল

লাল জলের বোতল বগলে করিয়া লালজল সরবরাহ করিতে আসিলে, হারাদন শনস্কে লাকাইয়া উঠিয়া কানাইয়ের দিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, “বৈচে থাক বাপ-ধন! বৈচে থাক! জন্ম জন্ম আমাদের লালজল খাইয়ে পিপাসা নিবৃত্ত করাও।” কানাই ক্ষিপ্ৰহস্তে বোতলের ছিপি খুলিয়া ঘাসে বিলাতী স্ত্রী ঢালিয়া ক্ষিপ্ৰগতিতে ত্রিমূর্তিকে তাহা দান করিতে লাগিল। ঘাসের পর ঘাস, বোতলের পর বোতল শূন্য হইতে লাগিল। ত্রিমূর্তিই নেশায় বিতোর। উল্লাসে পয়গচক্র বাঁগিয়া উঠিল, “কে জানে বাবা, বুড়ো ব্যাটাকে মেয়ে এমন রাজত্ব লাভ হবে! এমন রাজত্ব ভোগ করতে পেল, একটা বুড়ো কেন, মাতটা বুড়োকে খুন করতে পারি।”

জমীদার স্বয়ং নেশায় মজগল! কিন্তু হৃদয়ের গুপ্ত প্রদেশে জ্ঞান-নামক বস্তুটা তখনও তাঁহার একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। তিনি হারাদনের কথা শুনিয়া অড়িত স্বরে তাহাকে নীচজনোচিত বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তুমি স্বত্তর, ভারি বেয়াদপ, ভারি বেয়াদপ! এ সব আমার বাবার রাজত্ব, আমার বাবার রাজত্ব। উপেক্ষ-কিশোর আমার বাবা, আমার বাবা, বুঝলে কি না?—বুঝলে কিনা?” কানাই স্ত্রী ঢালিতে ঢালিতে একবার কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল। আকর্ষিত স্ত্রী-সাগরে নিমগ্ন হইয়া ত্রিমূর্তি ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিলেন। স্বরাদেবী তাহাদের নৃত্যকে উঠিয়া মোহন নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন ক্রমশঃ সেই ত্রি-মূর্তি পর-পর পরস্পরের সঙ্গে পতিত হইয়া ভূমিশয়া

অধিকার করিলেন। কানাই তখন নিজ কার্যে প্রস্থান করিল। বাটার অন্ত্যস্ত সকলে আহ্বাদাদি সম্পন্ন করিয়া নিশ্চিত হইলে পর কানাই ধীরে ধীরে তাহার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অতিসম্ভরণে বাটা হইতে বহির্গত হইল। কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না। কেবল দেউড়িতে রামশরণ পাঁড়ে দ্বারবান্ বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল; মনুষ্য-পদশব্দে চমকিত হইয়া দিক্‌দিগ্‌র থেকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই অর্ধজড়িত স্বরে বলিয়া উঠিল, “কোন ছায় রে?”

কানাই বেগ সপ্রতিভ ভাবে পরিষ্কার-কণ্ঠে উত্তর করিল, “আমি কানাই।”

রামশরণ দ্বারবান্ পূর্ববৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই ঝিমাইতে ঝিমাইতে বলিল, “এত্না ঘড়ী রাত্বে কাঁহা যাতা ছায়?”

কানাই তেমনি সহজ ভাবে উত্তর দিল, “বাবুর ত্রাণ্ডি ছুরিয়াছে, তাই বাবুর জন্তে ত্রাণ্ডি আনতে যাচ্ছি। এপুনি ফিরে আস্বে, তুমি ফটক বন্ধ কোরো না।” বলিয়াই কানাই চলিয়া গেল। রামশরণ পাঁড়ে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

কানাই বরাবর পুলিশের গোয়েন্দা বিজন-কুমারবাবুর বাটীতে গমন করিল। রাত্রি তখন প্রায় দুইটা বাজিয়াছিল। বিজনবাবুর বাটার সকলেই নিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল; কেবলু বিজনবাবুর শয়নকক্ষ-মধ্যে তখনও আলো জলিতেছিল। কে যেন কক্ষ-মধ্যে পদচারণা করিতেছিল। বাতায়ন-পথে রাস্তায় দাঁড়াইয়া কানাই তাহার ছায়া দেখিতে পাইল। কানাই রাস্তার দাঁড়াইয়া বহির্দরজা ঠেলিতে লাগিল। বহুক্ষণ কপাট ঠেলাঠেলি

করায় বিজনকুমারের ভৃত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সন্তঃস্বপ্নোখিত নিদ্রাগল জড়িত কণ্ঠে বিরক্তভাবে গৃহমধ্য হইতে সে উত্তর করিল, “আঃ—মর! এত রাত্তিরে কেরে জালাতন করতে এল?”

এই মধুর সম্ভাষণে কানাই সন্তুষ্ট হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না, কিন্তু মুখে সে দুই কষ্ট কোন ভাবই প্রকাশ না করিয়া সহজভাবে বলিল, “শীগগির দোর খোল।—আমি কানাই, বাবুর কাছে আমার একটু দরকার আছে।”

ভৃত্য পূর্ববৎ বিরক্তিতে রুদ্ধস্বরে বলিল, “কানাই হও আর বলাই হও, এত রাত্তিরে আমি দোর টোর খুলতে পারব না। কাল সকালে এসে তোমার যা বলবার আছে, বলে যেও।”

কানাই বলিল, “সকালে আমি আস্তে পারব না। শীগগির একবার দোর খোল, আমার বিশেষ জরুরি কাজ আছে।”

ভৃত্য পাশ ফিরিয়া শুইল,—উঠিল না। কানাই তখন একটু উদ্ধতভাবে বলিল, “বেশ! দোর না খোল ত’ আমি চলুম! কিন্তু এর পরে বাবুর কাছে জবাবদিহি কোর, আমি নিজের দরকারে আসি নি, বাবুর কাজের জন্তেই এসেছি।”

ভৃত্য তখন রাগে গম্‌ গম্‌ করিতে করিতে, আপন মনে গজ্‌ গজ্‌ করিয়া বকিতে বকিতে, দুই হস্তে নিদ্রাবিজড়িত চক্ষুর রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বিজনবাবুর বাটা কানাইয়ের অপরিচিত নহে। বিজনবাবুর বাটীতে তাহার যাতায়াত ছিল, ঘর দ্বার-পথ সমস্তই তাহার

পরিচিত। স্ত্রীরাং বহির্দ্বার খোলা পাইবামাত্র সে আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুত পাব-বিক্ষেপে বিজনকুমারবাবুর কক্ষের দিকে চলিল। বিজনবাবু তখন পৃষ্ঠাশয্যা সম্পর্শও করেন নাই; একাকী কক্ষ-মধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন এবং আপন কর্তব্য-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। কানাই আসিয়া তাহার অভ্যাগমত আত্মমি প্রণত হইয়া করযোড়ে বিজন-কুমারের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া বিজনবাবু সাহসে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রে, পবর কি? এত রাত্রিতে যে? ব্যাপারখানা কি রকম?”

কানাই চতুর্দিকে চাহিয়া খুব বিচক্ষণ-তার সহিত অস্ত্রের অশ্রাব্য ভাবে চুপি চুপি গোটাকতক কি কথা বলিল। বিজনকুমার-বাবু খুব মনোযোগ-সহকারে কানাইয়ের কথা-গুলি শুনিলেন, তাহার পর বেশ গভীরভাবে বলিলেন, “দেখিস্, খবরদার যেন পণাক্ষরেও একথা প্রকাশ না হয়! সাবধান! তা হলে সব মাটি হয়ে যাবে।”

কানাই মাথা নাড়িয়া সগর্ভে উত্তর করিল, “উহু! এ গোলাম সে পাত্র নয় হুজুর! সে ভাবনা আপনার কিছু নেই; গলায় ছুরি দিলেও আমি একথা কারো কাছে বল না।”

বিজনবাবু বলিলেন, “আজ্ঞা, দেখিস্। এখন যা, কাল একবার আসিস্, যা কবুত হয়, পরে বোলবো।”

এই বলিয়া বিজনবাবু একখানা চেয়ারে বসিয়া কি একটা কাগজ পড়িতে লাগিলেন। রজনীর অধিকাংশ কালই তাহার বিনীত অবস্থায় কাটিয়া যাইত। “যে আজ্ঞে হুজুর!” বলিয়া পুনর্বার আত্মমি অন্ত হইয়া কুর্বিস

করিতে করিতে কানাই গহ্বান করিল। যাইবার সময় রামধন ভাঁড়ির নিকট হইতে সেই বোতল মদ কিনিয়া লইয়া গেল।

(২)

প্রায় এক বৎসরকাল অমরকুমার কলিকাতার বাস করিলেন। কিন্তু আর তাঁহার এখানে বাস করা নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। কারণ, পথে বাহির হইলেই পরিচিত বন্ধু এবং সমপাতিগণের সহিত সাক্ষাৎকার হইত; তাহানের উপস্থাপরি প্রেমের উপর প্রেমের জালায় অমরকুমারকে বাতিবাস্ত হইতে হইল। অমরকুমার যতই প্রজ্ঞা ভাবে থাকিতে চাহিতেন, পাঁচজনে মিলিয়া ততই তাঁহাকে বাস্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিত। একদিন একটা শনিবারে তিনি সকাল সকাল আফিস হইতে ফিরিতেছিলেন, এমন-সময়ে তাঁহার পুঙ্ককার ধোপার সহিত পথে দেখা হইল। অমরকুমারকে দেখিয়া রজক-নন্দন দ্রুতগতি নিকটে আসিয়া আত্মমি নত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, “বাবু কবে কলিকাতায় আসা হলো গো? কাপড় চোপড় অবিশিষ্ট ময়লা হয়ে গেছেন? আমিত থপর পাই নি, তহুর! ওবেলা দিয়ে নিয়ে আসব এখন! অমরকুমার হঠাৎ তাহাকে পশ্চিমদে দেখিয়া কিছু রস্তু হইয়া পড়িলেন; কি বলিবেন, কি করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অমরকুমার যখন উপেক্ষাব্যবস্থায় কলিকাতার বাতিতে বাস করিয়া কলেজে পড়িতেন, সেই সময়ে এই রজক তাঁহার বস্ত্র দৌত করিত। তাহার পর কখনও কোন কার্য উপলক্ষে, অমরকুমার যদি কলিকাতায় আসিতেন, তখনও এই রজকই তাঁহার বস্ত্র

ধোত করিত। অমরকুমারকে নীরবে দেখিয়া রজক পুনর্বার বলিল, “তা হলে হুজুরের এখন থাকা হবেন? ত?” অমরকুমার কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “না।”

র। ছ’টার দিনও তো থাকবেন?
আমি ছ’দিনেই কেচে ইত্তিরি ক’রে দিয়ে দোব এখন।

অ। না, আমার থাকবার এখন কিছুই ঠিক নেই, এখন কাপড় কাচবার কিছু দরকার নেই।”

র। সে কি বাবু, আপনার কাপড় যে বড্ড ময়লা হয়ে গেছে দেখছি,—কাচাবেন না? এমন কাপড় আপনি পরবেন কেমন করে?

অ। থাকি যদি এর পর তোকে খপর দোব এখন। এখন আমার থাকবার কোনও ঠিক নেই।

সুন্ন হইয়া সেদিন রজক প্রস্থান করিল। আর একদিন অমরকুমার সকাল বেলায় বাজার করিয়া আসিতেছিলেন। একথানা গামছার বাধিয়া হাতে ঝুলাইয়া কিছু তরিকারি লইয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় রাস্তার মধ্যে তাঁহার একজন পরিচিত সহপাঠীর সহিত সাক্ষাৎকার হইল। তাহাকে দেখিয়া অমরকুমার পাশ কাটিইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে একটা গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। কিন্তু উক্ত সহপাঠী বহুট দূর হইতে অমরকুমারকে বেশ ভাল রূপেই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। অমরকুমারের এই অবস্থা, অর্দ্ধ-মলিন কাপড়, হাতে গামছার পুঁটুলি দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাসের সীমা রহিল না। তিনিও দ্রুতগতিতে গলির মধ্যে ঢুকিয়া

পড়িয়া, অমরকুমারের নিকটবর্তী হইয়া বলিলেন, “কি হে অমর! তোমার এমন অবস্থা কেন? এতদূর যে, শেষে গামছার পুঁটুলি হাতে করে বাজারে বেড়িতে হ’ল! কেন বল দেখি হ্যা?”

অমরকুমার কি উত্তর দিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না। চিন্তাযুক্ত মুখখানা একটু মলিন হইয়া উঠিল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজিমগঞ্জে প্রসিদ্ধ জমিদার অমরকুমার বহুকে এতদূর ওর-বহুপন্ন দেখিয়া, এবং তৎপরি অমরকুমারকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান বুদ্ধির মস্তিষ্কে চট করিয়া একটা কথা গজাইয়া উঠিল। ঈশৎ বিজপের হাসি হাসিয়া বন্ধুকে বলিলেন, “কি হে, বাপ-মব্বার পর বিষয়টা হাতে পেয়ে ছ’দিনেই ফুঁকে দিয়েছ বুঝি? সরে সম্বরে চলতে হয় হে! সরে সম্বরে চলতে হয়! একদিন জুড়ি হাঁকিয়ে বেড়িয়েছ, আর আজ গামছা হাতে ক’রে বাজার করতে বেরিয়েছ! তেবে দেখ দেখি, বুদ্ধির দোষে কি রকম কাজটা করেছ! চান্কা বয়ল! অত বড় জমীদারিটা হাতে পেয়ে রাখতে পারলে না! তা’ তোমার দোব কি? তোমার মত বড়লোকের আছরে গোপালদের মধ্যে অনেকেরই এই দশা ঘটে! তবে তুমি এত লেখা পড়া শিখলে, কলেজে একটা ভাল ছেলে বলে বরাবর নাম কিনে এলে, এনে, তোমার যে এমন বুদ্ধিগুদ্ধি হবে, তা আমরা কোন দিন মনে করি নি। যা হোক রূপচাঁদের মহিমা বটে! হাতে পড়লেই মাথাটা বিগড়ে যায়! আরে, ও মোসাহেবের দলই বল, আর বাইজীর দলই বল, সব ছাড়াবাজী! বতকপ

পল্লা ততক্ষণ, পরসী ফুলেই সব ফোঁকা। দেখতে পাচ্ছ তো এখন, বদখেয়াল জুটলে নেশার পড়লে কুঁবেরের ভাণ্ডাবও উড়ে যায়।" এক নিঃশ্বাসে বন্ধুর অনেকগুলি উপদেশ দান করিলেন, কিন্তু তাহার জ্ঞাত অমরকুমার তাঁহাকে একবারও ধন্যবাদ বা নিন্দাবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। অমরকুমারের নিকট ভালমন্দ কোন রকম উত্তর না পাইয়া অগত্যা বন্ধুর তাহার গন্তব্য পথে প্রস্থান করিলেন।

অমরকুমার ঘণায় লজ্জায় স্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা-সহরে আর একদণ্ডও তিষ্ঠান তাঁহার পক্ষে দায় হইয়া উঠিল। সেইদিন হইতে অমরকুমারের একটা প্রদান কাধ্য হইল সংবাদপত্রে কর্মখালির বিজ্ঞাপন পাঠ করা, আর দরখাস্ত লেখা।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড মহকুমার এন্ট্রান্স স্থলের হেড মাষ্টারের পদ খালি ছিল। কিছুদিন পরে অমরকুমারের সৌভাগ্যক্রমে এই চাকরিটুকু জুটিল। মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে, তিনি সীতাকুণ্ডর এন্ট্রান্স স্থলের হেড মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু অমরকুমারও আশালতার অভাবে বাসায় পুরুষ এবং মহিলাগণ সকলেই বড় দুঃখিত হইলেন। তাহাদের বিদায়ের দৃশ্যও বড় ক্লষণ হইয়াছিল। মহিলাগণ আশালতাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন। কোন্ অজানা দেশ হইতে ছই দিনের জ্ঞাত তাহার। শাপত্রটা দেবীর প্রায় এক সন্নিবি পাইয়াছিলেন! সেই স্বর্গচাতা দেবী যেন শাপ-বৃক্ষ হইয়া এখন চিরংমের মত তাহাদের

ভাগ করিয়া চলিয়াছেন,—তাহাদের এইরূপ মনে হইতে লাগিল। এমন নম্র এমন নিষ্ঠ-স্বভাব, এত লক্ষ্যী শাস্ত্র মেয়ে, তাহার। জীবনে কখনও দেখেন নাই। এই গৃহস্থ বন্ধুদ্বিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অমরকুমারের মন-টাও যে একটুও বিচলিত হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু তিনি এখন বিরাট-গৃহে ধন্যরাজের অজ্ঞাত-বাসের মত কোনও সুদূর প্রাণ্ডে প্রোক্ষণ ভাবে বাস করিবার জ্ঞাত ব্যাঘ্র! পিতৃ-মাতৃহীন অজ্ঞাতকুলশীল নিম্ন জীবনকাহিনী আর তিনি কাহারও নিকটে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন! বিষয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বিষয় বুঝাইয়া দিয়া তিনি একটা দৃক কর্তব্যের ভার হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন-মনে করিয়া এরূপ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। সে কার্য যখন দিগ্ হইয়াছে তখন আর তিনি নিজের অজ্ঞাত জীবনকাহিনী লোকের নিকট প্রচার করিয়া কাহারও নিকটে হস্তান্তর হইতে ইচ্ছুক নহেন। তাই এই পার্শ্বদেশে দেশে পর্তুগীজ-মণ্ডিত প্রকৃতিরামীর বিরাম-কুণ্ডলরূপ সীতাকুণ্ডে আসিয়া তিনি যেন দীক্ষা চাড়াইয়া বাঁচিলেন। একটা প্রবল প্রতির বাতাসে তাহার অন্তরটা হালকা করিয়া দিল। এখানে কেহ অবাচিত উপদেশ দান করিতে আসে না, কেহ বিরূপ-কটাক্ষ করে না, আবার "রাক্ষসজ" বলিয়া আকৃষ্মি আনত হইয়াও কেহ প্রণাম করিতে আসে না এই চির অপরিণিত সুদূর পল্লী-মধ্যে তাহার দিনগুলি বেশ বহুদূর কাটিতে লাগিল। চন্দ্রনাথ ও বিরূপাক্ষ পর্তুগীজের অপূর্ণ দস্তাবেজ দেখিয়া অমরকুমার মুগ্ধ হইলেন। একদিন তিনি আশালতাকে সইয়া

বাড়বা কুণ্ডে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই ফুটন্ত জলের মধ্যে অমরকুমার যখন আশালতাকে অবগাহন করিতে বলিলেন, আশালতা তো ভয়েই অস্থির! ভীত ভাবে বলিলেন, ‘অমন টগ্ বগ্ করে জল ফুটচে, ও জলে কেমন করে নাইব?’

অমরকুমার কষ্টে হাসি চাপিয়া গভীর ভাবে বলিলেন, “তা নাইতে না পারলে ত পুণ্য হবে না! তীর্থ করার কোন ফলই তা হলে পাবে না।” এখানকার পাণ্ডারা বলেন, এই কুণ্ডের জলে স্নান করলে পর সমস্ত তীর্থের ফল পাওয়া যায়! বহু পুণ্য লাভের লালসা, অথবা নিষ্ফলতার আশঙ্কা কিছুতেই আশালতাকে বিচলিত করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিল—“এমন গরম জলে স্নান করে গায়ে ফোঁকা পড়ানোর চেয়ে, পুণ্য না হয় সেও ভাল!”

অমরকুমার পুনর্বার গভীর ভাবে বলিলেন, “একটাই যদি নাইতে না পার, তা হলে আমি এক আঁজলা জল তুলে তোমার মাথায় দিয়ে দিই, তুমি স্পর্শ করে নাও। আর কি করব বল?” এই বলিয়া অমরকুমার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল তুলিয়া লইয়া আশালতার গায়ে ছিটাইয়া দিলেন। গায়ে ফোঁকা হইবার ভয়ে আশালতা প্রথমে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু জল-স্পর্শদ্বারা সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, “ও আমার কপাল! এমন পরিকার ঠাণ্ডা জল! কি আশ্চর্য! দেখলে পর ত’ মনে হয় খেন চায়ের জল ফুটছে।”

আর একদিন অমরকুমার আশালতাকে লইয়া চন্দ্রনাথদেব দর্শন করিতে গিয়া-

ছিলেন। প্রথমে আশালতা চন্দ্রনাথদেব ও পর্বতের শোভা দর্শন করিবার বাসনায় খুব আগ্রহের সহিত পর্বতে উঠিয়াছিল, কিন্তু পর্বতের শিখরদেশ ভ্রমণ করিয়া যখন নিম্নে অবতরণ করিবার সময় হইল, তখন আশালতা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল; কিছুতেই আর নামিতে সমর্থ হইল না। নীচের দিকে চাহিবামাত্র সেই সহস্র সহস্র হস্ত পরিমিত নিম্ন সমতল ভূমি ও এক গভীর জঙ্গল দর্শন করিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া আসিতে লাগিল; বোন রকমেই আর সে নামিবার সাহস-সঙ্কল্প করিতে পারিল না। অমরকুমার অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। দেড় হস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-সোপান পর্বত-গাত্র ভেদ করিয়া উজ্জ্বল উদ্ভিত হইয়াছে। ঠিক পাশাপাশি দুইজন লোক চলিতে পারাও হোমধ্য! সোপানের দুই পাশ্বই উন্মুক্ত! যদি একটা রেলিং দেওয়া থাকিত, তাহা হইলে আশালতা তাহা আঁকাড়িয়া কোন রকমে নামিতে পারিত; কিন্তু ছর্ভাগ্য-বশতঃ প্রকৃতিরাগী তাহার প্রজাদিগের সে সুখ-সুবিধার জন্ত একটুও মনোযোগী হন নাই। নিম্নে কোথাও হিংস্র-স্বাপন্ন কোথাও গভীর অরণ্য, কোথাও সমতল ভূমি, কোথাও পর্বতশ্রেণীর নিষ্কাশন করিয়া পার্বত্য জাতি বাস করিতেছে! কোন রকমে দৈবাৎ যদি সোপান হইতে পদস্থলন হইয়া যায়, তাহা হইলেই বিপদ! নন্দর মানবদেহের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া অপ্রত্যাশিত পরিণত হইয়া যাইবে! অতিসতর্পণে, বহু কষ্টে অমরকুমার আশালতাকে নামাইয়া লইলেন। সেই দিন হইতে আর তিনি আশালতাকে কোথাও

হইয়া বাইতেন না। আশাশুভতাও বড় লজ্জিত
ও ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। সেও আর
বাইতে চাহিত না। কিন্তু অমরকুমার প্রতি-
দিন দিবসের কাৰ্য্যান্তে পাহাড়ের উপর
বেড়াইতে বাইতেন। প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর
অসীম সৌন্দর্য্যমাশি অমরকুমারের মনঃপ্রাণ
শীতল করিয়া দিত।

কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আসিয়া পরিচিত
জনের সংস্রবশূন্য হইয়া, অমরকুমার বেশ
শান্তিতে রহিলেন। কেহ তাঁহার সংবাদ
জ্ঞানে না, তিনিও কাহারও সংবাদ জানেন

না। এ সংসারের সকল বস্তুতেই যেন তিনি
নির্লিপ্ত, নির্বিকার, শান্ত! নির্বিকারে অধির
ভায় তাহার দিন বাইতে গািল। কেবল-
মাত্র রাধাগোবিন্দবাবুর সনিকঙ্কক অমরোপ
অবহেলা করিতে অসমর্থ হইয়া মাঝে মাঝে
তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইত। অমরের পিতৃ-
প্রতিম সেই রুদ্ধ রাধাগোবিন্দবাবু যে
অমরকে অন্তরের সহিত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করেন,
তাহা অমরকুমারের অজ্ঞাত ছিল না।

(কমলাঃ)

ঐচাকনীয়া মিত্র।

আশে।

নিভৃত বন্ধু, আসিও,
অন্তর-আঁখি-অঙ্কন ওগো,
বিজনতা ভরি' হাসিও!
এমনি মধুর রাতে
যবে গন্ধে পবন মাতে,
হিলোলে লতা নীরব হান্তে
চন্দ্রমা-দীপ্তিপাতে;
চুপিলে বীণাটী গাতি'
যবে অনিদিব-আঁখি চাতি,
হৃন্দর! মম মর্ম্ম-মুকুরে
নয়নের পথে তাসিও!—
বিজনতা ভরি' হাসিও!

গভীর নিশীথ বানে
যবে অমৃত-পরশ নামে
মুচ্ছনা-রত চেতনা-তরী

বিশ হরণ গ্রামে,
হৃন্দর ওগো আসি'
নোরে তেমনিই ভালবাসি'
চন্দ্রন-কুল-দুলা পরশে
সকল চেতনা নাশিও!—
নিভৃত বন্ধু আসিও!
ঝরিলে নীহার-ধারা
যেন উড়ে না বিভাতি তারা,
কুঞ্জ-বিতানে পঞ্চম-হর
ভুলে না-ক কোনো সাড়া!
রহিব আপনা বিনা
চির বিরাম-অন্ধে লীনা,
(দুঃ) বন্ধন তব নন্দন মম
হৃন্দার কুল-ফাঁসী ও!—
নিভৃত বন্ধু আসিও!

ঐহৃথেননাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমাজে নারীর কাজ।

সংসারের ভিত্তিস্বরূপা নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গী হইয়া বে-কালে এই কৰ্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা, তখন অবশ্য তাঁহাদের সাহায্য-বিহীন হইয়া কোন কাজ করিলে সে কার্য্যটা সম্পূর্ণ ফলনায়ী হয় না। এ-জন্ত ক্রমেই আমরা বুঝিতেছি যে, নারী কেবল সংসারে জননী, ভগিনী বা পত্নী হইয়া জীবনযাত্রা-নির্বাহ করিলেই বে তাঁহার সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিল—আর কিছু অবশিষ্ট বহিল না—তাহা নহে। পুরাকালে গেরূপ স্ত্রীগণ শক্তিসঞ্চা-রিণীরূপে পুরুষের সহকর্ম্মিণী হইয়া সকল স্থানেই সকল অভাবের পূরণ করিতেন, এখন তাহার ব্যতিক্রম হওয়াতে আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা জন্মিয়াছে। অবশ্য সে-ক্রটি সাধারণের প্রত্যেকের চক্ষে নাও পড়িতে পারে।

আমাদের জাতীয় উন্নতির গোড়ায় সংসার ও সমাজ সমানভাবে সে অভাব বোধ করিতেছে। সংসারে নারী যে মঙ্গলময়ী ও লক্ষ্মীস্বরূপা, শাস্ত্র তাহা স্বীকার করেন। তবে তাহাদের প্রভাব বিস্তৃত হওয়াই ত কল্যাণপ্রদ। এ-জন্ত নারীকে সে-স্থলে সমান অধিকার দেওয়া ও তদুপযোগী শক্তি-ও জ্ঞান-লাভ হইতে বঞ্চিত না রাখাই ধর্ম্ম।

বর্তমান কালে সকল দিকেই তরঙ্গাশ্রিত অরোহা। এই সময় যেমন পুরুষশক্তির মুখ্যভাবে প্রয়োজন, সেইরূপ নারীর যত চোটা-সাহায্যও অন্ততঃ গৌণভাবেও আবশ্যক। সামগ্রিক ও একতরফ বন্ধন এই উচ্চ-শক্তি লাভের প্রধান উপায়। কিন্তু এখনকার সময় ঐ ছুটিই

ছলভ। এক ঘরের তিন জনেরই এক কার্য্যে বিভিন্ন যত দেখিতে পাওয়া যায়। এমন সময়ে সমাজকে উন্নতির মুখে টানিয়া আনা কি একা পুরুষ-শক্তির কাজ! বহু শক্তিতে অল্পপ্রাণিত হইয়া আমরা যেমন ঘরের অমঙ্গল দূর করিয়া স্তম্ভল আনিতে পারি, সেই-রূপ বাহিরেও সমাজকে তৈয়্যারী করিয়া তুলিয়া লইবার জন্ত সচেষ্ট হইতে হইবে। অনেক বলিতে পারেন, পুরুষেরা যে কঠিন আত্মসমাদা কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে না স্ত্রীগণের সেখানে কি সাধ্য! অগাধ সমুদ্রে তৃণের মতন ভাসিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে বিচিত্র কি! সমাজে দলাদলি, জাতিপাত, বিদ্বেষ ইত্যাদি নানা-প্রকারের উন্নতির অন্তরায়, সুখের পথের যে বর্নকগুলি আছে, তাহা নারীগণ যদি প্রেয়স না দিয়া, তাহার উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধবান হইয়া পুরুষের প্রাণে বল দিতে পারেন, তবে সে-কার্য্যের দ্রুত সফলতা অসম্ভব নহে। পুরুষের শক্তি বহি-মুখী আর নারী সেই সেই বিষয়ে অন্তঃমুখী-শক্তির দ্বারা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন। পুরুষের কার্য্যে উৎসাহ-বর্দ্ধন নারীর দ্বারা খুব সম্ভব এবং সে-স্থলে প্রতি-বন্ধকও সহজে অপসারিত হয়।

সমাজের মঙ্গলসাধনের প্রধান উপায় শিক্ষাবিস্তার। নারী সে কার্য্য করিতে অক্ষম নহেন। নারী মহিলা-সমাজে জীবিতবন্ধন করিতে তৎপর। যেখানে সমাজ শিক্ষিত, সে-স্থলে কুরুচি-পরিবর্তন, ভাল-মন্দেৰ জ্ঞান, গুণের প্রতি আসক্তি, পাণে যুগা, আশা করা

যায়। সত্য ও অসত্য, সত্য এবং অজ্ঞানের ভেদাভেদ এবং কুসংস্কারের প্রতি বিরাগ—এ সকলি নারী জন্মাইতে পারেন। শিক্ষিতা নারী সমাজের উপকারার্থ বন্ধপরিকর হইলে তাঁহার আদর্শে অপরের আস্থা সমাজের প্রতি ধাবিত হইতে পারে।

সমাজে নারী-শক্তির দ্বারায় সঙ্গীর্ণতা দূর হইতে পারে শীঘ্র, যদি নারীদিগকে টানিয়া জ্ঞানের আলোকে উন্নতির পথ ধরান যায়। নারী যেমন গৃহ উজ্জ্বল করিতে পারেন, তেমনি বাহিরেও তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে, যদি ক্ষেত্র কথিত থাকে। সমাজে নারীর কাজ প্রচার ও প্রচলনের উপায় প্রতিষ্ঠিত করিলে নারীগণ যে সফল দেখাইতে পারেন না, এমন বলা যায় না।

প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া এখনকার উল্লেখযোগ্য ত্রিযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী এবং অন্যান্য বহু শিক্ষিতা রমণী সমাজে সাহিত্য-প্রচার করিয়া ভাষার উন্নতি করিতেছেন। স্ত্রী-শিক্ষার স্রষ্টা স্রীমহামণ্ডল ও তদায় প্রতিষ্ঠাত্রী এবং জীবনদাত্রী স্বর্ণায়া কৃষ্ণভাবিনী দাসীর কাছে সকলেই শ্রদ্ধা। স্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী বিধবাগণের ঐশ্যশিক্ষা, জীবিকানির্ভরোপযোগী শিল্প-বয়নাদি-শিক্ষার যে সঙ্গোপ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবদিত নাই।

ইহা ছাড়া নারীসমাজের হিতার্থে ধাত্রী-বিদ্যা, শিশু-পালন প্রভৃতি ঘরে ঘরে গিয়া তলাইলে ও বুকাইলে কত কাজ হয়। ইহা পুরুষের সাধ্যাতিত; এবং ইহার অভাবে কত ক্ষুদ্র আশ্রয় ভেদপত্র হইতে অকালে বরিষা পড়িতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নারী

সমাজে আরও একটি অমঙ্গলমূল সহজে উৎপাটিত করিতে পারেন এবং তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনও নানাস্থানে ও অনেক পল্লীগ্রামে দিবা দুই-প্রহরের অবসরকালে যে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা গঠিত হইয়া পর-সমালোচনা ও কুৎসারটনা দ্বারা সভাস্থল মুগ্ধিত এবং মানুষের জীবনের অযোগ্যতা সাধিত করে, তাহারই নিবারণ করার চেষ্টা করা কর্তব্য। অবশ্য উপদেশে তথায় কোন ফল হইবে না। তথায় মহিলাগণের স্বয়ং-আকর্ষণকারী কলাবিদ্যার প্রচার হইলে স্বেচ্ছা-স্বাধীনতা করা যায়। সঙ্গীতবিদ্যাও মানব-জীবনে পরম শাস্তিময়ী। উহাতে শোক-দুঃখ অপসারিত হইয়া মানবচিত্তে সজীবতা প্রদান করে।

সঙ্গীত, শিল্প, চিত্রবিদ্যা—এ সকলই নারী স্বসমাজে প্রবর্তিত করিতে সমর্থ। আজ-কাল নব যুগের নতুন উৎসাহ—নতুন ধারা! বেশ-ভূষা, ধরণ-ধারণ সকলি নর-নারীকে সমভাবেই নিজের দিকে টানিতেছে। প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থা শিথিল হইয়া যাইতেছে। এরূপ হলে সমাজের স্রোত কিরান কঠিন। কিন্তু তাহার যেমন উপযোগী, সেটিকে বলায় রাখিয়া নিজের গন্তব্য-পথ ধরার দৃষ্টি রাখা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ভীকতার ছায়ার মিথ্যার আশ্রয়-গ্রহণ, একটা যেন ফ্যানসন বা সফ্রামক ব্যাবস্থাপণে সকলকেই আক্রমণ করিতেছে। সেগুলি হইতে সমাজকে রক্ষা করা নারীর কাজ।

‘জাতিচ্যুত, দলাদলি ও এক-ঘরে প্রভৃতি’র ভয়ে বাগা পরিহার্য ও অন্ত্যায়, কিন্তু যাহা বাস্তবিকই অপরিহার্য ও সমস্ত সেই

সকল ভায় ও সদাচারের অহুষ্ঠান দ্বারা করিতে পারেন, তবে সমাজের অনেক সমাজে ও সংসারে ভয়ী হইব', এ-ভাবে উপকার হইতে পারে।

প্রত্যেক রমণী নিজের পরিবারে যদি রক্ষা

ত্রিনিস্তারিণী দেবী।

আকাঙ্ক্ষা।

ধনের আকাঙ্ক্ষা করি
আকাঙ্ক্ষা মিটে না, হায়,
কৈদে কৈদে মরি!
মানের আকাঙ্ক্ষা করি,
কেহ ত না ফিরে চায়!—
বুকে শেল খরি!
বশের আকাঙ্ক্ষা করি,
শুধুই ফিরিতে হয়
অপবন ল'য়ে!
প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করি,
অবহেলা এ হৃদয়
দেয় যে দলিয়ে!
শক্তির আকাঙ্ক্ষায়
শুধু হেরি অপচয়
নিজত্বের মোর,

শুকতির আকাঙ্ক্ষায়
শুধু ধরে এ হৃদয়
বাধনের ডোর!
সফলতা-কামনায়
শুধু লভি ব্যর্থতার
কঠোর গঞ্জনা,
মাগি' তব করুণায়,
সহি নাথ! অনিবার
তোমারি ছলনা!
এই মৃগ-তৃষিকায়
বল নাথ! কত আর
বেড়ার ঘুরিয়া?
কত দিনে তব পায়
বলি দিব আকাঙ্ক্ষার,
আপনা ভুলিয়া?
শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

পুস্তক-সমালোচনা।

সাতনদী*—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ও শ্রীযুক্ত
নরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় এম, এ,
কর্কট ঝালক-বালিকাদিগের জন্য প্রণীত।
হিন্দুদিগের পুজার বসিরা জগৎপুত্র করি-

* মূল্য—দশ আনা। শ্রীযুক্ত গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায় এও সঙ্গ বিক্রেতা।

বার জন্ত যে মন্ত্রণী পাঠ করা হয়, পুস্তক-
খানিতে সেই মন্ত্রোক্ত গঙ্গা, যমুনা, গোদা-
বরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, ও কাবেরী—
এই সাতটি নদীর ইতিবৃত্ত অতি সুন্দর, সহজ
ও সুসংলগ্ন কথোপকথনে প্রচলিত ভাষায়
লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত এই সকল
নদী-সম্বন্ধে আধুনিক ভূগোলের কথাও ইহাতে

কিছু * কিছু সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইতি-
বৃত্তগুলি এত মনোরম ও চিত্তাকর্ষক যে ইহা
পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, শেষ না
করিয়া থাকিতে পারা যায় না। দিকু,
নন্দনা, কাবেরী প্রভৃতি নামগুলি কেন
হইল, কি-জন্ত ইহার পুণ্যতোয়া ও
জন-সাধারণের নমস্তা হইয়াছে, তাহারও
গৌরবিক বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।
নদী-সাতটীর ত্রিবিধ চিত্রগুলিও অতিমনোহর।
এইরূপ পুস্তকের দ্বারা গৌরবিক কাহিনীর
সহিত ভৌগোলিক বিবরণও বালকবালিকা-
দিগের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়।
নদীগুলির উৎপত্তি প্রভৃতি অঙ্কিত একখানি
ভারতের মানচিত্র পুস্তকে থাকিলে ভাল
হইত। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা, চিত্র
অত্যন্তক্লান্ত হইয়াছে। আশা করি, সকলের
নিকট ইহার যোগ্য সমাদর হইবে। পুস্তক
হইতে নন্দনা-সদীর কাহিনীটা সংক্ষিপ্ত করিয়া
নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

“পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, তারা, আর যেখানে
যা কিছু আছে, সে সবই মহাদেব অনেকবার
নষ্ট ক’রে ফেলেন ও তা’র পর নূতন ক’রে
আবার সব সৃষ্টি করেন। এই নষ্ট হয়ে
যাওয়াকে মহাপ্রলয় বলে।

একবার মহাদেব আর দুর্গাতে ছুটোছুটি
খেলা আরম্ভ করলেন। তাঁদের পদভরে
পৃথিবী নষ্ট হয়ে গিয়ে এক প্রকাণ্ড সমুদ্র তৈরি
হ’ল। খেলার পরিশ্রমে হ’জনে খুব ঘেমে
উঠলেন। ...মহাদেবের ঘাম জমে...একটা
পরম-সুন্দরী মেয়ে হ’ল।

নিজের সেই মেয়েটিকে দেখে’ মহাদেব
দুর্গাকে বলেন, ‘একটা মজা করা যাক।

এই বলে তিনি তাঁর সেই সুন্দরী মেয়েটিকে
এনে স্বর্গের যত দেবতা, দৈত্য, দানব ছিল,
তাঁদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তাঁরা
মেয়েটিকে দেখে সবাই বলেন, ‘আমি
মেয়েটিকে বিয়ে করবো’। তাঁদের কথা
শুনে মহাদেব বললেন, ‘তোমরা সবাই একটা
মেরকে কি ক’রে বিয়ে করো?’ তোমাদের
মধ্যে যে ঐ মেয়েটিকে দৌড়ে ধরতে পারবে,
আমি তা’রই সঙ্গে ওর বিয়ে দেবো।’

এই কথা শুনে সবাই মেয়েটিকে ধরবার
জন্তে ছুটলেন। মেয়েটা শিবের গা থেকে
হয়েছে, তা’কে ধরে কার সাধ্য? তাঁরা
যেমন তা’কে ধরতে গেলেন অমনি দেখে-
লেন, মেয়েটা এক যোজন দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে
রয়েছে। তাঁরাও ফেরে ছুটলেন। মেয়েটাও
সরে যেতে লাগল। এক যোজন, দু’ যোজন,
তিন যোজন, ক্রমে মেয়েটা শেষে এক শ’
যোজন দূরে গিয়ে দাঁড়াল।...তখন দেবতা
দানবেরা ভাাকা চাাকা খেয়ে গিয়ে চারি-
দিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁরা যে দিকে
তাকান, মেয়েটাকে সেই দিকেই দেখতে
পান। তখন তাঁরা মেয়েটিকে ধরবার জন্তে
পাগলের মত চারিদিকে ছুটোছুটি করে
বেড়াতে লাগলেন।...তাঁদের অবস্থা দেখে
দুর্গা আর শিব হো হো ক’রে হাসতে
লাগলেন। তখন মেয়েটা এক ছুটে আবার
শিবের কাছে ফিরে এল।...

মহাদেব তখন মেয়েটিকে বলেন, “তুমি
একাই এদের সব হারিয়ে দিয়েছ, এতে আমি
তোমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই
তোমায় বর দিচ্ছি যে...পৃথিবী যতবারই নষ্ট
হোক না কেন, তুমি কখন মরবে না।

সাপুড়েরা যেমন সাপ খেলায় তুমিও তেমনি এদের নিয়ে সাপ খেলান গোছের খেলালে; আর আমি যে কখন হাসি নে, তোমার ব্যাপার দেখে আমিও হেসে খুন হ'লাম; এই দুই কারণে তোমার নাম রাখলাম 'নর্খদা'।" (সংস্কৃত 'নর্খ' কথার মানে খেলা আর হাসি)।

তা'র পর আবার যখন পৃথিবী নষ্ট করে ফেলবার সময় হ'ল, তখন মহাদেব...পৃথিবী-টাকে একটা মত্ত সমুদ্র করে ফেললেন।... সেই সমুদ্রে মহাদেব খুব চমৎকার একটা ময়ূরের রূপ ধরে সঁতার দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। নর্খদাও সেই সমুদ্রে সঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছেন, এমন সময়...মহাদেব নর্খদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁগা, তুমি কে? আর সব্বাই মরে গেল, তুমি বেঁচে রয়েছ কি ক'রে?" তখন নর্খদা বললেন, "মহাদেব, ...আপনার ঘাম থেকেই আমি হ'য়েছিলাম। আমার নাম আপনি নর্খদা

রেখেছিলেন।...আমাকে আপনি অর্ধর করে দিয়েছিলেন, সেইজন্তে আমি মরি নি। আপনি এখন আবার পৃথিবী সৃষ্টি করুন।"

মহাদেব তখন...সব পৃথিবীর জিনিষ তৈরি করলেন। যেখানে নর্খদা সঁতার দিচ্ছিলেন সেইখানে চিত্রকূট পাহাড় হ'ল। মহাদেব তখন নর্খদাকে বললেন..."তুমি চিত্রকূট পাহাড় থেকে নদী হ'য়ে বেরিয়ে দক্ষিণ দেশ দিয়ে গিয়ে সমুদ্রে মেশ। তোমার জলে নাইলে এত পুণ্য হ'বে যে লোকে তোমাকে দক্ষিণ-গঙ্গা বলবে। সেই দিন থেকে নর্খদা পৃথিবীতে এসে নদী হলেন।

নর্খদা রেবা-রাজ্যের মধ্যে অমরকন্টক ...পাহাড় থেকে বেরিয়েছে। নর্খদা ৮০০ মাইল লম্বা। নর্খদা অনেক জায়গায় উঁচু পাহাড় থেকে হঠাৎ একেবারে নীচুতে পড়েছে...ব'লে ঐ নদীতে নৌকা চলাচল করতে পারে না।.....

উদ্যান নত।*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঐ মগজিল পকানন মোটরবাজ জ্যোতির চেহে ধীরেন ছেলেটি কোনও অংশে মন্দ ছিল না। শিবেশ্বর যখন ঘটনাটা শুনলেন, তখন তিনিও মনে করেছিলেন যে হাবলা যে ধীরেন এইটি প্রকাশ করে দিলে, সমস্ত গোল মিটে যাবে। ধীরেনের নিজের মনের মধ্যেও

সেই বিশ্বাস ছিল। সেই জন্তই সে ষ্টেশনে অত করে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল। মুক্তির মনের ভাবও আমরা পূর্বপর্বাৎ যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে ধীরেনের প্রতি যে বিশ্বস্তাটুকু পেয়েছি, তাতে এমন কিছু আমাদের মনে লাগে না যে মুক্তির সঙ্গে কোনও গভিকে ধীরেনের বিয়ে হলে মুক্তির মনে চিরদিনের মত একটা লাগ থেকে যাবে। যদি মুক্তির সঙ্গে সত্য সত্যই কোনও পাড়াগায়ের হাবলা কি গাংবলার সঙ্গে বিয়েটা

* একখানি উপভাস, জীশান্তা দেবী ও জীশীতা দেবী প্রণীত।—মূল্য ২ টাকা।

প্রবাসী কার্যালয়,

২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস্ ট্রীট, কলিকাতা।

অমনিষ্করে পেকে উঠত, তা হলে আমাদের মনে একটা আশঙ্কা হত এবং একটা ভাবী ট্র্যাজিডির আশঙ্কা আমাদের মন কণ্টকিত হয়ে উঠত এবং তাতেই একটি নাটকীয়সন্ধির সৃষ্টি হোত। এমন একটা crux এর স্বাভাবিক প্রেলোডন যে লেখিকারা বর্জন করেছেন, তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে বেচারী ধীরেনকে মুক্তিকে নিয়ে একটু নিষ্ঠুর কোতুক করা ছাড়া তাঁদের আর কোনও বড়রকম ব্যাপার জমিয়ে তোলাবার ইচ্ছা ছিল না। তবে জ্যোতির বিয়ের মিটার-ব্যাবহার সময় ধীরেনের ভাক পড়েছিল কি না এই কথাটি যদি তাঁরা আমাদের বলে দিতেন তা হলে আরও খুসি হতুম। আজকালকার দিনে চারিদিকের হিন্দুসমাজের পরস্পরাগত সংস্কার-জালের মধ্য থেকে ছুই একটি ব্যক্তি জাল কেটে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছেন। তাঁদের চারিদিকেই আত্মীয়স্বজন ; তাঁদের সঙ্গে স্নেহ-বন্ধন তাঁরা কিছুতেই ছিড়তে পারেন না। অথচ তাদের জীবনের ধারণা, সংস্কার সমস্তই তাদের প্রতিকূল। এই প্রতিকূলতা বা স্বপ্নের ছায়ার শিবেশ্বরের প্রসন্নোদার অপত্য-স্নেহের নির্ধা-আকাশে ও মোক্ষদাদেবীর স্নেহমুচ টানের মধ্যে একটি কুমারীজীবন কেমন করে গড়ে উঠেছিল, সেইটাই এখানে কোটাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনও প্রেমের কাহিনী, কি উপভাস, একোনটিই এ কাব্যের কোনও বিশেষ কথা নয়। এর বিশেষ কথাই হচ্ছে একটি উদ্যানলতার নিপুণ ছবি দেওয়া, একটি বর্তমান সময়ের কুমারীজীবনের স্মৃতিস্বরূপ রহস্যময় আনন্দোচ্ছল চিত্রকে কটরে তোলা এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আগামী

স্বপ্ন-ছাণ্ডের দুইএকটা রেখাপাত করা। কুমারীজীবনের একটা বিশেষত্ব এই যে তার মধ্যে একটা নির্মল আনন্দ ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠতে থাকে। সে জিনিষটিকে তার স্বার্থ ঠিক ব্যরণীয় করতে পারা পুরুষের পক্ষে বড় কঠিন। সেটুকু এত তরল ও কোমল যে শুধু কল্পনার সাহায্যে তাকে পাওয়া যায় না। যাদের স্বার্থ সে-রকম জীবনের সঙ্গে যোগ আছে, এবং যারা সেই রকম জীবনের নিছক আনন্দরসটিকে স্বার্থভাবে অনুভব করতে পেরেছেন, তাঁরাই তাকে ব্যক্ত করতে পারেন। এই বইপানির বিশেষত্ব এই যে বাড়ীতে বোড়িংএ পথে ঘাটে বেড়াবার সময়ে, চায়ের টেবিলের পাশে, পিতার রোগ-শয্যার পাশে, এবং আরো নানা রকম ছোট খাট বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়ে এমন সুন্দর ভাবে মুক্তির জীবনটি ফুটে উঠেছে যে, তাকে আর কোনও মতেই বইয়ের মুক্তি বলে মনে হয় না। আমাদের চারিদিকের জ্ঞান-শোনার মধ্যে কত মুক্তিই আমাদের মনের সামনে আসছে। সমস্ত নবশিক্ষিতা কুমারীদের গৃহ মূর্খকথাটি মুক্তিকে আশ্রয় করে এমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যে আমার মনে হয়, যে কোনও কুমারীকে আমরা ঐ রকম শিক্ষা ও সঙ্গের ব্যবস্থায় রাখতুম সেই মুক্তির মতন হয়ে গড়ে উঠত। শুধু একটা স্বচ্ছতা, সরলতা বা আনন্দপ্রিয়তা ছাড়া, মুক্তির মধ্যে আর কোনও বিশেষ রকম নতুন স্বভাব বা বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায় না। চরিত্রগত কোনও বিশেষত্বের দিক দিয়ে মুক্তিকে দাঁড় করান হয় নাই। মুক্তি, মাধবী, কি মল্লিকা, কি শৃঙ্খিকা, তার কোনও পরিচয় দেওয়া হয় নাই ; শুধু দেখতে পাই যে, সে শিবেশ্বরের বহুবল্লিত উদ্যানে আপন আনন্দে আপন লতিয়ে উঠেছে। মুক্তিকে দেখলে কোনও বনলতার সঙ্গে কোনও তুলনা তেমন মনে হয় না ; শুধু এই মনে হয় যে, সে একটি বহু-সংস্কৃত মনোহারিনী উদ্যানলতা। চরিত্রগত কোনও বিশেষত্বের আশ্রয় না নিয়ে কেবল-

মাত্র কুমারীজীবনের নিছক রসটুকুকে এমন সূৰ্ত্তমতী করিয়া তোলা সত্যই বিস্ময়কর । যাদের এ জীবনের সঙ্গে সহায়ত্ব ক্রম, তাঁদের চোখে এই বইখানির এই অদ্ভুত কৃতিত্বটুকু হয় ত তেমন চোখে না পড়তে পারে । কিন্তু ঐরা আমাদের নবযুগের কুমারীজীবনের মাধুর্য ও সৌন্দর্য্যটুকুর প্রতি কোনও দিন আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন যে সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই বইখানি যে-কোনও সাহিত্য-সভায় শ্রেষ্ঠ স্থান নিতে পারবে । কি স্বন্দর ভাষা বিলোল ভাষাতে নানাছলে এই উদ্যানতাকে নানা-ভাবে ছলিয়ে আমাদের সামনে এনে ধরে আমাদের মুগ্ধ করে দেয় । বাঙলা ভাষার যে কত শক্তি, কত সম্পদ, তা যেন এই বইখানি পড়বার সময় আমরা নতুন করে বুঝতে পারি । কোনও বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করে নি, কোনও সামাজিক তত্ত্বকে ইঙ্গিত করে নি, কোনও বিশেষ মনোভাব বেদনাতুর হয়ে প্রকাশ পায় নি, অথচ একটি আনন্দময়ী কুমারীমূর্ত্তি শিকা ও সংস্কারের জল-বাতাসে এমন সুষমায় হয়ে উঠেছে যে, যে দেখে আনন্দে তার মনে শিহরিয়া ওঠে । জ্যোতির সঙ্গে মুক্তির মেশামেশি দেখে আমরা অনেক সময়ে একটি প্রণয়ের অঙ্গুর খুঁজেছি, কিন্তু কোনও জায়গাতেই সেটি ধরতে পারি নাই । জ্যোতিও শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল বলে মনে হয় না । এমন কি মুক্তিও জ্যোতিকে জাহাজে বিদায় দেওয়ার পূর্বে পর্যন্ত একটুও ক্ষতি করে বুঝেছিল কি না, তা বলা কঠিন । কুমারীজীবনের ভাব প্রবণতার মধ্যে এমন একটি মায়ার শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে খেলা করে যে কোন সময়ে সৌহৃদ্য, কি বহুদূর হঠাৎ প্রেম হয়ে দাঁড়ায়, তার ঠিকানা করা সহজ নয় । যে-মুহূর্ত্ত থেকে সৌহৃদ্যটা প্রেমে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল, সেই সময় থেকেই উত্তোরস্তর সেই অঙ্কুরই বেড়ে চলত লাগল ; এটুকু কুমারকামল জ্বর বধন প্রচ্ছন্ন ভাবে

একটা প্রেমতীর্থের অবেষণে যাত্রা করে, তখন পথের আর কোনও কুণ্ডের দিকে ফিরেও চায় না । এই যে শক্তি, এই যে দৃঢ়তা, এইটুকু মেয়েদের জীবনের বিশেষত্ব । সঙ্কলের অলক্ষ্যে কখন যে উদ্যানলতা ঘোবনবতী হয়ে সহকার-তরুকে দৃঢ়ালিঙ্গনে বেঁধে ফেলে, তা কেউ টেরও পায় না, কিন্তু একবার জড়ালে সে বাঁধন আর কারো পক্ষে টেনে ছাড়ানো সহজ নয় । এই মূল ছবিটি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে এ-দিকে ও-দিকে নানাস্থানে প্রসঙ্গ-ক্রমে একটা আঁখটা করিয়া আঁচড় দিয়া উদ্যানলতার আশেপাশের চারিদিকে উদ্যানের একটি ছবি দেওয়া হয়েছে, হেডমিস্ট্রের গম্ভীর মাঠারি চাল, বোর্ডিং-এর মেয়েদের বিবাহ-সমুৎসবকতা, শিবেশ্বরের সংস্কার-প্রচণ্ডতা, মিসেস ঘোষের নীতি-সংরক্ষণপরতা, মোক্ষদা দেবীর সদাচারনিষ্ঠা, পাড়ারিয়ার বহু সংস্কারের আব-হাওয়া, ব্রাহ্মবন্ধুগণের সমাজ-সংরক্ষণে উৎকণ্ঠকতা ও ব্রাহ্মগৃহিনীগণের ছেলেপাকড়া করিবার উৎকণ্ঠাপরায়ণতা, যখন যে-দিকে কটাক্ষ করা হয়েছে, নিপুণ ভুলিকা তাই অতি জীবন্তভাবে সম্পষ্ট করে এঁকে দিয়েছে । এমন কি প্রসঙ্গ-ক্রমে উড়েমানী, কি হিন্দুস্থানী দারোগারানের কথা যেখানে উঠেছে, দুই এক কথা তাদের চিত্রও বেশ স্মৃতি হয়েছে । গল্পের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে শুধু ক্রান্তচিত্তকে সরস করবার জন্য কন্দের অবসরে যখনই যে যায়গা খুলে পড়েছি, সেইখানেই আনন্দ পেয়েছি ;—যেন কতগুলি জীবন্তলোকের সঙ্গ করছি । বই পড়ছি, সে-কথা ভুলেই গিয়েছি । এমন উজ্জল, হালকা, উৎফুল্ল স্বভাব-কুশল বিলাস-বিলোল ভঙ্গী বাঙলা ভাষায় কমই পড়েছি । এই উদ্যানলতার মধ্যে নবযুগের কুমারীবর্গের জীবনলতা যিনি দর্শন লাভ করবেন, তিনি আর কখনও জুহান্তের মত শোক করবেন না যে—‘দুরীকৃত বস্তু গুণৈকদ্যানলতা বন-লতাতিঃ ।’

প্রিয়রত্ননাথ দাসগুপ্ত ।

২১শ, নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ব্রাহ্মবিশ্বন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
ঐনুল সত্যোদয়ী দত্ত কর্তৃক, ৩৯ নং এন্টনীবাগান পেন হাইওয়ে প্রকাশিত ।

১৮ বর্ষ

কামাখ্যাবিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্তৃক প্রবর্তিত।

কাটিক, ১৩২৭—নভেম্বর, ১৯২০।

সূচী

১। গান	শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র বড়াল, বি-এল	...	১২৩
২। গানের-স্বরাংশ	শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র বড়াল, বি-এল	...	১২৪
৩। লীনার শিক্ষা (উপহাস)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী	...	১২৬
৪। মা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২০০
৫। জাহাজ-চুবি (উপহাস)	শ্রীমতী চাকলালী মিত্র	...	২০২
৬। নাড়ুগোপাল (কবিতা)	শ্রীমতী শ্রীলালমণ্ডলী মিত্র	...	২১৬
৭। হিন্দুর তীর্থ-নিবন্ধ	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	...	২১৭
৮। জীবন-রাগিনী	শ্রীমতী মানিকা রাইচৌধুরী, বি-এ	...	২২২
৯। দম্পতি (পত্র)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	...	২২২
১০। সংবাদ			
১১। প্রণাম (পত্র)	শ্রীমতী চাকলালী দেবী	...	২২৩
১২। বড়র বিপদ (পত্র)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বোস	...	২২৪

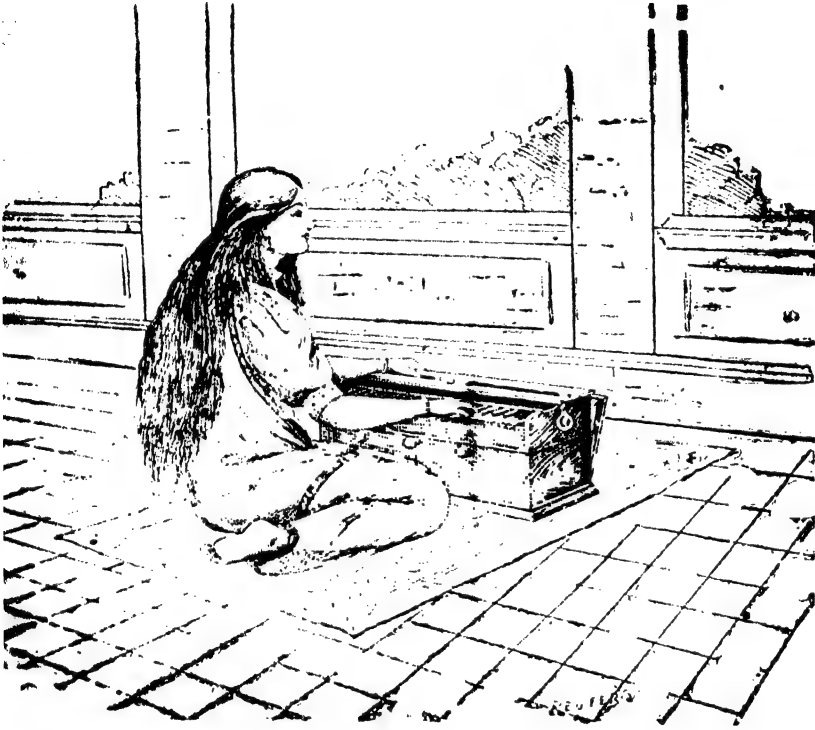
২১১, নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিভাগচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক, ৩৯ নং এণ্টরীবাগান লেন চাইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৮/০ ; অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ১৮/০ ;

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ১০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়াক নের হারমোনিয়ম ।

বাজারে জিনিষের মত নয় ।



বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ১০০ ও ২৪০ টাকা ।

২ সেট রিড মূল্য ৩০০, ৩০০, ৪৫০, ৫০০ হইতে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত ।

ফোর্ডিং অর্গেন—মূল্য ৩৫০, ৫৫০, ৭০০, ৭৫০, ও ১০০০ টাকা ।

বেহালা—মূল্য ৫০, ১০০, ১৫০, ও ২৫০ হইতে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত ।

সেতার—মূল্য ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০ ও ৩০০ টাকা ।

এস্প্রাঙ্ক—মূল্য ১২০, ১৫০, ১৮০, ২০০ ও ২৫০ টাকা ।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয় ।

ডোয়াকিন এণ্ড সন,

৯১ নং ডালহাউসি স্টোর, লালদীঘী, কলিকাতা

বাগাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 687.

November, 1920.

“কল্পাপোবৎ পাননীয়া শিকণীয়াতিযত্ত্বতঃ ।”

কন্যাকেও পানন করিবে ও যত্নেব সহিত শিক্ষা দিবে ।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ. কর্তৃক প্রদত্তি হ ।

৫৮ বর্ষ । ৬৮৭ সংখ্যা ।	ক ত্তিক, ১৩২৭ । নবেম্বর, ১৯২০ ।	১২শ কল্প । ১ম ভাগ ।
---------------------------	---------------------------------	------------------------

পান ।

(দরবারী কানেড়া—কাঙালি ।)

একটি করে' দুধের ঞ্চনীপ

আগিরে রেখে প্রিয়তম

তুলে তুলেই রইবে না আর

চির তোলা কদর মম !

বায়ে বায়েই নয়নজলে

এনো তোমার হৃদয়-তলে,—

দিয়ো না গো রইতে তুলে

অখে,— সুপ্ত পাষণ সম ॥

প্রিন্সিপলকে বড়াল ।

পানের স্বরলিপি ।

(রাগ ভৈরবী—একতাল।)

তোমারি পাখীর গান শুনি' নাথ,	জীক্স আমার—করুণা তোমার,
তোমা পানে মন ধর ।'	ভব প্রেমরসে সুন্দর ;—
তোমারি আকাশ, তোমারি আলো	এত হাসি-গান উছসিত প্রাণ
কি আবুল নয়ানে চায় ।	আশা-ভালবাসা তাঁণ্ডার ।
তোমারি তরু—তোমারি কুসুম,	তোমারে জীবনে লভিতে চাই,
তোমারি তপন—তারকা-প্রসূন ;	তোমার মাঝারে ডুবিতে চাই—
নদী পারাবার মহিমা তোমার—	করমে মরমে তোমারি চরণে
তোমারি করুণা গায় ।	অমিবারে যেন পাই ॥

কথা, হুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল ।

অঙ্কুরী ।

২'	৩	০	১
[পা]			
I বা খা না ।	না না না ।	পা না পা ।	পা পা পদপদমা
তো না রি	না বী হ	পা ম ত	নি মা খ
২'	৩	০	১
I গা পা খা ।	পা না গা ।	না -১ -১ ।	-১ না -১ ।
তো না পা	মে হ ম	বা . .	. হ .
I খা মা মা ।	না না -১ ।	পা না পা ।	না না না
তো না রি	না কা ন	তো না রি	আ লো কি
I বা না না ।	গা পা পা ।	না -১ -১ ।	পদপদমা না না II
না হ ল	ম না মে চা হ

অঙ্কুরা ।

II না না না ।	না না -১ ।	না না না ।	না না না
তো না রি	ত হ .	তো না রি	হ হ হ

I কী কী কী। কী কী সী। না না সী। সী সী সী
তো মা রি ত প ন তা র কা ঐ ন ন

I না সী সী। সী সী সী। না সী না। না পা -
ন দী পা রা না র ম হি মা তো দার •

I মা মা মা। মা গা পা। মা - গা। কা - না II
তে না বি ক ক পা গা • • • •

সকারী ও আভোগ।

II না কা কা। মা মা মা। গা মা পা। পা পা পা
দী ব ন আ মা র ক ক না তো মা র

I পা পা পা। পা দা পা। গমা পা পা। পা - -
ত ব ঐ ন র সে হু• ন হ র • •

I পা সী সী। সী সী সী। না সী না। না পা পা
এ উ হা সি গা ন উ হা সি ত ঐ ন

I মা মা গা। গা পা পা। গা - কা। সা - - II
আ পা কা ল বা সা তা • তা র • •

II দা দা দা। দা দা দা। না না সী। সী - সী
তো মা রে জী ব নে ল ভি তে চা • ই

I কী কী কী। কী কী সী। না না সী। সী - সী
তো মা র মা যা রে কু বি তে চা • ই

I পা সী সী। সী সী সী। না সী না। দা দা পা
ক র মে ম র মে তো মা ঐ ত র মে

I মা মা মা। মা গা পা। মা - গা। কা - না II
ব বি বা রে রে ন পা • • • •

লীনার শিক্ষা।

(উপভাগ।)

(৭)

মুখের বিয়াদ-গাভীরা বথাসাধা পরিবর্তন করিয়া উজ্জল মুন্দর বেশ-ভূষায় তারুণ্য-শ্রী-মণ্ডিত কীর্ণ-মুখিটির মনোরম শোভা বাড়াইয়া লীনা মুহূর্ণপদে বাবেগুয়ার আসিয়া বখন ঠাঁড়াইল, পার্সন তখন দ্রুতপদে বাবেগুয়ার এ-ধারে ও ধারে ঢুক দিয়া সজোরে হাঁটিতে-ছিলেন। লীনাকে দেখিয়াই থমকিয়া ঠাঁড়াইল বিনা প্রেঙ্গেই হাসিমুখে কৈফিয়ৎ দিলেন—“চায়ের দামটা আদায় করে নিচ্ছি, বুঝলেন? আপনার মত কাঁচিল মানুষদের সঙ্গে তো দোড়-কাঁপ করে রাস্তা-হাঁটা চলবে না, তাই এইপানেই ছুটোছুটি করে ঘাম বার করে নিলুম। চলুন, এবার ভদ্র-ধরণে পথ হাঁটা বাক।”

পার্সনের প্রশ্ন-সংলাপ মুখে কি সম্মোহন-মন্ত্রভরা আনন্দের আলো ছিল, কে জানে,—লীনার অন্তরের প্রচ্ছন্ন বিয়াদ-ম্লানিমা খেন চকিতে ঢাকা পড়িয়া গেল! সচসা অত্যন্ত খুসীর সহিত হাসিয়া লীনা উৎসাহ-ভাবে আগ্রসর হইয়া বলিল, “আপনি বুঝি আমার এতটুকু অপদার্থ মনে করেন যে, একটু জোবে পথ-হাঁটবার ক্ষমতাও আমার আছে,—এটুকুও বিশ্বাস করতে পারেন না? চলুন শো, কৃত জোরে হাঁটতে হবে বলুন,—আমি হাঁটছি।”

“দুই হাত বাড়াইয়া লীনাকে নিবারণ করিয়া পার্সন হাস্যরুদ্ধ অধরে কপট-কোণে বলিলেন, “হী, আহুন! আপনার দিম্বার দোড় জানতে তো বাকী নাই।—” বলিয়াই কপট

গাভীরা মাথা নাড়িতে নাড়িতে, মিটিমিটি চক্ষে চক্ষে চাহিয়া কৌতুক-স্মিত-মুখে বলিলেন, “সত্যি বলছি, বাস্তবিক বলছি, আপনার মত চক্ক-লজ্জার খাতিরে প্রাণের মায়-ত্যাগ-কারী উৎসাহসী রোগীদের চিকিৎসক হতে পারতুম যদি আমি,—তা হলে আপনাকে জেলে পূরে রাখবার বন্দোবস্ত করতুম।”

“বহু ধন্যবাদ,—ভাগ্যে ভাগ্যে বেঁচে গেছি, তা হলে বলুন?”—কথাটা বলিতে বাধ্য হইয়া লীনার পরিহাস-স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর বাগ্ন-কৌতুকে ভরিয়া উঠিল; পার্সনের মুখ পানে চাহিয়া সে বলিল, “আচ্ছা বলুন তো পার্সন, আপনি যদি সত্যি সত্যিই রাস্তামত চিকিৎসা-বিন্যা শিক্ষা করে চিকিৎসক—অর্থাৎ ব্যবসাদার-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষ হতে পারতেন, তা হলে—তা হলে, আপনি, নিজের মন্থমাত্তব খাতিরে রোগীর উপর বেশী দব্দ করতেন, না ব্যবসার খাতিরে রোগীর পরসর উপর বেশী দরদী হতেন?”

তরল-কৌতুক-চপল কণ্ঠে উচ্ছ্বাস হাসিয়া পার্সন বলিলেন, “মুখিলে ফেললেন! ব্যবসাদার না হয়ে, ব্যবসাদারী সম্বন্ধে যা খুসী বলে দেওয়া খুবই সহজ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, অবস্থা-বদলের নিরীখে নিজেকে বাচাই করে না দেখলে আসল সত্য সম্বন্ধে কি—”

হঠাৎ বাধা দিয়া, পার্সনের হাত চাপিয়া ধরয়া উৎসাহ-আবেগের সহিত লীনা সনিঃশব্দে বলিল, “ঠিক পার্সন, ঠিক,—এটাই আসল সত্যি কথা। কার্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অবস্থা-বদলের

নিরীখে নিজেকে বাচাই করে না দেখে, —
নিজের প্রকৃত স্বরূপ বুকেও পাওয়া যায় না,
খুঁজেও পাওয়া যায় না? মাপ করুন, মাপ
করুন আমার। আমার প্রপটাই ভুল হয়েছে।”

পার্সন কিছু না বুঝিলেও, এটা বেশ
বুঝিলেন, লীনা কি একটা নিগূঢ়-মস্তদীড়া
সত্ত্বপূর্ণ আড়াল কবিতা রাখিল, এবং সে
মস্তদীড়ার আভাসমাত্রও পার্সনের কাছে
প্রকাশ করিতে সে অনিচ্ছুক। নীরব-বেহ-
সহায়ত্বীপূর্ণ দৃষ্টিতে চকিতেই অন্য লীনার
বাখিত-করণ মুখের দিকে চাহিয়া পার্সন মুখ
কিরাইলেন। বাহিরের রাস্তার দিকে চাহিয়া
কণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “আমুন,
আর দেখা করা নয়।”

দুইজনে বাহির হইলেন। দুইজনেই নীরব।
লীনা অনামনস্ক, পার্সন গভীর। কিছু দূর
আসিয়া, মোড় ফিরিয়া দুইজনে একটা নিষ্কল
পথে পড়িলেন। পার্সন সুবিধা পাইয়া,
লীনার অনামনস্কতা ভাঙাইবার জন্য কি
একটা অবাস্তব প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে
উদ্যত হইয়া, সহসা পথের অন্য লীনানার
মোড়ের মাথার আর একজন ইউরোপীয়ান
যুবককে আদিত দেখিয়া রসনা সংবরণ
করিলেন। কথা আর বলা হইল না, উদ্যাস
দৃষ্টিতে মানুষটির দিকে চাহিয়া, লোকটার
বেজার অনামনস্কতা, তন্ময়ভাবে ও অসামঞ্জস্য-
গতি দেখিতে দেখিতে নীরবে মানিকটা
অগ্রসর হইয়া, কাছাকাছি পৌছিয়া, সহসা
নিজের অজ্ঞাতেই সবিস্ময়-কোতূহলে বলিয়া
উঠিলেন, “বাঃ, মানুষ চেনাই দার! মিসেস
পিকক্ চেয়ে দেখুন, লোকটাকে চিন্তে
পারেন?”

লীনা মুখ তুলিয়া চাহিল; নির্দোষিত
মাগুটি দিকে এই মুহূর্ত অবাক হওয়া চাহিয়া
থাকিয়া অশ্রু-ভিজিত হয়ে বলিল, “মিঃ
ডব্লুসন নয়? ও কি, নিজের মনে অমন
অদ্ভুত ভাবে হাসতে হাসতে আগুচ্ছেন কেন?
ঠিক যেন পাগল।—”

বাস্তবিকই আগমন-দীন মানুষটি নিজের
মাথার টুপটা কপালের উপর এত বেশী
টানিয়া, এত বেশী মাথায় বাড়ি টেঁট করিয়া
চলিতেছেন, যে টুপিখ মাথের আড়ালে তাঁহার
চোখ হইতে নাকের ডগা পর্যন্ত অদৃশ্য হইয়া
গিয়াছে এবং পারের নীচেকার পথটার দিকে
একান্ত ভাবে চাহিয়া চলিলেও রাস্তার বড়
ছোট ইট-পাটকে নুতলা যে তাঁহার চোখে
মোটেই ঠেকিতেছে না, সেটা তাঁহার প্রতিপদে
হোঁচট্ হোঁচক খাওয়া হইতে বেশই বুঝিতে
পারা যাউতেছে। চিবুক হইতে নীচেকার
মুখ পর্যন্ত যতটুকু অংশ দেখা যাউতেছে,
সমস্তটুকুই কি যেন একটা উজ্জল কোতুকর
নিঃশব্দ-উল্লাস-হাসো, অপরিবর্তনীয় সৌন্দর্যে
উজ্জল! ডান-হাতে ধরা ছড়িটি চিবুক
নীচে ঠেকাইয়া, বা হাতটি পকেটে পুরিয়া
তিনি নিজ মনে সটান চলিতেছেন তো চলিতে-
ছেন-ত? মুহূর্তের জন্যও কোন দিকে
জ্ঞেপ নাট।

পার্সন সহাস্য-প্রসঙ্গ-দৃষ্টিতে লোকটির
দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ও রকম খেয়ালী
লোকেরা পাগলেরই দ্বিতীয় সংস্করণ বটে।
কিন্তু দাঁড়ান; আচ্ছা, একটু পথ হেঁকে
দাঁড়াই, কখন হয়?”

একটু হাসিয়া লীনা বলিল, “বেশ নিরাপদ
হওয়াই হয়! দেখছেন না, জলপোক যে

রকম অঙ্কজানে অগ্রসর হইলেন, তাহে অন্য লখিকরা সতর্ক না হলে, আকস্মিক-সংঘাতের সম্পূর্ণ আশঙ্কা।”

পাস'ন বজাব-সিদ্ধ তরল কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। আগন্তুক তখন মশ বারো গজ দূর বাবধানে আসিয়া পড়িয়াছেন; শব্দটা তাঁঁচার কাণে এড়াইল না। অপ্রস্তুত ভাবে ঘনাক্ষরী দাঁড়াইয়া তিনি ক্ষণেকের জন্য অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরমুহূর্ত্তে পরিচিত মুষ্টি-হুটটিকে চিনিতে পারিয়া, হাস্যোচ্ছল মুখে টুপি পুলিয়া অভিযান করিয়া, ক্রতপদে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, “বাঃ না! আপনাবা! আমি ঠিক এটুহুই ভয় করছি! কিন্তু মাগ করুন উদ্ভ-মঃহলারা, আমি একটু অশিষ্টা প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি। মুঠে কবিরের এক চোখো রসিকতা আমি কিছুতেই সত্য করতে রাজী নই—” বলিতে বলিতে ফি পচরণে তিনি কোতুহলবিস্মিতা তরুণী-হুটটি ডান পাশে অতিক্রম করিয়া সাঁ করিয়া একচক্র ঘুরিয়া আসিয়া, বাঁ পাশ কাটাষ্টরা আঁ সাধনে পৌঁছলেন; হাত বাড়াইয়া করমর্দন করিতে করিতে, হাসিমুখে সম্মানে বলিলেন, “কিছু মনে করবেন না আপনারা, আমি সেখানে ভাল মানুষের মতই আসছিলাম মিঃ প্রিন্সের সন্ধানে। হঠাৎ পাথে মনে পড়ে গেল একটা পুরোণো কবিতা;—” বলিয়াই তিনি স্কোভুকে ব্যঙ্গ-বরে আবৃত্তি করিলেন :—

“A fair woman and a slashed gown
Will find some nail in the way.”

কি অববাক্য অত্যাচার বলুন দেখি! কবিরের চৌকশ বুদ্ধির চিত্তবৃত্তির তরানক

বাগ ধরছিল। একটা কড়া প্রতিবাদ করবার জন্য ভরসার ইচ্ছাও হচ্ছিল, অর্ধচ হাসিও পাকিল,—এমন সময় দেখি—আমার ভাগ্যেও, some nail in the way, ছুটে গেছেন। তাতে তাতে প্রমাণ দাখিল করে কবির উদ্দেশ্যে সন্তুষ্ট প্রতিক্রিয়া করে দিলুম। এনার আপনাবা বিচার করুন, আমার কাজটা ভাল কি মন্দ?”

সেই বালকের মত অসঙ্কট-সারল্য-ভরা সুবার মুখের নির্মল-মুন্দর-কৌতুক-লীলা লীনার দ্বান বিবাদ-ভরা দৃষ্টির উপর একটা মেহ-করুণ তৃপ্তির কিরণ ছড়াইয়া দিল।—পৃথিবীর মানুষ, তোমাদের সরল হাসির সৌন্দর্য কি অপার্থিব, কি চমৎকার! সৃষ্টিকর্তার নিজেই সেরা শিল্পী বুদ্ধি,—সরলপ্রাণ মানুষের মুখের এই প্রসন্ন কৌতুক-উচ্ছল আনন্দের হাসিটুকু! হে ভগবন্, হে ভগবন্, হে গ্রাহের কোণে পড়িয়া যে হৃদয়গা গ্রাণগুলি এ সম্পদ-কোণে অধিকারে বন্ধন উন্মোচ, তাহাদের সন্তুষ্ট প্রাণকে ক্ষণিকের জন্য আশ্রয়-বিশ্রুত হইবার শক্তি দাও,—এই সব পরিহ্রাণ মানুষের অঙ্কন-নির্মল হাসিটুকুর দিকে চাহিয়া!

মনের গুপ্ত বেদনাকে মনের আড়ালেই গুপ্ত রাখিয়া লীনা প্রকাশ্যে বেশ প্রকৃত ভাবে দেখাইয়া বলিল, “আচ্ছা পাস'ন, আপনার হাতেই আমি এর সম্পূর্ণ বিচার-ভার ছেড়ে দিলুম,—আপনার সমালোচনা-শক্তি আমার চেয়ে ঢের ভাল হবে, আশা করি।”

পা। মিঃ ডব্লু, আপনি মনে করবেন না, বন্ধুত্বের খাতিরে আমি নির্মিতারই, আপনার সাধু-উদ্দেশ্যটা সমর্থন করব। ততটা সন্ত-

প্রকৃতির বাহুব আমি মোটেই নই। আমি এখনই তুর্ক কুলুতে চাই, কবিকে আপন যে প্রতিবাদ করলেন সে প্রতিবাদটা বাস্তবিক ঠিক নির্ভুল হয়েছে কি না? কারণ, কবি-বর্ণিত fair woman আমরা যে ঠিক হতে পারি, তার তো কোন গমাণ নাই।

সবিস্ময়ে ডবসন্ বলিলেন “বলেন কি! চিত্রবিদ্যার পিছনে ধাওয়া (?) করে, আমার চোখ দুটো কি এমিই উচ্ছিন্ন গেছে যে আপনাদের নিগ্রো-বালিকা বলে মেনে নিতে হবে? আমি কি এমিই হতভাগা জীব!”

লীনা শ্রিতমুখে বলিল “নাঃ, বন্ধুহটা এবার বিপরীত মুখে পাক খেয়ে, বিষম ঘোড়ের মাথার উপস্থিত হোল যে! মিঃ ডবসন্ কমা করুন, পাস'নের মত কাঁহুড়ে লোকের হাতে সমালোচনার ভার দেওয়া যে কত বড় বিপজ্জনক কাৰ, সে সবকে কোন অভিজ্ঞতা আমার ছিল না, তাই আপনাকে তৎপরিদেছি। যাই হোক,—এবার আমি মধ্যস্থতা করছি শুধু, আপনার হিসাবের তুল নিয়ে নির্দয়-ভাবে তর্ক দ্বন্দ্ব না করে—”

লীনার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া পাস'ন সকেতুকে বলিলেন, “সটান নারী-সমাজের তরফ থেকে, আপনাকে হিতৈষী বন্ধ বলে সাধু বাদ দেওয়াই উচিত! এবং তাই দেওয়াই হচ্ছে। যে বন্ধ, কোন্ ত্যাগ করে এসন্ন হোন, আপনারই জয়! এখন মিঃ ক্রাউ-ডেনের কুশ-লসংবাদটি পড়ে তামার ব্যক্ত-কতন দেখি, তখনই পুনী হয়ে আর এক কথা কল্পনা নিজে, আপনার পক্ষের পক্ষের কলা কলস পড়বে!”

লীনার দিকে চাহিয়া করুণ অভিনয়ের

ববে ডবসন্ বলিলেন, “হেব্‌ডেন, আমার জয়লাভটা কতখানি তীব্র পরাজয়ের লাহুনা বহন করে আনলে। নাঃ, এবার টে-পট-চলট দেওয়াই নিরাপদ! মিঃ পিকক কাল আমার পুঁজু ছিলেন কেন জানতে হবে। বৃষ্টি-তেই আহেন তিনি, আশা করি? আমি গেলে পথে তাঁর দেখা পাব এখন?”

বন্ধু-কৌতুকপ্রোভে নিজেই ছাড়িয়া দিয়া, লীনা কণিকের জন্য নিজের হুঁত্যা-মানির দাহ তুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আবার ডবসনের মুখে পিককের নাম তুলিয়া চকিতে গত কলাকার কথা সমস্ত মনে পড়িয়া গেল,— নিমেষে মুখ শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল! ইতস্ততঃ করিয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতে গেল, কিন্তু তাহার আগেই কৌতুকময়ী পাস'ন সহদ্রুপে বলিয়া উঠিলেন, “সকল বিষয়েই স্থান-সমাজের কল্যাণ কল্যাণী যে পৃথিবীর মানুষদের পক্ষে পবন সহজ ব্যাপার, তা খুব জান, মিঃ ডবসন্, কিন্তু বন্ধুপ্রীতির অসুযোগে, নিঃস্বার্থ হিতৈষী ভাবে উপদেশ দিছি, শুধু— হতাশ হওয়াটা তার চেয়েও আশ্চর্য্য সংজ্ঞা ব্যাপার!”

প্রোবোদক দৃষ্টিতে চাচিয়া ডবসন্ বলিলেন, “অর্থাৎ? প্রিয়বন্ধু কুণ্ডিতে নাই?—”

লীনা স্তানমুখে কীট হাসি টামিয়া কি একটা উত্তর দিতে গেল, কিন্তু তাক-আগেই পাস'ন বাধা দিয়া বলিলেন, “তার আগেই আমাদের বন্ধন নকল সংবাদটা আমাদের দাবী করবার আধিকার আছে, যোগ কর।”

উৎসব অপ্রত্যাশিত হইয়া ডবসন্ বলিলেন, “হী, হী, তুলে গেছি, ক্রাউডেন-বন্দীরা কথা বলছিলেন নয়? তাঁরা কাল আহেন, চকলেট

ভাল আছেন।” কপাটা বলিতে বলিতে এ-পকেট ও-পকেট হাটুড়াইয়া ডবসন বাতুল্যে কি একটা জিনিস খুঁজিতে লাগিলেন।

পার্সন সেটুকু লক্ষ্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে বলিলেন, “আগার চিঠিপানি হারিয়ে এসেছেন তো? মিসেস ক্লাউডেন যেটা লিখেছিলেন?”

অবাক হইয়া মুহূর্ত্ত কাণ হী করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ডবসন বলিলেন, “সেটুকুও আমি অমন জানেই বুকে ফেলেছেন? বাস্তবিক আমি একটি আশ্চর্য। মাপ করুন, সত্যিই আমি চিঠিটা হারাই নি, বোধহয়; আগার টেবিলে পড়ে আছে বোধ হচ্ছে, আমি এখনি গিয়ে খুঁজে দেখছি।”

পার্সন সজ্ঞিতভাবে ধন্তবাদ জানাইয়া : বিনয়ে বলিলেন, “না মিঃ ডবসন, আপনাকে তক্ক করিতে গিয়ে সত্যিই এবার নিজেরা তক্ক হতে বসেছি, মাপ করুন। আপনার হাসিমুখ দেখেই মিঃ ক্লাউডেনের কুশল বুঝতে পেরেছি, আর চিঠির জন্য তাড়াতাড়ি নাই, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম

করুন। কিন্তু অমন সাংঘাতিক অস্থিরের পথ দিয়ে টেলিগ্রামটা করেছিল কে?”

হাসিয়া ডবসন বলিলেন, “বোকা বাঁধন-দেব থাকে যদি দুর্ভাগ্যবানদের কেউ বন্ধ হয়ে চড়ে বসতে পার, তবে সে আসন্ন অতিভাবকের চেয়েও বড় দরের মুকবি হয়ে পড়ে কিনা! ক্লাউডেনের সেই পাজী বন্ধুটাই আজাল থেকে এই খেলা খেলেছে, এখন সাফ পিটান লাগিয়ে সব পড়েছে।”

পার্সন চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। লীনা ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, “এমন ভাবে মিথ্যা হুঃসংবাদ দিয়ে, মানুষকে হুঃসংবাদ ফেলে তক্ক করবার অর্থ কি?”

উদাস হাসো ডবসন বলিলেন, “মজা দেখা!—বিদায়।”

“বিদায়। মিসেস ক্লাউডেন এখন সেই ঘানেই থাকবেন?”

“বোধ হয়। কিন্তু লীনা আসাও অসম্ভব নয়।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা বোধকার্য।

স্মৃতি

কি তবু লিখিত নারী,

ধনা তুমি বলিহারি,

ভাষার বর্ণিতে নারি তব গুণ সমুদার!

তবু তব অনির্গত

তব মেহ নহে মের!

কে তব তুলনা হবে দয়া-মেহ-করুণার?—

সন্তানের বকে করি,

নিগ্রাহার পরিহারি,

স্ববিপদ তুচ্ছ করি' বাণ শিশু কতবার!

সন্তান-বকল তব

বক্সা বাবা মাধি নিয়ে

সাক্ষাৎ চুম গো ডারে হেরি মুখ অসংখ্য।

নিজ রক্ত চক্ষুরূপে, তনয়ের দাঁও মুখে,

উদ্ব হরে মজ তাব সর্কাপের কানিয়া ।

এত মেহ কোথা পেলে, কে তোমাবে শিখাটিলে,

কহ দে পি সস্তানবে মেহময়ি ওগো মা !

স্বার্থময় এ জগত স্বার্থ তরে সবে বত,

স্বার্থ বিনা অন্য কাজ কেহ নাহি কবে আশ !

সেথা কত, তব কেন স্বার্থহীনা মুক্তি হেন,

দয়াময়ি মেহময়ি সুখময়ি মা আমার !

এত কষ্ট সচা করি, তেত জালা বকে ধমি,

পুত্রগণে বক্ষা করি কিবা ফল তব হয় !

তুমি দান কব এত !— প্রতিদান পাও কত ?

দেখ দেখি চিন্তা করি লাভ কিংবা কতি তায় !

লাভ নাহি ও জননি, সব দিকে হয় হানি,

বুঝিলেও কত তুমি বৃদ্ধিতে ত চাহ না ।

‘হা পুত্র, হা পুত্র’ করি পুত্রগণে কোলে ধরি

চিদানন্দে চুয়া দাঁও, অন্য কিছু দেখ না ।

এ ত্রুত মা কে শিখা’ল, এ মন্ত্র মা কে জানা’ল,

স্বার্থহীন লোভহীন এ কর্তব্য কে আনি’ল ?—

আনিল ত, তব প্রাণে কে গাহিল তানে মানে ?—

য়েছেব সুসার দিয়া কে জনম নিরমিল ?

বুঝিয়াছি এতদিনে তিনি ভিন্ন অন্য জনে

স্বার্থভরা বিশ্বমাঝে করে নাহি এই কাজ !

তিনি যে দয়াল পিতা পুত্রের করিতে বাণী

মেহরূপে অবতরি পশিয়াছে দ্বি-মায় ।

সেই তুমি সেই তিনি, সেই তিনি সেই তুমি,

বিলু হ’ল নাহি ভেদ মধ্যে তব উভয়ের ।

যে তোমা চিন্তিতে পাবে, কারমনে সেবা কবে,

সে ত হুংপ নাহি পায় তিলমাত্র জগতের !

তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণ তাই বাঁচি,

তুমি ভিন্ন তনয়ের কে দোষা গো বড়িবে ?—

সন্তানের দয় বত, সন্তান-প্রার্থনা শত

তুমি ভিন্ন আর কে গো সে-সমস্ত লহিবে ?

ধন্য তুমি ধন্য নারী,

ধন্য তোমার বলিহারি,

ধন্য তব সহ্য গুণ, ধন্য তব মহিমা ।

ধন্য তব পুত্র-স্নেহ,

ধন্য তব মাতা-মোহ,

ধন্য তব পুত্র মোরা, কৃপাময় ওপো মা ॥

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

জাহাজ ডুবি ।

(১০)

শ্রাবণের শেষভাগ । প্রবল বর্ষা অবিসৃত
 দ্বাৰিয়ারা বর্ষণ করিয়া ধরিত্রীমণিকে জ্ঞান
 করাইতেছে । নিবিড় জলদরাশিতে আকাশ
 আচ্ছন্ন । মাঝে মাঝে ক্ষীণ সৌদামিনী
 আকাশের গায় মৃদু হাসিয়া দেখা দিতেছে ।
 নীল-পুষ্করিণী কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া
 গিয়াছে । তটিনী কূলে কূলে উচ্চলিয়া পড়ি-
 তেছে । প্রবল তরঙ্গরাশি তটপ্রান্তে আঘাত
 করিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে । উর্ধ্বের পর
 উর্ধ্ব নাচিয়া নাচিয়া ছুটিতেছে । শুভকণ্ঠলি
 একবার উঠিয়া একবার ডুবিয়া ঠিক যেন
 লুকাচুরি খেলা করিতেছে । পথঘাট সর্বত্র
 কর্মমাক্ত ও পিচ্ছিল । বর্ষা-প্রাবনে পথিককে
 বাস্তবাক্ষ করিয়া তুলিয়াছে । বেলা অপ-
 রাহ্ন । অবিরত ঝিপ্ ঝিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে ।
 আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন । স্থগাৎবে কল্লন
 আদিরাছেন, কখন বাইবেন, তাহা নির্ণয়
 করা মানুষের সাধ্যাতীত । অবিরত বৃষ্টিব
 জন্য পথ ঘাটের অবস্থা বিশেষতঃ পরিগ্রামের
 পথের অবস্থা এত শোচনীয় যে তাহার কথা
 কানে নাই । সকল পথের এতটা জর্জরিত না
 হইলেও সংক্ষেপে কেহ এমন দিনে বাটীর বাহির

হঠতে চাহে না । দিওনের নৈঠকখানায়
 বসিয়া রাধাগোবিন্দবাবু নিবিষ্টচিত্তে একখণ্ড
 গীতা পাঠ করিতেছিলেন । তাঁহার ঘোম-
 মুড়ি অনাবৃত দেহ দেখিলে সেই পুরাকালের
 শ্রদ্ধাধর্মিগণের কথা মনে পড়িয়া যায় । তখন
 অনেককণ পূর্বে তামাকু দিয়া গিয়াছিল;
 কিন্তু তিনি গীতা-পাঠে এত মগ্ন হইয়াছিলেন
 যে, তামাকুটা পুড়িয়া পুড়িয়া ভাষে পরিণত
 হইয়া গেল তবুও তাঁহার মনিকো দৃষ্টি পড়িল
 না । কক্ষতলে বিস্তীর্ণ ফরাস, তক্তপত্র
 ধোপদস্ত চাদর, পাশে ধোপদস্ত ওয়াড়
 ঢাকা গোষ্ঠিকতক তাকিয়া । রাধাগোবিন্দবাবু
 একটা তাকিয়ার উপর কসুইয়ের ভার দিয়া
 অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গীতা পাঠ করিতেছিলেন
 এমন সময়ে এক ব্যক্তি সেট কক্ষমধ্যে প্রবেশ
 করিল । লোকটি আমাদের নতুন জমিদারের
 পারিষদই বলুন, আব সুহৃদই বলুন—শ্রীযু-
 ক্ত হারাদন । হারাদনের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ উত্তীর্ণ
 হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেহের গঠনে তাহ
 বৃদ্ধিতে পাণ্ডা যায় না । শরীর এখনও বেশ
 ছট পুট ও বলিষ্ঠ । মাংসপেশীগুলি স্বচ্ছ,
 মস্তকের কেশরাশির এক আনা অংশমাত্র
 শুষ্কবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে । যৌবনের সখ্য

এখনও পূর্ণ মাজার বিদ্যমান। তাহার পরি-
ধারে ঢাকাই করিগাড় মিহি ধুতি, পায়ে
ঢাকাই কুলদার চুড়ীদার, কাঁধের উপর এক
খানা তড়পবৃত্ত সিকের চাদর দোতাঙ্গ করিয়া
ফেলা; পায়ে সিকের মোজা এবং পল্লব
শোভা পাঠিতেছিল। মাথার উপর খাড়া
খাড়া চৌচ কাঁটার মত চুলগুলি তৈলাক্ত
করিয়া পমেটম এবং ‘কসমেটিকের’ সাহায্যে
যথাসাধ্য মসৃণ করিয়া তুলিয়াব চেঁচা করা হই-
য়াছে। গোলাকার চকু-তইটা সুবাদেবীর
রূপার সর্কদাই রক্তাক্ত, এবং তাহা যেন সর্ক-
দাই কিসের অঙ্গসন্ধানে বাস্ত। হারাদন
কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া পায়ের জুতাটা
খুদিতে খুদিতে মুককিরানা ধোঁজে বলিল,
“কি হচ্ছে মশাই?”

এই বাদলার দিনে নির্জন কক্ষমধ্যে
হঠাৎ মৃত্যু-কণ্ঠ শ্রুত হওয়ায় রাধাগোবিন্দবাবু
চক্ষের চশমা-খোঁড়াটি খুলিয়া বাম হস্তে রাখিয়া
পুস্তক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, “কে?”

“এই যে আমি শ্রীহারাদন চক্র, চিনতে
পারছেন না নাকি?” বলিয়া হারাদন ফবা-
সের মধ্যস্থলে একটা তাকিয়া টেন দিয়া বসিয়া
পড়িল। নূতন জমীদারের আচাব-দাবহায়ে
এবং কার্যকলাপ-দর্শনে রাধাগোবিন্দবাবু
কার্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার
সহিত রাধাগোবিন্দবাবুর আর কোন সংশ্রব
ছিল না। বৈবরিক সকল কার্যভার সম্পন্ন
করিত জমীদারের সুদূর হাবাদন এবং পরাণ।
নূতন জমীদার এতদুভয়ের বুদ্ধিমত্তাই পমি-
চালিত হইতেন। প্রজাসাধারণের নির্ঘা-
তনের সীমা ছিল না। তাহার তাহাদের
ইচ্ছার কাহিনী রাধাগোবিন্দবাবুর নিকটে

আনাইতে আসিত, তিনি তাহাদের মিষ্ট
কথার ভুই করিয়া বলিতেন, “আমি কি কব্ধ
বাপু, তোমাদের জমীদারকে জানাওগে।”
কিন্তু জমীদারের সঙ্গে তাহাদের দেখা-
সাক্ষাৎ ঘটিত না। জমীদারের নিকটে যাই-
বার সানথা তাহাদের ছিল না। ষাণ্ড পর্যন্ত
উপস্থিত হইলেই হাবাদন ও পরাণের হুকুম
মত, হাবাদনের নিকটে প্রজ্ঞত হইয়া তাহাদের
ফিরিতে হইত। এই সমস্ত দেখিয়া অনিয়া
রাধাগোবিন্দবাবু ইহাদিগকে অত্যাধিক সন্তো-
ষিত করিতেন। ইহাদিগের ছায়া স্পর্শ করি-
তেও তাঁচার অন্তর অস্থির হইয়া উঠিত।
আজ হাবাদনকে নিজের বাড়ীতে উপস্থিত
দেখিয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া
উঠিলেন। কিন্তু মনোভাব যথাসাধ্য গোপন
করিয়া ভ্রমোচ্চিত ভাবে বলিলেন, “আহুন!”

হারাদন রাধাগোবিন্দবাবুর কথার
কোনও উত্তর না দিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল,
—“ওবে তামাক দিয়ে যা।”

রাধাগোবিন্দ বাবু আশ্চর্যান্বিত হইলেন।
ভৃত্য তামাক দিয়া গেলে হারাদন তাহা বেশ
মনোযোগের সহিত টানিতে লাগিল। কোনও
কথা বলে না। ঠিক যেন সে তামাক সেবন
করিবার জন্যই আসিয়াছিল। কিছুক্ষণ চূপ
করিয়া থাকিয়া রাধাগোবিন্দ বাবু বলিলেন,
“মশায়ের কি অভিপ্রায়ে আমার কাছে আসা
হয়েছে?”

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হারাদন
বলিল, “অভিপ্রায়? আভিপ্রায় আছে বুই
কি! বিনা অভিপ্রায়ে কি মানুষ কোন
কাজ করে?”

হারাদনের এইকণ নিম্নবর্তি হামি এবং

কথাবার্তায় রাধাগোবিন্দবাবু আরও অত্যধিক বিরক্ত হইয়া বলিলেন—“কি অভিপ্রায়টা তবু শুনি?”

হারাধন বলিলেন, “বাঃ শুনবেন বই কি! বিলক্ষণ। আপনাকেই বলতে এসেছি, আর আপনি শুনবেন না?” বলিয়া তৃত্যকে পুনর্বার এক ছিলাম তামাকু দিবার জন্য আদেশ করিল। তামাকু টানিতে টানিতে বেশ মুগ্ধবিস্ময়ানা চালে বলিল “আপনার একটা নাত্নী আছে না?” বলিয়া সে উত্তরের প্রতীক্ষায় রাধাগোবিন্দবাবুর মুখের দিকে চাহিল। হৃদয়ের মুখে নাত্নীর নাম শুনিয়া রাধাগোবিন্দবাবু শিহরিয়া উঠিলেন। কি যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার ঠাহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। নাত্নীর সঙ্গে ইহাদের কি প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সন্দেহভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁ, তা কি হয়েছে?”

হা। ওর নাম কি,—এটা আর বুঝতে পাচ্ছেন না—আপনি এত বড় বুদ্ধিমান লোকটা হয়ে?

হা। স্পষ্ট করে খুলে না বললে আপনার মনের কথা বুঝে কেমন করে বলুন?

হা। ইয়ে হয়েছে, যে, জানেনই ত আপনারা জমিদার ছেলেবেলা থেকে চোর-ডাকাতির হাতে পড়ে কত কষ্টই না পেয়েছেন, বিয়ে খাও হয়নি। এখন বাই হোক ভগবানের কৃপায় এখন বাপের বিষয় পেয়েছেন, তখন বিয়ে খাও করা ত দরকার! আপনিই বুঝেন না?

অন্যান্যদিক ভাবে রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন “অ তো নিশ্চয়।”

তীর দৃষ্টিতে রাধাগোবিন্দবাবুর মুখের দিকে চাছিল হারাধন বলিল “এই কে ওর নাম কি,—আপনার নাত্নীটির সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে হবে।”

রাধাগোবিন্দবাবু বিষয়ে ক্রোধে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তবে তাঁহার বিচক্ষণতা ও বহু-সহিষ্ণুতাগুণে মুহূর্ত্ত-মধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন “তা আমার নাত্নীকে কেন? তিনি যদি বিয়ে করবার ইচ্ছে করে থাকেন, তা হলে অনেক জমিদারের মেয়ে পাওয়া যাবে।”

দম্ভবিস্তারপূর্ব্বক হাসিয়া হারাধন বলিল, “তা ত’ পাওয়া যায় জানি! তবে ওর নাম কি, আপনার নাত্নীর কপাল জোর বলতে হবে, তার ভাগ্য ফিরে গেছে। আপনার প্রভু-পুত্র কেমন করে আপনার নাত্নীটিকে দেখতে পেয়েছেন, দেখে তাঁর ভারি পছন্দ হয়েছে! তিনি বলেছেন আপনার নাত্নীকে তির আর কাকেও তিনি বিয়ে করবেন না।”

হা। আমার নাত্নী এখনও ছেলেমানুষ, এই সব বার তের বছরের, এখনও সে বিয়েও যোগ্য হয় নি!

হা। বার তের বছরের মেয়ে বিয়েও যোগ্য হয় নি! একথা বাঙলা দেশে খাটে না। এ দেশে কত বার তের বছরের মেয়েকে ছেলের মা হতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে!

হা। তা’ হতে পারে, কিন্তু সেটা জানেন কি, অভিভাবকের ইচ্ছানুরূপ হয়ে থাকে। আমি সে রকম বালা-বিবাহের পক্ষপাতী নই, তা ছাড়া আমার ছেলের অনভিমতে আমি তার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে কোন কথাই কইতে পারব না।

হা! সেটা কি আর কাজের কথা হল। আপনি এমন খোঁস কর্তা, আপনি যা বলবেন, আপনার কথার উপরে কি আর আপনার ছেলে কোন কথা কইতে পারবে?

রা। মোট কথা আমার নান্দীবা এখন বিয়ে দিতে আমাদের কারও ইচ্ছে নেই। আর তা দোষও না।

হারাধনচন্দ্র কি বলিতে যাঠিতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা সামলাটয়া লইয়া বলিল, “দেখুন আপনাদের জমিদার, আপনার প্রভু-পুত্র, একদিন যার চাকর বলে নিজেকে পরিচয় দিরেছেন, আজ তাকে জামাই বলে পরিচয় দিতে পারবেন;—স্বয়ং খেচ তিনি আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে চাইছেন। এটা আপনার সৌভাগ্য বলে মনে করবেন। এমন সুযোগ পরিত্যাগ করবেন না।

রাধাগোবিন্দ বাবু একটু অবজ্ঞা হাঙ্গি হাসিয়া বলিলেন, “মাপ করবেন মশায়! এহটা সৌভাগ্যের আমি প্রত্যাশা নই। আমরা গরিব মানুষ, চাকরের ভাত, জমিদারের সঙ্গে কুটুম্বিতা আমাদের শোভা পায় না।”

হারাধন তাড়াতাড়ি পকেট হইতে এক ভাড়া নোট বাহির করিয়া বলিল, “কত টাকা চান বলুন, আমরা কিছুতেই পিছপাও হব না।”

ক্রোধে রাধাগোবিন্দবাবুর সর্কাস্‌ টাপিতে লাগিল তথাপি তিনি শাস্ত্রভাবে বলিলেন, “এইবেলা মানে মানে চলে যান, নইলে আমি ভক্ততা রাখতে পারব না; আপনাকে ঘোর ক’রে উঠিরে দিতে বাধ্য হব।”

রাধাগোবিন্দবাবুর কথা শুনিয়া হারাদিন উত্তেজিত ভাবে বলিল “জামেন কা’র জমীতে বাস কাছেন?”

হারাধন রাধাগোবিন্দ বাবু বলিলেন, “সেটা আপনার চোর কা’র বেড়া জানি।”

হারাদিন গৃহে গিয়া বলিল “তবে? কা’র অপমান কাছেন, সেটা মনে করে দেখুন।”

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “তাঁকে দেখছি। একটা জুয়াচোরের ছদ্মদিন থাকে, তাকে জেলখানায় ঢুকতে হবে।”

ক্রোধে গর্জিতে গর্জিতে উদ্ভিয়া দাড়াইয়া হারাদিন বলিল, “সাদান! মুখ সামলে কথা বোল! বুড়ো বলে মাপ করব না বলে দাঁছি।”

দীর পশপত্বে রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “কিছু দরকার নেই। কে আপনার কাছে মাপ চাইবে মশাই? আপনায় যথ-শক্তি, যা ইচ্ছে হয় করতে পারবেন।”

হারাদিন—“আচ্ছা বেশ! তাই হবে। দেখে কি হাস কা’র। আমার বাড়ী বরিশাল জেলায়, আমাকে সাধারণ লোক মনে কোর না। আমার যে কথা সেই কাজ।” বলিয়া ক্রোধে গর্জিতে গর্জিতে ক্রত-পদক্ষেপে সোপান অতিক্রম করিয়া রাধাগোবিন্দবাবুর বাড়ী হইতে দূরগত হইয়া গেল। রাধাগোবিন্দবাবু চিন্তিতাস্ত্রকরণে অনামনহৃতাৎমীত্বাধীন হাতে করিয়া ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত-মুখে গমন করিলেন।

(১১)

নিশাদলের রাজবাটীতে একজন অপূর্ণ জ্যোতিষী আসিয়াছেন। তিনি লোকের

স্বতঃসিদ্ধি অদৃষ্ট গণনা করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ, কর্তমান—সকল কথাই বলিয়া দিতে পারেন। যে তাঁহার নিকটে অদৃষ্ট গণনা করাষ্টতে আসিত, তাহাকেই তিনি বালগা দিতেন; কাহাকেও নিরাশ করিতেন না; অথচ কাহারও নিকট হঠাৎ একটি পয়সাও গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার এই অত্যদৃষ্ট গণনা-শক্তি দেখিয়া লোকে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বাইত। সন্তুষ্ট হইয়া লোকে তাঁহাকে প্রণামী দিতে আসিত, তিনি তাহাও গ্রহণ করিতেন না; বড় জোর যদি কেহ পাদদ্বারা আঁচিয়া তথ্য লইবার অত্যাশঙ্কিত করিত, তাহারাষ্ট কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতেন। তাহাও তিনি অধিক পরিমাণে লইতেন না; বলিতেন “আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, কোনও দ্রব্য সংস্থান করি না। আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ, ভগবান্ যেদিন যেমন জুটিয়ে দেবেন, তাই আমাদের পক্ষে কেউই; পর্যাপ্ত পরিমাণে দ্রব্য আমাদের গ্রহণ করতে নেই! কেবলমাত্র কৃষ্ণবস্ত্রের মত দ্রব্য আমরা গ্রহণ করতে পারি।”

তাঁহার কথার তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আরও সহস্রগুণে বৃদ্ধিত হইত। শত সহস্র ব্যক্তি শত সহস্র মুখে তাঁহার প্রশংসা করিত। ধনাঢ্য, দরিদ্র, গৃহস্থ যে আসিত সকলকেই তিনি যত্নপূর্বক তাহাদের জাতব্য বিষয় বলিয়া দিতেন। কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। তাঁহার সুলভ সৌম্য প্রশান্ত প্রতিমূর্তি এবং ধীর নম্র ব্যবহারে তিনি সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে যে একবার দেখিত, সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি ইন্দ্রাজিতও বেশ পরিচয় করিয়াছিলেন।

পারিতেন। লোকে অস্বাভাবিক করিত তিনি কোনও বড় ব্যয়ের ছেলে, কোনও কার্যবশতঃ সমস্যাতে দীর্ঘস্থায়ী হইয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় কাহাকেও বলিতেন না। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মুহূর্তমধ্যে উড়াইয়া দিতেন। তাঁহার ব্যবহারে লোকে তাঁহার মর্মে অন্তঃকরণের পরিচয় প্রাপ্ত হইত। তিনি রাজবাটীর একটি নির্জন কক্ষে একাকী বাস করিতেন। রাজার আদেশে যদি কোনও সাধু সন্ন্যাসী সমাগত হন, তবে রাজবাটিতে তাঁহাকে স্থান দিতে হইবে এবং প্রত্যহ দুই বেলা তাঁহাদের সিংহাসনে দিতে হইবে। এ জ্যোতিষী রাজবাটিতে বাস করিতেন খটে, কিন্তু সিংহাসন গ্রহণ করিতেন না। লোকে বলিত, তিনি সাধু মহাপুরুষ ভক্তের দান ভিন্ন অন্যতর দান স্পর্শও করেন না। রাজা স্বয়ং যদিও একজন নিষ্ঠাবান্ ভক্ত, কিন্তু তিনি তখন বাটীতে ছিলেন না। তাঁহার কর্মচারিবৃন্দ, সাধু সন্ন্যাসী বা অতিথি ব্রাহ্মণ আদৌ দেখিতে পারিত না। নিতান্ত না করিলে নয় তাঁহাকে রাজ্যদেশ পালন করিত মাত্র। এমন অপ্রীতির দান তিনি গ্রহণ করেন না। আবার কেহ কেহ বলিত, তিনি যোগসিদ্ধ পুরুষ, বাহ্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকেন তিনি রাজার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু রাজা বৎসরে অধিক কাল প্রবাসে কাটাইতেন; মাঝে মাঝে বাটী আসিতেন। রাজার পাচক ভৃত্য-দ্বারবানের নিকটে বসিয়া জ্যোতিষী ক' গল্প করিতেন, রাজার সংবাদটা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহারাও জ্যোতিষী ঠাকুরের এই

অমরিকতা ভাব দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ খুলিয়া কথা বলিত। তাহার কতক প্রকৃত, কতক অপ্রকৃত, কতক অতি-রঞ্জিত। জ্যোতিষী ঠাকুর তাহারেব নিকটে আনিতে পারিলেন, রাজা পুত্রহীন; একটা নার পুত্র হইয়াছিল, বহুদিন পূর্বে শৈশবেই তাহাণ মৃত্যু ঘটিয়াছে। ছব্বস্তু কাল অত্যাগে শিশুটিকে অপহরণ করাতে, রাজা রাণী উদ্ধারের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিলেন; সেই পন্যায় তাহাণা তীর্থে তীর্থেই ভ্রমণ করিয়া কালান্তপাত করিতেছেন। তবে কিছুদিন হইল, তিনি মনঃস্থ করিয়াছেন দেওয়ানের কনিষ্ঠ পুত্রটিকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করিবেন। তাহারই অমুঠান হইতেছে। দেওয়ানের গুলু এখন রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত রাজপ্রাসাদেই বাস করিতেছেন। এবার রাজা ত্রিংশ বছরে প্রত্যাগত হইয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ করবেন। রাজপুত্রের কোণার, কবে, এবং কি প্রকারে মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাহাও জ্যোতিষী জানিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি গগনা কন্দিয়া বলিলেন—“রাজপুত্রের মৃত্যু ঘটে নাই।” “তিনি এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন?” এই প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিষী বলিলেন, তাহা তিনি বলিতে অক্ষম এবং যতদিন না রাজা গৃহে প্রত্যাগমন করেন, ততদিন এ সম্বন্ধে আর কোন কথাই তিনি প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু রাজার এখন আসিবার কোনও স্থিরতা নাই, এবং তিনি যে এখন কোন তীর্থে অবস্থান করিতেছেন, তাহাও কেহ অবগত নহে। কেবল টাকার দরকার হইলে মাঝে মাঝে দেওয়ানের নিকটে পত্র লিখেন। জ্যোতিষী রাজার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগি-

লেন। জ্যোতিষীর অমৃত গগনার লোক আশ্চর্যান্বিত হইল। বটে, কিন্তু অবিশ্বাস করিতে পারেন না। কারণ তাহাণে গগনার প্রতি লোকের একটা বিশ্বাস বিধাস এবং দৃঢ় ভক্তি হইয়া গিয়াছিল। একজন, দু'জন কখনো কখনো এই জগতের গতি জানে জানে। হাতে, দাঁতে, মনে, দোহাণে, গলাবে, বাজারে এবং অমৃত মনো বাহু হইয়া পাড়ল। সকলের মূগ্ধতা এই জগতের চর্চাতে প্রকাশ। কেহ জগতের অমৃত মনো বাহু প্রদর্শন করবার চেষ্টা করত, বলিত “কাজে সুখ বীজিত জগতের, অমৃত রাজা পোষ্য পুত্র গ্রহণ করছেন, সেই জন্য অমৃত মনো বাহু রাজাকে পুত্র মন করবার জন্য মাতৃস্বরূপে বাজবাহিরে আনিল হইয়াছেন। রাজা যে পন্যমণ্ডিক! এমন লোকের উপর ভগবানের দয়া হবে না, তাহার উপর হবে?”

কথাটা কখনো দেওয়ানের কর্ণেও উপস্থিত হইল। তিনি কুনিয়া চট্টাঙ্গ লাগ হইয়া উঠিলেন—কোথাকার একটা ভিক্ষু গীতাধোষ সন্ন্যাসী আসিয়া তাহার পুত্রের মাজা হইবার পথে কষ্টকররূপে হইয়া পাড়িল। একদিন তিনি সন্ন্যাসীর সহিত মাকান্দ করিয়া ফুল ভাবে বলিলেন, “ভগ্ন সন্ন্যাসী ঠাকুর! গীতার মাজাটা একটু কন কোরো!”

জ্যোতিষী অতিবিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—“মহার, আমি গীতা পাঠ না, আপনি ভুল বলাছেন।” কুৎসিত দেওয়ান বলিলেন “গীতা পড়েন তো, এমন গীতা-খুনির গল্প শুনি সব কোথা থেকে!” পুত্রহীন প্রশ্নায় প্রাণে জ্যোতিষী উত্তর করিলেন, “কি গীতাখুনির গল্প শুনি করেছি?” দেওয়ান

উত্তেজিত ভাবে বলিলেন “রাজাবুঁর পর নর ? আজ পঁচিশ বছর হলো রাজাবুঁর ছেলে মনেচে, আর আজ তুমি বগছ কিনা, সে ছেলে : র , বেঁচে আছে ! দি আশুয়া ! কেউ এত দল একথা জানতে পারে নি, আব তুমি বৃষ্টি স্বর্গ হতে দেবদূত আজ এত যথব নিরে এসেছ ?”

দুই চার সন্ধ্যা জ্যোতিষী বলিলেন, “ম’শায় ! কথাটা মিথ্যা নয়, সত্যই রাজাবুঁর ছেলে জীবিত।”

দে। তুমি ঠাকুর সতনমপুবে সাধ।

জ্যো। যখন ডিনি এখানে এসে উপস্থিত ছবেন, তখন আমার খণনার সত্য মিথ্যা উপলব্ধি কহতে পারবেন।

এবার দেওয়ান কিসাং নমুড়াব অবলম্বন করিলেন। অপেক্ষাকৃত একটু শান্ত ভাবে বলিলেন, “ঠাকুর, তোমাব মতলবখানা কি মলত শুনি ? আজ পঁচিশ বছর যে মরেছে সে কি আর যমের বাড়ী থেকে উঠে আসবে ? রাজা এখন পোষাপুত্র নেবার ইচ্ছা করেছেন, আমার ছোট ছেলেটিকে পোষাপুত্র নেবেন বলে স্থির হয়েও গেছে, এখন যদি তুমি তাঁর স্ত্রী পুত্রের কথা তুলে মন খারাপ করে দাও, তাই হলে তাঁর মাথা ঘুঁয়ে যাবে। হয় তো পোষাপুত্র গ্রহণ করবার বাসনা ত্যাগ করবেন, তার ফলে এত বড় একটা রাজবংশ লোপ হয়ে যাবে, জমীদারীটা কোম্পানীতে নেবে।”

শান্ত অবিলম্বিত ভাবে জ্যোতিষী বলিলেন “তাই বুঁর আপনার এতটা রাগের কারণ ? কিছু মশাই, রাজার জন্য আপনার কোনও ক্ষতিয়ার কারণ নেই। যথার্থই তাঁর পুত্র জীবিত।”

দেওয়ান মহা বিপদে পড়িলেন। একজন

ভিক্ষু সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার আশীতকর মূল কুঠারাবাত্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে। ধেকপে হটক তাহাকে বিদায় করিতেই হইবে। দেওয়ান বলিলেন, “বুঝতে পেরেচি ঠাকুর, তোমার কিছু টাকার দরকার হয়েছে। তাই সন্ন্যাসী সেজে রাজবাড়ীতে এসে রাজাকে ঠাকরে কিছু গ্যাড়া মারবার চেষ্টায় আছে। তা বাপু, আমার কাছেই বল না, কত তোমাব দরকার ? আমি যা দোব, রাজা তার চেয়ে বেশী কিছু দেবে না।”

সংসার জ্যোতিষী বলিলেন “না ম’শায়, আমরা সন্ন্যাসী, টাকার প্ররাসী নই ! জগতেব হিন্দু-মাধনট আমাদের কার্য্য। রাজা পুত্র-হীন নহেন, গ্রহবৈজ্ঞান্যে পিতা-পুত্র বিচ্ছেদ ঘটেছে মাত্র। এ স্থলে পিতা-পুত্রের মিলনের সাহায্য করা, তাঁর মঙ্গল সাধন করাটী আমাদের কার্য্য।” দেওয়ান যখন কোন প্রকারেই গর্হিত জ্যোতিষীটাকে সম্বরণ হইতে টলাইতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “একটা লাঠির চোটে তোমার সব বুদ্ধকিকি ভেঙে দেব ! ব্যাটা ভণ্ড, তুমি রাজার ছেলে বার করে দেবে ? যমের বাড়ী গিয়ে রাজাবুঁর ছেলেকে সঙ্গে ক’রে নিয়ে এস গে” বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধভাবে চলিয়া গেলেন। আর এখানে বাস করা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া জ্যোতিষীও সেইদিন গৈরিক বসনখানি এবং লোটা কল লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া চম্পট দিলেন।

(১২)

কানাইরের বড় অস্থখ। কি অস্থখ তাহা নির্ণয় করিয়া বলা যায় না। এতাহ যথানিয়মে দানাহারের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা

বার না। কিন্তু সে বলে, তার “বড় ব্যামো।” তাহার বুকের ভিতর কি একটা গুলি ব্যথা আছে, মাঝে মাঝে সেটা বুকে আগার উঠে, তখন সে মৃত্যুর হইয়া পড়ে। লোকে মনে করে সে নিদ্রা বাটতেছে, কিন্তু সেটা প্রকৃত ঘুম নহে। যন্ত্রণার চোটে সে জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়ে। বাড়ীতে গিয়া স্বপ্ন হইয়া আসিবে বলিয়া মনিবের নিকটে সে ছুই-মাসের ছুটি চাহিতেছিল, কিন্তু কানাইয়ের মত হিসাবী বুদ্ধিমান সভ্যভবা চাকর দুআপ্য বলিয়া মনিব তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিতেছেন না। তিনি যথারীতি ডাক্তার দেখাইয়া তাহার চিকিৎসা করাইতে চান। কানাইয়ের জন্য তিনি অর্থব্যয় করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত ন’ন, কিন্তু কানাই তাহাতে সম্মত নয়। সে বলে,—এ ব্যামো তাহার ডাক্তার-কবিরাজে আরাম করিতে পারিবে না। তাহার ভূতপূর্ব প্রভু একজন অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কলিকাতার লটয়া গিয়া থাতিয়া চিকিৎসকদের দেখাইয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। এ রোগ কাড়-কুক, মাগুলি-দারপ, দৈব অনুষ্ঠান-বাতিরকে আরাম হইবার নয়। কানাই আরও বলে—“এত অস্থির ভুগে কাজ করলে শেষ মারা পড়ব কি? দু’দিন দেশে গিয়ে ‘তিকিছে’ করে না জিকলে কি হয়!” আর তাহার এ রোগ আরাম করিবার রোজা নাকি তাহার দেশেই আছে। মনিব যখন কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চাহেন না, তখন সে বলিল—“হু মাসের মধ্যে আমার ভাই বলাইকে আপনার কাছে রেখে যাব। তার কাজ-কর্ম, হিসেব-কিতেব দেখলে পরে তখন আমার ভাকে

চাড়াতে চাইবেন না। তার এত বুদ্ধি যে আপনি হা করলে সে আপনার মনের কথা বুকে নেবে। সে এমন হিসিবি যে আপনি মাস চাইলে সেবি-সাম্পন, ছইকি-ত্রাণ্ডি, সব এনে চাঞ্জির করবে। আপনি জল চাইলে খাবাব, পান, তামাক সব তৈরি করে আনবে। আপনি খুঁটি চাইলে আপনার জামা, জুতো, ছড়ী, ঘড়ি, এমন কি গাড়ীও বুদ্ধিরে রাখবে। আমার ছোট ভাই বটে, কিন্তু তার বুদ্ধিভক্তি, হিসেব-কিতেব এমন যে, দেখলে পরে আপনি আশ্চর্য হইয়া যাবেন।”

সন্ধ্যায় জমিদার জিজ্ঞাসা করিলেন,
“সত্যি না-কিবে?”

কানাই বুক ফুলাইয়া সগর্বে উত্তর করিল,
“হাঁ হজুর! দু’দিন দেখে পৰখ করেই দেখুন না কেন? তবে তার একটা কিন্তু মন্ত দোষ আছে।”

বাস্তবাবে জমিদার জিজ্ঞাসা করিলেন,
“কি দোষ রে?”

কা। আজ্ঞে সে হাবা, আর কালা। কথাও কইতে পারে না, কানেও শুনতে পারি না। নইলে ভগবান তাকে সব গুণই দিচ্ছেন।

জমী। তবেই ত বলি ভাল! হাবা-কালা চাকর নিয়ে কাজ চালাবো কি করে?

কা। আজ্ঞে তা’হলেও আপনার কাজের কোনও কতি হবে না। ঐ ত বলুম হজুর! যে আপনি হা করলে আপনার মনের কথা টেনে আনতে পাববে। এত-চালাক সে একটু ইয়ারা পেলেই বাস! অমন সব বুকে ফেলবে। দু’দিন দেখুন না কেন! তার ভাকে কাজ-কর্ম সব বাতলে দিয়ে তবে যাব।

আপনার কোন কষ্টই হবে না। আপনার কাছে কষ্ট হয়, তেমন কাজ আমি কি করতে পারি হুজুর? আপনার মত এমন মনিব আমি আর কোথায় পাব? আশা, যেন সন্ধানিব! কি করব ব্যামোটা চ'দিন বড় চেগে উঠেছে ভাই! নইলে কি আর আমি আপনাদের কাছে ছেড়ে যাই! চাকরি যদি করতে হয় তাহলে আপনার কাছেই করব, নইলে এ শ্রমী আর কাহারও গোলামী করবে না।”

কানাইয়ের কথা শুনিয়া সপরিবার জমীদার প্রভু মহাসন্তুষ্ট হইলেন। হারাদন জনান্তিকে বলিলেন—“ওহে ভাই রেখেই বেধে না ওর ভাইকে। ও যা বলছে তা সত্যিই হবে। আর দেখ, হাবা কালা চাকর আমাদের পক্ষে এক রকমে ভালই হবে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার ও তোমার কানাইকে বড় ভাল বলে ঠেকে না। চাকর-বাকর অত চালাক-চতুর কিছু নয়। বিশেষতঃ বিজ্ঞে বড় পেছনে লেগেছে ; কেবল ঘুরঘুরে পোকায় মতন তাকে তাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেদিন সন্ধান জানতে নোরাখালিতে গেছিল; আসবার সময় নাকি আমাদের দেশে পর্য্যন্ত পারের খুলো দিয়ে এসেছে।”

পর্য্যাপ হারাদনের মুখের কাছে হাত তুলিষ্ঠা লাড়িয়া বলিল, “ভূই যেমন আহাম্রক! ভূই ত বলি সেদিন, বুড়ো ব্যাটার কাছে দেশেব পরিচর দিয়ে এসেছিল! নইলে কে জামত বল? হারাদন বোঝকবারিত-লোচনে পরাণের দিকে চাহিল। কানাই কাণের ছুতা করিয়া চট্ করিয়া কক হইতে নিঃশব্দ হইয়া গেল।

হারাদনের রক্তচক্ষুদর্শনে পরাণ হা হা করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল; বলিল, “কি বাবা পাঁচ বছরের কচি খোকাটা পেয়েছে নাকি যে আমাকে চোখ রাঙাচ্ছে?”

হারাদন অপেক্ষাকৃত বৃহত্তাবে বলিল, “খাকা গেছে ভজলোকের মতন সেটা বুঝি তোর ভাল লাগছে না? আবার কি সেই বনে-জঙ্গলে বেড়াবার সাধ হয়েছে নাকি? বুড়ো হয়ে গেলি, এখনও কি তোর লুকেচুবি খেলার সাধ মিটল না?”

অগ্নানন্দনে পরাণ বলিল, “না—সেই যে কথায় বলে ‘জন্ম গেল ছেলে ধেরে আর জ্বল ডান’! সমস্ত জন্মটা কেটে গেল যে কাজ করে, সে কাজ কি কখনও ভুলতে পারা যায়? তা বাবু সত্যি কথা বলতে কি, এ রকম নিরীহ গোবেচারী হয়ে চুপচাপ বসে থাকি আমার মোটেই ভাল লাগে না। গরীব প্রজার ঘর আগিরে আর কত স্নানোদ পায়? বলে, ‘মারি তো হাতী, লুটি তো ভাঙার।’ মাঝে মাঝে হাতটা জুড় জুড় করে ওঠে। কেবল লাল জ্বলের মহিমাধ কোন রকম ক’রে নিজেকে সামলে রেখেছি মাত্র! তবে বাই বল, তোমার ও বিজ্ঞেকে আমি একরত্তিও ভয় করি না। হুঃ! বাছাদন ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি ত! যেদিন পড়বেন আমার হাতে, সেইদিন টের পাইয়ে দোব! বলে কত বড় বড় টিক-টিকিকে ধরে ঝোল খাইয়ে দিলুম!—আর ও ত সেদিনকার ছোড়াটা! উনি কিনা আমাদের পেছুতে লাগতে আসেন! হার-হর কপাল!”

গলা ঝাড়িয়া কানাই কক্ষস্থে প্রবেশ

করিল; বিনীতভাবে একটুকে বলিল, “কি বলেন ছুঁর! আমার ভাইকে আসতে কি তা হলে একখানা পতুর লিখে দোব বাড়ীতে?”

হারাধন প্রভুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—“হ্যাঁ—হ্যাঁ দিবি বাই কি! বতাই কেন চাকর-বাকর থাকি না, তোর বদলে তোর ভাইয়ের থাকা চাই! আজকেই তাকে চিঠি লিখে দে আসবার জন্তে! ব্যালি! এই নে একখানা পোষ্টকার্ড নিয়ে যা।” বলিয়া উঠিয়া সেলফের নিকটে গিয়া একখানা বটমের ভিতর হইতে একখানা পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া সে কানাইয়ের হাতে দিল। কানাই পোষ্টকার্ড লইয়া তাহার স্বভাবাচরণী মুক্ত করে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

কয়েক দিন পরে কানাইয়ের ভাই বলাই আসিয়া উপস্থিত হইল। বলাই কানাইয়ের অপেক্ষা বয়েসে ছোট। বটো উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ, তবে ধলার কাদায় অল্প কিছু রক্ত রক্ত হইয়া পড়িয়া ফ্যাকাসে গোঁচ দেখাইতেছে; মাথায় রক্ত রক্ত ঝাঁকড়া, ঝাঁকড়া কৌকড়া কৌকড়া, এক বাঁশ চুল, তাহা দেখিলে মনে হয় না যে, জন্মে তাহা কোন দিন তৈল স্পর্শ করিয়াছে। হাত মুণ নাড়িয়া ঠিকিতে কথা বলে, কিন্তু খুব চটপটে! কানাই তাহার প্রতি-ক্ৰটিমত দুই দিন থাকিয়া ভাইকে তাহার কি কি কর্তব্য সে-সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া মনিবের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

কানাই চলিয়া বাইবার দিন কতক পরে একদিন অপরাহ্নে রাধাগোবিন্দবাবুর পৌত্রী নীলিমা নিয়ের সহিত তাহাদের খিড়কীর পুকুরীতে গা ধুইতে গিয়াছিল।

তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। তপসসেব অনেকক্ষণ পূর্বেই পশ্চিম আকাশের কোলে গা ঢাকা দিয়াছিলেন। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। সন্ধ্যা আগমনের প্রায়স্তই গাছের তলায় তলায় অন্ধকারমাশি জমাট বাধিয়া আসিতে-ছিল। বৃহৎ বাগান; বাগানে আম কাঠাল লিচু, গোলাপজান এবং ভাল বেল কুল পেরারা নারিকেল প্রভৃতি সমস্ত দেশীয় ফলের গাছ শ্রেণীবদ্ধভাবে ছিল। আবাস খোলা জায়গায় লাউ কুমড়া মূলা বেগুন শাক সবজি প্রভৃতি যে সময়ের যা ফসল সমস্তই সে বাগানে হইত। রন্ধকরূপ দুইটা মালী সর্বদাই বাগানে অবস্থান করিত। তাহাদের বাসের জায় বাগানে চই খানি ঘর ছিল। বাগানের মধ্যস্থলে একটা দীর্ঘিকা, সে দীর্ঘিকা-ব জল অতিশুদ্ধ, নির্মল! জলে অবতরণ করিলে পায়ের নখ পর্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। দীর্ঘিকা সুন্দররূপে বাধানো, বাগানের চতুর্দার্শ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মধ্যে গেট; গেটের দ্বার গৌর বেলিং-দ্বারা নির্মিত। রাত্রিতে শয়নকালে মালীরা তাহা সুদৃঢ় তালা দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকে। বাগানটী রাধাগোবিন্দবাবুর খিড়কীর বাগান। রাধাগোবিন্দবাবুর বাটীর মহিলাগণ এই দীর্ঘিকা ব্যবহার করিতেন।—উড়িয়া মালিঞ্চর ব্যতীত কোনও পুরুষের গতিবিধি তথায় ছিল না। নীলিমার সমতিবাহারিণী নিয়ের কক্ষে একটা পিড়লের কলসী ছিল। সে একটুইটু জলে দাঁড়াইয়া সোপানের উপর কলসীটাকে রাখিয়া মাজিতে লাগিল। কলসীটি মাজিয়া দুইখণ্ড সোপা-নের উপর রাখিয়া কাপড় কাটিবার জন্ত সে জলে নামিয়া পড়িল। নীলিমা একটা পেরার

দ্বারের ভলার কাঁড়াইয়া আঁকনি দিয়া পেরায়া পাড়িতে লাগিল। পুরিলীর পাশেই পেরায়া আছে। নীলিমাকে পেরায়া পাড়িতে নিয়ন্ত্রণ দেখিয়া বি নিবেদন করিল—“ওগো, কাল সন্ধ্যাতে সোমত ঘেরে গাছে হাত দিও না।” কিন্তু নীলিমা পেরারার লোভ সংবরণ করিয়া, বি নিবেদন গ্রাহ্য করিতে পারিল না। বি ব্যস্তব্যস্ত চোঁটাইয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল, কিন্তু নীলিমা তুলিল না। বি কাপড় কাটিতে লাগিল। নীলিমা গোটা কতক পেরায়া পাড়িয়া স্বকৃষ্ণিত গামছা খানাতে ঝাঝিয়া লইল। একটা পেরায়া হাতে করিয়া কামড়াইতে কামড়াইতে দীর্ঘকাল দিকে ফিরিতেছিল, ঠিক এই সময়ে নীলিমার পাখত্ব একটা কলমের আম গাছ হইতে, দুই ব্যক্তি ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া নামিয়া পড়িল। তাহাদের পরনে ঢিলা পাজামা, গায়ে ঢিলা বুর্জী। বুর্জর আন্তানাহার বেশ করিয়া শুটানো, পদবীর উজ্জ্বল ও সুখে মুখোশ পরা ছিল। তাহাদের সেই বিকট মুক্তি দর্শন করিয়া আতঙ্ক নীলিমা “মা গো” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নিমেষ-মধ্যে তাহারা নীলিমার নিকটবর্তী হইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া নীলিমাকে আব কোনও বাক্য-মুক্তি অবকাশ না দিয়া কিপ্রহস্তে তাহার মুখটা ঝাঝিয়া ফেলিল এবং নিমেষ মধ্যে হইতনে মিলিয়া মৃতদেহের দ্বায় বালিকার দেহলতাখানি স্বল্পে করিয়া ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। রুমালে ক্রোরকরম কাপানো ছিল, কেননা অতি কলঙ্কণের মধ্যেই দাপিতা মির্জাবী ভাবে তাহাদের স্বল্পে উপর পড়িয়া পড়িল। যখন তাহারা নীলিমাকে

লইয়া পলায়ন করিল। বি তখন তাহাদের দেখিতে পাইল, এবং ‘চোর’ ‘চোর’ ‘ওগো কি হলো গো! ও মালী, রঘুরা, ও চুনা, ওরে মুখ-পোড়ারা তোরা বেরোনাসে, মরিচিস্ নাকি,’ বলিয়া কাদিতে কাদিতে চীৎকার করিতে লাগিল। বিয়ের চীৎকার শুনিয়া রঘুরা ও চুনা, উড়ে মালীঘর ছই হস্তে জুড়ি রগড়াইতে রগড়াইতে, দৌড়িয়া আসিয়া বিকে জিজ্ঞাসা করিল, “কড় হউচি পারা?” বি কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, “আমার মাথা হয়েছে! এতক্ষণ ছিল কোন চুলোয়? দেখ দেখ খুকু-রাণীকে চুরি করে নিয়ে গেছে, লীগগির যা, ছুটে যা, অমন দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা না ছুটে”, আমি বাড়ী গিয়ে বাবুদের কাছে মুখ দেখাব কেনন করে?” নীলিমাকে বাড়ীর সকলেই আশ্রয় করিয়া খুকুরাণী বলিত। বিয়ের কথা শুনিয়া উড়িয়া-পুঙ্গবদয় অবাক হইয়া হাঁ করিয়া রহিল। বিয়ের কথার মর্মগ্রহণে সমর্থ হইল না। ভাবিল, খুকুরাণীকে চোবে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে কি? খুকুরাণী কি টাকার বস্তা, না সোণার ঢেলা, অথবা বাগানের ফসল যে, তাহাকে চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে! তাহারা সবিস্ময়ে উভয়েই এক-বাক্যে বলিয়া উঠিল, “কঁড় কউচি? খুকুরাণী গলা কঁউচি?” অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বি উত্তর করিল “আরে মোল, উড়ে ম্যাড়া, বুঝতে পাচ্ছি না? ছুটো কে যমদূতের মতন মিলে খুকুরাণীকে কাঁধে করে নিয়ে পালিয়ে গেল, দেখ না কোথায় গেল, ওমা কি হবে গো!”

তখন উভয়ের মস্তিকেই বুড়ির গাছ গজাইয়া উঠিল। কথার বলে—“চোর পালালে

বুঝি থাকে।" উড়িয়া-বীরধরেরও ঠিক তাই হইল। এইবার তাহার লম্পলপূর্বক "আরে মলারে শকা গলা কোরাড়ে" বলিতে বলিতে উড়িয়া-বীরধর ছুটিল। কিও প্রথমে চোর দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, এখন তাহার সাহস ও শক্তির আবির্ভাব হইল। আর্জবসনে গালাগালি দিতে দিতে মালীদের পশ্চাৎ সেও ছুটিল। গোলমাল শুনিয়া রাধাগোবিন্দবাবু এবং এবং নীলিমার পিতা অজয়নাথও বাহির হইয়া পড়িলেন। বিয়ের মুখে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অজয়নাথ একটা পিস্তল হাতে করিয়া উদ্ভয়ের দ্বার ছুটিলেন। চারিদিকে লোক ছুটিল, পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইল, কিন্তু চোর তখন সাধু হইয়া আড্ডায় গিয়া বসিয়াছিল, পুলিশের সাধ্য কি যে ধৃত করে? কিছুক্ষণ অস্থসন্ধান করিয়া সকলে ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিল। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। রাধাগোবিন্দবাবু বিজনকুমারের নিকটে গেলেন। বিজনকুমার তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার জনৈক কর্মচারী তাঁহার প্রতিনিধির কার্য্য করিতেছিলেন। তিনিই বৈঠকখানার বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "বিজনবাবু আজ কদিন থেকে বাড়ীতে নেই, কোন একটা বিশেষ দরকারের জন্তে স্থানান্তরে গেছেন। কেউ এলে পর, কি কোনও সংবাদ থাকলে আমাদের লিখে রাখতে বলে গেছেন।"

বিজনবাবুর সহিৎ সাক্ষাৎকার না হওয়াতে রাধাগোবিন্দবাবু অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কি একারে নীলিমাকে পাওয়া যাইবে, তাবিয়া

তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; বলিলেন, "তিনি কবে আসবেন? আবার বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ ছিল।"

কর্মচারী উত্তর করিলেন, "তার কিছুই ঠিক নাই, আজ-কালের ভিতরে আসতে পারেন, আবার দুদিন দেরিও হতে পারে। আবার এখনিও এসে পৌছিতে পারেন। তিনি কখন কি করেন, কখন কোথায় যান, সে কথা কারও কাছে প্রকাশ করেন না।"

"তাই ত! এখন-কি করা যায়?" বলিয়া রাধাগোবিন্দবাবু চিন্তিতমনে একখানায় চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

কর্মচারী বলিলেন, "আপনার আবশ্যকতাটা কি বলতে যদি বাধা না থাকে, তাহলে আমাদের বলুন, আমি নোট করে নিচ্ছি, তিনি এলে দোব।"

বলিতে বলিতে বিজনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজনকুমারকে দেখিয়া রাধাগোবিন্দবাবু যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, বলিয়া উঠিলেন "এই যে বিজনবাবু এসেছেন, বাঁচা গেল।"

বিজনবাবু সমস্তমুখে বলিলেন, "ও দাদামশাই সত্যে খেতেই বসে আছেন নাকি? বড় কষ্ট হয়েছে ত!"

রাধাগোবিন্দবাবু প্রবীণ ব্যক্তি বলিয়া বিজনকুমার কোনও দিন তাঁহার নাম ধরিতেন না। 'দাদামশায়' বলিয়া ডাকিতেন। এবং সম্বন্ধানুযায়ী সময়ে সময়ে রহস্তালাপ করিতেও ছাড়িতেন না। অপরকুমার চলিয়া যাইবার পর হইতে বিজনকুমারের রাধাগোবিন্দবাবুর বাটীতে যাত্রায়াতটায় কিছু বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং তাঁহার পরিবারবর্গের

সহিত ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতাও জন্মিয়াছিল।
বিজনকুমারের কথা শুনিয়া রাধাগোবিন্দ-
বাবু বলিলেন, “আমি বড় বিপদে পড়েছি।”

প্রশান্তভাবে বিজনকুমার বলিলেন,
“আপনি আসবেন বলেই আমি তাড়াতাড়ি
করে আসছি।”

আশ্চর্য্য হইয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন,
“কি বলছেন, আমি আসব বলে আপনি
জানতেন?”

সহাস্তে বিজনকুমার বলিলেন, “হাঁ
জানতাম বাই কি! আরও জানতাম নীলিমার
অজস্রকানের ভারটা আমার দ্বন্ধেই পড়বে।”

রাধাগোবিন্দবাবু অবাক! বিস্ময়-বিফারিত
নেত্রে বিজনকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া
বলিলেন, “নীলিমাকে চুরি করে নিয়ে গেছে
তাও জানেন?”

বি। জানি বই কি! আপনারা চোরকে
প্রেরণ দেবেন, আর চোরে চুরি করবে না?
দোর চোরের নয়, রাগ করবেন না দাদামশাই,
দোষ আপনারদের।

রা। আপনার কথাটা বুঝতে পারলুম না
বিজনবাবু! আমরা চোরকে প্রেরণ দিচ্ছি
কি রকম?

বি। দিচ্ছেন না? চোর যখন আপনাকে
শাসিয়ে গেছে’ল ‘বেমন’ ক’রে হক নীলিমাকে
নিয়ে যাবই, তখন ত কৈ আমাকে কিছু
বলেন নি? তা হলে আব এ দুর্ঘটনা
ঘটতে পারত না। আপনারা মেয়েকেও
সাবধানে রাখলেন না, আমাকেও জানালেন
নী। কাজে কাজেই চোরের চুরি করবার
সুযোগ হলো।

চট্ চট্ করিয়া রাধাগোবিন্দবাবু

পূর্বকথা শ্রবণ হইয়া গেল। তিনি আশ্চর্য্য-
স্থিত হইয়া বলিলেন, “আপনি সে কথা
জানলেন কি করে বিজনবাবু? আপনি কি
অন্তর্ধানী?”

বি। না, আমরা অন্তর্ধানী নয়, দাদা-
মশায়! তবে দিন-রাত চোর-ডাকাতে
পেছনে পেছনে ঘুরতে হয় বলে আমাদের
চারিদিকে চোখ-কান রাখতে হয়। কাজে
কাজেই সাধারণ লোকের চেয়ে আমরা
সংসারের খপর ঢের বেশী পাই।

রা। আপনি কি সন্দেহ করেন, তাদেরই
এই কাজ?

বি। নিশ্চয়! সন্দেহ কি?—নিশ্চয়!
আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

রা। প্রত্যক্ষ করেছেন? বলেন কি?
নীলিমাকে নিয়ে যেতে আপনি দেখেছেন
নাকি?

বি। হাঁ আমি তখন তাদের কাছেই
ছিলুম।

রা। কাছেই ছিলেন? আপনার স্মরণ
দিয়ে আমার নীলিমাকে চোরে চুরি করে নিয়ে
গেল, আর আপনি রক্ষা করলেন না?

বি। কি করব বলুন! তারা শক্তিশালী
দস্তা, তাতে সশস্ত্র! আমি ক্ষীণ-জীবী হালা-
রিয়াভুক্ত বাঙ্গালী! তাতে আমার একলা,
সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও কিছু ছিল না। কেমন
করে কি করি বলুন? নিজের ডাছ কাঁচা
গলাটা তো আর তাদের চুরির আগায়
বাড়িয়ে দিতে পারি না।

অত্যন্ত কাতর হইয়া রাধাগোবিন্দবাবু
বিজনকুমারের ডানহাতখানা চাপিয়া ধরিয়া
বলিলেন, “কি হবে উপায়! আমার নীলিমাকে

কি আর পাব না ? আমাকে রক্ষা কর তাই।
আমার জাত, কুল, মান, সব তোমার হাতে।
আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর।”

এমন ভাবে রাধাগোবিন্দবাবু কথাগুলি
বলিলেন, তাহাতে বিজনকুমারের অন্তরও
ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং বৃদ্ধের এই ভাষ্-
সম্বোধনে তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন।
বৃদ্ধের মুখে ‘আজ্ঞে’ ‘আপনি’র চেয়ে ‘তুমি’
কথাটা বিজনকুমারের বেশ মধুর বলিয়া মনে
হইতে লাগিল। তিনি আশ্বাস দিয়া বলিলেন,
“আপনার কোনও চিন্তা নাই দাদামশাই,
আমি যখন সন্ধান পেয়েছি, তখন নীলিমার
কোনও অনিষ্ট হতে দোব না।

যত শীগ্গির পারি আপনার নীলিমাকে
উদ্ধার করে আপনার কাছে এনে দোব।

সুনিরা রাধাগোবিন্দ কতকটা আশস্ত
হইলেন। বলিলেন, “ভগবান্ তোমাকে
দীর্ঘজীবী করুন। তুমি চিরদিন এমনি নিঃস্বার্থ-
ভাবে লোকের উপকার করতে থাক। অজ্ঞ
তো একেবারে ঘাড় গুঁজড়ে বিছানায় এসে
পড়েছে। একে মেয়ের ভাবনা, তাতে
অপমানের ভয়।”

যুহু হাসিয়া পরিহাসছলে বিজনকুমার
বলিলেন, “এত ভাবনাই বা কেন দাদামশাই ?
জমিদার নাভ-জামাই হবে মল্টাটাই বা কি ?
তারা তো আর মন্দ অভিশ্রায়ে নিরে যায়
নি ! বিয়ের আয়োজন কচ্ছে !”

চম্কিয়া উঠিয়া রাধাগোবিন্দবাবু
বলিলেন, “তাই নাকি ? বিয়ের আয়োজন
কচ্ছে ?”

বি। হ্যা, পুরুত ডাকিয়ে পাঁজী দেখিয়ে
বেশ চলনসই বিয়ের বন্দোবস্ত করছে।

তাহার পর তিনি আবার একটু হাসিয়া
বলিলেন, “কেন দাদামশাই, জমিদার নাভ-
জামাই আপনাব পছন্দসই নয় ?”

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া রাধাগোবিন্দবাবু
বলিলেন, “না তাই, আমার জমিদার নাভ-
জামাইয়ে কাজ নেই, ভগবানের কাছে প্রার্থনা
করি আমরা যেমন খেটে খেয়ে মানুষ হয়েছি,
আমাব নাভ-জামাইও যেন তেমনি খেটে খেয়ে
মানব হয় ; মত্তমত্ত শেখে ! এষ বাড়া
আমি আর কিছু চাই না।”

বিজনকুমারের মুখ-ভাব গভীর হইয়া
উঠিল। যেন একটা পূর্বকের তড়িৎপ্রবাহ
তাঁহার অন্তরের ভিতর দিয়া দ্রুত বহিয়া গেল।
বুঝি, কার একখানা কচি মুখ তাঁহার হৃদয়ের
গোপনজন প্রবেশে একবার উকি দিয়া গেল।
মুহূর্ত পরেই তিনি ত্রস্তে আয়তনবরণ করিয়া
বলিলেন, “তবে চলুন দাদামশাই, আমার
হাতে অনেক কাজ, আমার এক মুহূর্তও
দাঁড়াবাব অবকাশ নেই।”

রাধাগোবিন্দবাবুও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া
উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “যাও তাই ! ভগবান্
তোমার সহায় হোন, তোমার সকল কাজ
সকল হোক। আমি অস্থির হয়ে পড়েছি।
যতক্ষণ না আমাব নীলিমাকে পাই, ততক্ষণ
আমার মন স্থির হচ্ছে না ! হা ভগবান্,
এ কি করলে ! বড়ো বয়সে একি পরিতাপ !”
বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। বিজনকুমার
তাঁহার কর্মচাবীটাকে গোপনে ছই একটা
কি পবামর্শ দিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে
বাহির হইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

ঐচাকনীলা মিত্র।

নাড়ু-গোপাল ।

(১)

এস—বশোদা-চলাল ! নাড়ুরা-গোপাল !
 হামা দে ছুটে ধন পালায়ে না ।
 আমি—রয়েছি পসিয়ে, বাচ প্রসারিয়ে,
 দেখা দে যাহ, আর লুকায়ে না ।

(২)

মোর—কোলে ঢলে হেলে, এসে হেসে খেলে,
 ছুড়াও ভুষিত তাপিত দ্বি ।
 দেখি—তুম্বর হইয়ে, আপনা ভুলিয়ে,
 নাচ গো হ্রদয়ে হ্রদয়-নিধি !

(৩)

তুমি—বৃক্ষেতে নাচিবে, করতালি দিবে
 মুগধ নয়নে চাহিয়ে ব'ব ।
 তব—ককণ-কিঙ্কণী— রসাল-শিঞ্জিনী,
 —কণু ঘুণু রোলে বিচল হ'ব ।

(৪)

মরি—আ মরি আ মরি ! কি রূপ-লহরী !
 লাবণ্যে ভুবন ভাসিরা যায় !
 আরা—সুঠাম স্নানর, নিটোল নখর,
 মবীন-নীরব-বরণ কার ।

(৫)

নিরে—শিখি-চুড়া হেন— নভোযন্ত্র যেন,
 কজ্জল-শৈবালে নয়ন-পদ্ম ।
 কিবা—ললাটে অলকা— খচিত তারকা,
 অধর সারাক-রজিম লজ ।

(৬)

দোলে—নাসার বেশর— ধবল সুলব,
 —নীল-সায়রে মরাল যেন রে !
 খেলে—কটিতে মেখলা, মেঘেতে চপলা,
 কুণ্ডল ফণি-সুগ-মণ্ডল রে !

(৭)

কি যে—পরাণ মাতানো, ভুবন ভোলানো,
 হাতে নাড়ু ধরা গোপাল ওই !
 আমি—আমির যে ল'য়ে, মোহে মুগ্ধ হ'য়ে,
 এমন মানিক কোলে না লই !

(৮)

কেন যে গোপাল নাড়ুটি ধরে ।
 তুমি—বেথেছ আহা, সুমিষ্ট সুধার,
 বিশ্ব-প্রপঞ্চের প্রাণীর তরে ।

(৯)

জীব—শিখাতে সবল, অভেদ অমল,
 বালাভাব আহা মধুর কি যে !
 তাই—ভুবন-মোহন, নয়ন-রঞ্জন,
 বাল্যরূপ তুমি ধরেছ নিজের ।

(১০)

এস—বশোদা-চলাল ! নাড়ুরা-গোপাল !
 মেহ-স্তন্য দিই অধরে ওই ।
 ডাক—এসে মোর কোলে, আধ মা'মা' বোলে,
 বাৎসল্য-ভাবেতে মগন হই ।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র ।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয় ।

গোপীনাথের মন্দির ।—কাছোয়ার ঠাকুর-
বংশের রায়সেলজী-নামক জনৈক ব্যক্তি
গোপীনাথের মন্দির স্থাপন করেন । ইনি
আকগানগণকে দ্বীকৃত করিয়াছিলেন বলিয়া
আকবর ইহাকে দরবারী খেতাব দেন এবং
১২৫০ অখাবোহী সৈন্তের নায়ক করেন ।
ইনি মানসিংহের সহযোগে মেওয়ারের রাণা
প্রতাপ সিংহের সহিত যুদ্ধ করেন এবং কাবুল
আক্রমণেও বিশেষ বীরত্ব দেখান । ইহার
মৃত্যুকাল অজ্ঞাত । গোপীনাথের মন্দিরের
মত অবিকল এক মন্দির ইনি নির্মাণ করেন,
পরন্তু তাহা এখন ভয়ানক ভগ্নদশাপন্ন ।

মৃগলকিশোরের মন্দির ।—ইহা বহু
পুরাতন মন্দির এবং কেশীঘাটের নিকটে
অবস্থিত । ইহা জাহাঙ্গিরের সময় ১৬৮৪
সংবতে প্রতিষ্ঠিত হয় । চোহান রাজপুত-
বংশোদ্ভূত ননকরণ নামে জনৈক ব্যক্তির দ্বারা
এই মন্দিরটি নির্মিত হয় ।

রাধাবল্লভের মন্দির ।—১৬৮৩ সংবতে
মুল্লর দাস নামক জনৈক কায়স্থ-দ্বারা এই
মন্দিরটি নির্মিত হয় । ইনি দিল্লীর কোষাধ্যক্ষ
ছিলেন । ইনি ব্রজচাঁদ গোসাঁইয়ের শিষ্য
এবং রাধাবল্লভী উপাসক সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা
হরিবংশ-নামক জনৈক ব্যক্তির পুত্র ।

সুদ্র সুদ্র মন্দিরের মধ্যে কতকগুলির
নাম উল্লেখযোগ্য । শূদ্রার বটনামে বান্দালী
মন্দিরটি বদনমোহনের নিকট অবস্থিত ।
এই মন্দিরের বার্ষিক আয় ১৩৫০০ টাকা
এবং ইহার অংশীদার তিনজন চারিঘাস

ব্যাপিয়া প্রত্যেক অংশীদারের পালা পড়ে ।
নদীর পরপারের জহাঙ্গিরপুর নামে গ্রাম এবং
বেলবন উক্ত মন্দিরের জমীদারী ।

রাধা-দামোদরের মন্দিরে জীবগোসাঁই,
তাহার পুত্রতাত ও রূপসনাতনের চিতাভয়
রক্ষিত আছে । রাধা-দামোদরের মন্দিরের
প্রতিষ্ঠাতা জীব গোসাঁই এবং অপর দুইজন
গোবিন্দ দেবের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ।
জীবদশায় ইহার এই বাসনা প্রকটিত করেন
যে, মরণান্তে যেন তাঁহার একই স্থানে
সমাধিত হন ; সুতরাং তাঁহাদিগকে একই
স্থানে গোর দেওয়া হয় । শ্রাবণ মাসে উক্ত
তিন জনেরই বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে ;
এই সময়ে তথায় অনেক বান্দালীর সমাগম হয় ।
বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক জনে কিছু কিছু
পূজা চড়ান । মন্দিরের লভ্যাংশ দুই মন্দিরের
মোহান্ত বটন করিয়া লয়ন, কিন্তু ১৮৭৫ খৃঃ
রাধাদামোদরের মোহান্ত গোবিন্দদেবের
লোকগুলিকে পৃথক করিয়া স্বয়ং সর্বস্ব লইতে
চেষ্টা করেন । রাধা-দামোদরের মোহান্ত
বলেন যে, গোবিন্দদেবের ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব
ধর্ম হইতে বিচ্যূত হইয়াছেন ; কারণ, তাঁহার
জয়পুর-রাজের আদেশানুসারে কপালে ত্রিপুণ্ড্র
তিলক কাটেন । একরূপ তিলক শৈবদিগের
চিহ্ন । এই কথায় দুই দলে দাঙ্গা বাধিবার
উপক্রম হয় । পুলিশ হস্তক্ষেপ না করিলে
নিশ্চয়ই একটা হাঙ্গামা হইত ।

পুরাতন মন্দিরের কথা আমি বলিছি ।
একপে আধুনিক মন্দিরের কথা উল্লেখ করিব ।

আধুনিক মন্দিরের মধ্যে পাঁচটা উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগের মধ্যে যেটা খুবই পুরাতন সেইটার নাম কৃষ্ণচন্দ্রনা। ইহা ১৪১০ খৃঃ কৃষ্ণচন্দ্র ১৫৫ নামক জ্ঞানৈক প্রাচীনগ্রন্থের বাদ্যলী কার্যস্থের দ্বারা নির্মিত হয়। ইনিই বৃন্দাবনে লালাবাবু নামে খ্যাত। মন্দির-নির্মাণ করিতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

লালাবাবুর পূর্বজ হরকৃষ্ণ সিংহের পুত্র বাবু মুরলীমোহন সিংহ একজন ধনাঢ্য লণ্ডনাগর এবং জমিদার ছিলেন। মূর্শিদাবাদের অন্তঃপাতি কান্দী-নামক স্থানে ইঁহার বাস। তাঁহার উত্তরাধিকারী বিহারীলাল সিংহের তিন পুত্র,—রাধা-গোবিন্দ, গঙ্গা-গোবিন্দ এবং রাধাচরণ। শেষোক্তটি পিতার সম্পত্তি পাইবামাত্র অল্প দুই ভ্রাতার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া নিকুদেশ হন। রাধা-গোবিন্দ মূর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দি খাঁ এবং সিবাজীমোহর চাকুরি গ্রহণ করেন ও অতি শীঘ্র উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অগুরুত্ব করেন, স্ত্রীরাং তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি তাঁহার ভ্রাতা গঙ্গা-গোবিন্দ পান। ইনি Warren Hastings-এর সময়ে Bengal Settlement-এ অনেক সাহায্য করেন। ইঁহারই দ্বারা নদীয়ায় চারিটা মন্দির এবং কতকগুলি ধর্মশালা নির্মিত হয়। মন্দিরগুলি নদীর তলে ভাঙ্গিয়া যায় এবং দেববিগ্রহ কাদিতে লইয়া আসা হয়। নদীয়াতে ইনি কতকগুলি সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করেন। ইনি ইঁহার পিতার প্রাদে অনেক টাকা ব্যয় করেন এবং প্রতি বয়স-কিতেও ১ লক্ষ টাকার কম খরচ করিতেন না। গঙ্গা-গোবিন্দের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহ

পিতৃধনের আরও বৃদ্ধি সাধন করেন। ইঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ লালাবাবু নামে খ্যাত। ইনি প্রথমে বর্দ্ধমানে রাজকর্মচারী ছিলেন এবং পরে উড়িষ্যা আসেন। ব্রজ-ধামে আসিয়া যখন ব্রজের সীমানা নির্দ্ধারিত করেন, তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। বৃন্দাবনে ইঁহার মন্দির ত আছেই; তদ্যতীত পাহনিবাসও আছে। এই পাহনিবাসে যাত্রীগণকে প্রতাহ আহার দেওয়া হইয়া থাকে। ইঁহার বাৎসরিক খরচ ২২ হাজার টাকা। রাধাকুণ্ডের চতুর্পার্শ্বেই ইনি স্নানঘাট বাধাইয়া তত্পরি প্রস্তরের চত্বর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। লোকে এই চত্বরের উপর উপবেশন করিয়া রাধাকুণ্ডের শোভা দর্শন করে। এই অগাধসম্পত্তিশালী মাহাত্ম্যে মনে হঠাৎ ভগবৎপ্রেম স্পর্শ করিল। অমনি অতুল বিত্তের পরিত্যাগ করিয়া তিনি বৈরাগ্য-মার্গ অবলম্বন করিলেন। যখন ইনি সংসারপ্রশ্ন ত্যাগ করেন, তখন ইঁহার বয়স চল্লিশ মাত্র। এই বয়সে তিনি ব্রজের বন, উপবন, প্রভৃতি সর্বত্র ত্রীকক্ষের অন্বেষণে ভ্রমণ করেন। এই কালে ইনি ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিতেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও এইরূপ ভাবনাই জীবন কাটাইয়াছিলেন। দৈববশে ঘোড়ার পদাঘাতে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি ভ্রমণকালে প্রসিদ্ধ শেঠ লক্ষ্মীচাঁদের পিতার সহিত থাকিতেন। ইনিও সন্ন্যাসি-ধর্মাবলম্ব ছিলেন। মথুরাতে লালাবাবু যে দশবৎসর সংসারপ্রশ্নে ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি তথাকার তীর্থস্থানগুলিকে ভ্রমণ করেন। ইহাতেই তাঁহার আর বৃদ্ধি করিবার উপর কিরূপ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি

করিতে পারা যায়। তিনি তথাকার জমিদারদিগকে বলেন যে, স্থানগুলির মাহাত্ম্য-রক্ষার্থেই তিনি লইতেছেন—স্বীয় ভবিষ্যৎ আয়ের জন্ত নহে; এই সকল স্থানে বানর ময়ূর পূর্বকালে যেরূপ নৃত্য করিত, পরেও সেইরূপ করিবে। অবশ্য এই সব অঙ্গীকার মৌখিক মাত্র ছিল, কোনরূপ কাগজে কলমে ছিগ না। মহাত্মার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সে অঙ্গীকার প্রতিপালন করেন নাই। জমিদারগণও দেখিলেন যে, নালিশ করিলেও এবং বিধ ঘটনার কোনরূপ প্রতি-বিধান হইতে পারে না; কারণ মৌখিক কড়ার আদালতে গৃহীত হয় না। মথুরা জিলায় লালাবাবু যে সকল গ্রাম ক্রয় করেন, তাহার সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ১৫টী; যথা, (১) কোদী পব-গণায় জাউ, (২) ছাত্রায় নন্দগাঁও, (৩) বসানী, (৪) সঙ্কেত, (৫) করহেলা, (৬) গড়দী এবং (৭) হাতীয়া এবং মথুরা-পরগণায় (৮) মথুরা, (৯) যাইত, (১০) মাহোদী এবং (১১) নানীপুর। শেষোক্ত স্থান ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানই মুনাদিকপরিমাণে তীর্থস্থান। ইহাতে আরও চারিটা গুজরদিগের গ্রাম, যথা পীরপুর, গুলালপুর, চামারগাটী এবং ধীমডী যোগ করিলে একুশে ১৫টী গ্রাম হইয়া থাকে। নন্দগাঁওয়ের ক্রয়ের জন্ত ২০০০ টাকা, বসানীর জন্ত ৬০০০ টাকা, সঙ্কেতের জন্ত ৮০০০ টাকা এবং করহেলার জন্য ৫০০০ টাকা দেন। উক্ত গ্রামের বার্ষিক আয় নন্দগাঁও হইতে ৬৭১২০, বসানী হইতে ৩১০২০, সঙ্কেত হইতে ১৬৪২০ এবং করহেলা হইতে ১২০০০ টাকা। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, লালাবাবু যখন সংসারশ্রমে ছিলেন, তখন

আয়বুদ্ধিবিষয়ে তাঁহার মস্তিষ্ক কিরূপ ছিল। তিনি যেমন সম্ভ্রাসাশ্রমে বৈরাগ্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তেমনই তিনি সংসার-শ্রমে বিশ্বস্তীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তিনি আনিগড় ও বৃন্দাবনসহরে চৌহানবংশীয় রাজা বাবসিংহের নিকট হইতে ৭২টী গ্রাম ক্রয় করেন; কিন্তু তদাধো ১২টী গ্রাম লালাবাবুর বংশধর শ্রীনারায়ণ সিংহের সময়ে নিলাম লইয়া যায়। শ্রীনারায়ণ সিংহ পিতার মৃত্যুকালে নাবালক ছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে নারায়ণ সিংহ পরগোক প্রাপ্ত হন। রাণীমাতা তাঁহার পুত্রের দরক পুত্রদ্বয়কে প্রতিপালন করেন। ইহাদিগের মধ্যে যিনি দ্রোষ্ঠা তিনি প্রতাপচন্দ্র নামে খ্যাত। তিনি কামিতে একটা ইংলিষ পুল এবং কলিকাতার চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তিনি বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের মেজিস্ট্রেট কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন এবং সরকার হইতে বাহাদুর খেতাব পান। ইনি ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে পবিত্র্যাগ করেন। ইহাও চারিটা পুত্র যথা গিবীশ চন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কাশ্যচন্দ্র, এবং শরৎ চন্দ্র। ইহাও অল্পকাল জীবনচন্দ্র ১৮৬৩ খ্রীঃ একমাত্র পুত্র চন্দ্রচন্দ্রকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। লালাবাবুর জমিদারী ইচ্ছাচন্দ্র ও তাহার তিনটা খুদাতাত-পুত্রদিগের মধ্যে বন্টিত হয়। মথুরা জেলার জমিদারীর খাজনা ৭৬, ৭৩৮ টাকা। ইহা হইতে গভর্ণমেন্ট ৪২৪২৬ টাকা রাজস্ব লয়েন। যখন জমিদারী ক্রয় করা হয়, তখন তাহার মূল্য ছিল ২৪০১২০ টাকা; এখন ৩৮০৪১২ টাকা।

শ্রীচৈতন্যকুমার দেবী।

জীবন-রাগিনী ।

জীবন-রাগিনী কি ? কেনই বা বাজে, বাজার কে, শ্রোতাই বা কে ? কখনই বা এ রাগিনী বাজে ? কত কথা, কত প্রশ্ন ! এর সমাধান কোথায়, তা ত জানি না। জীবন জানি, সুখ দুঃখ আশা নিরাশা হাসি কান্নার ভিতর দিয়ে তাহার নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত নির-বচ্ছিন্ন চলে ; কি হাবর জন্ম, কি চেতন অচেতন, সকলে যে নিয়তির চক্রে বাঁধা—জীবনও সেই চক্রের আবর্তে ঘুরিতেছে ও তার সমাপ্তি—সেই বতরুকু তার আয়ু, তাহার পর আরো আছে কিনা, তাহা জানা যায় না। ‘সারা জীবন’ কথাটা শুনে যত বড়, জীবনকে তত বড় করে ব্যাপ্ত করে ক’জনে খাটাইতেছি। গোড়া থেকেই যখন ঘেটীর বা অর্থ তাহার অঙ্গুলারে না চলি সে যে অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাহাতে ভুল নাই।

তবে-এ অসত্যের মধ্যে সত্য, নিত্যের মধ্যে অনিত্য, জ্ঞেয়ের মাঝে দুজ্ঞেয় সেই অমর জীবন-রাগিনী কি করে বাজে ? সাধারণতঃ হান্সমোনিয়মের সুরে কণ্ঠ মিলাইয়া রাগরাগিনী গাহিয়া কত বাহবা লই, কিন্তু এ তো সে মূল রাগিনীর বাহিরের ছায়াও স্পর্শ করে না। সুরে যেমন কোমল-কঠিনতার তারতম্য, দিবস-রজনীর সময়ের পার্থক্য, পদ্ম ও কড়ি-কোমলের পার্থক্য বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর সৃষ্টি হয় ও গীত হয়, জীবনেরও সেইরূপ কত রাগ আছে। তৈরবী সেই অতি প্রত্যুষে আর পূরবী সেই সন্ধ্যাকালে, এই রাগে গীত এই সময়ে গাহিলে যেমন সুন্দর শোনায়, অন্য সময়ে তেমন লাগে না। সময়ের

পার্থক্যে নির্দিষ্ট রাগের কতটা পার্থক্য এই অর্থে পাওয়া যায় যে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারি। আনন্দের সময়ও সঙ্গীত মনোরম, দুঃখের সময়ও সঙ্গীত শাস্তিদায়ক। এতো সাধারণ মানব-সঙ্গীতের এরূপ পরিচয়। কিন্তু জীবন-রাগিনীর সঙ্গীত কিরূপ, ইহার তুলনায় তাহা ধারণায় আসাও সম্ভব নহে। বীণা বাজিলে পঞ্চম রাগে মুর্ছনার চাপে যে ব্যক্তার উঠে সে তো শুধু ব্যাকবের অঙ্গুলির স্পর্শের নয়। তাহার অঙ্গুলি কেন, সনত্ত প্রাণ-মনই সেই সেই চালনার ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে চায়। যে বীণী বাজায় সে কাল সময় সকল ভুলিয়া ভিতরের হৃদয়কে টানিয়া জোর দিয়ে বাজায় তবে তো বাহিরের অমন স্বর হয় যে, মানুষ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। যদি সাধারণ বাদ্য ও সঙ্গীতের এত মাদকতা, এত মহিমা, সেই অমর জীবন-রাগিনীর সৌন্দর্য্য কতদূর তাহা আমরা প্রবণে হীন বলিয়া শুনিতে পাই না বা উপলব্ধিও করিতে পারি না। সাধারণ সুরের রাগিনীকে আরো পবিত্রভাবে গাহিয়া জীবন-রাগিনীকে বাহির করিতে হয়। সুরের রাগিনীতে যেরূপ তৈরবী, গান্ধার, সিঙ্ক, খাম্বাজ ইত্যাদি আছে, জীবনের রাগিনীতেও তেমনি সুখ দুঃখের রাগিনী—আশা নিরাশার রাগিনী, শোকের আনন্দের রাগিনী হাসি, ও কান্নার রাগিনী আছে।

কখন এই জীবনরাগ বাজে ?—আর কেন বাজে ?—এর আলোচনায় যত প্রবেশ করা যায় তত বেশ আলোচনা আরো পাঠ্য হইয়া

উঠে । Merchant of Venice Loren-
zoর মুখে শোনা যায় যে, স্বর্গীয় দেবদুত্তেরা
দিবারাত্র অমর রাগিণীতে সঙ্গীত করিতেছেন ;
আমরা কিন্তু দিবারাত্র স্বার্থমোহে, পার্থিব
মুখে, মরজগতের ব্যাপারে এতটুকু অধিকৃত
যে সে সঙ্গীত আমাদের কর্ণের মধ্যে প্রবেশই
করে না । ঐ যে নির্জন গহনে গভীর সাধনে
মগ্ন জিতেন্দ্রিয় যোগী, যিনি জগতের সকল
সম্পর্কহীন, যেখানে সংসারের কোন ঝঞ্ঝাটের
শব্দ নাই বা ইন্দ্রিয়ের সহিত পরিচয়ের তাহার
দাস হইয়া জীবন কাটাইবার প্রলোভনের
অবসর নাই—সেখানেই সেই তপস্বী কেবল
সেই অমর সঙ্গীত শুনিতে সমর্থ ।

আমাদের জীবনরাগিণীও কত বেজে
যাইতেছে, গিয়াছে ! তাহা শুনিবার মত
অবসরও নাই, নিজেরা এতটুকু অল্পপন্থক !
সে যোগ্যতা থাকিলে তো সে রাগিণী শুনিল ।
ঋদ্ধার দ্বিগুণ বেজে যায় রাগিণী কখন কোন
সময় থেকে, তাহা মানুষ জানে না । যখন তাহা
তাহার কর্ণের ভিতর গেল, যখন সংসারের
আবর্তে প্রবর্তার হারাইয়া ভগ্নতরীর ন্যায় মন
এদিক-ওদিকে লক্ষ্যহারা হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়,
যখন শোকের পর শোকের আঘাতে সকল
অবলম্বন, সকল প্রিয়কে চারাইয়া ছদয়-তন্ত্রী
ছিন্ন হইয়া যায়—যখন পার্থিব ঐক্যের
অসারতা বুঝিয়া বীতরাগ হয় মন, যখন
কপটতার, খলভার ঘাত-প্রতিঘাতে মন নির্যত
জর্জরিত হইয়া উঠে—সব দিকে এক্রূপে
নিপীড়িত যখন মানবমন সার সেই ভগবানের
চরণে কঁদে পড়ে, তখন তাহার জীবন-রাগিণী
পূর্ণ মাত্রায় বেজে তাহাকে জাগ্রত করে দেয় ।
সে রাগিণী আমাদের জীবনে বাজান সেই

গীতবাদ্যকার যিনি ঈশ । ইহা জীবনে যখন
শোনিবার মত যোগ্যতা আসে, তখনই শোনা
যায় । তখন সেই শোকের মধ্যে গাণ অমর
রাগিণীতে গেয়ে ওঠে তাঁহাই বসনা । মাদ্রাস
বন্ধন ছিন্ন হলে, মন যখন ফাঁকা হয়ে যায়, তখন
সকল সময়েই মন যেখানে চাবানো প্রিয়জনবা
আছে সেই উদ্দেশ্যে ধার, তখন জীবন-রাগিণী
বাজিয়ে কাণের মধ্যে প্রবেশ কবে আর বলে
“এতদিন কোন পথে চলেছিলে এবার দেখ
কোথায় যাও ।”

এ যে অমর জীবনের রাগিণী ; এতো সে
বাতিরবে সেতাবের রাগিণী নয় ! এর তালের
মানের ক্রটিই বা কি ত আর বেতালই বা কি ?
মনের পরিবর্তন হিসাবে এ রাগিণী বাজিলে,
যত জড়মেহের আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইতে
পারিবে, ততই বিদেহি-ধামের অমর রাগিণী
জীবনে বাজে । কেন বা ইহা বাজে ? না
বাজলেই বা কি হতো ?

নাই যদি এই জীবন-রাগিণী বাজিত,
নাই যদি বিশ্বপতি এ রাগের সঞ্চার ছদয়ের
ভিতরে দিতেন, তবে কখনো কি সে “শান্তি”
বলিয়া বস্ত্র পৃথিবীতে থাকিত ? যে পতি-
পুত্রহারা ভ্রমিণী নারী, যাচার নরনের জল
সঞ্চল, আর ভগবানের করুণা পাথের, তাহার
“শান্তি” এইখানে তো, এই জীবন-রাগিণীর
বাজান তানে !—সে জড়মেহে ইন্দ্রিয়-বিন্যস্ত
হইয়া বিদেহীর রাগিণী শুনিতে পার নিজে
জীবনে ।

এই অমর রাগিণীর উপলব্ধি কখন কোন
শুভক্ষেণে হয়, তাও যদি জানিতাম ! আশ্চর্য
সঙ্গে পরমাত্মার মিলনে সে সম্যক বিকশিত হয়
তাহা নিঃসন্দেহ । কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষ যোগ-

সাপনেনে এত পবিত্রও হয় যে, সে অজ্ঞদেহধারী হইলেও বিদেহীর মত সকল জন্মের রাগিণী তনিত্তে পায়। বাজান সেই বিশ্ববাজের মালিক যিনি ! শ্রোতা ধনা সেই মানব ! যার মনের এত উৎকর্ষ আছে যে, সেই অন্তর্গামীকে ধ্যানের ধারণায় আয়ত্ত করিতে পারে ও নিজের জীবনে তাঁহারই প্রেমের সঙ্গীতের রাগিণী বাজিলে শ্রবণ করিতে পারে !

এ জীবন-রাগিণীতে পদাও বাধা নাই। সুখের সময় দয়ালের দয়া শ্রবণ করে, সুখ তাহার দান মনে করে, সুখের রাগিণী বাজে ; আর মনও তাহার সহিত গাহিয়া উঠে ! চতুর্থে নিরাশের ঘাতেও সেই বিষাদ-রাগিণী বাজে। মন জানে বাহিরের সুরের সহিত ইহার কত প্রভেদ, এ বিষাদও কত শাস্তিদায়ক ; আর জানেন অন্তর্ধামী। নিস্তরু রজনীতে পাতচিহ্নে কোল দিন যদি ভগবানের নাম

শ্রবণ করা যায়, মনে হইবে বৃষ্টি বা প্রকৃতির সকলই তাঁহাকে মনের সহিত যুক্ত হইয়া শ্রবণ করিতেছে ! তখনই এ রাগিণীর নীরব শব্দের তান কিছুক্ষণের জন্য পাওয়া যায়। কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তমাত্র ; পরক্ষণেই মন অন্ত চিন্তার মগ্ন। দেবতার সঙ্গীতের সঙ্গে জীবন-রাগিণীকে বাজাইতে পারিলে সার্থকতা যে চরম, তাহা জানি, কিন্তু সে পুণ্য কোথায় ? কয়জনেই বা তাহা পারে ? সে একাগ্রতার শক্তিও নাই, সে ধ্যানের গাঢ়তাও নাই। যদি পূতমনে সমাহিতচিত্তে সারা জগৎ-মাঝে নিখিল দেবের রূপ দেখার মত যোগ্যতা আসে, সেইদিনই মাত্র জীবনের রাগিণীকে যে তাঁহার অমর বীণাধ্বনির প্রতিশব্দের ভালে বাজানো যাইতে পারে, এ সত্য তখন পাওয়া যায়।

শ্রীমণিকা রায় চৌধুরী।

দম্পতি ।

শরীরে জ্বরে মমে পরাণে আত্মায়
ধরমে করমে আর ভাবে ভাবনার
হু'জনে হু'জনা মাঝে হরে একাকার
খুঁজে দেবতার পদে ঠাই আগনার !

সংসার-মরুর বুকে পাত্তি' খেলাঘর
হু'জনায় বুকে জাগে এক মধু স্বর,
হুখে হুখে রোগে শোকে হরবে রাখায়
আলোকে আধারে কিবা আশা-নিরাশার !

পিতা মাতা সখা গুরু দৌহার হু'জনে
দৌহার সর্বস্ব দৌহে জীবনে মরণে,—
দৌহাকার মেহ প্রেম প্রীতি আত্মদান
মরতে লইয়া আসে অমৃত-সন্ধান।

মিলিত যুগল নদী সাগর সঙ্গমে
লোক-লোকান্তর প্রাণি' জনমে জনমে !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

সংবাদ ।

১। সংপ্রতি লাল গঙ্গারাম হিন্দু ও শিখ বিধবাদের শিক্ষা-শিক্ষালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে লাহোরনগরে লোয়ার মলে একখণ্ড জমি গবর্ণমেন্টকে দান করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট এই মহৎ দান গ্রহণ করিয়াছেন এবং দাতার অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিবেন এই সুসংবাদ প্রচার করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে সাধারণ ও শিক্ষার নিমিত্ত ৮০টি হিন্দু ও শিখ বিধবা স্থান পাইবেন।

২। বাণীগঞ্জে ৪৬ নং ঝাউতলা গোটে ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল মহিলাদিগকে বিনা ব্যয়ে চরকায় সূতাকাটা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ডিসেম্বর হইতে শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ হইবে। যাহারা এই সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন, তাঁহারা পূর্বোক্ত ঠিকানায় সেক্রেটারীকে পত্র লিখিবেন।

৩। ঢাকাবিভাগের ইনস্পেক্টর মিঃ বিস সংপ্রতি বরিশালে গমন করিয়া তথায় বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক নিয়মশিক্ষা-প্রবর্তনে ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন হইবে তাহার তদন্ত করিয়াছেন।

৪। আগামী জানুয়ারী মাস হইতে হেষ্টিংস সুল উদ্বিগ্ন হইবে। ইহা বার অত্যধিক, কিন্তু ছাত্র সংখ্যা অত্যন্ত হওয়ায় গবর্ণমেন্ট ইহা উঠাইয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন।

৫। ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু এই আদেশ করিয়াছেন, যাহারা অল্প পেন্সন পান তাঁহাদের পেন্সন বৃদ্ধি করা হইবে।

৬। মনীষাসম্পন্ন সুপরিচিত অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ দীল মহাশয়

মহীশূর রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে অফিস চালাইয়া নিযুক্ত হইয়াছেন।

৭। এখন এক বংসর করিয়া টাইবোপীয় এবং এক বংসর করিয়া দেশীয় বাস্তব সেবক পদে নিযুক্ত হন। পিক্‌ফোর্ড সাহেব সেবক ছিলেন। তাঁহার স্থানে ডাক্তার বায় শ্রীযুক্ত চুলিলাল বহু বাহাদুর এলাহ কলিকাতার সেবক নিযুক্ত হইয়াছেন। মাদ্রাজে এবার রাও সাহেব মুখিয়া এস্ট সেবক নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮। “নিউ এম্পায়ার” সংবাদ দিতেছেন, বঙ্গের গবর্ণর লর্ড বোথলেমের এডিকং কাপ্তেন হসকেট স্বল্প বিহায়ে নব নিযুক্ত গবর্ণর লর্ড মিংহেম এডিকং নিযুক্ত হইয়াছেন। নিউ হাইব্রেন সিনিয়র এডিকং এবং টেনিট-গবর্ণরের মিলিটারী সেক্রেটারীর কার্য করিবেন। স্বল্প মিলিটারী বাণিবাদি অধিকার কেবল বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বঙ্গের গবর্ণরের আছে। বিহায়ে গবর্ণরের স্বল্প মিলিটারী সেক্রেটারী বাণিবাদি অধিকার নাই। তাই বিহায়ে গবর্ণরের সিনিয়র এডিকং মিলিটারী সেক্রেটারীর কার্য করিবেন।

৯। ব্রহ্মদেশের খাওয়াডী জেলায় জিগোন মহাব জনসাধারণের এক সভায় স্থির হইয়াছে, ব্রহ্মদেশে গোহত্যা বন্ধ করিতে হইবে। কারণ, গোবক্ষ্য ব্রহ্মদেশের যথেষ্ট উপকার হইবে। সভা সমগ্র ব্রহ্মবাসীকে গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

প্রণাম ।

পুত্রশোক কীদে মাতা
ধরাভলে লুটিয়া লুটিয়া,
তখন আসিয়া যিনি
আখিজল দেন মুছাইয়া—
মা বলে ডাকিয়া তাঁর
লাধিবিতে তান হৃদিভার,
চরণকমলে তাঁর
শত কোটি প্রণাম আমার ।
প্রাণে সাজানো মেঘ
স্তরে স্তরে আকাশের গায়,
অবিরত বারি করে,
পথ বাট সবি ভেসে যায়,
গৃহহারা ভিজিতেছে,
দেখে প্রাণে দয়া আসে বীর,
চরণ কমলে তাঁর
শত কোটি প্রণাম আমার ।

পৌষ মাসে ঘরে ঘরে
কাটা ধান রাপিছে তুলিয়া,
জানমুখে উপবাসী
সেই দিকে রয়েছে চাহিয়া ।
যিনি বুঝিবেন মনে
কত ব্যথা মরমে তাহার,
চরণ কমলে তাঁর
শত কোটি প্রণাম আমার ।
অতীতের স্মৃতিগুলি
স্বপ্নতনে হৃদয়ে ধরিয়া,
অভাগা পতিত কীদে
অনুতাপে জলিয়া জলিয়া ।
তখন আসিয়া যিনি
মুছাইয়া দেন অশ্রুধার,
চরণ-কমলে তাঁর
শত কোটি প্রণাম আমার ।
শ্রীমতী চাক্ললতা দেবী ।

বড়র বিপদ ।

বড় গাছে বড় লাগে ভেঙে যায় ডাল,
ছোটর নাহিক ভয় নাহিক জ্ঞান ;
চাঁদেরে প্রাসরে রাহ তারদলে নয়,
কষ্টিতে সোণার কষ্ট পিতলে কি ভয় ?
সরোবরে চার ফেলে বোহিতের তরে,
পুটির কি ভয় তার—তাহে নাহি ধরে ;
ব্যাধবাণ পক্ষী হত, পতকে কি ভয়,
শাদ্দিল শিকারী-ভীত, ছাগশিশু নয় ;

তুফানে তরীর ভয়, ডিক্রি যায় চলে,
বড়র সদাই ভয় এ মহীমণ্ডলে ;
গুরুর সদাই ভয় শিষ্য হিত তরে,
পুত্রের মঙ্গল হেতু পিতা তেবে মরে ;
রাজার নাহিক নিদ্রা নিশা কেটে যায় ;
প্রজার কি ভয় তার নিশ্চিত নিদ্রায় ?
বড়র বিপদ তাই সদা ধরাভলে ।
ছোটর নাহিক ভয় স্মৃতি বার চলে ।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ ।

৫৮ বর্ষ

বামা বোঝনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭-৭৮ ডিসেম্বর, ১৯২০।

সূচী

১। তোমার হাসি (কবিতা)	ঐনুল হক	২০
২। জীবন শিক্ষা (উপন্যাস)	ঐনুল হক	২১
৩। প্রতাপ (কবিতা)	ঐনুল হক	২২
৪। দণ্ডবৎ (কবিতা ও স্বপ্ন লিপি)	ঐনুল হক	২৩
৫। জীবন মূল (উপন্যাস)	ঐনুল হক	২৪
৬। প্রেম (কবিতা)	ঐনুল হক	২৫
৭। হিন্দু ভাষা-নিচর	ঐনুল হক	২৬
৮। সে-দিনের গাথা (কবিতা)	ঐনুল হক	২৭
৯। বিবিধ সংবাদ	ঐনুল হক	২৮

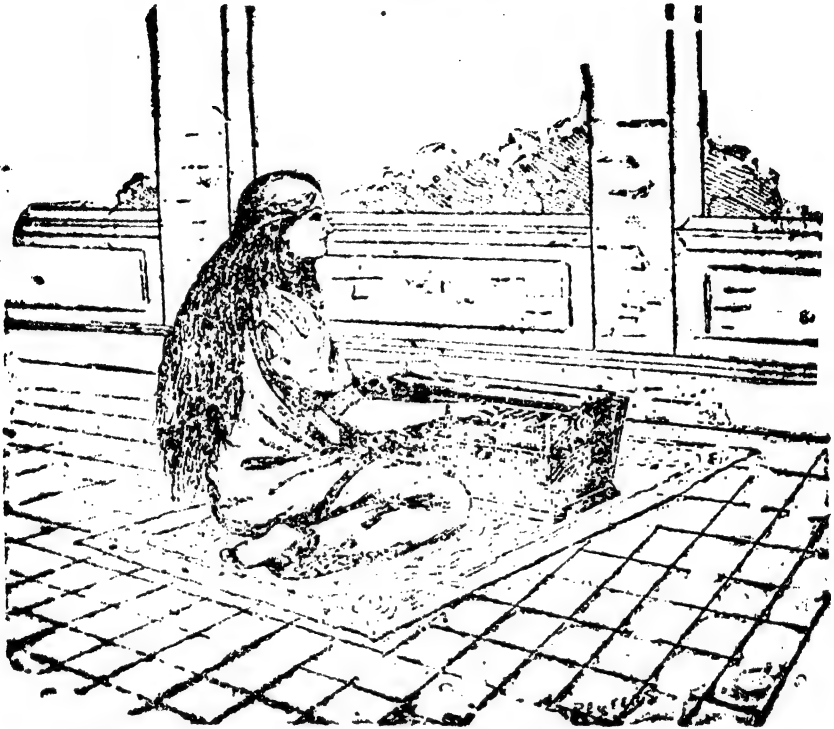
৫০ নং বামা বোঝনী বোন স্ট্রিট, কলকাতা প্রেসে ঐ. অমৃতচরণ বোন কর্তৃক মুদ্রিত ও
ঐনুল হক সম্পাদক কর্তৃক ৩৯ নং হেটমীথগান বোন স্ট্রিটে প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ বার্ষিক মূল্য ২/০; অগ্রহায়ণ বার্ষিক মূল্য ১/০;

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ১০ (দশ পয়সা) মাত্র।

ভোরাক নৈর বাসে সারসঙ্গী ।

বাজারে জিনিষের মত নয় ।



বাস হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০, ও ২৫ টাকা ।

২ সেট রিড মূল্য ৩০, ৪০, ৪৫, ৫০, ইহঁতে ১৫০ টাকা পর্য্য

ফোর্ডিং অরগেন—মূল্য ৩০, ৫৫, ৭০, ৭৫ ও ১০০ টাকা ।

বেচনা—মূল্য ৫, ১০, ১৫ ও ২০ ইহঁতে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০, ১৫, ২০, ২৫ ও ৩০ টাকা ।

বন্দরাজ—মূল্য ১৫, ২০, ২৫, ৩০ ও ২৫ টাকা ।

পত্র ছাপেরে সহস্র কক্ষ পালবস্ত্রের এলিকা পাঠান হয়।

ভোরাকিন এও মন,

১১ নং ডাকঘর পি. ডাকঘর, কলিকাতা ।

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 688.

December, 1920.

“কন্যাপোষং পালনীয় শিক্ষণীয়াত্মকতঃ ।”

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নেব সহিত শিক্ষা দিবে ।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত ।

৮ বর্ষ ।
৬৮ সংখ্যা ।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ । ডিসেম্বর, ১৯২০ ।

১২শ বর্ষ ।
১ম ভাগ ।

তোমার হাসি ।

আমি যখন আকাশ পানে চাহি,

তুমি হাস ;

নিশীথ-বাতের তাবাব সনে গাহি,

তুমি হাস !

কাজের-মাঝে হঠাৎ যখন বাজে

তোমার নামটি আমার বুকের মাঝে,

তুমি আড়াল হ'তে মুখ বাড়িয়ে বল—

‘আমার ভালবাস ।’

ভুবন-জোড়া মোহন মেলা মেলে’

বলে আছি,

প্রেমের বথন একটি প্রদীপ জ্বলে—

তুমি হাস !

ঐনির্মলচন্দ্র বড়াল ।

লীনার শিক্ষা ।

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

(৮)

গিফ্টা হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে, পাস'র্ন লীনার সঙ্গেই আসিলেন ; কুঠির কাছাকাছি হইয়া বলিলেন, “তা হ'লে আপনি এবার যান, মিঃ পিকক্, বোধ হয়, এতক্ষণ শিকার শেষ করে ফিবেছেন। আমি আর এখন গিয়ে আপনাদের জালাতন করব না।”

হঠাৎ খুঁজে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া লীনা বলিল, “এমন করে উল্টা চাপ লাগাবেন যদি, তা হ'লে বল-প্রয়োগ করে নিয়ে যেতে বাধ্য হব, তা বলে দিচ্ছি কিন্তু !—”

উচ্ছ্বসিত কোতুকে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া পাস'র্ন বলিলেন—“বলেন কি, বলেন কি !—আপনি চঠাৎ রাতারাতি এমন কুস্তি-গীর পালোয়ান হয়ে পড়েছেন যে, আমার ওপর বল-প্রকাশ করতে চান ? অবাক করে দিলেন যে ! কিন্তু না না,—সত্যি বলছি, সত্যি বন্ধু, গেয়ে দেয়ে আজ এখন আমার থানিক ক্ষণ পড়াশুনোর মাঝে ডুব মুরতে হবে, তা পর মিশন স্কুলের কাজে ছুটতে হবে, জানেন তো ? ‘Good luck to you both’. (আপনাদের সময় আনলে কাটুক।) বিদায়।”

‘Good luck t' ye, Miss’, বলিয়া হাসিমুখে বিদায় লইয়া লীনা কুস্তিতে ঢুকিল। পাস'র্ন চলিয়া গেলেন।

বাগেওয়ায় জুমন অপেক্ষা করিতেছিল।

সকাল বেথিয়া সে সসন্মমে সেলাম করিয়া
একটা টানিয়া পুলিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া

দাঁড়াইল। চলিতে চলিতে লীনা বলিল,
“সাহেব এসেছেন ?”

জু।—জী, না।

লী। কখন আসবেন বলে গেছেন
কিছু ?

জু। কিছু না, হজুর।

অজ্ঞাতেই লীনার চলন্ত পা-দুই খানা
আড়ষ্ট ও নিশ্চল হইয়া গেল। মুহূর্তকাল গুরু ও
নির্ঝাক থাকিয়া কম্পিত স্বরে সে আবার
বলিল, “কিছুই বলে যান নি ? কোন কথাই
না ? কোন দিকের জঙ্গলে শিকার করতে
গেছেন, তাও বলে যান নি ?”

লীনা নিজে ব্যুত্রে পারিল না, কিন্তু
সেই নিয়ন্ত্রণীর আশঙ্কিত মূর্খ ভূতাতা ব্যুত্রে,
—সেই ক্ষুদ্র প্রশ্ন-কয়টার মধ্যে কতখানি
বাকুল-কাতরতা আত্মপ্রকাশ করিল !—
মাটির দিকে চোখ রাখিয়া ক্ষুদ্র স্বরে ভূত
উত্তর দিল, “নেহি জনাব, কুচ নেহি।”

লীনা আন্তে আন্তে আসিয়া বসিবার ঘরে
ঢুকিল। একটা সোফার উপর আড় হইয়া
পড়িয়া ভ্রূহাতে কপাল চাপিয়া ধরিয়া সে
নিঝুম হইয়া ভাবিতে লাগিল। কোন
কথাই বলিবার অধিকার নাই তার !
প্রকাণ্ড অজ্ঞায়ের বিরুদ্ধে একটা অমু-
নয়ের আবেদন জানাইবার অধিকার পর্যন্ত
নাই,—এমন অক্ষম ! ভ্রূহাগের বোকা
ঘাড়ে লইয়া সে পৃথিবীর মাটির উপর দাঁড়াইয়া
আছে !—উচ্ছ্বল-দাঙ্গিকতার দর্পে ‘দিশে-
হারা’ হইয়া ঐ যে মানুষটি নিজের খেরালের

হৃদয়ে মাতিয়া, পত্নীকে প্রচণ্ড অবহেলা করিয়া চলিই তাঁহার পৌরুষের একমাত্র অকাটা প্রমাণ তাঁহারই রাখিয়াছেন,—তাঁহার শরীরের অনিষ্টকারিণী, মনের অবনতি-কারিণী যথেষ্টাচারিতার বিরুদ্ধে কথিয়া দাঁড়াইবার মত জীব কর্তব্যের অধিকার লীনার কোথায় ? ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা সকলের পক্ষে অব্যাহত থাকা প্রার্থনীয় । কিন্তু এই স্বাধীনতার ব্যতিচার, উচ্ছৃঙ্খল যথেষ্টাচার, এর বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অধিকার,—সেটুকু পত্নী বলিয়াও কি তাহার প্রাপ্য নয় ?

লীনার মনে পড়িল, পিককের অতীত জীবনের ইতিহাস ।—তিনি উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ-ছিলেন, কিন্তু বাপ-মার শাসন-শৈথিল্যের দোষে অল্পবয়সেই কুসংসর্গে মিশিয়া বিষম উচ্ছৃঙ্খল, দৌরাভ্যাপরায়ণ হইয়া উঠেন । মতের বৃদ্ধ বয়সেই এমন কিছু কাণ্ড করিয়া বসেন, যাহার জন্য পিতা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন । সুবোধ পুত্র ব্যতিরিক্ত হইবার সময় পিতার কিছু অর্থ লইয়া মায়ার পাড়েন । পিতা মাজাজ গভর্ণমেন্টের অধীনে কি একটা বড়দের কাজে নিযুক্ত ছিলেন ; সপরিবারে সেইখানেই থাকিতেন । পিকক ছিলেন তাঁহার ভোঁট পুত্র ।

লেখাপড়া শিখিয়া, টাকাব উপায় করিয়া পিতাকে জল করিবার সাধু সঙ্গ-আঁটিয়া পিকক সটান বিলাত চলিলেন । সেই জাহাজে লীনার পিতা ব্যাবিষ্টার শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভগ্ন-স্বস্ত্যের উন্নতির জন্য বিলাত ঘাইতেছিলেন ; সঙ্গে ছিলেন তাঁহার ইটালিয়ান-সুন্দরী পত্নী—লীনার মা, এবং দুই মেয়ে—বড়

হেলেনা, ছোট লীনা । লীনার বয়স তখন বছর বারো ।

ধৃষ্টতা ও চাতুরীবলে লোক ভুলাইতে পিককের অসাধারণ দক্ষতা ছিল । নানা-চলে এই ধনী পরিবারের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিলেন, এবং নিজেও প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া, বড় বড় কথাই চটকে লীনার পিতাকে ভুলাইয়া পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন, তিনি একজন মৃত লক্ষপতির একমাত্র সন্তান । পিতা মরিবার সময় কিছু দেনা রাখিয়া মারা যান, সে-জন্য পাণ্ডনাদারগণকে তিনি স্বেচ্ছায় উদারচিত্তে সম্পত্তির আর ছাড়িয়া দিয়া কায়ক্লেশে উপার্জন করিয়া লেখা পড়া শিখিতে বিলাত চলিয়াছেন ।

পিককের সুন্দর প্রিয়দর্শন চেহারাটি ছিল তাঁহার দোষ ঢাকিবার অমোঘ অস্ত্র । বিচক্ষণ ব্যাবিষ্টার শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে ছেলেটিকে বিশ্বাস করিলেন, এবং পিকক যদি খনি-বিদ্যা শিখিয়া গিয়া ভারতবর্ষে তাঁহার নতুন-কেন্দ্র করিলার খনিগুলির তত্ত্বাবধান-ভার লইতে রাজী হয়, তবে তিনি মাহিনা বাবদ পাঁচ বছরের পড়ার খরচ পিকককে অগ্রিম দিতে রাজী আছেন, সে কথা জানাইলেন । পিকক উৎসুকচিত্তে স্বীকার করিলেন ; বড় লেখা হইল, টাকাও দেওয়া হইল । তাহার পদ ভাহাজ হইতে নানিবার পূর্বেই পিকক কে জানে কি নজর কিশোরী হেলেনাকে মুগ্ধ ও বশীভূত করিয়া একেবারে বিবাহ-পণে রাখিয়া ফেলিলেন ।

চট্টোপাধ্যায়-পরিবার ইটালী গেলেন । পিকক ইংলণ্ডে গিয়া সেই টাকা লইয়া নির্দিষ্ট-কালচিত্তে সিভিল সার্ভিস পড়িতে লুটিলেন ।

তাগ্য পিককের সহায় ছিল, তাই মিথ্যা চাতুরী প্রকাশিত হইবার আগেই লীনার মাতা পিতা মারা পড়িলেন। পিতার পাকা উইল ছিল,—‘সম্পত্তি দুই কন্যা ও ভাগিনের সমান ভাগে পাইবে; যদি অপুত্রক অবস্থায় কোন কন্যা মারা যায়, তাহার অংশ অন্য কন্যা পাইবে। আর যদি এইজন্যেই অপুত্রক অবস্থায় মারা যায়, তবে সমস্ত সম্পত্তি তাহার ভাগিনের মম্বথনাথ বন্ধ্যোপাধ্যায় পাইবেন।’

পিকক লম্বা লম্বা চিঠিতে প্রশংসার স্তবগান ও বিয়া ছু হইতে ফুল-বাগিকা হেলেনাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন। সিবিল সার্কিসে পিককের শেষ পরীক্ষার পরই বিবাহ হইবে; সমস্ত ঠিক ঠাক;—ছঠাং নিউমোনিয়া হইয়া হেলেনা মারা গেল।

পিককের পরীক্ষা তখন মাথায় মাথায়। পরীক্ষা দিয়াই তিনি লীনার কাছে ছুটিয়া আসিয়া “চরণতলে লুটায় পড়িবার” আবেদন জানাইলেন। লীনা তখন সতের বৎসরের বালিকা। পিককের প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমটা সে ভয় পাইল, অসম্মতি জানাইয়া সিবিনয়ে প্রত্যাখান করিল।—যে লোকটি আজ পাঁচ বছর ধরিয়া তাহার ভগিনীকে সমস্ত মনঃপ্রাণ চাপিয়া ভাল বাসিয়াছেন,—ভগিনী মৃত্যুশোক দ্বন্দ্বভেদে না জুলিতে তিনি আজ লীনার পাণি-পাণী! বিষম অদ্ভুত ব্যাপার! লীনা কাদিয়া আঁশের হইয়া উঠিল। এ কি হৃদয়হীনতা!—

কিন্তু পিককের যে চাতুরীর কাছে লীনার রীষতা ঠিকিয়াছিল, সে-চাতুরীর কাছে লীনাকে শীঘ্রই হার মানিতে হইল। তোষা-তোষ-ওজনে মুগ্ধ হইয়া শেষে লীনা মত ফিরা-লেন। বিবাহ হইয়া গেল।

মধু-চন্দ্রযাপন খুব আড়ম্বর-সহকারেই শেষ হইল। সেই সঙ্গে পিকক খুব অপ্রতিভ-ভাবে সিবিনয়ে কমা চাহিয়া, অর্দ্ধাঙ্গীকে নিজের প্রকৃত পরিচয় এবং শিক্ষা-চাতুরীর খবরটা জানাইয়া দিয়া, লীনার পিতাকে প্রতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া পরন অহুতাপের অভিনয় করিয়া তোষামোদের ছটায় লীনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অর্দ্ধাঙ্গীর কর্তব্য-সম্বন্ধে লম্বা লম্বা উপদেশ বাড়িতেও ক্রটি করিলেন না। হতবুদ্ধি লীনা নিরুপায়-ভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া লইল। লোকসমাজে স্বামীর নীচতা-গোপনের জন্য নির্বিবাদে সমস্ত মানিবিষ নিঃশব্দে পরিপাক করিয়া লওয়াই পত্নীর কর্তব্য ঠিক করিয়া ফেলিল। সে প্রাণ-পণে সেই কর্তব্য পালন করিয়া চলিল,—কিন্তু আভ্যন্তরিক-যন্ত্রণা-পেষণে লীনার সমস্ত হৃদয় পলে পলে পিষিয়া যাইতে লাগিল। তাহার অবশ্রম্ভাবী প্রতিক্রিয়া,—কিছুদিন পরেই শরীরের স্বাস্থ্য তাড়িল।—তখন লীনার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং পিকক তখন চাকরী পাইয়া সমাজের গণ্য মান্য ব্যক্তি।

শিশুটি জগতে আসিয়া যখন তাহার মাতাকে পুরাতন জীবনের সমস্ত দুঃখ-ক্রটি উচ্ছল স্নেহের স্রোতে ভুলাইয়া দিতে আরম্ভ করিল, তখন শিশুর বাবার পত্নী-প্রেমে যেন হঠাৎ শনির কোপদৃষ্টি পড়িল এবং শনির কোপটা বেচারী শিশুর উপর এমন নিষ্করণ নির্দ্দয় হইয়া উঠিল যে, শিশুর বাবার চোখের দৃষ্টি ও রসনার ভাষা হইতে অষ্ট প্রহর আক্রোশের আগুন ছুটিতে লাগিল—হতভাগ্য শিশুকেই লক্ষ্য করিয়া!—অক্লান্ত, অব্যত

নানা রকম, এবং সেগুলো লোকসমাজে
অপ্রকাশ্য থাকাই ভাল।

লীনা যন্ত্রণার অস্থির হইয়া উঠিল, স্বাস্থ্যের
ক্রম অবনতি ঘটিতে লাগিল, এবং শেষে তাহার
পরিণাম এমন হইয়া দাঁড়াইল যে চিকিৎসকেরা
স্পষ্ট জ্বরের সঙ্গে স্থান-পরিবর্তনের উপদেশ
দিলেন। চক্ষুজ্বার খাতির পিকক্ সে
বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিলেন এবং লীনার
কাতর অনুনয় ও বেদনার অশ্রু তিন ধমকে
ঠাণ্ডা করিয়া ছেলেটিকে ছিনাইয়া লইয়া
নিজের কাছে রাখিলেন। বাত্বের বন্ধু-
সমাজ শুনিল, কর্তব্যপ্রিয় স্বামীর প্রাণ পত্নীর
মঙ্গলকামনার একান্ত উৎকণ্ঠিত, তাই তিনি
পত্নীর ঝড়টি হাঙা করিয়া আদর্শ মানুষের মত
নিজের ঘাড়ে শিশুর ভার লইলেন। চারি
দিক্ হইতে হুঁশত বাহবা চারিশত ধন্যবাদ
শুনিয়া লীনার কোমল মন গলিয়া গেল।
সকলেই যেটা ভাল বলিতেছে,—সেটাকে
ভাল নয় বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার সাহস রহিল
না; সেও স্বীকার করিল, তাই ভাল!—

কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ‘মায়ের
মনটা গোপনে বিরাজ করিতেছিল, সেটার
অপরিসীম কোভের কাগা লীনা কিছুতেই
থামাইতে পারিল না। স্বামীর কর্তব্য-বুদ্ধির
ছাচে নিজের কর্তব্য-বুদ্ধিকে ঢালাই করিয়া,
এক এক সময় লীনা গায়ের জোরে ধমক দিয়া
মনকে থামাইতে চাহিত,—কিসের এ হুঁসল
ব্যাকুলতা? অশিক্ষিতা ধাত্রী ব্রহ্মর
কোলে পুত্র ‘মাদুঘ’ হইতেছে, পুত্রের
উপর চোখ রাব্বিয়াছেন স্বয়ং তাহার
পিতা!—

কিন্তু ঐ পক্ষান্ত! এখানে আসিয়াই

লীনার চিন্তা আপনা আপনি কেমন অশান্ত
অস্থির হইয়া থামিয়া যাইত।

আজও ঠিক তেমনি হইল। চিন্তা পথে
চলিতে চলিতে ঐ পর্য্যন্ত আসিয়া চাঁপ
কি যেন অদৃষ্ট চাবকের অঘাত খাইয়া উঠে
বিদ্রোহে চিন্তাহত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গৌ ভবে
পাছু হটয়া দাঁড়াইল। লীনা অধীরভাবে
সোফা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। দুয়ারের
সামনেই আরা দাঁড়াইয়া ছিল। লীনার
মুখপানে চাহিয়া সে ভয়ে ভয়ে বলিল, “চক্ষুর,
ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।” পাশেই একটা
টেবিল ছিল, সেইটার উপর ভর দিয়া লীনা
শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, “নিয়ে এস।”

আরা চলিয়া গেল। একটা চেয়ার
টানিয়া লীনা বসিয়া পড়িল। বাবেণ্ডার
দিকে কাচের জানালাব পাশ দিয়া জুমন কি
একটা কাজে যাইতেছিল। লীনা হঠাৎ বাগ
কণ্ঠে ডাকিল, “জুমন জুমন!”

“জী” বাগরাই হাতের জিনিসগুলো নিয়ে
আড়ালে নামাইয়া রাখিয়া জুমন জানালা
আসিয়া দাঁড়াইল। উৎকণ্ঠা-ব্যাধী লীনা
তুলিয়া লীনা বলিল, “মার্মাস কি এখন
ইটতে লিখেছে, জুমন?”

উৎকণ্ঠমুখে জুমন বলিল, “হী মেমার, খুব!
কুটির পাশে মরদানে, কুকুর চান্দা
পেছু পেছু বেত নিড়ে তাড়া করে এমন
ছুটি করেন, সে এক জবর তামাসা! আমায়
দেয় ভারি হাসি লাগে।”

আগ্রহোজ্জ্বলমুখে লীনা বলিল, “তোমার
তাকে খুব ভালবাসো নয়, জুমন? খুব
দাও কেমন? তোমরা সবাই তার
খুসী আছ?”

সবিনয়ে ভৃত্য বলিল, “জী হাঁ। সাহেব যতকণ কুঠিতে না থাকেন, ততকণ ছোট পাছবকে নিয়েই আমাদের খেলবে আমোদ জমে। তিনি বেশ মুগ্ধিতে আছেন, মেম-সাৰ।”

অল্প দিকে চাহিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া লীনা ধীরে ধীরে বলিল, “আচ্ছা সাহেব কি—”

কিন্তু হঠাৎ নিজের মধ্যে চমক খাইয়া লীনা থাকিয়া গেল। কি জিজ্ঞাসা করিতে বাইতেছে, সে? পিতা পুত্রকে আদর-যত্ন উপবৃত্তরূপে করেন না? হাঁ তাই বটে! ধিক্, অসহ্য অভদ্র বর্ধরতা! পিতৃ-দেহের ওজন-বাচাই-সম্পর্কে, স্বামীর উপর গুপ্ত গোয়েন্দাগিরি! অস্বাভাবিক, নিম্নজ্ঞ মূঢ়তা! বৃথ নির্যোথ ভৃত্যটী না হয় কিছুই মনে করিল না, কিন্তু লীনার মধ্যে যে ভদ্র নারীঘটা রহিয়াছে, সেটা কি নিজের কাছে মিলে অপমামে ছোট হইয়া যাইবে না? লীনার মুণখান্ন লজ্জার যুগার নীল হইয়া গেল।

আয়া ওষধ-পত্র লইয়া সামনে আসিল। টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া ওষধ ঢালিতে ঢালিতে লীনা বলিল “আচ্ছা, তুমি এবার নিজের কাছে যাও, জুস্বন।”

আয়া ওষধ খাওয়ারিয়া, চলিয়া যাইতে উন্মাত হইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “সাহেব তো এখনো এলেন না, আপনার থানা কি—”

ডেরারের গিঠে হেলিয়া পড়িয়া লীনা জ্ঞানতঃ বলিল, “থাক্ এখন থাক্। তিনি এলেনই থাক্।”

আয়া চলিয়া গেল। লীনা দুইহাতে চোখ চাপিয়া ধরিয়া নিব্বন হইয়া বসিয়া গেল। দুইচোখ ভরিয়া উচ্ছ্বসিত ক্ষোভে অশ্রুজল ঠেলিয়া আসিতেছিল,—কান্না, শুধুই অর্থহীন, হৃৎকোষ বেদনার কান্নামাত্র! বড় নিকৃপায় যন্ত্রণার পীড়ন!—হা ভগবন!

শুক কণ্ঠে উপসর্গপরি চোৰ্ক গিলিয়া লীনা নিঃশব্দে হ্রস্ব উচ্ছ্বাস সামলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চারিদিকেই লোকজন,— ছিঃ, ওরা কি মনে করিবে?

(৯)

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া, পিকক্ বন্দুক ঘাড়ে করিয়া দীর মন্ডর গমনে কুঠিতে চুকিলেন। নিজের ভাইবার ঘরে গিয়া চুপ চাপ খানিকটা বিশ্রাম করিয়া, পোষাক বদলাইয়া স্নানের ঘরে চুকিলেন। তাহার পর আবার শয়ন-কক্ষে চুকিলেন। আদেশমত সেইখানেই অহাথা গেল।

লীনা নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া সমস্ত শুনিла। ঢাকর-দাসীদের সামনে বাহির হইল না। শঙ্কিতচিত্তে নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শুনিয়া গেল। বুকের স্পন্দনবেগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া কণে কণে যেন দুর্জীর অবসান টানিয়া আনিবার উপক্রম করিতেছিল। অতিকণ্ঠে প্রবল চেষ্টার নিম্নে সে সামলাইয়া রাখিল।

আয়া ঘরে চুকিয়া বলিল, “আপনার রাত্রে খাবার কি এইখানেই আনা হবে?”

লীনা উত্তর দিল “নিয়ে এস। বেশী

কিছু নয়, শুধু এক টুকরা পাউরুটী আর একটু দুধ।”

প্রতিবাদ করিয়া আরা বলিল, “সে কি? আপনি তো ও-বেলা ডিনারে বসেন নি, ‘লাঞ্চ’ও—”

উদাস-কণ্ঠে লীনা বলিল, “ভুলে গেছি, ভুলে গেছি! আচ্ছা, যা খেতে হবে নিয়ে এস।”

খাবার আনিয়া টেবিলে সাজান চইল। চেয়ারটা সরাইয়া টেবিলের কাছে গিয়া লীনা লম্বরে বলিল, “ও বাবা, এত!”

স্নেহভরা কহুড়ের সঙ্গে আরা একটা ছোট থলুক দিয়া বলিল, “এত আবার কি? বসে বসে খান, সব খাবার ফুরিয়ে যাবে। কাল রাত্রে আমি আবার ভৃত দেখেছি,—সমস্ত দিনে বলতে সময় পাই নি; এইবার বলি, শুনবেন, কেমন?”

পার্সনের কাছ হইতে বিদায় লইয়া অবধি সমস্ত দিনে লীনা আর হাসিবার অবকাশ পায় নাই। তাকে ভূতের গল্প বলিয়া ভুলাইয়া খাবার খাওয়াইতে চায় দেখিয়া, সে এবার না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। ওসর কোতুক আয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, “আচ্ছা, ভূতের সঙ্গে তোমাদের এত ভাব হোল কি করে বল দেখি? যখন তখনই ভৃত দেখেছ! মানে কি?”

আরা খুব গভীর হইয়া বলিল, “খেতে আরম্ভ করুন না, তারপর কথা হচ্ছে। আচ্ছা ভৃত বলে একটা জিনিষ আছে, এটা কি মানে নাকি?”

ষাড় নাড়িয়া লীনা বলিল, “তা খুব মানি কিন্তু বামকা অত লম্বায় ভৃত দেখতে পাওয়া

আমি সহজ বলে মনে করিনা। তারপর গল্পটা চলুক,—কটা হাতওলা ভৃত দেখেছ?”

আরা অতিরিক্ত গভীর হইয়া বলিল, “কিন্তু মাস্কাজে যে ডিপুটী কমিশনার সাহেবেব মেয়ের কাছে আমি থাকতুম,—তিনি বাতের বেলায় ভূতের ভয়ে ডবাতেন। আমাকে একদণ্ডের জন্যে কাছ-ছাড়া করতেন না।”

লীনা হাসি চাপিয়া বলিল, “তা কি করব? বল? আমার ভর্তাগা, রাত্রে কেউ থাকলে আমার মোটেই ঘুম হয় না, সে ভূতের দোহাই দাও, আর যাঁচ কর।”

আয়ার মুখখানা নিশ্চিন্ত হইয়া গেল। থানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কি একটা কথা বলিবার জন্যেই বোধহয়,—মেন ঠতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু লীনা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই থাটতে লাগিল। একটু পরে সহসা কি যেন মনে পড়ায়, লীনা চকিত দৃষ্টি তুলিয়া দ্রুত-স্বরে বলিল, “জন্মের কাছে খবর নাও, সাহেব শুয়ে পড়েছেন কি?”

আরা বাতিবে গিয়া তই মিনিট পরে কিরিয়া আসিয়া বলিল, “না, ঘুমের পোষাক পরেছেন, কিন্তু এখনো বসে বই পড়ছেন।”

লীনা অগ্রমনস্কভাবে তাড়াহাড়ি থাটতে লাগিল। খাওয়া শেষ হইতেই হাত ধুইয়া উঠিয়া গড়িল। অনেক খাবার পড়িয়া রচিল বলিয়া তারা কুম অভিযোগের উপক্রম করিতেই লীনা বাস্তবাবে বলিল, “টেবিল পরিষ্কার কবে শেষ হোল যাক, বিরক্ত কোর না এখন।”

আরা আঙ্গুর সযাপন করিয়া চলিয়া

গেল। লীনা কেমন যেন অশান্তচিত্তে, অস্থিরভাবে ঘরের ভিতর বার-কতক পারচারি করিয়া, শেষে ধীরে ধীরে স্বামীর ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ শুক থাকিয়া, একটু কানিয়া মৃদুভাবে বলিল, “আর্থার, আমি আস্তে পারি ঘরে?”

পিকক্ সংক্ষেপেই উত্তর দিলেন, “পারো।” লীনার বুকের ভিতর ধড়াশ্ ধড়াশ্ করিয়া উঠিল। তীব্র জ্বালাময় বিদ্রুপ-বিলিকের মত তাকার মনের উপর দিরা বহিয়া গেল—কাল রাত্রির সেই রুঢ় তর্কব্যবহারের স্মৃতি! একটা হর্ষিষহ ক্রেশভারে লীনার যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিল। আড়ষ্ট শুকভাবে কিয়ৎক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ধীরে ঘুরার ঠেলিয়া ঘরে ছুঁকিল।

পিকক্ চোখের সামনে একটা বই খুলিয়া ধরিয়া আর্ম' চেয়ারে আড় হইয়া পড়িয়াছিলেন। লীনা পাশ কাটাইয়া গিয়া আর একটা চেয়ার লইয়া একটু দূরে বসিল। টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা বইয়ের পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে সেইদিকে চোখ রাখিয়া শুক কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, “সমস্ত দিন অজল ঘুরে তোমার কি শিকার জুটল, আর্থার? কই, কিছুই তো আন নি।”

মুখের উপর বই আড়াল রাখিয়া পিকক্ লজ্জিতভাবে সম্ভ্রান্ত বক্র কাটাক্কে লীনার মুখের দিকে একবার চাহিলেন, তারপর বইয়ের দিকে ফিরিয়া আসিয়া সংযতভাবে উত্তর দিলেন—“আজকের দিনে তোমার বার-বারেই ভাল হয় না?”

লীনা মুহূর্তের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া

ধীরস্বরে বলিল, “তুমি আজ ডিনার নিলে কোথায়? সঙ্গে কোন বন্ধু পেয়েছিলে, কি?”

পিকক্ বেশ একটু কড়া আওয়াজেই উত্তর দিলেন, “সে সব অনধিকার চর্চার তোমার কোন দরকার নাই।”—একটু থামিয়া বইয়ের দিকে চোখ রাখিয়া পুনরায় কর্কশ কর্তৃত্বপূর্ণ স্বরে বলিলেন, “কয়লার খনির হিসাব-বইগুলো কোথা? কাল সকালে সেগুলো আমার চাই, আট-টার ট্রেনে আমি চলে যাব।”

শাস্তদৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া লীনা বলিল, “কালই চলে যাবে? এখনো তোমার দু'দিন ছুটি আছে তো?”

হাতের বইখানা সশব্দে কোলের উপর ফেলিয়া বক্র-বিরক্তির সহিত জু কুঞ্চিত করিয়া পিকক্ বলিলেন, “সে যোঁজে তোমার দরকার কি? তোমার বাবা তোমার জন্য পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড আয়ের কয়লার খনি রেখে গেছেন, তুমি তাই নিয়ে সুখ ভোগ কর। আমার জীবনাসের জীবন—দাসঘ-ময়! তোমার কি?—”

কি কথার কি উত্তর! লীনা হতবুদ্ধির মত কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বলিল, “তুমি অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছ, এখন বিদায় নেওয়াই আমার পক্ষে ভাল। কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে একবার ভেবে দেখ দেখি, তোমার দাসঘের জন্য তুমি কি নিজেই দায়ী নও? আমার বাবার পরামর্শ শুনে চললে,—”

সক্রোধে পিকক্ বলিলেন, “চুপ করে থাক। একটা কাল ইন্ডিয়ানের মেয়েকে বিবাহ করতে আমি বাধ্য হয়েছি, এই আমার

বখেই হুগার-বিবর, লজ্জার বিবর! তোমার
বাবার পরামর্শ শুনে কাজ করি নি,—সে
আমার স্বাধীন-চিত্ততার প্রমাণ।

উঠান দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে গীনা বলিল,
“উত্তম, স্বাধীন-চিত্ততা-পরিণাম—কঠোর
হাসহ তবে প্রাণনীর মনে কবাই উচিত! ওর
অন্তে আমার ওপর আক্রোশ-বর্ষণ মিছে।
আর কাল ইতিহাসের মেয়েকে বিয়ে করা—
এর অঞ্চে তুমিই সর্বতোভাবে দারী! এ
বিবাহে কেউ তোমায় বশপূর্ব্বক বাধা করে
নি।—আমি তো আত্মরিক স্বনির্ভর মনে
যাব বার-তোমার পোস্তাব প্রমাণমান করে-
ছিলাম। শপথ করে সভা বল—ই কি না?”

হৃদ্যন্ত হিংসামোহে বাধা যেমন তীব্র
শক্তিশালী ঐকজালিকের সামনে পড়িলে,
চোখ লুকাইবার জন্য ভয়ে বাস্তব হইয়া পড়ে,
পিকক ঠিক তেমনি বাস্তব মনে যোগ
নামাইলেন। গীনা সের-দিকে লক্ষ্যমান বর্ণনা
করিয়া তীব্র শ্রেয়ের করে বলিল, “তোমার
হাতের মুঠোয় পেয়ে, জ্বর হিংসার অত্যাচার
পলে পলে আমায় পিঠে মারতে শুরু করেছে?
দিনে দিনে আমার জীবন গিরি বিসময় করে
তুলছে,—সমস্ত নিঃশব্দে মহা করে ঘাচ্ছি;
কারণ, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বড়
অটল-বান্দনে বাধা! জ্বালা করে না
তোমার? আমার একমাত্র শিশু,—মার
পিতা তুমি, হিংসার আক্রোশে তাকে তুমি
আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বেখেছ।
চুপ করে সয়ে যাচ্ছি সব, কিন্তু বুক আমার
অতিমূহুর্তে যন্ত্রণার পিঠে ঘাচ্ছে না?” ক্রোধে
কোতে গীনার কণ্ঠবোধ হইয়া গেল, “আপদ-
সত্ত্ব ধ্বংস করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পিকক গীনার এ মূর্খি কলমও দেখেন
নাই, আজ প্রথম দেখিলেন। বিসম-ভীত
দৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের অস্ত্রাতই অড়িতভাবে
বলিলেন, “তুমি কি মনে কর, আমি তাকে
হত্যা করবাব? মতলবে নিজের কাছে
বেখেই?”

গীনার চোখ হইতে আগুন ঠিকরাইয়া
পড়িতেছিল। গীনা তবে বলিল, “তাব চেয়েও
বেশি আমিই তুমি করবে তার। হত্যার মান্দ্য
এদাব মার, কিন্তু নাচ-প্রস্তুতি পিতা মাতার
চাবতার আশ্রয়ে যে শিশুর শৈশবজীবন
প্রতিষ্ঠা হয়, সে চিবজীবনের মত নীচতা-পাপে,
হীনতা-মানিতে, প্রণীত অভিশপ্ত হয়ে যায়।
হত্যা, তাব চেয়ে মস্তম ওয়ে ভালা। মুহুর্ত
শেই হেতুবানের সব আশ্রয় একেবারে শেষ
করে দেয়।”

পিকক হৃদয়-নিরুতর-ভাবে অর্ধজীন ধুড়িতে
চাহিয়া রহিলেন। তাঁতার সেই উদাস বৈরাগী
এবম স্বাধিকতার লক্ষণ, কি অতিবড় জ্বর-
বান্দা মান্দ্যের স্বভাবোচ্চিক প্রবৃত্তি অগ্রাহ্য
ভাবের প্রমাণ, তা ঠিক করিয়া বলা কঠিন।

গীনা ওয়াবের দিকে অগাসব হইল,
কোকাঠের বাহিরে পা বাড়াইয়া আবার
দাঁড়াইয়া দাঁড়াইল; আমার মুখেব দিকে স্থির
দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, “স্বামী
তুমি, তোমার স্বামির আমার কাছে
পূজনীয়, ই, বখেই পূজনীয় ছিল। কিন্তু সে
সম্মান নিজের হাতে ধরাস করে স্থগিত
পতনের দখে অধিগত-জ্ঞানশূন্য হয়ে,
নিষ্কৃতাবে নিরাতন-শক্তি প্রকাশ করাই যদি
স্বানিহেব—খেচ্ছাচাব প্রবৃত্তির, একমাত্র
কঠবা বলে মনে কর, তবে,.....তবে, গী

আমি, তোমার অন্তিম নিশ্বাসে আমার রসনা অসাড় হয়ে যাচ্ছে'; কিন্তু মনে রেখো, মনে রেখো, ... একগুণে সকলের ওপর সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর বলে একজন আছেন; তাঁর ন্যায়-দৃষ্টি সকলের ওপর সমানভাবে অহরহঃ জেগে আছে। তাঁর হৃদয় বিচার কোন দাস্ত্রিকের অন্যায় দণ্ডকে ক্ষমা করে না, কখনো ক্ষমা করে না।"

পরমেশ্বরের নাম পিকক্ সহ্য করিতে পারিলেন না; জলিয়া উঠিয়া, উত্তেজিত গর্জনের সহিত মেঝের কার্পেটে জুতা ঠুকিয়া বলিলেন, "তোমার বৃদ্ধকণী রাখো। গোটাকতক বৃদ্ধক গির্জাওয়ালা আব বাচাল মিশনারী মেমের সঙ্গে জুটে তুমি উচ্ছন্ন গেছ! ধবরদার আমার কাছে বৃদ্ধকণী করতে এসো না! পরমেশ্বর করমেশ্বর তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি।—দূর হয়ে যাও।"

ঠিক কাল এমনি ছর্যাকোর গলাধাক্কা পাইয়া লীনা বিদায় লইয়াছিল, আবার আজ! মুহূর্তের মধ্যে বিমত্ভাবে দাঁড়াইয়া পাকিয়া ধীরে ধীরে পা টানিয়া লইয়া লীনা আবার ফিরিল; নিজেব পারিতোক্ত চেয়ারটার বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। পবল উত্তেজনামত্ত দ্রুত খাস-প্রাশাসেব থাকায় বৃকের পাজরগুলো যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল।

নিজেকে সামলাইবার চেষ্টায় মিনিটখানেক চুপ থাকিয়া, লীনা অকুণ্ঠিত হ্রিৎ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখ-পানে চাহিয়া বলিল, "খুব ভাল, তাই হোক! এস, আজই তাহলে এ বিষয়ের একটা শেষ দীক্ষা করে নেওয়া যাক। এই প্রতিমুহূর্তের ইতর-সংঘাতপূর্ণ ঘণিত পশু-জীবন যাপনের চেয়ে, হুজনে তফাৎ হয়ে

ভ্রাতাবে জীবন-যাপনের চেষ্টা ঢের ভাল তোমারও পারের বেড়ি খসে যাক, আমারও হাত-কড়া খুলে পড়ুক! মানুষের জীবনে,—মহুয়া-নাশি-হীনতা-বহন আর সহ্য হয় না।"

পিকক্ লীনার চোখের উপর চোখ রাখিতে পারিলেন না। অধীর চঞ্চলভাবে ছই একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, হঠাৎ ফশ্ করিয়া আলোটা নিবাইয়া দিলেন। হতবুদ্ধি লীনা কোন কথা বলিতে না বলিতে পরক্ষণেই পিকক্ তড়াক্ করিয়া উঠিয়া গিয়া বিছানার তইয়া পড়িলেন; তারপর দ্রুত-গভীরস্বরে বলিলেন, "কমলাব খনির সমস্ত দলিন-দত্তাবেজ, আয়-ব্যয়ের হিসাব কাল সকালেই আমার চাই। কাল সকালেই যেন সমস্ত পাই। সমস্ত আমি নিয়ে যাব।"

অসহ্য ক্রোধে লীনার শরীর জলিয়া উঠিল! চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তীব্র ঘৃণার স্বরে সে বলিল, "কাল-ইণ্ডিয়ানকে—প্রতারণা করে টাকা নিয়ে যে বিদ্যা শিখেছ, —কাল ইণ্ডিয়ানের মেয়ের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়টুকু এইবার সেই বিদ্যার জোরে আত্ম-সাৎ করতে চাও, কেমন? তোমার মহুয়াঘের মহিমামা ধনা হোক! অনেক সহ্য করেছে, ত্রৈ-অনেক সহ্য করার' একটা দারুণ-মানি-পূর্ণাঘণাও আমার ভেতর দিনে দিনে অসহ্য যন্ত্রণায় পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, আর নয়! তোমার সঙ্গে বিবাহিত হওয়াই মস্ত ভুল হয়ে গেছে, তার পর প্রাণপাত চেষ্টায় প্রাণান্তিক লাঞ্ছনা সহ্য করেও তোমার স্বভাব সংশোধনের চেষ্টা করেছিলাম, সেও আমার প্রকাণ্ড মূর্খতা—অপবাব! আমার স্পর্ধা মার্জনা কর। আজ থেকে এই পর্যন্ত!—"

লীনা নিজেই শয়নকক্ষে ঢুকিয়া দ্বাররোধ বেঁচে থাকতে, তোমার কোমল ভেজবালি করিল। • পিপকু মিনিট-কতক চূপ চাপ টিক্বে কি ?”
 থাকিয়া, তীব্র জিহ্বাংসা-পূর্ণ বিক্রপের স্বরে কথটা লীনার শয়নকক্ষ পর্যন্ত পরিষ্কার-
 বলিলেন, “স্নানকালে হতভাগা মাদুসি আছে কপেই পৌছিল, কিন্তু লীনার কোন উত্তর
 যে, তার সন্দেহিত্য ব্যবস্থা কি হবে ? সে পাওয়া গেল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষণায় ।

গ্রন্থকার ।

মমি আমি তব পদে ওহে গ্রন্থকার,
 জগতের পূজ্য তুমি মঙ্গল-আধার ;
 তব উচ্চ পদ হেরি এই ভূমণ্ডলে,
 মানবের হিত হয় তব কৃপাবলে ;
 অজ্ঞানের জ্ঞান দাও, উচ্চ কর মন,
 তোমার গুণের কথা না যায় কখন ;
 সৌধবাসী ধনিজনে কর শিক্ষা দান,
 তব জ্ঞানে বাড়ে তার ধনের সম্মান ;
 অজ্ঞান কুটীরবাসী তব শিক্ষাদানে,
 জ্ঞানচক্ষু লাভ করে, স্থখী হয় প্রাণে ;
 নিরাশের আশা দাও, কর বল দান,
 শোকার্তে সাধুনা দাও, সুস্থ কর প্রাণ ;
 উচিত অল্প দাও জ্ঞানজন-করে,
 প্রেমস্ত বারণ-রিপু দমিবার তরে ।
 মহাব্রত তব হেরি ওহে গ্রন্থকার,
 বাঞ্ছা সদা মানবেরে কবিত্তে উদ্ধার,
 তাহার করিতে ভাল বাস্তু সর্গক্ষণ,
 তব সম বিশ্ববন্ধ কে আছে এমন ?

• • •
 তব স্বর্ণ শোণ দিতে পারে কোন জন !
 সবাধে উদারহৃদে দাও আলিঙ্গন ;
 পরনিন্দা স্তুতিবাদে নহে চঞ্চল,
 তোমার কণ্ঠব্য-সাধা করিছ কেবল ;
 বাত্রি নাই, দিবা নাই, নাতিক আহার,
 জগৎ তোমার ছদে জাগে অনিবার ;
 তার তবে করিয়াছ লেখনী ধারণ,
 স্নান সাহিত্যমালা করিছ গ্রহণ ;
 তব মালা শিরোপথে যে করে ধারণ,
 শোভায় সুবাসে হয় পুলকিত মন ।
 ধন্য তুমি গ্রন্থকার ধন্য পবাতলে,
 মহারত পায় নব তব করতলে ;
 নিশ্চয় হলেও তুমি ধনী প্রধান ;
 তব ধনে সাধে মহা জগৎ-কল্যাণ

শ্রীভদ্রদনমোহন

দণ্ডবৎ ১

প্রভাতী—একতাল।

প্রভাতে উঠিয়া ভূতলে লুটিয়া
 হইব দণ্ডবৎ ;
 স্নান সমাপনে বসি' নিরঞ্জে
 হইব দণ্ডবৎ ।
 জপিব তোমার মঙ্গল নাম,
 সঘনে বাজিবে সুধা প্রাণারাম,
 তোমার প্রকাশে প্রতি স্বাসে স্বাসে
 পূরিবে হে মনোরথ,—
 পূজা সমাপনে একান্ত মনে
 হইব দণ্ডবৎ ।

ক্ষুৎপিপাসায় তোমার দয়ায়
 যা' জুটিবে মম ভাগে,
 তব দান বলি' তাই লব তুলি
 তোমাতে নমিয়া আগে ।
 সকল কর্মে সকল বিরামে,
 নিশ্বাস ব'বে তব প্রিয় নামে ;
 সুখে ও দুঃখে তোমার সৌখ্যে
 খুলিবে শান্তিপথ ;
 সবখানি প্রাণ করিয়া প্রদান
 হইব দণ্ডবৎ ॥

রচনা—শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ । সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ।

আঙ্গামী।

০ ১ ২' ৩
 I I {সা ঙা মা। মা পা পা I পা পা দা। না দা পা।
 প্র ভা তে উ টি য়া ভূ ত লে লু টি য়া

০ ১ ২' ৩
 I মা মা গা। সা -া ঙা I মা -া -া। -া -া ঙা।
 হ ই ব গ্ ড ব . . . ত্ .

০ ১ ২' ৩
 I সা -া সা। সা ঙা সা। I না সা না। দা পমা।
 সা ন স মা পনে . ব সি' নি র জনে

০ ১ ২' ৩
 I মা মা গা। সা -া ঙা I মা -া -া। -া -া ঙা।
 হ ই ব গ্ ড ব . . . ত্ .

অমৃত।

১ ২ ৩
I I {মা মা পা। পা দা দা I খা -ননা না। সা -না -না।
জ পি ব তো মা র ম ঙ্গ ল না • ম

• • ১ ২ ৩
I সী খী খী। খী সী সী I না সী না। দা পা -না।
স ঘ নে বা জি নে সু ধা প্রা গা গা ম

• ১ ২ ৩
I {সী গী গী। গী গী গী I সী গী ঝাঝা। ঝা স সা I
তো মা র প্র কা শে প্র তি ধা সে ধাসে •

• ১ ২ ৩
I সী সী গী। ঝা সী সী I সী -না -সী। -না -না I
পু রি বে হে ম লো র • • • থ •

• ১ ২ ৩
I {সী সী সী। সী ঝা সী I না সী -ননা। দা -পা পা I
পু জা স মা গ নে এ কা ন্ত ম • নে

• ১ ২ ৩
I মা মা গা। সা -না প্রা I মা -না -না। -না -না I I
হ ই ব দ ঙ্গ ড ব • • • ত্ •

দক্ষারী।

• ১ ২ ৩
I I {সা -না -না। মা মা মমা I মা মা পা। পা দা: -পা I
হু • ত্ পি পু পা সায় তো মা র দ দা ক

• ১ ২ ৩
I মা গা জা। সা সা ঝা I মা -না মা। -না -না I I
যা' জু টি বে ম ম ভা • গে • • •

I[মা গা কা। সা সসা I মা সা দা। মা সসা. ব।।
ত ব দা ন বনি • তা ই ল ব তুলি •

Iসা সা খা। মা মা মা I গা -না -কা। সা -না -না।
তো মা রে ম মি রা আ • • পে • •

আভোগ।

I[মা মা পা। পা -না দা I দা না না। সী সী সী।
স ক ল ক দ মে স ক ল বি রা মে

Iসী -কা কা। কা -না সী I মা সী না। দা পা পা।
নি কা স ব • বে ত ব প্রি দ না মে

I[সী গী গী। গী -না গী I মা গী গী। কা -না সী।
হ খে ও হ : খে তো মা র স উ খে

Iসী সী গী। কা -না সী I সী -না -সী। -না -না -না।
খু লি বে না নু তি প • • • •

Iসী সী সী। সী কা -সী I মা সী না। দা পা -না।
স ব খা নি প্রা ৭ ক রি রা প্র দা ন

Iমা মা গা। সা -না কা I মা -না -না। -না -না II II
হ ই ব দ নু ও ব • • • ত •

জাহাজ-ডুবি।

(১০)

অমরকুমার সীতাকুণ্ডর এটোল দ্বীপের শিক্ষকতা করিতেছিলেন। তাঁহার গৃহে কিছুদিন হইল একটা নূতন অতিথির আবির্ভাব হইয়াছে। প্রায় এক বৎসর চইল, আশালতা একটা অকুমার পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। নবকুমারটিকে লইয়া জীবনে যে কি সুখ, কি আনন্দ প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা বর্ণনা করিবার নহে। সেই অকুমার শিশু স্বর্ণের ধিমল সুখা আনিয়া মাতাপিতাকে প্রদান করিয়াছিল। শিশুর কল-তাসো অমরকুমারের সেই ক্ষুদ্র গৃহে নন্দনেরা পারিজাত ফুটিয়া উঠিত; শিশুর বাতাসে অমরকুমারের গৃহ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহের রূপের ছটায় যেন দিগন্ত পূর্ণ হইয়াছিল। ক্ষুদ্র শিশুর উজ্জল গৌরবর্ণ, আকর্ণ-বিস্তৃত কঙ্কতারকা-মণ্ডিত চক্ষু, নখর গোলাপি কপোল, ক্ষুদ্র গুঠধর, তন্মধ্যে দুই চারিটা দন্ত;—কি সুন্দর! সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তা-সদৃশ দন্ত বাহির করিয়া যখন সে কল-হাস্ত করিয়া উঠিত, তখন তাহা দেখিয়া মাতাপিতার আনন্দের সীমা থাকিত না। সে যে স্বর্ণের সুখা, নন্দনের পারিজাত, বিধাতার দান! সে ত এ পাপ-তাপময় পৃথিবীর নয়, সে স্বর্গীয়! বৈকালে স্কুল হইতে ফিরিয়া অমরকুমার যখন শিশুটিকে বকে লইয়া ক্ষুদ্র বারান্দাটিতে পদচারণা করিতেন, তখন আশালতা মনে করিত, “এই স্থানের মাটি হইয়া মিশাইয়া বাই।” ঐশ্বর্যের আড়ম্বর নাই, সংসারের বন্ধ্যা নাই, ক্ষুদ্র সংসারটি স্বচ্ছ, নির্মল, পবিত্র শান্তিরিকে তন!

আশালতা বহুতে গৃহকার্য্য করিত, স্বামীর পরিচর্যা করিত, সন্তান-পালন করিত। শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অসন্তোষ নাই, বিলাসিতার চিহ্নমাত্র নাই। ইহাদের দেখিলে কে বলিবে ইহারা একদিন অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর ছিলেন। কে বলিবে আশালতা ক্লাটোর কন্যা, ধনাটোর বধুরূপে জীবনের প্রথম অঙ্ক অতিবাহিত করিয়াছিল। পত্নীর প্রতি চাহিয়া চাহিয়া অমরকুমারের হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিত। অমরকুমার ভাবিতেন, ‘জন্ম-জন্মান্তরের বহু সাধনা-বলে এমন পত্নী লাভ করিয়াছি।’ সংসারের দুঃখ-দৈত্য কোন দিন অমরকুমারকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি যেচ্ছার সর্ব্বদা দান করিয়া রাজর্ষির ছায় সন্তোষ লইয়া অবস্থান করিতে ছিলেন। সে মহান উদার প্রশস্ত হৃদয়ের ধর্ম দিয়াও কোন দিন অশান্তি-বিষাদ উঁকি দিতে সাহস করে নাই। প্রত্যহ দুইটি বেলা বেড়াইয়া বেড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দর্শন করা এবং নিয়মিত রূপে স্কুলে গিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দান,—এই দুইটি কার্য্যই তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরে জনকতক দরিদ্র ছাত্র তাঁহার নিকটে পাঠাভ্যাস করিতে আসিত; তাহাদিগকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না; যথানিয়মে শিক্ষা দিতেন।

একদিন কোনও পক্ষ-উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ ছিল। দিবা দ্বিপ্রহরকালে অমরকুমার তাঁহার শরনকক্ষ-মধ্যে একথানা তক্তপোষের উপরে সামান্য একটি শয্যা শয়ন করিয়া-

ছিলেন। আশালতা আসিয়া-উঠার পক্ষে
বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। এমন সময়
একটা অন্ধ ভিথরী বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া
আকিল, “মাগো! অন্ধকে হুটা ভিকে দাও মা!”
আশালতা উঠিয়া এক রেকাবী চাউল ও
চারটা পয়স তাহাকে দিয়া আসিল। অন্ধ
আজ্ঞা আদির্দ্বারা বর্ণন করিতে করিতে
চলিয়া গেল। আশালতা বহির্দ্বারা কক্ষ
করিয়া দিয়া পুনর্বার অমরকুমারের নিকটে
আসিয়া বসিল। আশালতাকে একদিন
চন্দ্রনাথ পাহাড়ে লটয়া গিয়া অমরকুমার জন্ম
হইয়াছিলেন বলিয়া আর কোথাও তাহাকে
লইয়া যাঠিতে চাহিতেন না। কিন্তু আজ
আশালতা ঘরিয়া বসিয়াছে, বিরূপাক্ষদেব
দেখিতে যাটবে। যদিও চন্দ্রনাথ-পাহাড়
অপেক্ষা বিরূপাক্ষ পাহাড় অনেক ছোট,
তথাপি আশালতা পরিত্যক্তারূপের যে নমুনা
একদিন দেখাইয়াছিল, সেই কথা মনে করিয়া
আশালতার গতি-সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ করি-
তেক। যে কোমল পদযুগল কেবলমাত্র
অন্ধের গন্তীটুকু বাতিরেকে কোন দিন
সররেও পদার্পণ করে নাট, সেই অসুখাম্পা
মহিলার চরণযুগল যে কক্ষরমর উপলব্ধপূর্ণ
পার্কৃত্য পথ অতিক্রম করিতে অশক্ত হইবে,
সে বিষয়ে অমরকুমারের মনে অত্রান্ত বিশ্বাস
অভিয়া গিয়াছিল। তাই আজ আশালতার
কথা শুনিয়া অমরকুমার হাসিয়া উত্তর করি-
লেন, “বেশ নিরে যেতে রাজি আছি—কিন্তু
নিজের পায়ে হেঁটে আসতে পারবে ত?
কাউকে কাঁধে করে আনতে হবে না?”
আশালতা বলিল, “আমাকে বুঝি কেউ কাঁধে
করে নিয়ে এলছিল?”

মুহ হাসিয়া অমরকুমার বলিলেন “সেই
রকমই ত মনে হয়! গরুড়ের সাহায্য বার্মিতরেকে
নিজে যে সহজভাবে চলে আসতে পেরে-
ছিলেন, সেটার ত অসুখান হচ্ছে না!”

পরাজিত হইয়া আশালতা দৃঢ়ভাবে
বলিল, “তা আমি জানি না। একদিন আমাকে
দেখিয়ে আনতেই হবে! নিজের সোজ
যাওয়া হয়, আর আমি বুঝি একটা দিনও
বিরূপাক্ষদেব দেখতে পাব না?”

অমরকুমার বলিলেন, “সেটা বড় আক্ষে-
পের বিষয় সন্দেহ নেই!” বলিয়াই তিনি
উঠার নিমিত্ত শিশুটির দিকে চাহিয়া বলিয়া
উঠিলেন, “ওঃ—ছেলেটা যে বড় সুসুখে!”
বলিয়া নিমিত্ত শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন।
আশালতা কৃত্রিম কোপসহকারে বলিল, “বেশ!
সুস্থ ছেলেটাকে তুলে, কান্দলে পরে তুমি
ভুনিও, আমি পান্ন না!”

সহাস্যে অমরকুমার বলিলেন, “ছুটির বেলা
নাট ঘুমোও একদিন, রোজই ত ঘুমোয়!”
নাড়া পাইয়া থোকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু
সে ক্রন্দনের কোন লক্ষণই দেখাইল না। পিতার
বক্ষের উপর শয়ন করিয়া মাথা তুলিয়া পিতার
মুখ দর্শন করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া
উঠিল। অমরকুমার গুরুত্রে আদর করিতে
লাগিলেন। আশালতা অমরকুমারের গাত্র
স্পর্শ করিয়া বলিল “বল্লে না নিয়ে যাবে কি
না?”

অমরকুমার বলিলেন, “আচ্ছা, হুকুম বধন
হয়েছে, তখন অবশ্যই ভামিল হবে তার অস্ত্রে
আর ভাবনা কি? কিন্তু থোকাকে নেবে
কে?”

আশা। কেন?—তুমি।

অ। ভাল, তাই হবে।

এই বলিয়া অমরকুমার আবার খোকার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। এমন সময় হাৰে কে কথাবাৰ্ত কৰিল। অমরকুমার বলিলেন, “দেখতো খোকারে; ছেলেরা বেশ হয় পড়তে এসেছে। দোটা খুলে দি’র আসি।” অমরকুমার উষ্ণতা বহির্বিজ্ঞা গুলিয়া দিলেন, দেখিলেন, তাঁহার ছাত্র-বর্গ নহে, তাঁহার ভূতপূৰ্ণ ভূতা কানাই! অমরকুমারের বিশ্বাসের সীমা রহিল না। আশ্চৰ্যান্বিত হইয়া বলিলেন, “কি বে তুই এতদিন পরে আজ চঠাং কোথা থেকে এলি!”

কানাই তাহার হস্তস্থিত কাদম্বিন্দব বাগতি ভূমিতে নানাইয়া সাঠাঙ্গে প্রণত হইয়া দুই হস্তে অমরকুমারের চরণ ধূনি গ্রহণ করিয়া মাগায় দিল; বলিল, “হজুৰ! এ গোলাম চিদিন আপনার চাকর। আপনার কাছে ভিন্ন কি আনাব আর কারও কাছে কাছ কৰা পোয়ায়? হজুৰ! কি কষ্টে যে এতদিন কাটিয়েছি, তা আনিই জানি। ডাকাত-বন্দীতাব পা টিপ্তে টিপ্তে মনে হত কাছ কৰে গাটা তাব কেটে ফেলি। কেবল আপ-নাৰ জন্তেই এতদিন এ কষ্ট সহ্য কৰেছি।”

অমরকুমার বলিলেন, “আমি যে এখানে আছি তা কেমন কবে জানি?”

কানাই বলিল, “বিজনবাবু আপনার ঠিকানা যোগাড় কৰে দিহেন।” এই বলিয়া কানাই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পুনর্বার আশালতাকে সাঠাঙ্গে প্রণাম করিল। আশালতা চঠাং কানাইয়ের আবির্ভাব দেখিয়া একেবারে বিষয়ে অভিভূতা হইয়া বলিয়া উঠিল, “একি! কানাই কেমন কবে এলি?”

কানাই সহান্তে বলিল, “আজ্ঞে তা

আপনাদের আশীর্বাদে এক রকম ক’রে এসে পড়লুম।”

আশা। ভাল আছিস?

কা। হাঁ।

আ। জেঠামশাইয়ের বাড়ীর সকলে ভাগ আছেন?

কা। হাঁ।

আ। জমিদারবাবুদের বাড়ীর সবাই ভাগ?

কা। হাঁ। শীগ্গির তাদের সাগর-পারে পাঠাবাব ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আশালতা এ কথাই কোনও অর্থ বুঝিতে সমর্থ না হইয়া বলিলেন “তোমার খাওয়া হয়েছে?”

অমরকুমার বলিলেন—“কোথেকে আর হবে? এজিনেব দোয়া খেতে খেতে এইতো এসে পৌঁছোলে!”

“বাবু—বেশ খোকাটি হয়েছে! ঠিক বাবুর মতন!” বলিয়া যেমন কানাই কোলে কবি-বাব অভিপ্রায়ে তটী হস্ত দ্বিভাষিত করিল, খোকা অমন সহাস্যে কাঁপাইয়া কানাইয়ের কোলে গেল। আশালতা অমরকুমারকে বলিল, “দেখ, দেখ—কানাইয়ের সঙ্গে যেন ওর কত কালের চেনা-পরিচয়! ছুটে কোলে গেল।” হাসিয়া অমরকুমার উত্তর করিলেন, “ওর না হোক, ওর বাবাব সঙ্গে কত কালের আলাপ পরিচয় সেটা ও জানে।”

আশালতা বলিল, “কানাই, খোকারে নাড়িয়ে দিগে চান কবে নে। আমি ছুটি তাত চড়িয়ে দিগে।”

খোকা কিছ কিছুতেই আর কানাইয়ের কোল হইতে নামিতে চাহিল না। অবশ-

কুমার তাকে জোর করিয়া টানিয়া লইলেন। কানাই তাহার বাগটা দেহালের গায়ে একটা ফুস্কাটা রাখিল। তাহার পর কুমার কানাইর মাথার ছই খট জল ঢালিয়া চান করিয়া লইল এবং আঁধা বস্ত্র পরিচাণ করিয়া শুধাইতে দিল। আশালতা তাহার বহুতে প্রস্তুত গেটাকতক সন্দেশ আনিয়া এক রটা জল গড়াইয়া কানাইকে খাইতে দিল। কানাই জলযোগ করিয়া থোকাতে ছোলে লইয়া পুতলে বসিয়া আবার গল্প শুড়িয়া দিল। কানাই যে সমস্ত ঐখ্যোয় বিলাসের উপকরণ পরিচাণ করিয়া ছোজার নিঃস্ব অমরকুমারের সেবা করিতে অমরকুমারের নিকটে আসিয়াছে, ইহাতে অমরকুমার মনে মনে অত্যন্ত খ্রীত হইয়াছিলেন। কানাইকে নিকটে বসাইয়া সেই অতীত শৈশবকালের জ্ঞান কত কথা তিনি বলিতে লাগিলেন; কত প্রশ্ন করিলেন। কানাইও প্রস্তুত অতীত প্রস্তুত যথার্থ উত্তর দিতে লাগিল। প্রস্তুত প্রস্তুতের নির্দোষত্বের কথা শুনিয়া অমরকুমারের মনোহর কুমার বিগলিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, ‘ভগবান্! এই জন্যে দায়ী কি আমি? কিন্তু আমি তো কোন অবৈধ কাজ করি নি। দ্বার প্রজা তিনি যদি তাদের স্বপ্ন-শাস্তির হস্তা হন, সে লোভ কি আমার? আমি কে?’

অমরকুমার তাঁহার প্রতিজ্ঞা মত বৈকালে আশালতাকে লইয়া বিরূপাক্ষদেবের দর্শনের বাসনায় বিরূপাক্ষ পাহাড়ে চলিলেন। কানাইও থোকাতে কোলে করিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিল। কানাইকে পাইয়া অমরকুমার খুব আশ্চর্য হইয়াছিলেন বটে,

কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি একটু শঙ্কিত হইয়াও পড়িয়াছিলেন। যদিও তিনি ঐহিক কোণেও প্রকার পূর্ণকাহিনী প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, বৃথাইয়া দিয়াছিলেন যে তিনি কুমার-পুত্র নহেন, দিন-কটক কুমারের সংসারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন মাত্র, আর তাঁহার মাতৃপিতার পরিচয় অজ্ঞাত—এ কথা প্রকাশ হইলে পরে তিনি লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিবেন না, এবং যদিও কানাইও মনযোগসহকারে তাঁহার কথাগুলি শুনিয়াছিল, এবং কোন কথা বলিবে না বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, তথাপি অমরকুমারের মনের আশঙ্কা একেবারে দূর হয় নাই।

আজ পাহাড়ে উঠিবেই বলিয়া আশালতা হৃদয়প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল। সে তাহার দেহের সমস্ত শক্তি এবং মনের সমস্ত বল একত্র করিয়া অতিশয় মনোযোগ সহকারে উপরে উপস্থিত হইয়া সন্দেশে সগর্ব্ব অমরকুমারের মুখের দিকে চাহিল। অমরকুমার তাহার মনের ভার বুঝিতে পারিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন “ও—আজ মস্ত একটা কাজ করে ফেলেন দেখছি যে। সার্টফিকেট দিতে হবে।” পতিপত্নী উভয়ে ঠিক পাশাপাশি চলিতে লাগিলেন। কানাই তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু মন্দির-সান্নাতি উপনীত হইয়া অমরকুমার ভীত হইয়া চমকাইয়া উঠিলেন এবং শুক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আশালতা ভীত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, “কিগো, এমন করে কি দেখছে?”

অমরকুমার একটা ‘কুজ’ দ্বারা দেখাইয়া

কলিগেন, 'দেখ না' !

আশ্চৰ্য্যতা চাহিয়া দেখিল, মন্দিরের নিকটে মন্দিরের ছায়াতলে একজন ভদ্রমহিলা মূৰ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহাব শিরে অনেক পুরুষ বিমৰ্ষিত্তে একতন্ত কপোলে স্থাপন করিয়া অপর-হস্ত ধীরে ধীরে বমণীর মাথায় বুলাইয়া দিতেছেন।

তখন সকলে সেই মহিলাটির নিকটবর্তী হইয়া বিষয়-বিবাক্ষিতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কারণ, মূৰ্ছিতা মহিলাটির আকৃতি অৰ্বকল অমরকুমারের পালঙ্গিনী মাতা নবদুৰ্গার মত। মাথার কেশগুলি হইতে হস্তপাদেব নগগুলি পগান্ত সমস্তট ঠিক নবদুৰ্গার মত। কোন অংশে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। দাগ্রবেশে সজ্জিত মাতুলবেশ যে এতদূর সাদৃশ্য থাকিতে পারে, অমরকুমার ইতঃপূৰ্বে তাহা আর কখনও দেখেন নাই। অমরকুমারের মনে হইতে লাগিল, বুঝি নবদুৰ্গা স্বপ্ন-দৃষ্টা হইয়া এত দেব-মন্দিরের ধারে গ্রাম দূৰ্গাস্তরণে উপর পতিত রহিয়াছেন। তাঁহাব চক্ষু-দুটটি নিম্নলিখিত, সুখভাব প্রসন্ন, অধঃপ্রাপ্ত বেন ঐশ্বৰ্য্য প্রাণ-বেশা লুকাইত রহিয়াছে। বোধ হয় তিনি যেন কোনও সুখবশ দৰ্শন করিতেছিলেন। অমরকুমারের মনে হইতে লাগিল, যে-দিন নবদুৰ্গা মৃত্যুশয্যা শয়ন করিয়াছিলেন, সে-দিন তিনি ঠিক এমনই ভাবে—এমনই প্রাণক হস্যোজ্জল মূৰ্ত্তিতে শয়ন করিয়াছিলেন, সে-দিনও এমনই উজ্জল আভা তাঁহার প্রতি অঙ্গ হইতে বিকীৰ্ণ হইতেছিল। মৃত্যুর করালছায়া সে দেবী-অঙ্গ বিমূৰ্ছিত্ত হান করিতে সমৰ্থ হয় নাই। আর এমনই বিষয়ভাণে গণ্ডে হস্ত-স্থাপন করিয়া উপেক্ষ-

কিশোরবাবু তাঁহাব শিরোদেশে উপবিষ্ট ছিলেন। আর পদশান্তে বসিয়া অমরকুমার অঙ্গ বিসৰ্জন করিতেছিলেন। মৃত্যুর কণ পূৰ্বে তিনি অমরকুমারকে বুকেব কাছে আসিতে ইচ্ছিত করিয়া অমরকুমার হাত দিয়া কত আশীৰ্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাব পর ধীরে ধীরে চক্ষু-দুটটি জন্মেব মত নিম্নলিখিত করিয়াছিলেন। অমরকুমার তাঁহাব চরণ-তলে কাঁদিয়া পুটাইয়া পড়িলে, উপেক্ষ-কিশোরবাবু তাঁহাকে ধরিয়া বাধ্যতায় সমৰ্থ হন নাই। অমরকুমার যে তাঁহাকে আশীৰ্বাদ প্ৰদৰ্শনার্থী জননী বলিয়াই জানিতেন। আর সেই দেবীও তাঁহাকে মনে জানে সন্তোষভাৱে। তাঁহাব মাতৃসন্তাটুকু অমরকুমার দান করিয়া-ছিলেন। সেই অতীত কাহিনী আজ হঠাৎ অমরকুমারের স্মৃতিপটে উদ্ভিত হইয়া তাঁহাব চক্ষু-দুটটি সজল করিয়া তুলিল। তাঁহাব মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া তাঁহাব চরণশান্তে পুটাইয়া পড়িয়া কলিগেন, “বুঝি যে আমার গৰ্ভধারিণী মাতা, আমার সে ভ্রম দূৰ্ব কবে হইবে।”

শিরোদেশে উপবিষ্ট পুরুষটিও মূৰ্ছিত্ত অস্তিত্ব, সৌন্দৰ্য্য ও প্রাণত! উজ্জল গৌরবর্ণ, অচিন্তনোৎকল শাবীৰিক গঠন। সুখভাব প্রাণত! মাথাব কয়েকগাছি শুক্লকেশ প্রৌঢ়-বৈৰ্য্য পরিচয় দান করিতেছে।

অমরকুমারের মনঃপ্রাণ যেন উভয়ের চরণেব লুটাইয়া পড়িবাব ভক্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। অমরকুমার ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিকটবর্তী হইয়া অতীবিনয়ময় বচনে বলিলেন, “মহাশয়! তিনি কি দুৰ্ছা গেলেন?” পুরুষটি একাকী, এই নিৰ্জন স্থানে ইচ্ছিত পক্ষীকে গাইত।

বড়ই বিপাকে পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ নিকটে মহা-কণ্ঠস্বর ক্ষত হওয়ার তাঁহার প্রাণে সাহসের সঞ্চার হইল। তিনিও দেহমাথা ঘুরে বলিলেন, “ইম আমরা এই বিরাট-দেব দর্শন করবার জন্য এসেছি, কিন্তু এখানে এসেই হঠাৎ আমার স্ত্রী মৃত্যু হইতে পড়েছেন। একলা বড়ই বিপদে পড়েছি, কি করব যে এঁকে নিয়ে, কিছুই ঠিক করতে পারছি না।” অমরকুমার যদিও চিকিৎসক নহেন, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বেচ্ছা-সেবকদিগের সহিত মিলিত হইয়া পীড়িতের শুশ্রূষা করিতেন; তাহাতে তাঁহার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি মহিলাটিকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “অত্যন্ত দুর্বল!”

তিনি আর কোনও কথাই প্রতীক্ষা না করিয়া ক্ষতপাদবিক্ষেপে উৎসর্গ নিকটে গিয়া নিজের উত্তরীর ভিজাইয়া স্থণীতল জল লইয়া আসিলেন এবং সেই উত্তরীর নিংড়াইয়া জল লইয়া রমণীর চক্ষু ও মুখে দিতে লাগিলেন; কানাই একটা পার্শ্বত্যা কুণ্ডের বড় বড় পাতা লইয়া, কাটি বিঁধিয়া, পাখার আকারে নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে ব্যঞ্জন করিতে লাগিল। উজ্জ্বল মুখ তুলিয়া ধোকা সেই সমস্তল ভূমিতে মহানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কখন সুনীল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, কখনও বা দৌল্যমান গাছের পাতা-গুলিকে ছুইত। সঞ্চালনপূর্বক ‘আয়’ ‘কায়’ বলিয়া ডাকিতে লাগিল; আবার কখনও সানন্দে ‘তাই’ ‘তাই’ বলিয়া তালি দিতে লাগিল। আশালতা খোকার অন্ত বোতলে করিয়া ত্রুণ ও বিষকবাটা আনিয়া-ছিল। সে সেইরূপ একটু উক করিয়া বিষকে

করিয়া অল্প তরল রমণীর মুখে দিতে লাগিল। প্রাণে সে-চক্ষু তাঁহার ওষ্ঠ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা তরল গলার মধ্যে মাইল। কিছুক্ষণ পরে তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন। হৃদ-লোকটি কুণ্ডলভরে অমরকুমারের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, “আজ আপনারা আমাকে যে বিপদ থেকে উদ্ধার করতেন তাহা ক্ষণ জীবনে পরিশোধ করতে পারব না।”

রমণী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আহা, কেন আমার ঘুম ভাঙলো? আমি কেমন সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম!” তাহার পক্ষে অমরকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “এতলোক কে গো?”

হৃদলোকটি বলিলেন, “এই সাহায্যেই আজ তোমার ঘুম ভাঙতে পেরেছি, কখনো নইলে আমি ত মনে করোঁছুলাম, আজকে এ ঘুম বুঝি তোমার চিরদিনের ঘুম হয়ে যায়! তোমাকে যে আবার এমন করে কথা কইতে উদ্ভোগ, তা আর মনে করি নি!”

কনলা ধীরে ধীরে উঠিয়া দিয়া মাথাব কাপড় টানিয়া দিলেন, দেখিলেন তাঁহার পাশে একটি শুভ্র মল্লিকাকুসুমের স্তম্ভ অরুণাশিত খেলিয়া বেড়াইতেছে। শিত্রব নিকটে একটা তরলী। তিনি আশালতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “খোকাটি বুঝি, তোমার মা!”

অদ্বাবগুপ্তিতা আশালতা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, “হ্যাঁ।”

তিনি বলিলেন, “একবার কোলে দেবে?” আশালতা তাকাতাড়ি শিশুটিকে লইয়া তাঁহার কোলে দিল। তিনি শিশুটিকে

কোলে লইয়া তাহার মুখ চুখন করিয়া পরম ভূপ্তি যোধ করিলেন। ক্রমশঃ দিবা অবসান হইয়া আসিল। দীননাথ রক্তরাগ-রঞ্জিত হইয়া অন্তঃস্নানোদ্ধত হইলেন। অমরকুমার ভ্রমলোকটীকে বলিলেন, “আব এখানে বসে থাক। উচিত নয়; চলুন একে আস্তে আস্তে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক।”

সকলে শুষ্কভরে বিরূপাক্ষ-দেবকে প্রণাম করিয়া গাত্রোথান করিলেন। আশালতা গোকাকে একটু তরু খাওয়াইয়া কানাইয়ের কোলে দিল। সর্বাগ্রে কানাই গোকাকে কোলে করিয়া অবতরণ করিল। বাইতে বাইতে অমরকুমার ভ্রমলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার বাসা কোনপানে?”

তিনি উত্তর করিলেন, “সবে আজ এখানে এসেছি। এখনও বাসা ঠিক করি নি; মনে করি, যে ক’দিন থাকি ডাক-বাংলায় থাকব।”

বিনীতভাবে অমরকুমার বলিলেন, “আজ্ঞে ডাক-বাংলায় প্রায়ই সাহেব-সুখোরা এসে থাকে। একে নিয়ে সেখানে থাকাটা কি সুবিধে হবে?” ভ্রমলোকটি বলিলেন, “কি করি! শুনেছি এখানে সে রকম সুবিধে মত বাসা পাওয়া যায় না।”

অমরকুমার বলিলেন, “আমার এখানে একটা ছোট বাসা আছে। যে-ক’দিন থাকবেন, যদি দয়া ক’রে সেখানে থাকেন, তা হলে বড় সুখী হব।” ভ্রমলোকটি অমরকুমারের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। অমরকুমারও আনন্ডিত হইলেন।

কথামতে সকলে অমরকুমারের বাসার

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশালতা রান্না চড়াইয়া দিলেন এবং একপ্রান্তে রন্ধন শেষ করিয়া আগন্তুক ভ্রমলোকটি ও অমরকুমারকে খাইতে দিলেন। ভ্রমলোকটি আহায়ে বসিয়া আশালতার রন্ধনের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঔষাদেব আহাৰ শেষ হ'লে আশালতা ঔষাদেব পাণ দিয়া থোকাকে দুধ খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া, কানাইকে ভাত দিল, এবং তৎপরে কমলার জন্ত ও নিজের জন্য ভাত বাড়িল।

কমলা একপানা চাদর মুড়ি দিয়া শয্যায় একপ্রান্তে শয়ন করিয়াছিলেন। আশালতা তাঁহাকে ডাকিয়া আসিয়া খাওয়াইতে বসাইল। আহাৰ কবিত্তে কবিত্তে আশালতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার একলা বেড়াতে এসেছেন? ছেলে পুত্র সব কোথায় আছেন?”

কমলা কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি শুনিতে পান নাই মনে করিয়া আশালতা পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার ছেলে পুত্র কোথায়? কেও সঙ্গে আনেন নি কেন?”

অব্যবহিত অঙ্গ সংবরণ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া পুনর্বার রমণী উত্তর করিলেন, “ছেলে পুত্র কোথায় পাব মা? আজ পচিশ বৎসর হ'ল আমার একমাত্র ছেলেকে বমের দ্বাণ্ডে দিয়েছি।”

(১৪)

বিজনকুমার বাটী হইতে বহির্গত হইয়া রাজপথ ধরিয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন। কিছুকণ প্রান্ত সোজাপথ দিয়া গমন করিয়া, একটা সঙ্কীর্ণ গলিপথে হুকিয়া পড়িলেন। এত সন্ধ্যা গলি বে, তাহাতে কষ্ট

একজন মাতৃসমাজ কোনও প্রকারে চলিতে পারে। পণের দুইপার্শ্ব কণ্টকাকীর্ণ, জঙ্গলে পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে বাদল-বৃক্ষের এবং সেতাকুলের ডাল পণের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে গণিকের অঙ্গ এবং বস্ত্র, চই-ই ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। বিজন-কুমার অতিসাবধানে সস্তূর্ণনে নিজের অঙ্গ এবং বস্ত্র বাচাইয়া চলিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদূর গিয়া একটা অস্পষ্ট পথ ধরিয়া গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। একে কৃষ্ণপঙ্কের নাজি, তাহাতে বন্যবৃক্ষপূর্ণ নিবিড় জঙ্গল! অভ্যস্ত ব্যক্তি ব্যতীত তাহার অভ্যস্তরে গমন করে, কাহার সাধ্য! জঙ্গলের মধ্যে একটা লোক একটা ক্ষুদ্র পুঁটুলী-হস্তে অপেক্ষা করিতেছিল। বিজনকুমার একবার শিশু দিব্যমাত্র সে ব্যক্তি তাহার নিকটবর্তী হইয়া পুঁটুলিটা বিজনকুমারের হস্তে অর্পণ করিল। বিজনকুমার তদ্ব্যথা হইতে বস্ত্রাদি বাহির করিয়া লইয়া অতিশীঘ্র নিজের পরিধেয়-বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। যে-ব্যক্তি পুঁটুলি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, সে পুন্সর্কার বিজনকুমারের পরিত্যক্ত বসন-গুলি লইয়া পুঁটুলি বাহিয়া জঙ্গল ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। বিজনকুমারও জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া ক্রতপাদবিক্ষেপে পূর্কোন্নিখিত পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় পৃষ্ঠদেশে যেন কাহার মুহূর্তস্পর্শ অমুত্বব করিলেন বলিয়া তাহার মনে হইল। বিজন-কুমার ত্রস্তে ফিরিয়া চািলেন। কিন্তু অকারণে কিছুই দৃষ্ট হইল না। তিনি পুন্সর্কার চলিতে লাগিলেন। পুন্সর্কার কে যেন তাহার পৃষ্ঠদেশে বৃহৎ আঘাত করিল। তিনি আবার

দাড়াইলেন; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু কোন দিকেই কোন মনুষ্যচিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তাহার পায়ের নিবট দিয়া একটা শৃগাল ছুটিয়া চলিয়া গেল; মাথার উপর দিয়া একটা কাল পেচক বিকট চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গেল। স্থানটা নিরাপদ নহে—গৌরস্থান। বহুদিন পূর্বে অতীত যুগে নবাব আলিবর্দিখাঁর আমলে ভক্তমুসলমান অধিবাসীদিগের মৃতদেহ এই স্থানে সমাহিত করা হইত। তখনকার দিনে এ সমাধি-স্থানের শোভা-সমৃদ্ধি যথেষ্টই ছিল। কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মেব বশে এখন আর সেই পূর্কসমৃদ্ধির চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। বহুদিন সংস্কারাভাবে সমাধিস্তম্ভগুলি জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ ধূলি-সাং হইয়া পড়িয়াছে; সেই ভয় ইষ্টকস্তূপ বড় বড় অশ্বখ, বট এবং বন্যবৃক্ষাভিতে সমাকীর্ণ হইয়াছে। সমতলক্ষেত্র পুন্সর্কারের পরিবর্তে কণ্টকময় বন্যবৃক্ষে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভূতের ভয়ে এখন এখানে মনুষ্য-সমাগম রাহিত হইয়াছে। কচিং কখনও রাখাল বালকের দল গরু চরাইতে চরাইতে এখানে আসে, এবং গ্রামে গিয়া গ্রামবাসী-দিগের নিকটে তাহাদের ইচ্ছামত কল্পিত “মামদো” ভূতের অত্যদৃত কোতুকাবহ কাহিনী-সকল বলিয়া গ্রামবাসীদিগের অন্তরে ভয় ও কোতুকের সৃষ্টি করিয়া দেয়। অবশ্য বিজনকুমারের মনে ভূতের ভয় ছিল না। তাহা হইলে দিনেই কি রাত্রেই কি, তিনি এ পথে আসিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু এক্ষণে তিনি মনুষ্যের করস্পর্শ অমুত্বব করিলেন, অথচ কিছু দেখিতে

পাইলেন না, ইহার কারণ নির্দেশ করিতে না পারিয়া আরও দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবার স্পর্শ নহে, তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন কে বেন মূহূহাসোর সহিত বলিল, “আপনার এত ভয়!”

বিজনকুমার আবার থম্কিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, “কে তাঁহার সহিত এরূপ কোতুক করিতেছে? এ কি ভূত না মাহুষ?” যেই হউক, মুষ্টি তাঁহার অতিনিষ্ঠে। অন্ধকার ভেদ করিয়া তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেন, ভূতই হউক বা মাহুষই হউক, আকৃতি তাঁহার সগুণে দণ্ডায়মান! আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাহার আকার প্রকার কিরূপ, বা বেশভূষা কিরূপ, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নীবব নিস্তরু মম্বা-সমাগম-শুভ্র অন্ধকার রজনীতে সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া হঠাৎ তাঁহার বুকটা যেন কেমন ধক্ করিয়া উঠিল। মুষ্টি পুনর্বার মূহূহাসোর সহিত বলিয়া উঠিল—“আপনার এত ভয়? তাহলে গোয়েন্দাগিরি করেন কি করে? একাজ আপনার পরিত্যাগ করাই উচিত!”

ভয়ের সহিত বিশ্বাস আনিয়া বিজনকুমারের হৃদয় অধিকার করিয়া বলিল। তিনি ছদ্মবেশে এমন অনুপূর্ণ যে তিনি যখন ছদ্মবেশ-পরিগ্রহ করেন, তখন তাঁহার অতিপরিচিত ব্যক্তিও তাঁহাকে চিনিতে সমর্থ হয় না। এ ব্যক্তি তবে চিনিল কি প্রকারে? এ কি তবে প্রচলিত ভাবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত দেখিয়াছে না কি? কে এ ব্যক্তি! তবে কি এ শত্রুর চর? বিজনকুমারকে তদবস্থায় দেখিয়া মুষ্টি পুনর্বার সহাসো বলিল, “বড়

ভয় পেয়েছেন দেখছি! একবার মনে কচ্ছেন ভূত, আবার মনে কচ্ছেন, শত্রু-পক্ষের লোক। কিন্তু আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই; আমি এ ভয়ের একটাও নয়।”

এবার বিজনকুমার বিশ্বাসভরে কদা কহিলেন, “কে আপনি? কণ্ঠস্বরে ভয়লোক বনেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন? এমন ভাবে নিজেকে আমার সঙ্গে সাক্ষাতেরই বা কারণ কি? আগমন অভিপ্রায়টা কি?”

মুষ্টি উত্তর দিল, “একটা বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাই আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি।

বি। কি?

মু। শত্রুর আপনাকে সন্দেহ করেছে। আপনাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে। হাবা-কালা সেজে তাদের চখে ধূমো দেওয়া সহজ কথা নয়। তা’রা মস্ত ধড়িঝাজ! তা’রা আপনার মতন, অথবা আপনার চেয়েও কত প্রবীণ ডিটেক্টিভকে ঘোলা খাইয়ে দিয়েছে।

বি। আপনি কা’কে কি বলছেন? কে ডিটেক্টিভ?

মু। এমনও আপনার সন্দেহ! যান, আর আপনার সময় নষ্ট করব না। একটা ভয়-লোকের মনে ইচ্ছা মনস্ত আপনার হাতে। আর অশোভনে গীতাদেশীর মত, বালিকা যে মস্তাকারাগারে বন্দিনীভাবে অবস্থান কচ্ছে, ইংবাজ-রাগেই পুলিশ কন্স্টেবলদের পক্ষে সেটা নিত্যশূন্য কল্পনামাত্র। এখন যত শীঘ্র পারেন তা’কে উদ্ধার করুন। কিন্তু আপনি একা বড় চমৎসাহসিক কাজ কচ্ছেন। অগুন নিয়ে খেলা করতে গেলে, সকলকারই হাত

শোড়বার আশঙ্কা আছে। আপনি ডালে ডালে করেন, গুল পাঠার পাঠার করে। ওদের সহজ লোক মনে করবেন না। নগরতে ওদের হস্ত মজিত হয়ে আছে। আপনার উচিত একবারে লোকজন নিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করা।”

বিজনকুমার কিয়ৎকাল নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আপনি কি ওদের সমস্ত জানেন?”

উত্তর হইল—“জানি।”

বিজনকুমার বলিলেন, “আপনার কি অনুমান হয় এ ব্যক্তি উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর পুত্র নয়?”

উত্তর হইল, “না।”

বিজনকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে এতদিন আমরা যাকে উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর পুত্র বলে জানিলাম, আমাদের সেই অমর-অমরবাবুই কি উপেন্দ্রকিশোর বাবুর পুত্র?”

উত্তর হইল, “না।”

বিজনকুমার বলিলেন, “তিনিও নয়? উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর পুত্র তবে কোথায়?”

উত্তর হইল, “তা’ বোলব না।”

বিজনকুমার বলিলেন, “বলবেন না? তবে আপনার সমস্ত মিলিয়া কথা! নিশ্চয় আপনি শত্রুপক্ষের চর। আমাদের প্রবঞ্চিত করাই আপনার অভিপ্রায়! আমি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না।”

উত্তর হইল, “কি করতে ইচ্ছা করেন?”

বিজনকুমার দৃঢ়বরে বলিলেন, “গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাব।”

বীর প্রশান্তভাবে তিনি বলিলেন, “নিয়ে যান।” বলিয়াই বিজনকুমারের দিকে দক্ষিণ

হস্তবাণি প্রসারিত করিয়া ছিলেন। বিজনকুমার তাহা দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলেন, কিন্তু তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিয়া দেখিলেন যে সে-হস্ত নরঘাত-দস্যুর মত নয়, রমণীর হস্ত-তুল্য স্নেহময়! বিজনকুমার তাঁহার হাত ছাড়িয়া ইচ্ছা বলিলেন, “অন্ধকারে আপনাকে ভাল দেখতে পাচ্ছি না, দেখতে পেলেই বুঝতে পারতুম দস্যু কি না।”

তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, “সেটা অনেকেরই পায়ের। কিন্তু অন্ধকারে লোক চেনাই গোয়েন্দার কর্তব্য।”

বিজনকুমার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, আপনাকে গ্রেপ্তার করতে চাই না, কিন্তু আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।”

মু। কি?

বি। আপনি যা যা জানেন, আপনাকে তা’ বলতে হবে। দস্যুদের বিরুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দিতে হবে।

মু। না, আদালতে দাঁড়িয়ে আমি সাহায্য দিতে পারব না।

বি। কেন তাতে বাধা কি?

মু। আমার ইচ্ছা!

বি। তবে আপনাকে আমি ছাড়তে পারব না, থানার নিয়ে যাব।

মু। বলছি ত’ সঙ্কল্পে নিয়ে যান! আমি বলব, আমি কিছুই জানি না। বিজনবাবু আমাকে বলপূর্বক ধরে এনেছেন।

বিজনকুমার পুনর্বার চিন্তিত হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা ওদের ধরিয়ে দেবার জন্তেই বা আপনার এত আগ্রহ কেন? তাতে আপনার লাভ কি?”

উত্তর হইল, “কিছুই নয়।”

বিজনবাবু বলিলেন—“তবে ?”

তিনি বলিলেন, “আপনারা ছোড়ীৰ দস্ত
কিতে স্মরণ হইলেন না। এ বকম ভয়কর
লোক দৃষ্টিতে না হলে সংসারের আবণ্ড কত
অভিমান করবে ? তাই আপনাকে পবানন্দ
ও উপদেশ দিতে এসেছি। আপনি তুলে
নাচ্ছেন, কি শুক ভাব স্বপ্নে নিয়েছেন।
অনর্থক বিলম্ব না করে লোক-জনে নিয়ে এক
সঙ্গে সকলকে গোপ্তার করুন। এট উত্তম
প্রয়োগ। এ প্রয়োগ হারালে আপনাকে
অনেক পক্ষান্তে পড়ে থাকতে হবে। চিন্তিত
হইয়া বিজনকুমার বলিলেন, “কি অপরাধে
গোপ্তার করব ? অপরাধের প্রমাণট বা কি ?”

উত্তর হইল—“ধনা পড়লে অনেক প্রমাণট
সেইরূপে পড়বে। উপস্থিত বালিকা-চরণট
কি শুকন্তর অপরাধ নয় ?” বিজনকুমারকে
নীষের দেখিয়া তিনি পুনঃপুনঃ বলিলেন,
“আর আপনার সময় নষ্ট করতে চাই
না ; দেখছি আপনাব মজাটা তুলিয়ে
গেছে। কি করবেন ঠিক করতে
পারছেন না। আপনি একেবারে সব
প্রমাণগুলো হাত করতে চান। কিন্তু তাতে
কি বিপদ কি অনিষ্ট দ্বারা পড়েন না।”
এই বলিয়াই তিনি প্রস্থানোন্মত হইলেন ;
অইতে যাইতে বলিলেন, “আর চুটো দিন মাত্র
সময় আছে, কিন্তু দিনের দিন বিবাহের দিন
স্থির করেছেন, সে থপর বোধ হয় বাপেন।”

তিনি চলিয়া গেলে বিজনকুমারও ভাবিতে
ভাবিতে চলিলেন—“লোকটি কে ? কেনই বা
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিল। সে নিজে
কোনও পরিচয় দানে ইচ্ছুক নয়। সম্মানলকে
শ্রুত করিবার ক্ষমতা তাঁহার নিতান্ত অপ্রচ

ক্ষেপে গেল। কিন্তু তাহােব বিকল্পে সাক্ষা
জান কার্যতে সম্ভব নয়। এ-প্রতিলিকা বোঝা
চকচক। লোকটি যেই হউক, সে তাঁহার অগোচর
হই প্রথমে-বুদ্ধিগমী যে বিষয়ে সন্দেহ
নাই। লোকটি মৈব-বাণীষ নায় ঐশ্যকে
সামান্য করিয়া দিয়া গেল। তাহার প্রতি
যে দৃষ্টিগোচর কোনও প্রকার সন্দেহ হইয়াছে,
সে কথা তিনি আরো বুঝিতে পারেন নাই।
লোকটি বলিয়া গেল, একেবারে সকলকে
গোপ্তার করিতে। কথা শুনিয়াই হইলেও
এ-বলে তাঁহা সম্ভব নয়। কারণ, বাধা-
গোপ্তারবাবু লোকজনতা শু কলঙ্ক-ভয়ে একে-
বারে নিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন ; পুলিশ
আগিয়া নীলামের উদ্ধাব-মাধান করিলে
এ-কথা জন-সাধারণে পচাব হইয়া পড়িবে।
তাঁহা হইলে নিকরকর বলনা শত সহস্র হইয়া
অপরাধ ঘোষণা করিয়া বেড়াইবে। লজ্জার
বাধাগোপ্তারবাবু জন-সাধারণকে মুখ দেখা-
ইতে পারিবেন না।” অধিকন্তু নীলামকে
উদ্ধাব করিতে অক্কেব মাগিয়া গাইতে হইবে,
তাঁহা হারিয়াও বিজনকুমার লজ্জিত হইলেন।
তিনি আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—“নীল-
মাকে আমি একটি উদ্ধাব করব, যেমত
কবে পারি।”

হঠাৎ আকাশে একখণ্ড মেঘ স্বেদা দিল,
বিভাৎ চক্ষাটতে লাগিল, চুট এক ফোঁটা
দ্রুটিও পড়িতে লাগিল। ক্রমে বড় বড়
ফোঁটা, তাঁহাৰ পব কুম্ভক কবিতা মৃদলধারে
জল আবন্ত হইল। একে বজা পপ, তাঁহাতে
অন্ধকার-বাহি, তাঁহাৰ উপর আবার অজস্র
বারিধাবা। বিজনকুমারের বস্ত্রাদি সমস্তই সিক্ত
হইয়া গেল, তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

কৃত গমনে তাঁহার পদাঙ্কন হইতে লাগিল, একত্ৰ তিনি বখাশক্তি সাবধানে চলিতে লাগিলেন। স্ফুটন্ত অন্ধকারে পথের কিছুমান্ তছিল না। তিনি কেবল যত্নচালিত
... জ্ঞান নিজের অহমানের উপর নির্ভর
কারিয়া পথ চলিতেছিলেন। একস্থানে একটা

শব্দ, পতিত বৃক্ষকাণ্ডে ধাক্কা লাগিয়া তাঁহার
দক্ষিণ পদ কাটিয়া বাইরা রক্তপ্লুত হইতে
লাগিল। তিনি তাহাতে অক্ষিপ না করিয়া
বখাশক্তি ক্রতবেগে চলিলেন, এবং প্রবল
বারিধারা যেন তাঁহাকে উপহাস করিতে
করিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচোকশীলা মিত্র।

প্রেম।

বিগত হইলে নিশা স্রীরাম হ'বেন নরপতি,
হেনকালে যনে তাঁরে বিষাডা দিলেন পাঠাইয়া!—
চতুর্দশ বর্ষ-অন্তে কিরি ক্লম আপনার দেশে,
আগে বিমাতার পায়ে প্রসমিলা “মা” ব'লে ডাকিয়া।

শীলাত স্রীশারে যবে বিনাশিল ক্রুশে বিদ'াইয়া,
অস্তিম সময়ে প্রভু বলিলেন সম্মিত 'আননে,—
“হে পিতঃ করিও ক্ষমা, এরা সব অবোধ অজ্ঞান,
তোমার সন্তানগণে পিতা তুমি রাখিও চরণে।”

“সর্বজীবে কর প্রেম” প্রচারিলা নিমাত যখন,
জগাই মাধাই তাঁরে প্রহারিল শত শত কায়।
আলিঙ্গিয়া হইলেন বলিলেন শচীর তনয়,
“এসো এই বৃকে এসো, তোমরাও ভাই বে আমার!”

আরব-প্রান্তর মাঝে যু. দু. করে উত্তপ্ত বালুকা,
মহম্মদ এসেছেন প্রজাবিতে ধর্ম ইসলাম;—
সবার প্রহারে তাঁর দেহে বহে শোণিতের ধারা,
যুগে বলি—“ধর্ম সত্য, সত্য হোক সৈয়দের নাম!”

যৌবনে তাজিয়া গৃহ শুদ্ধোদন-রাজার নন্দন,
“অহিংসা পরম ধর্ম” দেশে দেশে করিলা প্রচার;

ব্রাহ্মণেরা দিয়া বাধা সূত্রিত্রে দিল অপবাদ,
হাসিা বলিলা বৃদ্ধ—“অমঙ্গলে মঙ্গল আমার।”

ছে মহাপুরুষগণ, নমি আমি তোমাদের পারে,
তোমরা সকলে আজ নীন হীনে কর আশীর্বাদ,—
বিভ্রিতে পারি যেন ধরণীতে ঘেহ, কমা, দয়া,
সহস্র তুংখেও যেন হৃদয়ে না আসে অবসাদ ।

শ্রীমতী চাকুস্তা দেবী ।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয় ।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

রঙ্গজীব মন্দির ।—আধুনিক মন্দিরের
রম্যো-রঙ্গজীব মন্দিরট নক্সাপেঙ্কা বৃত্তে । শেঠ
কলীচাঁদের ভ্রাতা শেঠ গোবিন্দদাস এবং
শেঠ বাধাকৃষ্ণ উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ।
শ্রীমদ্বজ্রী বিষ্ণু অপর একটি নামনাম ।
শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ এবং তাঁহার
শিষ্যবৃন্দ রঙ্গজীব সেবারেং । মন্দিরটি
মাস্ত্রাজী ধরণের এবং ইহা স্বামী রঙ্গজীবের
নক্সা অনুসারে নির্মিত । ১৮৪৫ খ্রীঃ মন্দির-
গঠন আরম্ভ হয় এবং ১৮৪১ খৃঃ শেষ হয় ।
ইহার প্রস্থতিতে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া-
ছিল । বাহির দেওয়ালটি লম্বায় ৭৭০ ফিট
এবং চওড়ায় ৪৪০ ফিট । ইহার একটি
স্থলর বাগান এবং পুষ্করী আছে । বিগ্রহের
সম্মুখে ভাস্কর্য্যাদিত ধ্বজস্তম্ভ অবস্থিত ; ইহা
উচ্চে ৬০ ফিট এবং স্থপ্তিকার নিম্নে ২৪ ফিট
প্রোথিত । এই একটিতেই দশ সহস্র মুদ্রা
ধরত হয় । মন্দির-দ্বারের একটু পার্শ্বে একটি
ঘর আছে, তাহাতে বৎসরকিত । চৈত্র মাসে

ব্রহ্মোৎসবের দিন এই রথে রঙ্গজীকে বাহির-
করা হয় । মেলাটি ১০ দিন থাকে । যখন
রঙ্গজীকে লথে বাহির করা হয়, তখন বাঁদোদ্যাম্য
এবং বাঁজী পোড়ান হয় । দেবতাটি অষ্টপাত্ত-
নির্মিত । যখন দেবতাকে রথে চড়ান হয়,
তখন তাঁহার স্থান মধ্যে থাকে এবং চুই পার্শ্বে
চুই জন ব্রাহ্মণ চামর ব্যজন করেন । যে-দিন
রথ বাহির করা না হয়, সে-দিন দেবতা নানা
প্রকারের মানে চড়েন :—যথা পুণ্যাকোটি
(পাকী), সিংহাসন, কদম্ব অথবা কলস্ক । কখন-
বা সূর্য্য, চন্দ্র, গজুর, হস্তমান অথবা শেখনাগ,
এবং কখনও নাগোড়া, সিংহ, মবাল এবং
অষ্টলাল শরভের উপর দেবতাকে দেখা যায় ।
এক একটি উৎসবে প্রায় ৫ সহস্র মুদ্রা ধরত
হয় । রঙ্গজীব বার্ষিক খরচা ৫৭ হাজার টাকা ;
ভক্ষণো ৩০ সহস্র মুদ্রা কেবল মাত্র ভোগে
লাগে । এই ভোগ পূজারীগণকে অথবা
কাকে গরীব লোকদিগকে দেওয়া হয় । প্রতি-
দিন ৫ লক্ষ ত্রৈলোক্য মন্দিরে আহাৰ্য্য পাক

এবং প্রত্যহ বেলা ১০টার সময় এক ডোল
আটা (গোধূমচূর্ণ) জাভিনির্কিষেবে কোন
প্রার্থাকে দেওয়া হয়। ৩৩টা গ্রাম লইয়া
রাজারী আমদারী। ইহা হইতে ১১ লক্ষ ৭
হাজার টাকা আর হইল থাকে। তদন্তে ৬৪
হাজার টাকা গভর্ণমেন্ট করবরূপ লইয়া
থাকেন। উক্ত ৩৩টা গ্রামের মধ্যে ১৩টা
মণ্ডার এবং বাকী ২০টা আগ্রা-জেলার অব-
স্থিত। মণ্ডার গ্রামগুলিতে বৃন্দাবনেরও
কতকটা অংশ আছে। লোকে যে সকল
পূজা চড়ায় তাহার বার্ষিক মূল্য গড়ে দুই
সহস্র মুদ্রা এবং পূজার জন্ত যে সকল জমা
আছে, তাহার বার্ষিক মুদ্র ১১ হাজার ৮ শত
টাকা। ১৮৬৮ খ্রীঃ আমোজী সমস্ত আমদারী
খীর সন্তানের উপর গ্রস্ত না করিয়া একটা
কমিটির হস্তে দেন। আমোজীর পুত্র একটা
হস্তিযুগ্ম ও পারদারিক ছিলেন। পূজারীর
এ গুণ থাকিলে লোকে তাহাকে কেমন পছন্দ
করিবে? সুতরাং বদ নাম এক হইতে লাগিল
যে তাহার পিতাও বিচলিত হইলেন। অব-
শেষে আমোজী সন্তানকে একটা বৃদ্ধিমান্ন দিয়া
ভুক্তপদ হইতে বঞ্চিত করিলেন। অবশ্য
মাজাজ হইতে অল্প শুদ্ধ পূজার জন্ত আমদার
করা হয় এবং কাঠাভার ছয় জম লোকের
একটা কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়। কমি-
টির লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাভায়ন নাম
মন্দিরের হিতের জন্য সকাপেক্ষা মনোযোগী
ছিলেন; সুতরাং তাহার নামে মন্দিরের সকাপ
অর্থাৎ ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখা হয়।
যে-দিন হইতে এই কাণ্ডটা হইয়াছে, সেই দিন
হইতে কি পূজা সম্বন্ধে, কি জমা বিষয়ে সন্ধান-
দীন উন্নতি হইয়াছে এবং জমোদানীও উৎকর্ষ

লাভ করিয়াছে।

উক্ত জমোদারীর মধ্যে যে সকল গ্রাম
আছে, তন্মধ্যে তিনটা গ্রাম মহাবলে এবং
দুইটা জলেবরে অবস্থিত। এগুলি ভয়পুরের
রাজা মানসিংহ দান করেন। যদিও তিনি
সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন, কিন্তু
তথাপি ইনি কখনও সিংহাসনে উপবেশন
করেন নাই। ইনি রাজা পৃথ্বীসিংহের পুত্র।
পিতার মৃত্যুকালে ইনি জননী-অধিকারী ছিলেন।
পিতার মৃত্যুর পর ইহার অন্য ভাই প্রতাপ-
সিংহ সিংহাসনের দায়িত্ব করেন। কিন্তু
দৌলত রাও সিক্কি তাহার খুল্লতাত প্রতাপ
সিংহাসনে হক সাব্যস্ত করার, ইনি বার্ষিক
৩০ সহস্র মুদ্রার বৃত্তিতে সিংহাসন ত্যাগ
করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। মৃত্যুকাল
পর্যন্ত তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই এবং
বর্জদিন বাচিয়া ছিলেন ততদিন যোগি-বেশেই
ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমে
ইহঁর মৃত্যু হয়। ২৭ বৎসর কাল পর্যন্ত ইনি
পক্ষাসমে উপবেশন করিয়াছিলেন;—কখনও
সে আসন ত্যাগ করেন নাই। সম্ভাষে
কেবলমাত্র একবার মৃত-পৃথ্বী ত্যাগের জন্য
তিনি আসন ত্যাগ করিতে, অন্যথা মহা
মৃত্যুর পক্ষ দিবস পূর্বে তিনি জামিতে পারেন
যে মৃত্যু সমাগত হইয়াছে; সুতরাং, তিনি
তাঁহার পুরাতন চাকরদিগের তত্ত্বাবধানের
তার শেঠের উপর দেন।

রাবারমণের মন্দির।—১৮৭৬ খ্রীঃ রাধা-
রমণের মন্দিরের মিস্ত্রীপাঠা শেষ হয়।
লক্ষ্মীমিনাসী সাহ কুমললাল এই মন্দিরের
মিস্ত্রীতা। মন্দির তৈয়ার করিতে দশ লক্ষ
টাকা ব্যয় হয়।

রাধা ইন্ড্রকিশোরের মন্দির।—রাধা-বরণের মন্দিরের বাঁচে এই মন্দিরটি গরার নেকটুই টিকারী-নামক স্থানের হেতরাশ-নামক জনক জমীদারের পত্নী রাণী ইন্ড্রজিৎ-কুমারী-দ্বারা নির্মিত হয়। মন্দিরটি প্রস্তুত হইতে ৬ বৎসর লাগে এবং ইহা ১৮৭১ খ্রিঃ শেখ হয়। মন্দিরের শিখরদেশটি তাম্রফলক-দ্বারা মণ্ডিত; একা শিখরদেশের নির্মাণেই ৫ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

রাধাগোপালের মন্দির।—রাধাগোপালের মন্দিরটি গোমালিন্দের মহারাজার দ্বারা নির্মিত। মহারাজের গুরু ব্রহ্মচারী গিরি-ধারী দাস মন্দির নির্মাণে তত্ত্বাবধান করেন। এই মন্দির-নির্মাণে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়।

বৃন্দাবনে সর্কোপেক্ষা পুরাতন ইমারতের নাম ঘেরা। জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা সওয়াই জয়-সিংহ যখন আগ্রার শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তিনি এই স্থানে বাস করিতেন। নদী-সম্মুখে ঘাট-রাজী দেড় মাইল দূরিতা অবস্থিত। নদীর সর্কোচ্চ যে ঘাট আছে, তাহা কালীর-মর্দন-ঘাট নামে খ্যাত। এখানে কদম্ব বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কদম্ব বৃক্ষ হইতে ত্রীকৃষ্ণ-দেব কালীর সর্পের সহিত যুদ্ধ করিবার অস্ত্র জলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। সর্কনিহ্নে কেন্দ্রী-ঘাট। এত স্থানে ত্রীকৃষ্ণ কেন্দ্রী-দৈত্যকে সংহার করেন। কেন্দ্রীদৈত্যের সন্নিকটে ভরতপুরের রাজা রণজিৎ সিংহ এবং রণধীর

সিংহের রাণী কিশোরী এবং লক্ষী দুইটি মূর্তির স্নেহভর ভৈরব করান। বীবসমীরকে সন্নিকটে নদী-সম্মুখে কতকগুলি বৃক্ষ অবস্থিত, সে-গুলি ভরতপুরের প্রথম রাজা শ্রীধরকে পিতাঠাকুর বদন সিংহ এবং শ্রীধরলেন রাণী গঙ্গা দ্বারা নির্মিত হয়। এই বীবসমীরকে উদ্দেশ্য করিয়া জয়দেব গীত-গোবিন্দে লিখিয়া-ছিলেন :-

“বীবসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী”।

ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে বস্ত্রভরণ-ঘাট দর্শনীয়। এত ঘাটটি শাহজীব মন্দিরের পশ্চাতে এবং ফরুখাব তটে অবস্থিত। এখানে যাত্রিগণ স্নান করে। ঘাটের সন্নিকটে একটি পুরাতন কদম্ববৃক্ষ আছে। তাহার শাখাতে কাপড়ের টুকরা বাঁধা থাকে।

সেবাভূজ।—একটা পাকা ঘেরার ভিতর নানা প্রকারের লতা এবং তম্বালাদি অনেক পুরাতন বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। উক্ত ঘেরার ভিতর একটি ক্ষুদ্র মন্দিরও আছে। সেখানে ত্রীকৃষ্ণাদির মূর্তি অবস্থিত। অস্ত্র ললিতাকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড আছে। এখানে হাজার হাজার বানর বাস করে। যাত্রিগণ বানরগণের আকারে সোণাটীয়া থাকে।

বংশা বট।—গোপেশ্বরের কিছু আগে একটি পুরাতন বটবৃক্ষ আছে। তাহার সন্নিকটে এক প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণের মূর্তি আর রাসলীলার চিত্র দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবীঃ

সেদিনের গাথা ।

যে-দিন—ছিল বাঙ্গালীর প্রতি মেটে ঘরে
ধানের মরাট থরে থবে থবে,
বার বলে সবে অঙ্কার ভরে

যেত না মাটিতে পা দিয়া,—

সে-দিন গিয়াছে চলিয়া ।

যে-দিন—নিজ বাগানের কাঁচা পাকা ফল,
নিজ পুকুরের সুশীতল জল
পাটয় সকল বাঙ্গালীর দল

আনলে উঠিত না'চয়া,

সে-দিন গিয়াছে চলিয়া ।

যে-দিন—পল্লীগামবাণী তত্ত্বায়গণ
বদেশী তুলায় করিত বসন,
কত শত বস্ত্র নয়ন-শোভন

কপালের বাস মুছিয়া,

সে-দিন গিয়াছে চলিয়া ।

যে-দিন—প্রতিগৃহস্থের গোয়ালের আলো
ভিল কত গাভী লাস, সাদা, কাল,
খাটী ক্ষীর সব জানা খেয়ে ভাল

বাঙ্গালী থাকিত বাঁচিয়া,

সে-দিন গিয়াছে চলিয়া ।

যে-দিন—প্রাতঃকালে উঠি' গৃহলক্ষ্মীগণ
গোময় প্রাক্ষণে কবিত লেপন
ঝড়া লয়ে কঁাকে ঘানের কারণ

পথ দিয়া যেত হাঁটিয়া,

সে-দিন গিয়াছে চলিয়া ।

যে-দিন—মিষ্ণু-হাতে মাতা অন্নপূর্ণা প্রায়
বিবিধ বাজনা-রাখিত হেলায়,
পরিভূট করি' খাওয়ায়ে সবায়

স্বামী হ'ত নিজে খাইয়া,

সে-দিন গিয়াছে চলিয়া ।

যে-দিন—অতিথির সেবা হ'ত প্রতি ঘরে,
অন্নদ্বীনে অন্ন খেত পেট ভরে,
আরো কিছু নিয়ে পরদিন তবে

“জয়” গাহি' যেত চলিয়া,

সে-দিন গিয়াছে চলিয়া ।

যে-দিন—ব্রাহ্মণের ছেলে উপনীত হ'য়ে
যেত গুরুগৃহে বিদ্যার আশয়ে,
নানা শাস্ত্র শিখি' অল্পমতি করে

সংসার করিত আসিয়া,

সে-দিন গিয়াছে চলিয়া ।

যে-দিন—বৃদ্ধ মাতাপিতা নিজ পুত্র-করে
বিষয় বৈভব দিয়া সব ধরে
আত্মার উন্নতি-কামনার তবে

থাকিত বনেতে ঘাইয়া,

সে-দিন গিয়াছে চলিয়া ।

যে-দিন—ব্রাহ্মণের কাজ দেব-আরাধনা,
ফজিরের ছিল অস্ত্রে কনুখনা,
বৈশ্য কবিত ব্যবসা'-চালন,

শূদ্র ঘাইত সেবিয়া,

সে-দিন গিয়াছে চলিয়া ।

যে-দিন—পবিত্রসলিলা-ভাগীগণী-পথে
বেদ-মন্ত্র পুত উঠিয়া প্রভাতে
ওঁকার—ওঁকার—ওঁকার সহিতে

ঘাইত গগন ভেদিয়া,

সে-দিন গিয়াছে চলিয়া ।

যে-দিন—ব্রাহ্মণ ছিল সর্কশিরোমণি

অর্থহ্যাগী, যোগী, পরম জ্ঞয়ানী,

রোষানলে ধীর ছোট বড় প্রাণী

ঘাইত তন্দ্র হইয়া,

সে-দিন গিয়াছে চলিয়া ।

যে-দিন—ভারতের পথা ঝাঁকিত ভারতে,
 হ’তো নাকো পরমুখাপেকী হ’তে ;
 হেসে খেলে দিন যেত যাতে তাতে
 বিভূর আশিস্ পাঠিয়া,
 সে-দিন গিয়াছে চলিয়া ।

যে-দিন—বৃদ্ধ-শঙ্করা দি নবমুখবদন
 প্রকাশি’ মুক্তির পথ অগণন
 এক সত্য ধর্ম কবি’ প্রবর্তন,
 গোড়ান অমন হইয়া,
 সে-দিন গিয়াছে চলিয়া ।
 (আব না আসিবে কবিবদন ।)
 শ্রীমদ্রত্ন বন্দোপাধ্যায় ।

বিবিধ সংবাদ ।

১। ব্রিহত্ত-মজঃফরপুর-সাহায্য গ্রামেব সজ্ঞাত ব্যক্তি বাবু আউরঙ্গ দিহাবী মহাশয়ের আকুদিনে পঞ্চাশটি দাবিজ বিদবাকে পঞ্চাশটি সূতা কাটিবার চরকা দান করা হইয়াছে ।

২। এইরূপ শুনা যাউতেছে যে; নবদ্বীপের রামচন্দ্রপুর চরে সাড়ে চৌদ্দ হাত ভূমির নীচে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের নিশ্চিত মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে । সাড়ে চারি শত বৎসর পবে ইহার আবিষ্কার ।

৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অত্রতম হিতৈষী সদস্য ‘বুদ্ধাবনকপা’-প্রণেতা ত্রীমুকু সুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বংস সাহিত্যিকগণের সাহায্য ভাণ্ডারে ১৫০০/- দেড় হাজার টাকা দান করিয়াছেন । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই দান গ্রহণ করিয়াছেন ।

৪। গত সমবকালে প্যাগেটাইন ও মিশরের রেলের সংযোগ-সাধনের জন্ত ফরেন্স-খালের উপর এক সেতু নির্মিত হইতছিল । ইহা শীঘ্রই তাক্রিয়া ফেলা হইবে । কারণ,

ইহাতে ভবিষ্যতে পালের অপরূপ চৌহত পাবে । ইহাও পরিবর্তে এক সড়ক নির্মিত হইবে । এই সড়কযোগে প্যাগেটাইন ও মিশর রেলের সংযোগ সাধিত হইবে ।

৫। কানিশামেন শ্রীনাথচন্দ্র-মহামণ্ডল উইনোপীর যুদ্ধ-স্মৃতি বন্ধার প্রস্তাব করিয়া-ছেন । ইহার প্রস্তাব,—কানিশামে এক “সর্পদর্শন ইয়া” প্রতিষ্ঠিত করা হইবে । এই সম্পর্কে তুলনামূলক দর্শন এবং দর্শন অধ্যয়নের ব্যবস্থা থাকিবে ; আব সর্প দর্শনের সর্প শ্রেণীর শব্দও গাছসমূহও ইহাতে সংযুক্ত হইবে ।

৬। সংবাদপত্রে প্রকাশ—মডেল হাই স্কুলের ভূঁইঃ মাষ্টার মহোদয়গোবিন্দচন্দ্রের নিদ-র্শনরক্ষা মন্তকে প্রাক্রি টাপ দাবণ কদিয়া-ছিলেন বলিয়া, জবাবপূর্ব ইংলিং কলেজের প্রিন্সিপাল ইহাকে সমবেত বা অস্থায়ীভাবে পদচ্যুত করিয়াছেন ।

৭। গত ১৫ ডিসেম্বর চইতে আলগড় বিশ্ববিদ্যালয় আইনকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে ।

আমদানবাহন রাজ্য বিবিবিদ্যালয়ের উইকান-
সেলর নিযুক্ত হইয়াছেন। এই বিবিবিদ্যালয়ের
ব্যক্তি নির্বাহার্ষ গবর্ণমেন্ট বৎসবে ১ লক্ষ টাকা
প্রদান করিলেন।

৮। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ
সৈয়দ হাসান উমাম ৯ট ডি সম্বরের "সার্জ
লাইট" পরে লিপিবদ্ধ হইল,—“আমার মতে
সাহায্যে তাৎক্ষণিক অধ্যয়নটা কার্যতঃ
নিরর্থক নহে, বাস্তবিকভাবে তাৎক্ষণিক ইচ্ছা
অসম্ভব এবং ছাত্রদের ক্ষেত্রে ইচ্ছা একবারে
প্রায়শ্চিন্দ।”

৯। দীর্ঘায়ু :—পেনসিলভেনিয়ায় অসুস্থ
জিমেট-সহরের বেতায়েণ্ড এলবার্ট হোজেল
শুক্রবারের মধ্যে একজন প্রাচীনতম কণ্ঠ
স্বাক্ষর। তাঁহার বয়স ১০২ বৎসব। এখন
পর্যন্ত তিনি অক্লান্তভাবে ধর্ম প্রচার করিতে
ছেন। তিনি বৈদিক জীবনকে নিয়মে আবদ্ধ
করিয়াছেন; তিনি নিয়মিত শাবীরিক পরি-
চর্য ও বহু-দূরব্যাপী ভ্রমণ করেন; তাহাৎ বা
জন্ম গ্রহণ না; মধ্যে মধ্যে নৌকা-ভ্রমণ করেন
ও বৈদিক-অনুযায়ী কাণ্ড করেন। এই
সকলের জন্তই অত বয়স সত্ত্বেও তিনি এখনও
জুড় মেহে বর্তমান আছেন।

১০। পশু বয়স :—পশুবার্জো বোধ
হয় হস্তীই সর্বাধিক বয়স্ক দিন পাঁচ। তাহারা
১০০ হইতে ২০০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।
পৃথিবীতে উল্লেখ আছে যে হস্তী ৩১০ বৎসর
পর্যন্ত বাঁচিতে পারে। তিনি বৎসরবৎ হস্তী

বয়স ১০ বৎসর-ব্যাপী দীর্ঘ জীবন। উক্ত ১৫
বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে। সিংহ ৪০
বৎসর ও ব্যাঘ্র ২৫ বৎসর মাত্র জীবিত থাকে।

১১। হোপী ইণ্ডিয়ানদের বিবাহ-
প্রস্তাব ও বিবাহ :—হোপী ইণ্ডিয়ান কুমারী
নিজের পছন্দমত বর চিত্ত করিয়া তাহাকে
বিবাহ করিতে পার না। সে মনোনীত
বরের মাতার নিকট গিয়া সবল অথচ
দৃঢ়ভাবে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করে। সে
জিজ্ঞাসা করিতে যাঁহার পুত্রের কণ-
করের উপরে চুল দিয়া দুইটি গোলাকার
খোপা তৈয়ার করে। ইহাট নাকি তাহাদের
শ্রোণের বিবাহ-প্রস্তাব করিবার চিহ্ন। তাহার
তারা স্বাক্ষরী সম্মত হইলে, সে লিঙ্গ দ্বিন
স্বয়ং তাহা স্বতন্ত্র-পুত্রে বা তাহাঙ্গার কাণ্ড
করিবে। এ-দিকে পাত্রীও যে নিকট হইয়া
বাসিয়া থাকিবে, তাহা নহে। সেও তাহা
পাত্রীর বিবাহ-পারদর্শন দ্বিতীয় প্রাকাবে।

১২। অন্ধ নারীর কাজ—১৯১৯ সালে
Ohio stateএ অন্ধ নারীগণ নিজ হস্তে
পর্বে মুড়িয়া ১৮৬০০ তোয়ালে সেলাই করি-
য়াছে ও ৪৮০০০ apron (বস্ত্র-রক্ষণী)
সেলায়ের কলে তৈয়ার করিয়াছে। (Bangor
Daily News.)

১৩। আমেরিকায় নাপিতের মাহিনা :—
Boston Globeএতে একটা নাপিতের
বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। তাহার মাহিনা
সপ্তাহে ৭৫ টাকা, অর্থাৎ মাসে ৩০০ টাকা।

• সংগ্রহীত—শ্রীমতী জব্বা সিংহ।

বামানুবিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কড়ক প্রবর্তিত।

পৌষ, মাঘ ও কাশ্বন ১৩২৭—জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, ১৯২১।

সূচী

নিমন্ত্রণ (কাবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার ভট্টাচার্য্য বি-এ	...
ভাণ্ডার-ভূমি (উপন্যাস)	শ্রীমতী চাক্ষুশালা মিত্র	২৫২, ৩০০, ৩২০
মিলন-ফল (কাবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেশকুমার দত্ত	২৬২
স্বা-শিক্ষা ও স্বা-সাধীনতা	শ্রীমতী—	২৬২
চিহ্নের চিত্র-নবীনতা (কাবিতা)	শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র বড়াল বি-এস	২৬৩
শ্রীনার শিখা (উপন্যাস)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজাঙ্গা, মদনমতী	২৭৩, ৩৮২, ৩৯৫
মানবের মৃত্যু (কাবিতা)	শ্রীযুক্ত সত্যজিতি বিহারীদত্ত	৩৯৬
গঙ্গাব-সঙ্গ (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)	শ্রীযুক্ত দত্তবংশ দত্ত	...
গুণ-কমলা (কাবিতা)	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	২৯৩
জিহ্বা-গান (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)	শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র বড়াল, বি-এস	৩০৫
জীবন-সংগ্রহ (কাবিতা)	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৩০৬
ভাণ্ডার-ভূমি (কাবিতা)	শ্রীযুক্ত কমলকুমার মল্লিক	৩০৭
ভাণ্ডার-ভূমি (কাবিতা)	শ্রীমতী কমলা মিত্র	৩০৮
পারের ভাণ্ড (কাবিতা)	শ্রীমতী শান্তিপ্ৰভা দাস	৩১২
কি (কাবিতা)	শ্রীমতী শান্তিপ্ৰভা দাস	৩১৩
কি (কাবিতা)	শ্রীযুক্ত—	...

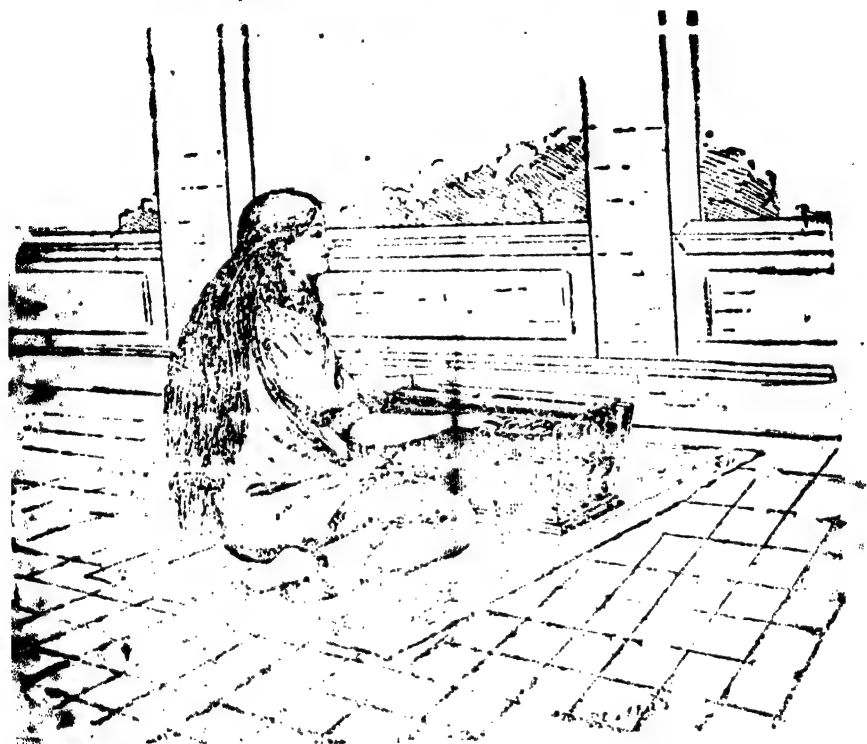
১৩ নং বাবিলগী রোড ষ্ট্রীট, কলকাতা প্রেসে প্রিন্ট করা যবে সেন কড়ক মাসিক পত্রিকা
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত কড়ক ৩১ নং এটেনীয়া রোড বেন হাউজে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫/০ ; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৫/০ :

প্রভাচ সংখ্যান মূল্য ১০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়াকি হারমোনিয়ম ।

বাজারে জিনিদের মত নয় ।



বাগ্ম হারমোনিয়ম—

১ সেট লিড মূল্য ১০০ ও ২৫০ টাকা ।

২ সেট লিড মূল্য ৩০০, ৪০০, ৪৫০, ৫০০ হইতে ১২০০ টাকা পর্যন্ত

ফোর্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৫০, ৫৫০, ৭০০, ৭৫০ ও ১০০০ টাকা ।

বেহালা—মূল্য ৫০, ১০০, ১৫০ ও ২৫০ হইতে ৩০০ টাকা পর্যন্ত ।

সেতার—মূল্য ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০ ও ৩০০ টাকা ।

এসবাজ—মূল্য ১২০, ১৫০, ১৮০, ২০০ ও ২৫০ টাকা ।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয় ।

ডোয়াকি'ন এণ্ড সন,

৯১ নং ডালহাউসি কোয়ার, লালদীঘী, বালিকাজ ।

বাগ্যাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 689.

January, 1921.

“কণ্যাপোষং পালনীয়া শিক্ষণীয়ত্বমুভয়ং ।”

কন্যাকে ও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে ।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কৃত্তিক প্রবর্তিত ।

৫৮ বর্ষ ।
৬৮৯ সংখ্যা ।

পৌষ, ১৩২৭ । জামুয়ারী, ১৯২১ ।

১২শ কল্প ।
১ম ভাগ ।

“নিমন্ত্রণ ।”

(১)

রবাহৃত আমি নহি !—

গঞ্জনা মোরে দিও না তোমরা,

অনাহৃত আমি নহি !

তোমরা যেহে না সকলে চলিয়া,

আমার পথের মাঝারে ফেলিয়া,

মরিব অচেনা এ পথে ঘুরিয়া ;

সাথী আর কেহ নাহি ।

অবহেলা মোরে করিস্ নে ভাই !

দাঁড়া মোর সুখ চাহি ।

(২)

আহা !—যেপার তোমরা যাবে গো !

কত না শাস্তি বিরাজিত সেথা—

কত আনন্দ পাবে গো !

সেথা সব সুন্দর, সকল সত্য

সব মঙ্গল, সকল নিতা,—

ভারি তরে মোব ধাইছে চিত্ত,

পায়ে ধরি সাথে লও গো !

আহা ! যেপার তোমরা যাবে গো !

(৩)

অনাহৃত সুরে আশান তোর

উঠে অধর ছাপিয়া ;

সেই আমন্ত্রণ স্তনি প্রাণে প্রাণে

আসিয়াছি আমি ষাইয়া !

গিরি কান্তার অনিল অনল

ছুটেছে সকলে উধাও বিভল,

তটিনী চলেছে হেসে থলথল,

আমি কি বহিব পড়িয়া ?—

অনাহৃত ভেবে অবহেলা ভরে

যেহে না আমাঝে ফেলিয়া !!

(৪)

বিবাক আমন্ত্রণে—

তোমরা তাঁহার যোগ্য অতিথি,

চলেছ কল্প-মনে ।

দত্ত সম্ভারে পূর্ণ করিয়া

পূজা উপহাস নিতেছ বহিয়া ;

তোমাদের তিনি নেবেন কুমিয়া

সাদর সম্ভাসনে !—

তাই চলেছ কল্প মনে !

(৫)

ওগো ! দাঁড়াও ক্ষণেক তরে—

আমি ত কাহারো করিব না ক্ষতি

নিয়ে গেলে সাথে করে !

অক্ষম আমি বিত্ত ভিখারী !—

তাঁরে দিতে কিছু নাই যে আমারি ।

নিজের দীনতা শুধু মনে করি

অশ্রু পড়িলে করে !

ওগো ! নিয়ে যাও সাথে করে !

শুধু একধারে ঘৃণা কুড়াইল

থাকিব কেনন পড়ে !

শ্রী প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য ।

জাহাজ-ডুনি ।

(১৫)

নূতন জমীদার এবং তাঁহার পারিষদবর্গের অত্যাচারে দেশের লোক উত্ৰাক্ত হইয়া তাঁহাদের নির্দাসন কামনা করিতেছিল। কোন কোন মহলে প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজনা বন্ধ করিয়াছিল এবং সুবিধা পাইলে সময়ে সময়ে জমীদারের অত্যাচারী লোক-জনকে প্রহার পর্য্যন্ত করিত। উপেক্ষা-কিশোর বাবুর সুবৃহৎ জমীদারীর মধ্যে ধীরে ধীরে একটা বিদ্রোহাগ্নি প্রধুমিত হইয়া উঠিতেছিল। এই অল্পকালের মধ্যেই প্রজাদিগের মধ্যে বেরূপ বিদ্রোহভাব আগিয়া উঠিতেছিল, তাহাতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া জমীদার-বন্ধ-সম্বন্ধে জমীদার যে চিন্তাকুল হইয়া উঠেন নাই, তাহা নহে ; কিন্তু তিনি সর্বদা বিলাস-সাগরে মগ্ন, গৃহের বাহিরে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা দেখিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না ; এবং প্রজাদের মধ্যে কিরূপে শাস্ত্র স্থাপিত হয়, সে বিবেচনার শক্তিও তাঁহার ছিল না। তাই তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হারামন কৌশল করিয়া রাধাগোবিন্দবাবুকে হস্তগত করিয়া সংকল্প করিল। হারামন কৌশল-বিদ এই-বিবাহের প্রস্তাব রাধাগোবিন্দ-

বাবর নিকটে উপাধন করিলে, তিনি অসম্মত হইবেন না। একদিন যাহার বেতনভোগী কর্ম্মচারিমাত্র থাকিয়া তাঁহার এতটা খ্যাতি-প্রতিপত্তি, আজ তাঁহার পুত্রের হস্তে পৌত্রী-সমর্পণ করা ত তাঁহার পক্ষে পবনসোতাপোর বিষয় ! তিনি যে উচ্চাতে অসম্মত হইবেন, তাহা তাহার মনে করিতে পারে নাই। তাই তাহারা পবনসম্মত করিয়া বিবাহের প্রস্তাব উপাধিত করিবাব অল্প রাধাগোবিন্দবাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। রাধাগোবিন্দবাবু যখন ঘণা-ভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন হারামনের ক্রোধেব সীমা রহিল না। তাহার দৃঢ় সংকল্প হইল, যে প্রকারেই হউক রাধাগোবিন্দবাবুর পৌত্রীর সহিত জমীদারের বিবাহ দিতেই হইবে ! এক্ষণে অল্প কোনরূপ উপায় না থাকায়, তাহার নীতিমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া মনঃস্থ করিয়া, তাহারই সুযোগ অল্পসন্ধান করিতে লাগিল ; এবং দৈবক্রমে সে সুযোগ উপস্থিতও হইল।

তাহারা নীতিমাকে লইয়া গিয়া একটা কক্ষ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আশা—
হই নিম্ন গবে উভয় জমীদারের সহিত

তাহার বিবাহ দিবে। সপাবিধ জমীদারের
অন্তরে মহাহর্ষ! আর দুইটা দিন যেমন
তেনন করিয়া কাটিলে হয়! অসামান্য রূপসী
তাঁহার অঙ্কলক্ষী, গৃহলক্ষী হইবে! সন্ধ্যা-
প্রাক্কটত শুভ মল্লিকাকুসুমের মত একটী
সুকোমল সুন্দরী বালিকা তাহার বংশন-গঞ্জন
আঁধ-হুইটী লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে।
আর তিনি সেই অপারোবিনিকিত সুকুমারী
বালিকাটিকে বক্ষে ধারণ করিয়া জীবন ধন্য
করিবেন। সেই কল্পনাতেই জমীদার
বিভোর!

বিবাহের সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত,
কিন্তু কাহারও খুব গোপনেই সম্পন্ন করিবার
সংকল্প হইরাছে। স্বর্ণ ও বোপোর হাল্কা নিয়া
পুরোহিত-ঠাকুরের মূখ বন্ধ করা হইরাছে।
তিনি একথা কাহারও নিকটে প্রকাশ না
করিয়া গোপনে জমীদারের বিবাহ-নিয়ম
সম্পন্ন করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।
কিছুদিন পূর্বে এই ভট্টাচার্য্য পাড়া বাসা-
গোবিন্দবাবুর সহপাঠী মহামায়াব মাতী-
চতুর্দশী-ব্রত-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রচুর অর্থ এবং
নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভারাদিতে বৃহৎ পূর্ণ করিয়া
ফেলিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পরে স্বয়ং জমীদার এবং তাঁহার
দুই হস্তবন্ধ দুই পারিধন হারাদন ও পরাণ—
এই ত্রিমূর্তি বিতলেব একটা প্রশস্ত কাফ
বসিয়া সুবাসবীর আরাধনার নিযুক্ত। কক্ষের
মধ্যস্থলে একটা মন্দির-প্রস্তবেশ বৃহৎ টেবিল।
টেবিলেরিয়া চতুর্পার্শ্বে কতকগুলি স্ত্রী-দের
গবীপুত্র সুদৃশ্য কাঠাসন। তাহারই তিনপানি
অধিকৃত করিয়া ত্রিমূর্তি বিরাজ করিতেছিলেন।
টেবিলের উপর মোতল মাস এবং রূপার ট্রে

করিয়া নানাবিধ ষাটোজবা বধানিরমে সজ্জিত
ছিল। সুবাসবী তখনও তাঁহাদের উদর
অতিক্রম করিয়া মস্তকে উঠিতে সমর্থ হন
নাই। তাহাদের এই সাক্ষাভোজনের আয়ো-
জন করিয়া দিত কানাই। কানাই চলিয়া
যাইবার পরে এ কার্য্যভার পাইয়াছিল বলাই।
বিন্দু আজ তাঁহাদের এ অমূল্য সময়টুকুতে
বলাই অতৃপ্তিত। মাসে মদিরা ঢালিয়া
দিবার জন্য আজ কেহই তাঁহাদের আদেশেব
অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া নাই। আজ তাঁহারা
নিজেরাই ঐকবে মদিরা ঢালিয়া গলাধঃকরণ
করিতেছিলেন। অবশ্য ইহার অল্প তাঁহাদের
কষ্ট ও অসুবিধার গীমা ছিল না। অনেক
ডাকাডাকির পরও যখন শ্রীমান বলাইটাদেব
কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেলনা, তখন হারাদন
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, “বলা ব্যাটা
আজ গেল কোন চুলায়?” ক্রুদ্ধবরে পরাণ
বলিল, “নিশ্চয় ব্যাটা কোনও কু-মন্তলকে
ফিরাছে। ব্যাটা থাকে থাকে একেবারে
যেন কোথাও উদাও হয়ে যায়।” এমন
সময়ে পায়ের হাঁটুতে পানিকটী নেকড়া জড়া-
ইয়া খোড়াইতে খোড়াইতে স্বয়ং বলাইটাদ
মশবীবে তথায় উপস্থিত হইল। ধমক দিয়া
হারাদন বলিল, “কোথায় গেছনি যে ব্যাটা-
কেলে! এতক্ষণ ছিল কোথায়? কাজের
সময়ে ব্যাটাকে যদি একবার দেখতে পাওয়া
যায়! উল্লুক, কোথা কোথাকার—!”

বলাইটাদ হাঁটুতে জানাইল, সন্ধ্যার পর
পুকুরে গা ধুইতে গিয়া পা পিছলাইয়া সে জলে
পড়িয়া গিয়াছিল। পুকুরিণীর গোপানে
আঘাত লাগিয়া তাহার পায়ের হাঁটুটা কাটিয়া
গিয়াছে;—শব্দ চাকর যদি সেই সময়ে আসিয়া

না পড়িত, তাহা হইলে তাহাকে আজ সেই পুকুরের জলেই পকর পাইতে হইত।

ক্লান্ত হইয়া পরাণ বলিল, “ব্যাটা আমাদের ভাকা পরেছে; আমরা কিছু বুঝি না?” এই বলিয়া পরাণ চেরার ছাড়িয়া উঠিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে বলাইয়ের একটা হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করে এক পদাঘাত করিল। বলাই পড়িয়া কঁাদিতে কঁাদিতে কাতরভাবে ফণাল ক্যাল করিয়া জমীদারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহা দেখিয়া জমীদারের প্রাণে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি পরাণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আহা, কি ও। ও একটা হাবা কালা গো-বেচারী মানুষ, ওকে তোমার সন্দেহ করবার কোনও কারণ নাই। দাঁও দাঁও ও-বেচারাকে ছেড়ে দাঁও।” এই বলিয়া তিনি বলাইকে বলিলেন, “বা বা, তোর নিজের কাজ করগে বা! আর কোনও দিন এমন সময় কোথাও বাস্ নি; আনিস্ এ সময়ে আমাদের খাবার সময়।” পরাণ জমীদারের অনুরোধে বলাইয়ের হস্ত পরিত্যাগ করিয়া নির্দিষ্ট চেরারে আসিয়া উপবেশন করিল, বলাইটাদি চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্বকার্যে চলিয়া গেল।

হারান ও পরাণ নীলিমাকে আনিয়া তাহাকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিল; তাহাকে প্রবোধ দিবার জন্য বখাসাধা চেষ্টা করিয়াছিল। ‘তাহার কোনও ভয়ের কারণ নাই, তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; সে এই গৃহের একমাত্র কর্ত্রী হইয়া প্রথম জুখে কালাতিপাত করিবে; এ গৃহে বিষয়-সম্পত্তি, হীরা-রক্তার গহনা, সবই তাহার’—এই সকল কথা নীলিমাকে

বুঝাইতে তাহার কিছু মাত্র ক্রটি করে নাই। স্বয়ং জমীদারও তাহাকে আকর্ষণের বহুতর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু বন্দিনী নীলিমা এই সকল প্রবোধবচনে বিন্দুমাত্র সান্না লাভ করিতে পারিল না। বিকলমনোরথ হইয়া জমীদার চলিয়া গেলেন। তখন তাহার বন্ধুদ্বয় নীলিমাকে একটি কক্ষে আবদ্ধ করিয়া ঘারে তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

এই কক্ষে আশালতা ও অমরকুমার শয়ন করিতেন। আশালতার আমলে কক্ষটি যেমন সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন ছিল, এখন তাহার লেশমাত্র নাই। চেরার, টেবিল, আরনা প্রভৃতি আসবাব-পত্রগুলি অথক্রে পড়িয়া রহিয়াছে। খাটের উপর শয্যারও সেই অবস্থা। তবে আজ নীলিমার জন্য ভৃত্য আদেশমত তাহার শুলি বাড়িয়া ময়লা চাদরখানা তুলিয়া গদির উপর একখানা পরিষ্কৃত চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। নীলিমা কিন্তু সে শয্যা স্পর্শও করে নাই। যে কক্ষে যে শয্যা বসিয়া নীলিমা আশালতার সহিত কত গল্প করিয়াছে, তাহার কাছে বসিয়া কত শিরকার্য শিখিয়াছে, আশালতা বিহনে সে কক্ষ তাহার আশান-সদৃশ বোধ হইল। যাহার অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করিয়া সে নিজের গৃহ ও আত্মীয়-স্বজনের কথা বিস্মৃত হইয়া যাইত, আজ তাহার সেই স্নেহময় কাকাবাবু ও মেহময়ী কাকীমা কোথায়! তাহার থাকিলে আজ তাহাকে দয়া-হস্তে বন্দিনী হইয়া এই কক্ষে এমনি ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত না। নীলিমা এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। এই শত্রু-পূরী হইতে উদ্ধারের কোন উপায়

নিরুপণ করিতে না পারিয়া সে হতাশ হইয়া
কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে
হারাদন রূপার খালায় করিয়া নানাবিধ খাদ্য
এবং একটা রূপার গ্লাসে করিয়া এক গ্লাস
শীতল জল লইয়া আসিয়া নীলিমাকে তাহা
আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে
লাগিল। কিন্তু নীলিমা কিছুতেই তাহা
খাইতে সম্মত হইল না। তখন আর অধিক
পীড়াপীড়ি করিয়া গোলযোগ-বৃদ্ধি করা
যুক্তিসঙ্গত নয়, মনে করিয়া সে তাহা গৃহের
এক পার্শ্বে রাখিয়া পুনর্বার দ্বারে তালা
লাগাইয়া প্রস্থান করিল এবং নিজেদের
পান-ভোজনে রত হইল; ভাবিল, ক্ষুধার
উদ্রেক হইলে আপনাই খাইবে। কিন্তু
নীলিমা হতভাগ্যদিগের সে-পাদা স্পর্শও
করিল না। সে সমভাবেই গৃহতলে পড়িয়া
নয়নজলে বক্ষ ভাসাইতে লাগিল।

পরানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া
বলাইচাঁদ নীলিমার রুদ্ধ কক্ষদ্বারের পার্শ্বে
আসিয়া দাঁড়াইল। কক্ষ-মধ্যে একটা রঙ্গিন
আলোকের ঝড় জ্বলিতেছিল। তাহার
উজ্জল নীল আভার কক্ষটা উজ্জল হইয়া
উঠিয়াছিল। ঘরদ্বার ফাঁক দিয়া বলাই
দেখিল, নীলিমা গৃহতলে পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া
কাঁদিতেছে। তাহার কবরী-বন্ধন শিথিল
হইয়া ধূলার লুপ্তিত হইতেছে। এই শোকাবহ
দৃশ্য-দর্শনে বলাইয়ের হৃদয় হইতে লাগিল,
একটা পদাঘাতে গৃহের কপাটটা বিচূর্ণ করিয়া
এই পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গীকে মুক্ত করিয়া
তাহার গৃহে রাখিয়া আসে। কিন্তু এই শত্রু-
পুত্রীর মধ্যে শত্রু-বেষ্টিত থাকিয়া একাকীর
এ-কাজ সহজসাধ্য নয়, মনে করিয়া বলাই

মনে মনে অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।
তাহার পর বজ্রাভ্যন্তর হইতে এক টুকরা
কাগজ ও পেন্সিল লইয়া বড় বড় অক্ষরে
লিখিল—“ভয় নাই!” লিখিয়া কপাটের ফাঁক
দিয়া কাগজের টুকরাটুকু গৃহমধ্যে কেলিয়া
দিল। নীলিমা কপাটের পার্শ্বেই শয়ন
করিয়াছিল; কাগজের টুকরাটুকু তাহার
ঠিক সম্মুখেই পড়িল। সে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু
সেই অক্ষর-চারটি পড়িয়া তাহার কোনই
মর্ম্ম বৃদ্ধিতে পারিল না। কে এ শত্রু-পুত্রী-
মধ্যে “ভয় নাই” বলিয়া তাহাকে আশ্বাস
দান করিতেছে? এ কি দেবতার অতর-বাণী,
না শত্রুর চাতুরীজাল? মানুষ বিপদে পতিত
হইলে স্বভাবতঃ তাহার মনে কুচিন্তারই উদ্রেক
হইয়া থাকে। স্বতরাং নীলিমার মনেও তাহা
শত্রুর চাতুরী বলিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত হইল।
যে মুহূর্ত্তেই বলাই কাগজের টুকরাটুকু কক্ষ-
মধ্যে নিক্ষেপ করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই
কালান্তক বম-সদৃশ পরাণ বলাইয়ের পশ্চাতে
দাঁড়াইয়া বজ্র-গভীরস্বরে বলিল, “ব্যাটা!
শুয়ার, এখানে কি হচ্ছে? তালা ভাঙবার
চেষ্টার আছ বুঝি? তুনি না বড় সাধু?”
এই বলিয়াই বলাইয়ের একখানা হাত ধরিয়া
হড় হড় করিয়া টানিয়া পার্শ্বের ঘরে লইয়া
গেল। বলাই কাতরভাবে ইজিতে জানাইল,
তাহার কোনও অপরাধ নাই। ঘরের
ভিতর একা মেরেটা কি করিতেছে, তাহাই
সে একবারবার উকি দিয়া দেখিতেছিল।
তাহা ভিন্ন তাহার অন্য কোনও সপন্যাস
নাই। পরাণ তাহার এ কৈকিন্তে লক্ষ্য না
হইয়া বলিল, “জানিস ব্যাটা! তোমার জীবন
আমার হাতে।” তাহার পরে তাহাকে একটা

ভীষণ পাক্সা মারিয়া সেই কক্ষ-মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গৃহদ্বারে শিকল তুলিয়া দিয়া তাহাতে স্ফূট তাল লাগাইয়া দিল। বলাই সেই কক্ষ-মধ্যে বন্দী হইয়া রহিল।

(১৬)

এক দিন, দুই দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। বলাই সেই কক্ষ-মধ্যেই আবদ্ধ রহিল, কেহ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিল না কিংবা হত্যা করিতেও আসিল না। সে পলে পলে মুক্তি অথবা মৃত্যুর জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। সে এক একবার মনে করিতে লাগিল, হয় তো স্বয়ং জমীদার আসিয়া দয়া করিয়া গৃহের কপাট খুলিয়া তাহাকে মুক্তি দিয়া যাইবেন। কেন না, বলাই না হইলে ত তাহার একদণ্ডও চলিবে না। আবার একবার সে মনে করিতে লাগিল, পরাণের কু-পরামর্শে তিনিও নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; এখনি পরাণ আসিয়া একটা লাঠির আঘাতে কিংবা একটা গুলির ঘায়ে অথবা এমনিই একটা কিছু ঘায়া তাহার জীবন-প্রদীপটা নিবাইয়া দিয়া যাইবে। রাজির পর প্রভাত, প্রভাতের পর মধ্যাহ্ন, তাহার পর সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর আবার রাত্রি, এইরূপ করিয়া সুদীর্ঘ ছত্রিশ ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গিয়া আবার রাত্রি দেখা দিয়াছে। সে সেই একভাবেই সেই কক্ষমধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে; কেহ তাহাকে কিছুই খাইতেও দিয়া যায় নাই, কিছু বলিতেও আসে নাই। ক্রমশঃ ক্ষুধার তৃষ্ণার তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার গা মাথা যেন কেমন কিম্ব কিম্ব করিতে লাগিল। সে সেই গৃহভূলে হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

কিন্তু তাহাতেও সে স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া গৃহের চতুর্দিক বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল কোথাও কোনও প্রকারে পলায়নের পথ আছে কি না, কিন্তু সে উপায় কিছুই দেখিতে পাইল না। গৃহের জানালা, কপাট স্ফূট। জানালার লৌহদণ্ড-সকল স্ফূট ভাবে জানালার পথ রক্ষা করিতেছে। প্রত্যেক গরাদে-টিকে সে প্রাণপণ শক্তিতে টানিয়া দেখিল, কোনটা ভাঙ্গা যায় কি না; কিন্তু তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, দুই হস্তে দুইটা গরাদে ধরিয়া বাহিরের বাগানের দিকে চাহিয়া সে কত কি ভাবিতে লাগিল। অধিকক্ষণ একরূপভাবে সে দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারিল না। ক্ষুধার তৃষ্ণার তাহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একজন্ত সে শুইয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যেই নিদ্রাভিত্ত হইয়া পড়িল। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল, তাহার স্থিরতা নাই। যখন সে চক্ষু মেলাই চাহিয়া দেখিল, তখন রাজির গভীর অন্ধকারে ঘব পূর্ণ। হঠাৎ তাহার মনে হইল, কিসের যেন একটা খট খট শব্দ হইতেছে। প্রথমে সে তাহা গ্রাহ্য করিল না, কিন্তু শব্দ যেন ক্রমশঃ আরও নিকটে, তাহার পার্শ্বে, জানালার নীচে বলিয়া অজুমিত হইল। সে একবার ভাবিল, উঠিয়া দেখে—ব্যাপারটা কি! কিন্তু উঠিবার শক্তি নাই, মাথা ঘুরিতেছে। চক্ষু বুজিয়া সে শুইয়াই রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল জানালা দিয়া যেন কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া কে কি অতুসন্ধান করিতেছে। তখন সে মনে করিল, বোধ হয় চোর চুকিয়াছে। নচেৎ সহজ পথ পরিত্যাগ

করিয়া এ-ব্যক্তি বাগানের দিক্ হইতে জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিল কেন? আগন্তুক যখন ধীর পাদবিক্ষেপে কক্ষ-মধ্যে বিচরণ করিতেছিল, বলাই তখন আর চূপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—“কে?” আগন্তুক ধীরে ধীরে বলিল—“চূপ!”

ব। কে তুমি? কি চাও?

আ। উঠে আসুন, বলি!

বলাই চম্কিয়া উঠিল, স্বর যেন তাহার পরিচিত বলিয়া মনে হইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আগন্তুকের নিকটনিকট হইয়া তাহাকে ভালরূপে দেখিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। আগন্তুক পূর্ব্ববৎ অতিধীরে ধীরে বলিল, “শীগগির শীগগির, আর দেখি নয়! জানালার নীচে মই লাগানো, আপনি আগে নেমে যান, তার পরে আমি যাচ্ছি।”

বলাই আর কিছু বলিল না, স্বপাশিষ্ট ব্যক্তির মত বিনা-বাক্যবাহ্যে ক্ষিপ্ৰগতিতে বাতায়ন পথ দিয়া মই বহিয়া পলায়ন করিল। অজুত ক্লান্তদেহে সে কোথা হইতে যেন অস্তরের বল পাইল। নীচে নামিয়া একবার তাহার নীলিমার কথা মনে হইল। এমন সময় আগন্তুক তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বলিল, “কি এমনও দাঁড়িয়ে কেন?” বলাই বলিল, “নীলিমা—”

বাধা দিয়া আগন্তুক বলিল, “সে ভাব আমার!” বলিয়াই হস্তোড়োলন করিয়া সে কি ইঙ্গিত করিল। আগন্তুকের দৃষ্টপথে বলাই চম্কিয়া উঠিয়া বলিল, “আদর্শই কি কাল স্নাত্তিতে আমাকে সংসদান করে নিলেন—

আগন্তুক বলিলেন, “সে পরিচয় দিবার এখন সময় নয়।”

তখন কৃষ্ণা নবমীর ক্ষীণ চন্দ্রালোক গাঢ়ের ফাঁক দিয়া উঁকি দিতেছিল। বলাই-চাঁদ আর কিছু না বলিয়া প্রাচীর উন্নয়ন-পূরক পলায়ন করিল। এদিকে আগন্তুক পূর্ণ উপায় অবলম্বনে নীলিমার গৃহে জানালার নীচে মই লাগাইয়া জানালার কাঠ কাটিয়া ঘোটা-চুপ গলাদে সবাইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছিল। নীলিমার চক্ষেও ঘুম ছিল না। আগন্তুক এতকণ এত সন্মুখণে চোখের মত যে বিন্দু কাটিতেছিল, নীলিমা তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই। হঠাৎ ঘরের ভিতরে মনুষ্য বৈশিষ্ট্য ভয়ে সে একেবারে কেমন হইয়া পড়িল। যদিও আগন্তুকের আকৃষ্ট মস্তাব কোনও চিহ্ন বিদ্যমান ছিল না, তবুও নীলিমা তাহাকে দম্ভা বলিয়াই অনুমান করিয়া লইল।

আগন্তুক বলিল, “ভয় কোর না, আমার সঙ্গে এস! আমি শত্রুপক্ষের লোক নই। আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।”

নীলিমা কোনও উত্তর করিল না, সেই-ভাবেই বসিয়া রহিল। তাহাকে এইরূপভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আগন্তুক বাস্তবতাবে বলিল, “শীগগির এস, আমি দেখী করবায় সময় নষ্ট।” তথাপি নীলিমাকে নীরব ও সন্দেহভিত্তি দেখিয়া আগন্তুক বলিল, “বিশ্বাস কর, নীলিমা! আমি তোমার শত্রু নই। যদি তুমি যেতে চেষ্টা কর, তাহলে আর হবে তো তোমাকে উদ্ধার করার সময় নয়। এস মা

অন্যি সশব্দে পূঁহের কপাট খুলিয়া গেল। পরাণ কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্তবরে বলিল, “বলা ব্যাটা! সিঁধ কেটে পালিয়ে এসেছ বুঝি? ব্যাটা, চোরের উপর বাটপাকী!” তাহার পর আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, “না ত বলা নয়! কে তুই?” তাহার পর নীলিমার মুখের দিকে চাহিয়া কঠোরস্বরে বলিল—“কে ও?”

নীলিমা তখন ভয়ে ধর ধর করিয়া কাঁপিতেছিল; পরাণচন্দ্রের কথার কোনও উত্তর দিতে পারিল না। পুনর্বার পরাণ ঐ প্রশ্ন করিল। তখন ভয়ে ভয়ে অড়িতস্বরে নীলিমা বলিল, ‘জানি না’! পরাণ পূর্ববৎ কঠোরস্বরে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, “কে হয় ও তোমার?” নীলিমা তেমনি ভাবে উত্তর করিল—“কেউ নয়!”

মৃৎ ফিরাইয়া পরাণচন্দ্র চাহিয়া দেখিল আগন্তুক পলায়নপর। তখন সে ক্রোধে নিফল গর্জন করিতে লাগিল এবং নীলিমাকে অস্ত্র বন্ধে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া কক্ষান্তরে লইয়া চলিল। নীলিমা নিজের যন্ত্র-চালিত পুতলিকার দ্বারা তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এমন সময়ে স্বয়ং জমীদার মহোদয়ের প্রসাদে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া টলিতে টলিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরাণ নীলিমাকে লইয়া বাইতেছে দেখিয়া তিনি ক্রোধে দিগ্‌বিদগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া অড়িতস্বরে বলিলেন, “পাজী, বুড়ো বয়েসে এখনও এত দোত? আমার মূখের গ্রাস কেড়ে নিতে এসেছ? এত বড় স্পর্ধা!”

উত্তেজিত ভাবে পরাণ বলিল, “কা’কে

কি বল, তার হিসেব নেই? মৃৎ সামলে কথা কও?”

জমীদার তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “ইঃস্! ভয় দেখানো হচ্ছে! তোর বাবার বিষয় নাকি?”

তবুও পরাণ ক্রোধ দমন করিয়া ধীরভাবে বলিল, “বেতর খেয়েছ, এখন তোমার মাথা ঠাণ্ডা নেই, তাই কমা কচ্চি! কিন্তু সানধান করে দিচ্ছি, চটিও না আমার, আমি তোমার ভাল করতেই যাচ্ছি।” এই বলিয়া যাহা যাগ ঘটয়াছিল তাহা সে সমস্ত বর্ণনা করিল। চুরমাতাল জমীদার-মহোদয়ের তখন সে সকল কথা কর্ণগোচর হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না। তিনি পরাণের কথার কোনও উত্তর না, দিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিলেন, “ভাগো হিঁরাসে! জলদি ভাগো! উল্লুক কাঁহাকা!”

পরাণ আর সহ্য করিতে পারিল না। অদমা ক্রোধে গর্জিয়া উঠিয়া পরাণ বলিল, “বটে! ভারি তেজ হয়েছে দেখতে পাই যে! যত কিছু বলছি না বলে বুঝি? জানিস তোর এতেজ এপুনি বার করে দিতে পারি। ভাল চাস তো, এখনও সরে যা বলছি; নইলে তোর ডাড়ীর হাল করে, তবে ছাড়ব, তা জানিস! আমাকে অপমান করলে তোর ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।”

বিজ্ঞপের হাসি হাসিয়া জমীদার বলিলেন, “ও! ব্যাটা আমার লাট সাহেব হয়েছেন দেখতে পাই! আমাকে চোখ রাতানো হচ্ছে! আমি যেন ঠুর বিষয় খাচ্ছি আর কি!”

প। কে কার বিষয় খাওয়ার দেখিয়ে দিচ্ছি!

জব্বার "হায় সিং, হায় সিং! তেওয়ারি, জব্বার ইলেকো কান ধরকে পাকাড়কে নেকাল বে'ও", বলিয়া হাঁক দিলেন। অদম্য ক্রোধে কাপিতে কাপিতে পরাণ বলিল, "কে কা'কে নেকাল দেয় দেখাচ্ছি।" স্ত্রাপানাসক্ত উন্নত জব্বার পরাণকে তখন এক ভীষণ পদাঘাত করিলেন। পদাঘাত পরাণ ক্রুদ্ধ ক্রুদ্ধসর্পের মত গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, "এর শোধ তুলব, তবে জল গ্রহণ করব।" বলিয়াই সে হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া বাইবার কিছুকণ পরে ব্যতভাবে হারাবদ-আসিয়া বলিল, "সর্কনাশ হয়েছে। জানালা ভেঙে বলাই পালিয়েছে। নিশ্চয় সে কোন কু-মতলবেই গেছে।" তখন বোধ হয়, জমীদারম-হাশয়ের নেশা কিঞ্চিৎ ছুটিয়া গিয়াছিল; তিনি তন্ত্রিত হইয়া বলিলেন, "আঁ।" হারাবদ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, গৃহের জানালা ভাঙিয়া বলাই পলায়ন করিয়াছে এবং ঐ রকম জানালা ভাঙিয়া নীলি-মাকে লইয়া পলাইবার উপক্রম হইতেছিল, এমন সময় দৈবক্রমে পরাণ আসিয়া পড়াতে নীলিমাকে কেহ লইয়া বাইতে পারে নাই; কিন্তু শত্রু পিছু লাগিয়াছে।

জব্বারবাবুর স্তম্ভভঙ্গ তখন হইয়া গেল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। হারাবদ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "তুমি ভেব না, আমি এখুনি এমন একটা ব্যবস্থা করি যে রাধা-পোষিক আর তোমার কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। তা'কে হাত করতে পারলে, আর কোন তাবনা থাকবে না।" বলিয়াই সে সে-স্থান হইতে দ্রুত চলিয়া গেল।

অরকণ পরেই হারাবদ পুরোহিত-ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল এবং বলিল, "ঠাকুর এই রাজ্যেই বাবুর বিয়ে দিয়ে দাও, আমাদের সমস্ত উদ্ধার হয়ে আছে।" পুরোহিত-ঠাকুর বিষয়-বিস্তারিতভাবে হারাব-দনের সুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ একুশি কেমন করে বিয়ে হতে পারে?"

হা। কেন পারে না?

পু। আজ তো বিয়ের লগ্ন নেই।

হা। আরে তা নাই থাকলো, তুমি লগ্ন দেখে ঠিক করে দাও না।

পুরোহিতঠাকুর গভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাও কি হয়? পাক্ষিতে লগ্ন নেই যে!"

উত্তেজিতভাবে হারাবদ বলিল, "আরে দেখে দাও ঠাকুর, তোমার পাণি-পুঁথি। তোমরা নিজেরাই ত পাণি-পুঁথি, ঠাকুর। এই যে কোন কোন খানে দেখতে পাই, আখিন মাসে বিয়ে হয়। সে বিয়ে হয় কি করে? তোমরাই তো তার বিধান দাও। আবার তোমরাই বলে থাক, তাত্র-আখিন মাসে বিয়ে নেই। দাও ঠাকুর, শীগ্গির ক'রে দিয়ে কেল, আমি ততক্ষণ এ-দিকে সব পোছ-পাছ করে ফেলি। দক্ষিণা ডবল পাবে, না হয়, আরও কিছু বেশী দেওয়া যাবে।"

পুরোহিতঠাকুর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তা অস্বাভাবিক আছে বটে, অরকণীরা কত-নবকে আলাদা ব্যবস্থা চলে। তা এও এখন আজ বিয়ে না হ'লে নয়, স্ত্রীরা তখন অরকণীরাই ধ্বংস হবে।" বলিয়া তিনি একটা তাঁহার কর্তৃত্ব সোঁচ আওড়াইলেন।

হারাদন বিবাহের আরোজন করিতে আরম্ভ করিল। দানানে পীড়ি পাতিয়া, কুল-চন্দন, সিন্দূর, ঘৃত, অগ্নি, খই প্রভৃতি বাহ্য কিছু আরোজনীয় দ্রব্য সমস্তই আসিয়াছিল। অমীদার টোপর মাথার দিয়া লাল ঢেলী পরিধান করিয়া বর সাজিয়া পীড়ির উপরে বসিলেন। এইবার নীলিমার পালা। উপযুগপরি এতক্ষণ যে ব্যাপার তাহার চক্ষের সম্মুখে ঘটিল, সেই ঘাত-প্রতিঘাতে ভরে সে কাঁঠ হইয়া গিয়াছিল। এই বার তাহাকে ব্রজ-পরিবর্তনের অস্ত্র অস্ত্ররোধ করা হইলে সে কিছুতেই তাহাতে সন্মত হইল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মহা অনর্থ বাধাইয়া তুলিল। এদিকে দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, তৃতীয় প্রহরও যায় যায়। বিবাহের অস্ত্র সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তখন বাটার একজন দাসী আসিয়া বহুকষ্টে নীলিমার বস্ত্র পরিবর্তিত করিয়া তাহাকে আনিয়া শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া বরের পার্শ্বে পীড়ির উপর বসাইয়া দিল। পুরোহিত-ঠাকুর মন্ত্র উচ্চারণ করিতে উঠত হইতেছেন, অকস্মাৎ তাঁহার জিহ্বা অড়তা প্রাপ্ত হইল, মুখের কথা মূখেই রহিয়া গেল। তাঁহার মূখে এক প্রকার অস্বাভাবিক রূপ ফুটিয়া উঠিল। তিনি ঐ ঐ করিতে করিতে বিকট-শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কারণ, যে সময়ে তিনি আসন-পীড়ি হইয়া বসিয়া দক্ষিণার বহরটা স্মরণ করিয়া মনে মনে খুব আত্মাদিত হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় সাক্ষাৎ শমন-সদৃশ ডিঙেটিত বিজনকুমার সালুচর তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন! সকলে গুপ্তিত! বিজনকুমার সহান্তে অমীদার-মহোদয়কে

বলিলেন, “আপনার এই ভর্ত্তি বিবাহের দিনে কিঞ্চিৎ উপহার এনেছি, অনুগ্রহ কীরে গ্রহণ করে অধীনকে বাধিত করুন।” এই বলিয়াই তিনি তাঁহার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া ছইজন কনঠেবলের হাতে তাঁহার রক্ষার ভার দিলেন। ইতোমধ্যে—তাঁহার অল্পচরণ হারাদনকে বাধিয়া ফেলিয়াছিল। বিজনবাবু তাহার অবস্থা দেখিয়া, বলিয়া উঠিলেন, “আপনি আমাদের আমাইবাবুর বন্ধু, ইতরাং আপনাকেও আমরা প্রীতিউপহার দান করতে কুণ্ঠিত হ’ব না।” ইহার পরই তিনি অনুলি-ঘারা পুরোহিতকে দেখাইয়া বলিলেন, “এই যে ভট্টচার্য-ম’শাই বাদ পড়েন কেন? একেও বঞ্চিত করা হবে না।” তিনি ঐ ঐ শব্দে চীৎকার করিতে করিতে অনেক কষ্টে বলিলেন, “আমি আমি পুরুত, আমাকে কেন। আমাকে বাধু কেন? আমি পুরুত, নির্দোষ; আমি পু পু পুরুত।” আর তাঁহার বাক্য ক্ষুণ্ণ হইয়া না।

যথাকালে বিচার-আরম্ভ হইল। বিচারে অদ্ভুত রহস্য-সকল প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিজনকুমারের পরামর্শে পরাণ সরকারী সাক্ষী হইয়া তাহাদের সমস্ত কথা প্রকাশিত করিয়াছিল। উপেক্ষাব্যবস্থাপন পুত্ররূপী ব্যক্তিটি বরিশাল-জেলার একজন বিখ্যাত মহা এবং সেও হারাদন-নামধারী ব্যক্তি তাহার অল্পচর। খুন, ডাকাতি প্রভৃতি অসংখ্য অপরাধের জন্য ইহাদের সকলের নামেই বহুতর ওয়ারেন্ট আছে। কিন্তু পুলিশ ইহাদিগকে এতদিন ধরিতে পারে নাই। পরাণের সাক্ষ্যে ইহাও জানা গেল যে, তাহারাই উপেক্ষাকিশোরবাবুর বৃদ্ধ ভৃত্ত

নব্বের হত্যাকারী ; এবং উপেক্ষিকশোর-
বাবুর পুত্র জীবিত, কিন্তু নিরুদ্ভিষ্ট !
বিচারে সকলে বখাযোগ দণ্ড লাভ করিল !
একমাত্র পরাণ সরকারী সাক্ষী হওয়ার সে
নিষ্কৃতি পাইল। পুনর্ব্বার উপেক্ষিকশোর-
বাবুর নিরুদ্ভিষ্ট পুত্রের উদ্দেশ্যে ভার বিজন-
কুমারবাবুর হস্তে অর্পিত হইল।

(১৭)

এই বিরাট ব্যাপারের বিচার শেষ হইয়া
বাইবার পরে গভর্ণমেন্ট সন্তুষ্ট হইয়া বিজন-
কুমারকে কয়েক হাজার টাকা ও একটা
রিভলভার পুরস্কার দিলেন এবং তাঁহার
পদোন্নতি ও বেতন-বৃদ্ধিও করিয়া দিলেন ;
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে স্থানান্তরে বদলিও
করিয়া দিলেন। এখান হইতে বদলি হওয়াতে
বিজনকুমার কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না।
অনেকদিন তিনি এখানে কাজ করিতেছিলেন,
এখানকার প্রত্যেক লোকটী, প্রত্যেক স্থানটি
তাঁহার পরিচিত এবং প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।
কিন্তু কি করিবেন!—পরের চাকুরী তাঁহার
ইচ্ছা-নাগেচ্ছ নর !

একদিন সন্ধ্যার পরে বিজনকুমার রাধা-
গোবিন্দবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্ত
রাধাগোবিন্দবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন ;
তৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তখনও
রাধাগোবিন্দবাবুর সন্ধ্যা-আহিক শেষ হয়
নাই। তাঁহার অপেক্ষায় বিজনকুমার তাঁহার
বিতলের বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া রহিলেন।
তিনি অন্তমনস্কভাবে একখানা মাসিক-
পত্রিকা লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছিলেন,
এমন সময় দরজার পার্শ্বে খুন্ খুন্ করিয়া
হার চুড়ীর মুহ শব্দ উথিত হইল। তিনি

চাহিয়া দেখিলেন, নীলিমা ! চাহিবার সঙ্গে
চক্ষু সংমিলিত হওয়ার নীলিমার অন্তরটা যেন
কেমন পুলক-প্রবাহে নাচিয়া উঠিল। তাহার
শরীরের সমস্ত রক্তটা যেন মুখের উপর
আসিয়া জমাট বাধিয়া গেল। বিজনকুমারও
নীলিমার সহিত এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ-
কারে যেন কেমন হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া-
ছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি আত্মসংবরণ
করিয়া প্রস্থানোদ্ভ্রান্ত নীলিমাকে সন্ধান
করিয়া বলিলেন, “কি নীলিমা ! আমাকে
চিন্তে পারলে না ?”

লজ্জিত হইয়া নীলিমা বলিল—“না, তা
নর, আমি মনে করেছিলুম দাদাবাবু এসেছেন,
তাই।”

মুহ হাসিয়া বিজনবাবু বলিলেন, “আর
তাই বুঝি, তিনি নাই দেখে পালিয়ে
যাচ্ছিলে ! আর একটা অতিথি যে তোমার
ঘরে বসে আছে, সেটা বুঝি লক্ষ্য কর নি ?”

নীলিমা লজ্জায় মুখ নত করিল ; কোন
উত্তর করিল না। বিজনকুমার বলিলেন,
“আমাকে এখান থেকে বদলী করে দিয়েছে।
আমি যে এখান থেকে চলে যাচ্ছি।” ফুৎ
হইয়া নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, “আবার
কবে আসবেন ?” বিজনকুমার বলিলেন,
“আর এখানে কি করতে আসব ? আমার
এখানকার কাজ যে ফুরিয়ে গেল। আর
তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।”

ইতোমধ্যে সন্ধ্যাহিক শেষ করিয়া রাধা-
গোবিন্দবাবু তথায় আসিলেন এবং বিজন-
কুমারকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিভরে বলিলেন,
“বাঃ, এই যে বিজনবাবু। আমার পরম
সোভাগ্য !”

বিজনকুমার সহাস্যে বলিলেন, “ঐ বাবু শকটী ছেড়ে দিয়ে শুধু বিজন শকটীই ব্যবহার করবেন; এটাই আপনার মুখে শুনতে মিষ্টি লাগে।”

হাসিয়া রাখাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “আজ্ঞা তাই, তাই হবে, তাই হবে। ভগবান যদি দিন দেন।”

বিজনকুমার বলিলেন, “আমাকে যে এখান থেকে বদলি করে দিয়েছে।—শুনছেন কি?”

রা। কই না।

বি। পতর্পমেট আমার পদোন্নতি আর বেতন-বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

সঙ্কট হইয়া রাখাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “বেশ! বেশ! যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য পুরস্কারই দিয়েছেন।”

বি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বদলীও করে দিয়েছেন। আপনাদের ছেড়ে যেতে হবে, শকটী তাই উঠছে না। আপনার কাছে বিদায় নিতেই এসেছি।

রাখাগোবিন্দবাবু অভিযেহ-কোমল-স্বরে বলিলেন, “বিদায়” কথাটা বোল না তাই। তবে কাজের জন্যে যাচ্ছ, হু’দিন ঘুরে এস গে। আমরা তোমাকে ছাড়তে পারব না। আবার তোমাকে আসতেই হবে।”

তাহার কথার প্রকৃত অর্থ-গ্রহণে অসমর্থ হইয়া বিজনবাবু কিছু অন্যান্যরূপে বলিলেন, “তা তো নিশ্চয়। আপনাদের মায়ী কি আর এ জীবনে ভুলতে পারব।”

রাখাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “আমিও মনে করছি, অমরের কাছে একবার সীতাকুণ্ডে যাব। অনেক দিন তাকে দেখি নি। তা

ছাড়া এখন এ-বিষয়-সংস্কার তার যে তারই। বতরুণ না উপেক্ষাবাবুর প্রকৃত পুত্রকে পাওয়া যায়—।”

বিজনকুমার বলিলেন, “তা তো বটেই। আমিও সংকল্প করেছি, অমরবাবুর বাপের সন্ধান আর উপেক্ষাবাবুর ছেলের সন্ধানটা নিয়ে তবে অল্প কালে হাত দোব।”

সঙ্কট হইয়া রাখাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “উত্তম। তুমি যে কাজে হাত দেবে, নিশ্চয় সে কাজ সফল হবে। তোমার উপর বিধাতার অপার করুণা। নইলে এতদিন কেউ বা পারে নি, তুমি সেই শঙ্করের হত্যা-কারীকে খুঁজে বার করলে! সোজা কথা নয়।”

এই সময় নীলিমা এক রেকাবি জল-খাবার ও এক গ্লাস জল আনিয়া বিজন-কুমারের সম্মুখে স্থাপন করিল। বিজন কুমার একবার নীলিমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; নীলিমা সজ্জতাবে ছুটির পলাইয়া গেল। রাখাগোবিন্দবাবু স্নেহ-কোমলস্বরে বলিলেন, “নাও তাই একটু মিষ্টি মুখ কর। খাবারগুলো তোমার ঠাকুরমা নিকটে তৈরী করেছেন।”

সহাস্তে বিজনকুমার বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ তাই না-কি।” বলিয়াই তিনি সুবোধ বালকের মতন সেই মিষ্টি হাতের ‘মিষ্টিগুলির’ সখ্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তবে যিনি মিষ্টি তৈরী করিয়াছিলেন, তাহার যে তাহা আনিয়াছিল, তাহার হাতটাই বিজনকুমারের নিকট অধিক মিষ্টি হওয়া সম্ভব।

(ক্রমশঃ)

ঐচাক্ষুণী দ্বিধা ।

মিলন-ক্ষণ।

সকাল কিশোরী বধা দিবসের কর্ণ-কোলাহলে অন্ধকারে ঘিরে আসে, হ'য়ে যায় নিম্ন
পতি হ'তে রহে দূরে, কখন যদি বা কোন ছলে নিম্ন
ধরিতে দেখিতে পায়, এক-করে গুঠনে আবার বাহিরের হট্টগোল—সাগরের তরঙ্গ উচ্ছল
ব্রীড়া-নন্দ স্নিতানন, সচকিতে দূরে যায় সরি', অশ্রান্ত দিগন্তব্যাপী, মুহূর্ণমে কম্পিত হিরার
কহে না একটা কথা, যেন তার নাহি পরিচয় তব কাছে আসি নাথ ! মুহূর্ত্তকে জীবন
জীবন-দেবতা সাথে। পুনঃ সে যে নিশীথ-
সময় ও নিবিড় ভূজ-পাশে। কোন বাধা-
সর্ব-কর্ণ-অবসানে স্থনীৰব নিতৃত নির্জনে বসনান আর
সকল সঙ্কোচ ত্যজি' প্রাণেশের গাড় আলিঙ্গনে নাহি রহে, নাহি রহে বলিবার কিছুই আমার,
আপনা হারান্নে ফেলে। সেই মত হে প্রিয় সর্বস্ব বিলায়ে মোর ও-রাতুল চরণ-কমলে
আমার, নির্দাক্ আনন্দে দেব, তাসি বুঝি
সারাদিন নানা কাছে মগ্ন হ'য়ে রহি অনিবার, পূতজল-জলে
তোমা হ'তে কত দূরে আত্মহারা ঘুরিয়া তব বৃকে রাখি মুখ। মনে হয় এ মিলন-ক্ষণ
বেড়াই, কত অন্তর্যাতনের কত তীব্র সাধনার ধন।
চাহি না জানি না তোমা তার পর যবে
চারি ঠাই প্রীতীবেশকুমার দত্ত।

স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা।

বহু প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় সেই ভিত্তিরেই রহিয়া গিয়াছে। এ-বিষয়ের
পৰ্যন্ত স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-বিষয়ে সর্ববাদিসম্মত সমাধান করিতে মানব-বুদ্ধি
প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই মনে পরাত হইয়াছে। এই বিষয়-সমাধানের মূল-
চিন্তার উদয় হইয়াছে। এই বিষয়ে কত
আলোচনা কত গবেষণা, কত পরীক্ষা, কত
নূতন নূতন প্রত্যাবের সূত্রপাত হইয়াছে এবং
প্রত্যেকেরই কত শত অশ্রুত ও প্রতিশ্রুত
তীব্র সমালোচনা যেনা গিয়াছে। কিন্তু
তথাপি ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা হইতে পারে
যে, মানব এ বিষয়ে যে ভিত্তিরে ছিল, সে
সেই ভিত্তিরেই রহিয়া গিয়াছে। এ-বিষয়ের
সর্ববাদিসম্মত সমাধান করিতে মানব-বুদ্ধি
পরাত হইয়াছে। এই বিষয়-সমাধানের মূল-
চিন্তাকে যে মানব কখন কখন ধরিতে না
পারিয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার প্রতি
লক্ষ্য না রাখিতে পারিয়াই মানুষ পুনঃ পুনঃ
ক্রমে পতিত হইয়াছে।
আমাদের দেশীয় কবি যে গাহিয়াছিলেন—
“না জানিলে সব ভারত-লগন
এ ভারত আর জাপে না জাপে না।”

ইহা অতিসত্য কথা । দেহের এক অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া থাকিলে অন্য অঙ্গের কি স্বচ্ছন্দে ও সুচারুরূপে কার্য্য করিবার শক্তি থাকে না, সে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় ? দেহের ন্যায় মানব-সমাজের এক অঙ্গ পুরুষ ও অপর অঙ্গ নারী । পুরুষ বিদ্যার, জ্ঞানের, শক্তিতে, স্বাধীনতার বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, আর নারী অজ্ঞানতার অন্ধকারে, চূর্ণল, পরমুখাপেক্ষিনী, অশিক্ষিতা অবস্থায় পড়ু হইয়া পড়িয়া থাকিল ! ইহাতে কি জাতীয় জীবনের কিংবা সমাজদেহের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে ? কখনই নহে । ইহা আপামর সকলেই বুঝিতে পারে । এই কারণেই অধুনা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা-ও স্ত্রী-স্বাধীনতা-বিষয়ে এত চিন্তা ও এত আলোচনা ।

ফ. স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধে নানা জনের নানা প্রকার মত । কেহ বলেন—(১) স্ত্রী এবং পুরুষের শিক্ষা একইরূপ হওয়া উচিত । কারণ, স্ত্রী এবং পুরুষের শিক্ষা একরূপ না হইলে, পুরুষ এবং নারীর চিন্তা, কার্য্য ও শক্তি কখনই একত্র মিলিত হইয়া দেশ এবং সমাজের সেবা করিতে পারে না—জগতের উন্নতিতে সহায়তা করিতে পারে না । নারীকে যদি পুরুষের সহযোগিনীরূপে কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে উভয়ের চিন্তার ধারা বাহাতে একই দিকে প্রধাবিত হয়, উভয়ের শক্তি বাহাতে একই কার্য্যের জন্য নিয়োজিত হয়, উভয়ের আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ বাহাতে একই দিকে আদিভূত হয়, সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত ।

(২) আবার কেহ কেহ বলেন, স্ত্রী এবং পুরুষের শিক্ষা একইরূপ হওয়া কখনই শুল্ক-সিদ্ধ নয় । পুরুষের এবং নারীর প্রকৃতি ও শারীরিক গঠন যখন ভিন্ন, উহাদের উভয়ের কার্য্যক্ষেত্রও যখন পৃথক, তখন উভয়ের শিক্ষাও ভিন্নরূপ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । কোমলপ্রকৃতি নারীদিগকে কঠোর-প্রকৃতি পুরুষের সমকক্ষ করিয়া একইরূপ শিক্ষা দিলে সমাজ ও সংসারে মহা অকল্যাণ ঘটবে ; বস্ত্রের শাস্তিময় গৃহে আর গৃহলক্ষ্মীর মূর্ত্তি দেখা যাইবে না ; তৎপরিবর্তে বিলাতের “সফবিজেক্টের” প্রাদুর্ভাব ঘটবে । নারীর কার্য্যক্ষেত্র তাহার নিজ-গৃহের অন্তঃপুরে, পতি, পুত্র, পরিজনদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ-বিধানের জগ্গাই, সেবার মধ্যেই, শৃঙ্খলা-সাধনের মধ্যেই আবদ্ধ । নারীর এই যে কার্য্যক্ষেত্র, এই কার্য্যক্ষেত্রের জন্য তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করাই মহাকল্যাণজনক । অন্য শিক্ষা তাহার মহা অনিষ্টকর ।

(৩) আর এক দল বলেন, নারীকে কেবল তাহার নিজগৃহ-পরিজনদের সুখ-শৃঙ্খলা-সাধনের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে ও সেইরূপ শিক্ষা দিলে কিংবা পুরুষের কার্য্য, চিন্তা ও শক্তির পরিপূষ্টির সুবিধার জন্য তাহাদিগকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে ও সেই শিক্ষালাভে তাহাদিগকে সহায়তা করিলে কখনই নারীদিগের প্রতি সুবিচার করা হয় না । যুগ-যুগান্তর ধরিয়া পুরুষ তাহার নিজের স্বার্থের দিকে চাহিয়াই নারীকে তাহার প্রকৃত অবস্থায় পৌছাইতে বের নাই । নারীকে পুরুষ তাহার ক্রীড়ার পতলিকা ও সুখ-স্বার্থে-সিদ্ধির যন্ত্রপাতি

এতদিন ভোগ করিয়া আসিয়াছে, এখনও যদি তাহাদের এই অবস্থাতেই রাখা হয়, তাহা হইলে এ জাতির বিনাশ অনিবার্য।

এই কারণে হউরোপের কোন কোন প্রদেশের নারীগণ আজীবন পুরুষের এই স্বার্থের দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পবিত্র পরিণয়-প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইয়া ইহার মূলোচ্ছেদের জন্য বন্ধপরিকর হইয়াছে।

নারী পুরুষের ন্যায় ভগবানেরই সৃষ্টি, তাহারও বুদ্ধি আছে, স্বত্বশক্তি আছে, জ্ঞান-পিপাসা আছে, বিবেকবুদ্ধি আছে, শ্রায়-অশ্রায়-বিচারের ক্ষমতা আছে, সর্ব-বিষয়ে শৃঙ্খলা-সাধন ও কর্মপরিকল্পনের দক্ষতা আছে। সৌন্দর্য ও শাস্তির রসাস্বাদন করিবার শক্তি পুরুষ অপেক্ষা নারীরই প্রবল এবং গুণ ও গুণীর আদরের স্থান নারী-হৃদয়েই সমধিক। পুরুষের শ্রায় নারীরও সকল ইন্দ্রিয় সতেজ ও সজাগ। যে-সকল গুণ, যে-সকল উচ্চশক্তি, যে-সকল ঠিক্ত্রিয় ও নিপুণতার জন্য পুরুষ জগতের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে, নারীও সেই সকল গুণরাজী ও সেই সকল উন্নত শক্তিনিচয়ের দ্বারা বিভূষিত। সুতরাং, এই সমগুণাধিষ্ঠা নারীদিগকে ত জগতের শ্রেষ্ঠ আসনে বসিবার সুযোগ দেওয়া একান্ত কর্তব্য। নারীর শিক্ষা, জ্ঞান ও কার্যক্ষেত্র কখনই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত নহে। নারীর চিন্তা ও শক্তি-সকল ক্ষুদ্রতার গণ্ডি এড়াইয়া যাহাতে অবাধে অসীম অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে দানিত হইতে পারে, নারীর জ্ঞানপিপাসা যাহাতে ক্ষুদ্র পৃথিবীর মধ্যে হইতে জগতের কার্যে,

শিল্পে, বিজ্ঞানে—সকলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া চরিতার্থ হইতে পারে, নারীর কার্যক্ষেত্র নিজ গৃহ-পরিবারের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহ্যতে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইতে পারে, এইরূপ শিক্ষার আলোকই নারীর প্রাণে দিতে হইবে। সক্রিয়তা হইতে মুক্ত হইয়া নারী যাহাতে উন্নত মহাপ্রাণতার অনুপ্রাণিত হইতে পারে, ভাবে, চিন্তায় ও কাৰ্যে বাহ্যতে মহিমময়ী হইয়া সে নিজের গন্তব্য পথ, নিজের স্থান নিজেই নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বাধীনতার পথই তাহাদের নিকট গুলিয়া দিতে হইবে, এমনই জ্ঞানালোক তাহাদের অন্তরে প্রাণিত করাইয়া দিতে হইবে।

শ্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে এই যে মন্তব্য ও আলোচনা, ইহা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনও অকাটা সিদ্ধান্তে কেহই উপনীত হইতে পারেন নাই এবং কেহ যে কখনও পারিবেন সেদূর বিশ্বাসও আমার নাই। মানুষের প্রকৃতি এবং ঋতি যখন বিভিন্ন, তখন শিক্ষা-সম্বন্ধে মতও কখনই এক হইবে না বা হইতে পারে না। তবে স্রীলোকদিগকে লেখাপড়া শিখানর বিষয়ে যেমন বর্তমানকালে শিক্ষিত-ব্যক্তিমানেরই অস্বাভাবিক পরিমাণে মত ও সহামত্ব আছে, তেমনি আর একটা বিষয়েও বোধ হয়, জ্ঞান-মানেই একমত হইবেন। সে বিষয় এই যে, নারীজীবনে ধর্মভাবের প্রকৃত উন্মেষের চেষ্টা করা ও তাহাদিগকে অধ্যাত্মজ্ঞান-বিষয়ে উন্নত করা। এই উত্তরাদি ব্যবস্থার দ্বারাই আমার মনে হয়, পুরুষ নারীর মধ্যে নারীজীবনে নারী দেখিতে ও পাইতে চাহিতেছেন, তাহা লাভ করিবেন।

মানুষের মধ্যে বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রেম, স্নেহ, নয়া প্রভৃতি যে গুণ এবং দর্শন, শ্রবণ, আশ্রয়, আশ্রয়ন ও স্পর্শরূপ পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে শক্তি রহিয়াছে, এইগুলিকে সংশিক্ষা ও সাধন-দ্বারা যথার্থ ভাবে ও যথোপযুক্তরূপে ফুটাইয়া বিকশিত করিয়া তোলাই ধর্ম। ইউরোপীয় সভ্যতার আলোক এই ভূ-ভারতের অন্তঃপুরে প্রবেশের পূর্বে গার্হস্থ্য-জীবনের মধ্য দিয়া প্রবেশের নারীদিগকে শৈশব হইতেই ব্রত, নিয়ম, পূজা, ভগবদ্-অর্চনা দ্বারা ধর্ম-শিক্ষা দেওয়া হইত। এই যে ব্রত, নিয়ম, পূজা, অর্চনার বিধি, ইহার পালনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর হৃদয়ে সংযম, নিষ্ঠা ও ভক্তির উদয় হইত এবং সংযম, নিষ্ঠা ও ভক্তি হইতেই প্রাণে শক্তির সঞ্চার এবং দয়া ও প্রেমের বিকাশ হইত। তাই আমরা সে-নারীদের মধ্যে পদ্মিনীকে দেখিতে পাই, রমাবাহিকে দেখিতে পাই।

সংযমী হইয়া নিষ্ঠাপূর্বক ভক্তি-সহকারে ভগবদ্-অর্চনার যখন মানুষের মন প্রবৃত্ত হয়, তখনই মানুষ ঐহিক লালসা পরিত্যাগ করিয়া দেশের ও দেশের জন্ত আত্মপ্রাণ বলি দিতে পারে, তখনই মানব-হৃদয়ে বিদগ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখনই মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধর্মের জন্ত সকল নিন্দা, সকল অপমান, সকল হুখ, পুত্র, আত্মীয় প্রভৃতি প্রিয়-জনকে পরিত্যাগ করিতে পারে, তখনই ধন-ঐশ্বর্যের মোহকে পশ্চাতে রাখিয়া আপনাকে মানুষ মানুষ বলিয়া পরিচিত করিতে সমর্থ হয়; তখনই বলিতে সমর্থ হয়—

“যেনাহং নাস্মৃতা স্যাম,

তেনাহং কিং কুর্যাম্।” অর্থাৎ

“যাহা লইয়া আমি অমর না হইব, তাহা লইয়া আমি কি করিব?”—এ-কথা মানুষের মন কতদূর উচ্চে উঠিলে অধ্যাত্ম-জ্ঞানের বিকাশ কতদূর হইলে তবে মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে পারে? এই জন্যই আমরা আজ ঋষিপত্নী গার্গীর মুখে এই বাক্যের সন্ধান পেয়েছি। নারীর মুখ হইতেই সর্বপ্রথম আমরা এই বাক্য বহির্গত হইয়াছে, দেখিতে পাই। তখনকার শিক্ষা নারীকে কতদূর উচ্চ-জ্ঞানের মধ্যে লইয়া গিয়াছিল, ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্তমাত্র। ভগবদ্জ্ঞানের, অধ্যাত্ম-জ্ঞানের সাধনার দ্বারা মানুষ কতদূর উচ্চে উঠিতে পারে, তাহা দেখান যাইল। সে যুগ সেই প্রাচীনকালের ঋষিদিগের অধ্যাত্মজ্ঞান-সাধনার যুগ। বর্তমান যুগ আমাদের জড়-বিজ্ঞান-সাধনার যুগ। এখন দেহতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচিত হইতেছে। পাশ্চাত্য জাতি এই জড় সাধনার কতদূর অগ্রসর হইতেছেন, তাহা এখন সকলেই দেখিতেছেন ও জানিতেছেন, সে বিষয় বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন দেখি না।

এখন আমাদের আলোচনার বিষয় হইতেছে বর্তমানে নারীর শিক্ষার আদর্শ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন? যে শিক্ষার একমিক অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া যায়, সে শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা-পদবাচ্য হইতে পারে না। অতএব আমাদের আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে বর্তমান-সময়ের উপযোগী পাশ্চাত্য-শিক্ষা এবং পূর্বকালের অধ্যাত্ম-জ্ঞানলাভের ব্যবহার একত্র সমাবেশ করিতে হইবে। কেবল জড়বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া কি করিবে, যদি অধ্যাত্ম-জ্ঞান না জন্মে! জড়তত্ত্ব আলো-

না করিতে যাইলে, আমরা দেখিতে পাই, কত আশ্চর্য্য বাণীর ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে! একটা ফুলের স্তম্ভকে ও সৌন্দর্য্যোন্মোহিত হইয়া যখন আমরা তাহার আলোচনা করিব, তখন তাহার জন্ম হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত কি অপূর্ণ ব্যাপারসমষ্টির দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, দেখিতে পাই! ফুলটির উৎপত্তি কিরূপে হইল! কোথা হইতে কোন মধুমক্ষিকা বা বায়ুপ্রবাহ পরাগ আনিয়া দিয়া তাহার জন্মের সাহায্য করিল, রূপের ও বিকাশের সাহায্যের জন্ত সূর্য্য, জল, বায়ু, আশ্চর্য্য-কৌশলে তাহার পুষ্টি সাধন করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিল; শেষে সেই পুষ্পটা ধীরে ধীরে পৃথিবীর অঙ্গে ফরিয়া পড়িল।

এই যেমন একটা ফুলের আলোচনা করিতে যাইয়া জড়রাজ্যের নানা বিষয়ের জ্ঞান জন্মবার মধ্যে সঙ্গে চিত্তাশক্তি বৃদ্ধিত ও প্রসারিত হইল, তেমনি ইহার সহিত যদি অধ্যাত্ম জ্ঞানের যোগ হয়, তাহা হইলে মানুষ ঈশ্বরের শৃঙ্খলার বিষয় উপলব্ধি করিয়া অমর হইয়া যাইতে পারে; নতুবা সে এই বাস্তব জগৎ লইয়াই থাকিবে। এই জড়দেহের অবসানে, জড়তত্ত্বালোচনার পর কোথায় তাহার গতি হইবে, সে তাহা ধারণাও করিতে পারিবে না। তখন—‘বেনাহং নাশ্বতা স্তাম্’

‘বেনাহং কিমকুশ্যাম্’—গাণেশের প্রলাপ বলিয়া মনে হইবে এবং ভোগ-বালসার ও স্বার্থাচিন্তায় মানব মগ্ন হইয়া জগতের মহা অনিষ্ট সাধন করিবে। ইহার দৃষ্টান্ত বহুমান যুরোপের পৃথিবীবাসী মহাসমুদ্র আমাদের দোষাইয়া দিতেছে।

জড় ও অধ্যাত্মজ্ঞান-শিক্ষাই পূর্ণ শিক্ষা। প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে যে শিক্ষার শোভা বহিয়া গিয়াছে ও বহিতেছে, তাহাই একীভূত করিয়া আমাদের শিক্ষার আদর্শকে দাঁড় করাইতে হইবে এবং এই আদর্শ দ্বারা জগতের মহা কল্যাণ হইবে। এই শিক্ষার দ্বারাই নারী প্রকৃত স্বাধীনতা ও উচ্চ-জ্ঞান লাভ করিয়া মনে, চিন্তায়, জীবনে মহতী হইয়া সকল মহত্ব লাভ করিবে। নারী যখন এই মহত্বের অধিকারিণী হইবে, তখনই সে জাতীয় কল্যাণের জন্ত, সমাজের জন্ত, গৃহ পরিবারের কল্যাণের জন্ত মুক্তহৃদয়ে নিঃস্বার্থভাবে পুরুষের পাশে নিভয়ে দাঁড়াইতে পারিবে এবং চিন্তায়, শক্তিতে, কার্য্যেতে, বুদ্ধিতে তাকে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে চিরোত্তর পথে লইয়া যাউতে এবং নিজেদের স্থান, নিজেরা অধিকার করিয়া জগতে মহাশক্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে।

সীমন্তী—

লীনার শিক্ষা

(১০)

তীর মানসিক পীড়নের ভিতর দিয়া অর্দ্ধ নিদ্রা ও অর্দ্ধ ভাপরণ ক্লাস্তিতে সারা রাত কাটাওয়াই ভোরের দিকে লীনা বেশ গভীর

শান্তিতেই গাড়ি নির্দার স্পর্শে সব ভুলিয়া আশ্রয়-বিস্তৃতির মাঝে আরাম পাউয়াছিল। কতক্ষণ পরে কে জানে, হঠাৎ পাশের গলে একটা উগ্র

অসহিত্যতঃপূর্ণ ধূপ্ ধাপ্ তম্ তম্ বন্ বন্ বন্
বন্ বিচিত্র আশ্রয়াজ উঠিয়া লীনার ঘুমের
শান্তিটুকু ভাঙাইয়া দিল।—অতিমাত্রায় ভয়-
বাকুল লীনার আপাদমস্তক এক মুহূর্তে ঘামিয়া
উঠিল। অপক-সুপ্তিআলা-ভরা চোখ দু'টা খুলিয়া
সে জানালার দিকে চাহিয়া কষ্টে দেখিল, ভোরের
আলো পল্লিকার-রূপে কুটিয়া উঠিয়াছে। লীনা
হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। দিনের আলোয় চোর-
ডাকাতে ঘরের ভিতর এত শব্দ-উপস্রব করিতে
পারে না,—নিশ্চয়ই বাড়ীর কোন অসাবধান
ঝি-চাকর! লীনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ
ফিরিয়া গুহিতে গুহিতে ক্রান্তব্রের বলিল, “উঃ,
বড় শব্দ! আশ্বে, আশ্বে রে।”—কথা-কয়টা
বলিতে লীনার যন্ত্রণা পীড়িত মাথা বন্ বন্
করিয়া উঠিল।

পাশের ঘরের শব্দটা মিনিট-কতকের জন্ত
ক্রান্ত হইল। লীনার চোখ আলস্বে আবার
জড়াইয়া আসিল, অন্ধ-নিদ্রামগ্নের কাণে আবার
অস্পষ্ট ব্রেরবাকিতে লাগিল, ঠুক ঠুক ঠুক!—
লীনা গুনিতে গুনিতে গাঢ় শ্রান্তিতে ঘুমাইয়া
পারিল।

ঘড়িতে বেলা আটটা বাজিবার শব্দ শুনিয়া
লীনার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চট করিয়া মনে
পড়িল, আজ পিক্কেত যাইবার দিন, আটটার
টোনেই তিনি যাইবেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে
যাইবার জন্ত লীনা উঠিয়া বসিল। মাথা বন্ বন্
করিয়া ঘুরিয়া গেল। ক্রান্ত অবসরদেহে
বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া সে দ্রুত নিঃশ্বাস
ফেলিতে লাগিল।

আজ ঠয়ারের বাহির হইতে সাড়া দিল :
লীনা ডাকিতে ঘরে ঢুকিল। ভীতদৃষ্টিতে
লীনার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, “অপা-

নার শরীর খুব খারাপ হইয়াছে কি?”

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া লীনা বলিল,
“না। স্বানের ব্যবস্থা ঠিক করে দাও। সাহেব
জুস্মনকে নিয়ে চলে গেছেন?”

কুণ্ঠিত হইয়া আয়া বলিল, “হাঁ, ছ’টার সময়
চলে গেছেন। প্রাতরাশ পর্যন্ত খেয়ে যান্ নি।”

বিচলিত হইয়া লীনা নড়িয়া চড়িয়া বসিল ;
মাটির দিকে চাহিয়া অগকাল স্তব্ধ থাকিয়া
অত্যন্ত জোরের সহিত বলিল, “যেতে দাও।
আমার স্বানের জন্তে ঠাণ্ডা জল চাই, তার ঠিক
কর।”

লীনা উঠিয়া আলিচরণে স্বানের ঘরের
দিকে গেল। আয়া মুখ ধুইবার সরঞ্জাম
গুছাইয়া লইতে লইতে নিজমনেই মাথা
নাড়িয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল,
“এ, সকল মোটেই ভাল হইতেছে না। একটা
কিছু ভয়ানক কাণ্ড না ঘটয়া গেলে, ঈ চা
যায়!”

স্নানাহারের পর, উত্তেজনার অবশাদ-
শ্রান্তি দূর হইলে, লীনা মাথা ঠিক করিয়া গত
স্বাত্রির ব্যাপারটা ভাল করিয়া ভাবিয়া লইবার
জন্ত লাইব্রেরী-ঘরের নির্জনতায় বই লইয়া
বসিতে গেল। ছয়ারের কাছে আসিয়া
সবিস্ময়ে দেখিল, তালা বন্ধ!—অসহিত্য বিরক্ত
কণ্ঠে ভৃত্যকে ডাকিয়া সে বলিল, এখন তালা
বন্ধ কেন?”

ভৃত্য ভয়ে ভয়ে উত্তর করিল, “সাহেব
নিজে বন্ধ করে কুলুপের চাবি পকেটে পুয়ে
নিয়ে গেছেন।”

গভীরমুখে নিঃশব্দে শুইবার ঘরে ঢুকিয়া,
লীনা ভিতরের তরার খুলিয়া লাইব্রেরীতে
ঢুকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হার হুঁতগে!

লাইব্রেরীর ভিতর হইতে সে দ্বারেরও একটা কুলুপ বন্ধ। অসহক্রোধে লীনার দুই চক্ষু অগ্নিঃ উষ্ণিঃ,—আড়ালে লোক-চক্ষুর অগোচরে স্তম্ভচূর অপমান করিয়াও পিককের আশা মিটিগ না, প্রকাশে সকলকে জানাইয়া এইরূপ অপমানের অয়োজন! বিচারকদের সামনে মুখ দেখাইবার পণ পণ্যস্থ বন্ধ! দিক্!—

বিকৃত তবুও মুখ দেখাইতে হইল, এবং চাকরকে ডাকিয়া দয়ারটার কুলুপ ভাঙ্গিবার আদেশ, গুব শাস্ত-সহজ স্বরেই দিতে হইল। কুলুপ ভাঙ্গা হইল, দয়ার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া, লীনা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল—একি কাণ্ড! —লাইব্রেরীর এক কোণে লীনার অত্যন্ত সখের বে স্তম্ভিত মেহম্মাকাঠের প্রকাণ্ড সিঁদুকটি ছিল, সেটা ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা হইয়াছে। পূর্বে সেটার কয়লার খনি সম্পর্কীয় কাগজ-পত্র রাখা হইত। দিন-কয়েক হইল, ম্যানেজারের হিসাব-মিলাইয়া লইবার জন্ত লীনা কাগজগুলি বাহির করিয়া নিজের শুইবার ঘরে একটা খোলা দ্বারের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিল; তুলিতে মনে পড়ে নাই। এ সিঁদুকে মূল্যবান গহনার কেসগুলি ও পিতার পুরাতন হিসাব-পত্রগুলি ছিল। সে-গুলি সমস্তই নিস্রয়োজন; শুধু পিতার বহুতে লেখা বলিয়া লীনা সেগুলি সর্বত্র রাখিয়া দিয়াছিল। পিতার 'ডায়েরী'টাও ছিল এষ্ট সকলের মধ্যে। সেটা অবশ্য নিস্রয়োজন নয়।

লীনা চাহিয়া দেখিল ভাঙ্গা সিঁদুকটা শূন্য-গর্ভে হাঁ করিয়া পড়িয়া আছে; কতকগুলি কাগজ মেঝের উপর বিশৃঙ্খলভাবে লগ্ন তগ্ন হইয়া পড়িয়া আছে; খবর এককোণে

কাপেট সরাইয়া একরাশ কাগজ পোড়াইয়া ফেলান হইয়াছে; তাহার ছাইগুলি খুঁপাকার হইয়া আছে; মূল্যবান গহনার কেসগুলির কোন চিহ্নই ঘরের কোথাও নাই।

লীনা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিল। বহুদিন আগের পড়া—ঈশপের গল্প একটা নীতি-উপদেশ তাহার মনে পড়িয়া গেল—যারা ইচ্ছাপূস্ক অত্যাচারী বা অসৎ হাতে আত্মসমর্পণ করে, তাদের আশ্রয় হওয়া উচিত নয়, অত্যাচারী যদি শেষে তাদের বিকছেই থরে দাড়াইয়।

লীনা নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। নাঃ, আজ তারও আশ্রয় হইবার কিছু নাই! এইরূপ চৈতন্য অত্যাচার সহিবার জন্ত আগে হইতেই তার প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল। তার প্রিয় পিতার স্মৃতিগুলির মর্ষাদা তার জন্মের কাছে আদরণীয় বলিয়া সেগুলির উপর পর্যাখ্য চৈতন্য পশ্চতের অত্যাচার স্বামীর যোগ্য সহদম্বিনী হইলে, এ ব্যাপারের সম্ভাবনা পূর্বেই সে অনুমান করিয়া লইতে পারিত;—পারিতে বাদ্য হইত।

হেঁট হওয়া কম্পিত চৈতন্য কাগজগুলি উন্টাইয়া লীনা পিতার ডায়েরী খুঁজিতে লাগিল। না, সেটা নাই; পিকক সেটা গহনা গিয়াছেন, কিংবা পুড়াইয়া দিয়াছেন।—টা পুড়াইয়া দেওয়াই সম্ভব; কারণ, পিকক ও পিককের প্রতিশ্রুতি পনি-বিজ্ঞা শিথিবার জন্ত টাকা লগ্নয়ার বণ্ড-সম্বন্ধীয় সমস্ত কল্যাণ তাতে লেখা ছিল। বণ্ড-পানি অবশ্য লীনা বিবাহের পরেই পিককের সামনে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু পিতার হাতে লেখা পারিবারিক নীতি নষ্ট করিতে পারেন নাই। কারণ, পিতার জীবনের

প্রদান ঘটনাগুলি তাতে লেখা ছিল।

উঠিয়া গিয়া লীনা সাবধানে একটা কলমের ডগে করিয়া ছাইগুলি উন্টাইয়া দেখিতে লাগিল।—হাঁ ঠিক, ডায়ারির মোটা মলাট-ছাইখানা সম্পূর্ণ পুড়িতে পারে নাই, আধ-পোড়া হইয়া ছাইয়ে চাপা রহিয়া গিয়াছে। বাকী সমস্ত পাতাগুলি ছাই হইয়া গিয়াছে।

মাথায় হাত দিয়া খানিটা হতবুদ্ধি নির্মাকের মত বসিয়া থাকিয়া, লীনা দীর্ঘকাল ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাজার টাকার যে ব্যাগটা সিন্ধুকে ছিল সেটাও লইয়া গিয়াছেন, বোধ হয়!—

শান্ত মৈথোঁর সহিত উঠিয়া এদিক ও দিক খুঁজিয়া লীনা দেখিল টেবিলের উপর খোলা ব্যাগট উন্টাইয়া পড়িয়া আছে, নোটগুলি সমস্তই অক্ষত।

তীর ঘুগাভরা বিক্রপের হাসি লীনার ওষ্ঠ-প্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। বাহবা,—মহামায়াবর আমার সর্বব্যাপী প্রভু প্রতাপের দাপটে সে আজ কপর্দক শূন্য ভিখারি হইয়া পড়িল। আর কি সোভাগ্য এর বেশী আছে!—টাকা আনা-ইবার জন্ত কয়লার খাদের ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করিবার পরচা পর্গস্তে লীনার তহবিলে আজ নাই।

মস্তকের ভিতর বোঁ বোঁ শব্দে তীরবেগে রক্তস্রোত ছুটিতে লাগিল। টলিতে টলিতে সরিয়া গিয়া গোলাপ-জলের শিশিটা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া সে সোফায় বসিয়া পড়িল; মাথায় খানিটা জল চাপাড়াইয়া নিখুঁত হইয়া শুইয়া, আশ্চর্যের জন্ত ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিল।

কিন্তু কখনো লীনার চোখ চাপা বহিয়া দব্দ দব্দ

করিয়া জল পড়িতে লাগিল,—কি দুর্ভাগ্য লজ্জা-জনক এই ঘৃণিত বিপদ! কোন বন্ধুর কাছে, মুখ ফুটিয়া প্রতিকার প্রার্থনা জানাইতে,—এতটুকু সাহায্য চাহিতে ঘৃণায় মাথা-কাটা যাইতেছে! এবশী কি, ঐ ষিচাকরগুলার সামনেও যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। দিক্! আঃ, ভগবন্ ধন্যবাদ তোমায়! হেলেন মরিয়া নিকৃতি পাইয়াছে, না হইলে এই কপুরুষ পুস্তর অধীনে পড়িয়া আজীবন তাকে এই সকল ঘৃণিত লজ্জনার চাপে পণে পণে পিসিয়া মরিতে হইত।

উগ্রচিন্তা-পীড়নে ক্লান্ত মতিপট্টা বেদনা অধীর হইয়া উঠিল! টেবিলের ডায়ার খুলিয়া স্মেলিং সল্টের শিশি লইয়া বার কতক স্নান লইয়া লীনা মাথার যন্ত্রণা কমাইয়া ফেলিল। তার পর একটুকুরা কাগজ লইয়া পার্সনকে লিখিল, “বড় দরকার, শীঘ্র। গোটা-পঞ্চাশ টাকা দেন।”

বাহিরে আসিয়া, কাগজটুকু চাকরের মার্ক'স পার্সনের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, লীনা আবার ঘরে ঢুকিল। সিন্ধুকের কাছে যে কাগজগুলি পড়িয়াছিল, একসঙ্গে জড় করিয়া আনিয়া সেগুলি সেই ছাইয়ের স্তুপের উপর রাখিল। তারপর সমস্তগুলি আগুন ধরাইয়া দিয়া, পুড়াইয়া ছাই করিয়া, যে স্থির নিশ্বাস ফেলিল; বাহিরে আসিয়া অস্ত্র চাকরকে ডাকিয়া ঘর পরিষ্কার করিবার আদেশ দিল।

অরক্ষণ পরেই পার্সনের নিকট হইতে টাকা লইয়া ভৃত্য ফিরিল। লীনা টাকা লইয়া কয়লার খনি ম্যানেজার মিঃ মরিস্কে টেলিগ্রাম করিল—“শীঘ্র আমার দশহাজার টাকা চাই। আপনিও অবিলম্বে আসুন, কলকাতা

বাদ আপনাকে ইজারা-বন্দোবস্ত করে দিয়ে আমি পর সপ্তাহের জাহাজে বিলাত যাব।”

টেলিগ্রাম পাঠাইয়া লীনার মাথার উপর হইতে যেন একটা অসহ্য উদ্বেগ-হৃদ্যাবনার বোঝা নামিয়া খেল। সে মাথা ঠিক করিয়া শাস্ত হইয়া নিজের অবস্থাটা আগাগোড়া ভাবিয়া লইতে বসিল। নিরুপায় অত্যাচার-পীড়িতা লীনা এই যে অভদ্র ইতর অত্যাচারের পাল্লা এড়াইয়া ভদ্রভাবে মানে মানে সরিয়া পাড়বার ব্যবস্থাঃ প্রশ্নঃ ঠিক করিল, বাহিরের লোক সমাজ কোন দৃষ্টিতে এটাকে বিচার করিবে?—তাহারা বিচার করিবে সেই দৃষ্টি লইয়া, যে দৃষ্টিতে মিঃ ক্লাউডেনের পরদার-প্রিয়তা লোক-সমাজের চোখে তত দোষাবহ নয়, যতটা দোষাবহ ক্লাউডেন পত্নীর নীরব বেদনায় অতঃ অবস্থান পাপটা! ক্লাউডেন-পত্নীও তো স্বামীকে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ভালবাসেন, কিন্তু স্বামীর জঘন্য পাপাচরণগুলো অন্ধ-ভক্তিতে চোখ বুজিয়া পূজা করিতে পারেন না বলিয়া স্বামীর পক্ষ-সমর্থক উদারচেতা বন্ধু বান্ধবের দল কতখানি উগ্র অসন্তোষের দৃষ্টিতে ঐ হতভাগিনীর দিকে চাছেন! এবং কত রকমেই তাঁকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করেন!—হায় রে হায়, পুণিবীর অভিশপ্ত নারীর দল!—কোন ছুতায় যদি তোমরা দেবতাদের প্রসন্নদৃষ্টি মুহূর্তের জন্ত প্রার্থনাছ, তবে প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও,—উপদেবতাদের ঘৃণার পদাঘাতে তোমাদের আপাদ-মস্তক জর্জরিত হইবে-ই!

এই যে এতদিন ধরিয়া লীনা এত অস্ত্রায়ের অত্যাচার কঠোর মৈথো সহিয়া আসিল, গোপনে গোপন বেদনায় অন্ধ হৃদয় ক্ষত

বিক্ষত প্রাণের অশ্রাময় অভিযোগ-উত্তেজনা প্রাণের ভিতরই চাপিয়া রাখিল, —গায়ে জোর নাই বলিয়া গারের জোরের অত্যাচার নিশ্চেষ্ট ভাবেই সহিতে বাধ্য হইল,—এই নিষ্ফলা সহ্য শক্তিটুকুর দ্বারা সংসারে কার কি উপকার করিতে পারিল? স্বামীর স্বভাব ইচ্ছাতে সংশোধিত হইল কি? পরকৃত পারিবারিক হইল কি? স্বামীর মনুষ্যত্বের উন্নতি-ম্যাদা বাড়িল কি? —আত্মীয় মঙ্গল হইল কি? —উপু স্মৃতিত বাল্য ইচ্ছামনের লাঞ্ছিত মেয়ের ব্যক্তিগত বেদনা লইয়া গাফিলত গোরা হুটুরোপীড়নের কাছে নয়,—সমগ্র নারী-সমাজের, যেখানে যত অত্যাচার-পীড়িতা নারী আছে, সকলের লাঞ্ছিত নারীদের তরফ হইতে পুণিবীর কাছে সাবিনায়ে এ প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা কর,—দেখিবে, গতা মনুষ্যত্বের নামে যে মানুষের আত্ম-চেতনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, কেবল মাত্র সেট মানুষ-কয়টি ছাড়া বাকী সব প্রাণীগুলি বিরাট বিজ্ঞান দর্পে বিকট অট্টহাস্য করিয়া, আকাশ কাটাইয়া প্রচণ্ড চাঁৎকারে উত্তর দিবেন,—“এ সব অদ্ব্যুত প্রশ্ন, শুধু নভোলাবহার ফল!”

পাক পুণিবীর সাধারণ মানুষের অলঙ্ঘন্য অধিকার অধিকূল ঐ সব সম্ভাদনের বিধি-বিধান এবং তাত্ত্বিক সত্তা শাসন-বিচার-প্রণালী! লীনার নিজের অবস্থা মখন নিজেই মধ্যে মধ্যে তাঁর ঘরপায় বসিতে হইতচে, তখন যথোচিত ব্যবস্থার ভারটা যথার্থকি নিজের ঘাড়ের বহিতে হইবে! পক্ষের কাছে যখন লীনার জন্মের কোন মর্গাদাট লেশমাত্র নাই, শুধু কয়লার খান চুস্তগত করিবার গোভট্টাট দ্রুত ভীষণ,

প্রচণ্ড হইয়া পাড়াইয়াছে, তখন লীনার পক্ষে নিজের জন্মের দাবীটা মানে মানে ফিরাইয়া লইয়া, কেলেঙ্কারী বাড়িবার পথ বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়াই ঠিক! শিক্কের অশান্তির কাটা দূর হউক,—যেখানেই তিনি থাকুন, প্রাণে বাঁচিয়া থাকুন, আর কোন প্রার্থনা নাই।—এই যন্ত্রণা-ভয় মনের বোঝা বহিয়া লীনা আর কত দিনই এখিবীতে টিকিবে? কিসের ভয় তবে? যে ক’দিন বাঁচে—শাস্তি না থাক, তবু একটু নিরীহাটে নিজের মনুষ্য-হুতা বাঁচাইয়া থাকার চেষ্টা করাই ভাল।—

কিন্তু এক মহৎ দুঃখ শুধু, হতভাগা মার্সিস!—হঠাৎ উৎক্লিষ্টচিত্তে উঠিয়া গিয়া লীনা লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া চমার বন্ধ করিয়া একথানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল। বইয়ের মাঝখানটা ফস্ করিয়া খুলিতেই দেখিল, সেই পাতার এক স্থানে Wordsworth এর উক্তি উদ্ধৃত রহিয়াছে :—

“Say what is honour but the
nicest sense
Of justice the human heart
can frame.
Intent each lurking frailty
to disclaim
And guard the ways of life gainst
all offence
Suffered or done?”

অর্থ—মানুষের উৎকৃষ্ট-জ্ঞান-মাজিত হৃদয় নৃষ্টি ও বিচার বুদ্ধি, যে বুদ্ধি চরিত্রের গুণ চরুলতাকে প্রত্যখ্যান করে, এবং গাছা অত্যাচার করা ও অত্যাচার সহ্য হইতে জীবনের পথ রক্ষা করে, সেই প্রভেদম হৃদয় নৃষ্টি ও জ্ঞান-বোধ-শক্তি ছাড়া,—মনুষ্য আর নাই!

লীনা মস্ত-মুণ্ডের মত সেই অক্ষর-করটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, উদ্বেল-বক্ষে, দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

(১১)

পরস্পর-বিরোধী কতকগুলি জটিল মনো-বেদনার স্বন্দ ও অসহ্য উদ্ভাস্ত বাকুলতার ভিতর দিয়া লীনার দু’দিন দু’রাত সময় কেমন করিয়া কাটিল, কেহ জানিল না। লীনার সৌভাগ্যবশতঃ বন্ধুরাও কেহ এই দু’দিন কোন খোঁজ-খবর লইতে পারিলেন না। সন্ধ্যার বাহিরে কোন কটা ভাষগায় খুব কলেরার মড়ক লাগিয়াছিল; মিসনের লোকজন লইয়া পার্সন ও মিস লীন খেজাসেবক-রূপে সেখানে গিয়াছেন। মিসেস ক্লাউডেন্ কাল এখানে ফিরিয়াছেন, তাঁরাও দু’ভাই-বোনে সে দলে যোগ দিতে গিয়াছেন। মৃত্যু-মহাগর্ভের ক্ষণায় গ্রাস হইতে অসহায় দরিদ্র মানব-গুলিকে রক্ষা করিবার জন্ত, তাঁহারা প্রাণের আত্মদে, প্রাণপণ সংগ্রামে মাতিয়াছেন।—

লীনা বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া সব শুনিতে-ছিল, আর বেদনার নিঃশ্বাস ফেলিয়া এক একবার ভাবিতেছিল, আত্মবিশ্বস্তির আশ্রয় পাইবার জন্ত যদি সেও ঐ সেবক-দলের সেবাত্রিতে যোগ দিতে পারিত, কি আনন্দই সে পাইত আজ! কিন্তু হায়, সামর্থ্য নাই। শরীরে এতটুকুও সামর্থ্য নাই, বিষাদ-ভয় মনটাকে যে, কোন কাজে বুদ্ধিয়া দিয়া এক মুহূর্তের জন্ত শাস্তি পায়, সে সুযোগটুকু পর্যন্ত নাই! ভগবান্, ভগবান্, এই একান্ত স্বার্থ-সর্বস্ব, শোক-বাণীর পীড়ন হইতে মনকে মুক্ত করিয়া দাও,—এই রূপ জীর্ণ জন্মের বোঝা বহিয়া জীবন-তটর পাশিতে পারা

রায় না।—যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, মানুষকে মানুষের মত সজীব সতেজ গ্রাণ লইয়া রাখিতে দাও! যে মানুষের সংসার-জীবনের নৃশংসি জলিয়া পুড়িয়া ধ্বংস হওয়াই অনিবার্য,—তার মনকে বার্থতার বেদনা-দীড়ন হইতে বাঁচাও! বিশ্ববাপী বিশাল কর্তৃকর্তে পড়িয়া আছে,—শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থের গতিবদ্ধ আত্ম-স্বপ্ন, আত্মপরায়ণতা লইয়া কিপু-কোতে হা হা করিয়া দিন কাটানই মনুষ্য-জীবনের পরম সার্থকতা নয়। নিজের পুত্র বলিয়া, মার্সিস শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার ভাবের পরিবর্দ্ধন জন্ত ভালরূপ চেষ্টা করিবার সুযোগ পাইল না বলিয়া লীনার মন ব্যাকুল কোতে কঁাদিতেছে! কিন্তু হায়, স্বার্থপর গ্রাণ!—নিজের ক্ষুদ্র গতি ছাড়িয়া একবার সমস্ত জগৎটার দিকে কান পাতিয়া শোন দেখি! ঐ একমাত্র লীনার পুত্র মার্সি নয়,—অমন কত লক্ষ কোটি মার্সি কত লক্ষ কোটি অভাবের শোচনীয় নিষ্পেষণে পিষ্ট হইয়া মৃত্যু-বরণীর আর্ন্তনাদে জগৎ ভরাইয়া তুলিয়াছে! এক মার্সিস উপর মায়ের কর্তব্য-পালনের অধিকারে বঞ্চিত হইলে বলিয়া বঝনার ব্যথার কীধিয়া মরিতেছে, কিন্তু ঐ জগৎ জোড়া হতভাগ্য মার্সিস দল,—ওদের মজল-চেষ্টার, ওদের উপর তোমার রেহ ঢালিবার কর্তব্যও যে আছে, এবং সে কর্তব্যকে যদি পালন করিতে যাও, তবে ঈর্ষার অত্যাচারে প্রচণ্ড আঘাত দিয়া তোমার রেহকে স্ফুগন্তরে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, এমন নৃশংসগ্রাণ পিতা বা অভিাবক ওদের পূর্ব কর্মই আছে,—পূর্ব কর্ম! না হইলে মনুষ্য-জাতির চিহ্ন এত দিন ধরাশয় হইতে মুছিয়া বাইত,—

এটা একান্ত সত্য!

কত এলোমেলো চিন্তার ঝড় যে লীনার মনের উপর দিয়া বহিয়া বাইতে লাগিল, তার ঠিক ঠিকানা নাই। স্বামীর সহিত বিরোধ এড়াইতে, নিঃশব্দে চির-বিদায় লইবার জন্ত সে যতই মনে মনে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিতে লাগিল, পুত্রের জন্ত বৃকের ভিতরটা ততই 'হার হার' করিতে লাগিল। দুর্বল কাতরচিত্তে এক একবার সে ভাবিতে লাগিল, পদাঘাত সহ্য করিতে হয় সেও ভাল, তবু স্বামীর পায়ে ধরিয়া পুত্রকে শিক্ষাস্বরূপ, অন্ততঃ বছর পনের পর্য্যন্ত কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবার জন্ত, চাতিয়া লইবে। কিন্তু তখনই দুঃস্বপ্ন কঠোরপ্রকৃতি পিককের একজ্ঞানী বেদ মনে পড়িতে লাগিল,—জিনি দিবেন না, দিবেন না, কিছুতেই দিবেন না! একান্তই যদি কোন কারণে দিতে বাধ্য হন, তবে সহজে গলা টিপিয়া সম্মানকে হত্যা করিবা তবে মৃত দেহটা দিবেন!—

নিজের চিন্তায় লীনা নিজেই পিঠরিল! থাক, মার্সি তোমার অদৃষ্টে বা আছে তা হইবে। মা চটয়া লীনা এত বড় অমজল চিন্তাটা করিতে পারে না আর, ভগবান!—

চতুর্থ দিন প্রাতে মিঃ মার্সি তাঁর প্রধান কর্মচারীকে সঙ্গে করিয়া কুঠিতে আসিয়া লীনার সহিত দেখা করিলেন। শিষ্টাচার মত সম্মান-বিনিময়-পর্ক শেষ হইলে, বৃক মার্সি পকেট হইতে একটা টেলিগ্রাম বাহির করিয়া লীনার সামনে রাখিয়া গভীরভাবে বলিলেন, “আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই আমি প্রস্তুত হয়ে বেরুছি, এমন সময় মিঃ পিককের এই টেলিগ্রামখানা পেলুম। কিন্তু এর অর্থ

হামি কিছুই বুঝতে পারলুম না। আপনি দেখুন দেখি।”

লীনা বুকের মুখ-পানে চাতিতে সাহস করিল না; কম্পিতহস্তে টেলিগ্রামখানা তুলিয়া লইয়া, সেইটার উপর খুঁকিয়া পড়িল; দেখিল, পিকক্ গতকলা তাঁহার আফিসের ঠিকানা হইতে জানাইতেছেন, “পিককের বিনামূল্যে মিসেস পিকক্কে যেন অতঃপর টাকা-কড়ি কিছুই না দেওয়া হয়, এবং হালের হিসাবপত্র সমস্ত প্রস্তুত করিয়া মিঃ মরিস্ যেন অবিলম্বে পিককের প্রধান অফিসে উপস্থিত হইয়া সমস্ত হিসাব দাখিল করেন। মিঃ পিকক্ শীঘ্রই কলিয়ারী বিক্রয় করিবেন।”

লীনার হাত ভরষর কাঁপিতে লাগিল।

সুস্থমানভাবে ক্ষণকাল শুদ্ধ থাকিয়া, টেলিগ্রামখানার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া লীনা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “আপনি তা হ’লে টাকা আনেন নি?”

সুশক দাড়ির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বৃদ্ধ মরিস্ বেশ ধীর মৌল্যেয় স্বরে বলিলেন, “মিঃ পিককের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা...সম্পর্কটা...হাঁ, সে অবশ্য আমার কাছে বিশেষ সম্বন্ধ, কিন্তু, আমি আপনারই আত্মাভাব্য। আপনার অমূল্য ছাড়া মিঃ পিককের আদেশ-পালনে আমি বাধা নই। আপনার টাকা, আপনার আত্মমত আমি আনতে বাধা হইবে নিশ্চয়ই, এবং আপনাকে দিতে কোন আপত্তি করবার অধিকার আমার নাই।

মিঃ মরিসের কণ্ঠস্বরী বাগ খুলিয়া হাজার টাকার করিয়া দশখানি নোট বাহির করিয়া লীনার টেবিলে রাখিল। কলমটা তুলিয়া লইয়া লীনা বলিল, “হিসাবের খাতা দেন, সহি

করে দিই।”

বাক্ত হইয়া মরিস্ বলিলেন, “থাক থাক, তার জন্তে তাড়াতাড়ি নাই। কিন্তু কাজের কথাটা আগে হোক। কলিয়ারী ইজারা দেওয়াই কি আপনার স্থির সঙ্কল্প?”

দৃঢ় স্থিরকণ্ঠে লীনা বলিল, “হাঁ অবশ্যই! মিঃ পিককের আপত্তির জন্তে আপনার ইতস্ততঃ করবার কোন কারণ আছে?”

হাসিমুখে উঠিয়া ঠাড়াইয়া মরিস বলিলেন, “কিছুমাত্র নয়। সম্পত্তির মালিক আপনি, সম্পত্তি-দাতা-বিক্রয়ের সম্পূর্ণ অধিকার আপনার,—ইজারা দেওয়া তো সামান্য কথা! কলার অন্তর আপত্তি এতে টিকবে না।”—

অধারভাবে উঠিয়া ঠাড়াইয়া লীনা বাধা দিয়া বলিল, “সেটা আমারও জানা আছে। বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের আরম্ভক সম্পত্তি থেকে আপনি আমার মাসিক তিন হাজার পাউণ্ড করে খরচ দিতে...”

আগ্রহের সহিত মরিস বলিলেন, “আজ্ঞা-দের সঙ্গে! এ প্রস্তাব আমি পূর্বেই করেছিলাম, আপনার মনে আছে, বোধ হয়। অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের জন্তে আপনি যদি ঐ সঠে আমার ইজারা দেন, তবে বলুন, আমি এখন চুক্তিপত্রে সহি করে দিচ্ছি, পাঁচ বৎসর পরে ঐ তিন হাজার পাউণ্ডের পরিবর্তে আমি ছ’হাজার পাউণ্ড করে আপনার মাসিক আর বাড়িয়ে দেব। যদি এরকম আর আমি না বাড়তে পারি, তবে আমার এই বার্ষিক লাভ—চোদ্দ হাজার পাউণ্ড, পাঁচ বছর পরে এক সঙ্গে একলাখ চুয়ান হাজার পাউণ্ড গুণে আপনাকে দণ্ডরূপে ফেরৎ দেব।”

সৌম্যমুখি বুকের শান্ত চক্ষু-চিহ্ন উৎসাহ-

আনন্দে জল্ জল্ করিতে লাগিল। শীনার মনে পড়িল,—এই বৃদ্ধ আজ বোল বৎসর বিশ্বতভাবে ঐ কয়লার খনির পেছুতে খাটিতেছেন; অনেক যত্নে খনির আয় বাড়াইয়া তুলিয়া, তিন-শো টাকা মাহিনার কন্মচারী হইতে আজ সাড়ে ন'শো টাকা মাহিনার কন্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইনি নিজের সত্য-নিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য সর্ব-স্বাস্থ্য হইতেও কুণ্ঠিত নছেন। তাহার এত প্রমাণ পূর্বে পাওয়া গিয়াছে।

শীনা নিবন্ধ হইয়া কয়-মুহূর্ত ভাবিল, তারপর মুখ তুলিয়া চাহিয়া দীরস্থরে বলিল, “পাঁচ-বছর পর্যাণ্ত বেঁচে থাক্‌বার সুযোগ আমার হবে কি না, আমি জানি নে মিঃ মরিস!—যদি বাচি, আপনি ছাত্রজার পাউণ্ড করেই আমায় দেবেন। কিন্তু যদি না বাচি, তবে তিন হাজার পাউণ্ডই আমার উত্তরাধিকারী পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার খরচের পক্ষে যথেষ্ট হবে। তার বিলাসিতা বা বদ-মাইসির খোরাক ঘোটাবার জন্যে বেশী অর্থ দিতে আমি ইচ্ছা করি নি। চলুন রেজিষ্ট্রী অফিসে; ও সম্পত্তি আমি আঠারো বছরের জন্যে আপনাকে রেজিষ্ট্রী করে দিচ্ছি। আমার পুত্র সাবালক হয়ে আপনার বা আপনার উত্তরাধিকারীর হাত থেকে সম্পত্তি গ্রহণ করবে। অবশ্য যদি সম্পত্তির অধিকারী হ'বার যোগ্য সচরিত্র এবং সুশিক্ষিত হয়ে বাচে, তবেই সম্পত্তি পাবে, নচেৎ দেশের মঙ্গল কাজের জন্য ও-সম্পত্তি গবর্ণমেন্টের হবে।

চমকিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, “ভগবন্! ভগবন্! এ কি অর্পণীন চিন্তা! আপনি মনে স্থান দিচ্ছেন? মিঃ ব্যানার্জির দোহিত্র ঠায় উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হবেন নিশ্চয়ই।”

শীনার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল! তার সরলপ্রাণ বৃদ্ধ, যদি জানিতে কত বড় অসম্ভব ঐ আশাটা! যে বৃদ্ধান্ত দার্শনিক পিতার উগ্র অভ্যাস দৃষ্টান্তের আব'হাওয়ার ভিতর তার শৈশব জীবন, বিযুক্ত সংস্বারে পরিপুষ্ট হইতেছে,—সে প্রভাব এড়াইয়া বিকৃতভাবে বাড়িবার সম্ভাবনা তার পক্ষে

নাই, নাই,—একেবারেই নাই!

চোখের জল গোপনের জন্য শীনা ভাড়া ভাড়া অজদিকে মুখ ফিরাইয়া, সংক্ষেপে ও একটা কথা বলিয়া, ঘরের বাহিরে চালায়া গেল।

যথাসময়ে একটা গাড়ী ভাড়া লইয়া, সকলে রেজিষ্ট্রার-অফিসে গেলেন। চুক্তিমত লেখা-পড়া রেজিষ্ট্রী হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্বে সকলে বাসায় ফিরায়া আসিলেন; কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রাত্রির আহার শেষে মিঃ মরিস কন্মচারীকে সঙ্গে লইয়া বাজির টেনেই স্বস্থানে রওনা হইলেন।

তাঁহাদের বিদায় দিয়া কিছুক্ষণ স্থায়রচিত্তে শীনা আত্মোপাস্ত সমস্ত ঘটনাগুলি ভাবিয়া লইল। তারপর টেবিলের কাছে গিয়া একটা চেয়ার লইয়া পদ লিখিতে বসিল :—

“প্রিয় স্বামী, ক্ষমা কর। আর্থার নামক কোন ব্যক্তিকে প্রিয় সম্ভাবন জানাবার অধিকার বা সাহস আজ আমার নাট। গিফ্টাওয়ালাদের অমুগ্ধত দত্ত স্থান সম্পর্কে কেই প্রিয় সম্ভাবন জানাচ্ছি, যদি এটাও তোমার অসহ—অপিচ বোধ হয়, তবে জানিও আমার,—এ সম্প্রদায় আর কখনো প্রকাশ করবে না।

“জীবনে অনেক শিক্ষার্থী শিশু, সব চেয়ে ভীত অবস্থার ভিতর দিয়ে ভগবান আমায় যে শিক্ষা লেখালেন,—সেই শিক্ষার্থী আজ আমার কাছে চরম! তোমার মঙ্গল হোক। কাকুর নামে কোন অভিযোগ আজ আমার করবার নাট।”

চীনা শীনার কলম বন্ধ হইয়া গেল। প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত অজস্র অশ্রুধারা ও চকু আড়ার হইয়া গেল! তার, একি ভর-লতা,—একি মিশ্রা আশ্র-পতারণা! কাকুর নামে অভিযোগ করিবার কিছু নাট,—ইটা সত্য কি? ঝল, ঝল, সম্পূর্ণ ঝল!..... স্বামী বলিয়া একান্ত আগ্রহে ভালবাসিয়া তার হাতে অকপট প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়া ছিল, তিনি যে পদে পদে বর্ধীর দৃষ্টে পদাধিত করিয়া শীনার প্রেমকে লাঞ্ছনা-বিকৃত করিয়া, সমস্ত জীবনটা বিষময় করিয়া দিলেন,—এ মন্বর্ত্তিক ক্রতির বিরুদ্ধে মন্বর্ত্তিতা নারী

কোন অভিযোগ.....ওঃ ভগবান, বাঁচাও, বাঁচাও! এ অসহ্য চিন্তার উৎপীড়ন হইতে লোনাকে বাঁচাও!

লোন যতক্ষণ পারিল, খুব কাঁদিয়া গেল। তারপর কলম তুলিয়া লইয়া চোখ মুছিয়া আবার লিপিতে শুরু করিল:—

“না, আমি উপভ্রাসের নায়িকা নই, নাটকের প্রধানা পাত্রী নই,—আমি শুধুই তোমার স্ত্রী ছিলাম, শুধু তোমার বিশ্বস্তা সচক্ষণী হতে চেয়েছিলাম।.....যাক সে ওরাশা-স্পষ্টা রসাতলে! ভীবনে স্বপ্ন দেখার ক্ষরুৎ আমার ছিল না, আমি স্পষ্টে চোখেই আগাগোড়া বাস্তবটাকে লক্ষ্য করে আসছি,—হাঁ পুত্র ভাল রকমেই লক্ষ্য করে আসছি,—অবশ্য আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধিতে যতটা শক্তি সম্ভবে, তার দ্বারা।

“তুমি পেয়ালের বশেই একদিন আমায় চেয়েছিলে, পেয়েছিলেও অত্যন্ত সহজে। তোমার চাওয়া পাওয়ার খেয়াল শেষ হয়ে গেছে, এখন আমি তোমার জীবনের পক্ষে একটা বিরক্তিকর গলগ্রহ মাত্র! তোমার বিরক্তি প্রতিদেও তোমায় অসংযত উগ্রতায় ক্ষেপিয়ে তুলছে, আর অশান্তির আঁটা খেয়ে আমায় মনও ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন একটা জায়গায় ঠিকরে গিয়ে পড়ছে, যে জায়গায় চারিদিকেই শুধু অভাবের বাণী, ক্ষোভের হাহাকার, আর নৈরাশ্রের অবসাদ!—

“এ সংসার নিয়ে বেঁচে পাকা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কেশকর,—মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়েও বেশী অসহ্য,—অস্বস্ত: আমার তো তাই মনে হচ্ছে। তুমি আকুতিগত বৈষম্যটাই সব চেয়ে বড় খুঁৎ মনে করছ, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, প্রকৃতিগত বৈষম্যের বাড়ী কঠোর অস্ত্রায় দাম্পত্য-প্রেমের মধ্যে আর নাই!

“চুলোয় যাক সে কথা। কালো ইণ্ডিয়ানের মেয়ে তোমার পথ ছেড়ে যাচ্ছে। আমার আত্মরিক্ত শুভ কামনা গ্রহণ কর। বিবাহের দায়িত্ব-বন্ধন থেকে তোমায় মুক্তি দিলাম। তোমার প্রকৃতির উপযুক্ত, যোগ্য সঙ্গমণ্ডলী খুঁজে নাও। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,

তোমাদের দাম্পত্য-জীবন সুখময় হোক।

“আগামী সপ্তাহের মেলে আমি রওনা হব। ইটালী যাবার ইচ্ছা আছে, যে ক’দিন বাঁচি বোধ হয়, সেইখানেই শেষ দিন ক’টা কাটাব।

“বৈষয়িক ব্যাপারের সমস্ত কর্তৃত্ব ভার নিজের হাতে নিলুম। কয়লার খাদের কাগজ-পত্রগুলো হস্তগত করার জন্য সিক্কুটা ভেঙে দিয়ে, তুমি আমার বড়ই উপকার করে গেছ। তুমি খরচের টাকাগুলো না দিয়ে যেতে যদি, তাহলে টাকার অভাবে মিঃ মরিসকে টেলিগ্রাম করতে বাধ্য হতুম না। মরিস আজ এসেছিলেন। তাঁকে আঠারো বছরের জন্য পান ইজারা দিলাম। আমার মৃত্যুর পর বিশ্বের যেকোন ব্যবস্থা হবে, সেটা আমার উইলে জানতে পারবে। আপাততঃ তোমাদের না জ্ঞানাই ভাল। মরিস বা কয়লার খাদের ওপর কোন কর্তৃত্বের অধিকার আর তোমার বা আমার রইল না।

“মরিসের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলবার ছিল, কিন্তু ভয়ানক মন পারাপ হয়ে যাচ্ছে, আজ এই পর্যন্তই থাক। শুধু একটা কথা, যাবার আগে তাকে একবার ড’ঘণ্টার জন্যে কি আনায় দিতে পারবে না? ইতি

তোমার অযোগ্য স্ত্রী—লীনা।

চিঠি ভাঁজ করিয়া খামে পুরিয়া ঠিকানা লিখিয়া, চাকরকে ডাকিয়া, পোষ্টবাক্সে ফেলিবার জন্য পাঠাইয়া লীনা যখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল, তখন সে অসুস্থ করিল যন্ত্রণার তাহার মাথা ফাটিয়া বাইতেছে, এবং সকলদিকেরে ভয়ানক শৌভ-বোধ হইতেছে। কয়দিনের উগ্র-মানসিক ওশিষ্টার প্রতিক্রিয়া ভিতরে ভিতরে শরীরকে বড়ই অসুস্থ করিয়া তুলিতেছিল।—লীনা বৃষ্টি প্রতিক্রিয়াটা এবার বেশ জোর-তালেই কাষ আবস্ত করিল।

আমাদের ডাকিয়া পাশের ঘরে থাকিবার আদেশ দিয়া, লীনা বিছানায় গিয়া কবল-মুড়ি দিয়া শুইল। আশ্বস্তার মধ্যেই প্রবল জ্বর লীনার সংজ্ঞালোপ করিয়া দিল।—(ক্রমশঃ)

ঐশ্বর্যবালা ঘোষদ্বারা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 690.

February, 1921.

“কল্যাপোং পালনীয় শিক্ষণীয়তিষত্তঃ।”

কল্যকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত।

৫৮ বর্ষ।
৬৯০ সংখ্যা।

মাঘ, ১৩২৭। ফেব্রুয়ারী, ১৯২১।

১২শ কল্প।
১ম ভাগ।

চিত্তের চির নবীনতা—

ওরে বৃদ্ধ! তুলিস্ নে তোর গান,
ও তুই হারাস নে তোর প্রাণ,
চির-যৌবনময় চিত্ত কি তুই
রাখ'বি স্থপ্ন দিনযাম?—
হয়ে বিনাদ-মিহ্নমাণ?
পাকু' না তোর চুল
হোক' না দেহ ক্ষণ,
বিদায়-বেলাও হাসিয়া চায় তুল,
আবীর-বানে হয় রবি রঙীন!
বহুক্করা গাইচে সদাই গান
রূপ-সাগরে নিত্য করি স্নান;—
আকাশ গাছে, বাতাস গাছে,
তৃণ তরু-লতা গাছে,
তপন গাছে—তারা গাছে
অনন্দের অণু-অণীয়ান!
ওরে বৃদ্ধ বন্ধ করি' গান
চুইচ' র'বি সবার চেয়ে স্নান?

প্রাণের ঠাকুর দেছেন প্রাণে গান
 গাবার তরে সারা দিবস যাম—!
 হুঃখে হুঃখে শোকে তাপে
 স্বপ্ন-রাতে গ্রহের শাপে,
 সকল কাজেই গাইতে হবে গান !—
 খামিয়ে সে গান, রইবি পরিমান ?
 যৌবনময় চিত্ত মোদের
 গাইতে চাহে গান,—
 কবি বলে,
 কলনারি বার্ক্য-জাল বুনে'
 ওরে মুঢ়,
 অকালে তুই হস্ নে বিষাদ-মান ॥
 ত্রীনিশ্চলচন্দ্র বড়াল ।

লীনার শিক্ষা ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(১২)

অরের ঘোরে প্রাণপণে যা-খুসী তাই
 বকিয়া বকিয়া যন্ত্রণা-বিকল অবস্থার ভিতর
 দিখা, তিনটা দিন পুরাপুরী কাটাইয়া, চারি
 দিনের দিন লীনার যখন অর ছাড়িয়া
 যন্ত্রণাটা দূর হইয়া গেল, তখন খুব একটা
 গাঢ় ঘুমের পর সে স্বস্থ হইয়া চোখ চাহিয়া
 দেখিল, পার্শ্ব বিছানার পার্শ্বে বসিয়া তাহার
 মাথার জলপটি লাগাইতেছেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে
 কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া লীনা মুহূর্ত্তের বলিল,
 “প্রভাত বহু, কবে কিরিলেন? কেমন
 আছেন বলুন?”

হাসি-মুখে পার্শ্ব বলিলেন, “ভালই আছি।
 কিন্তু আপনি তো চমৎকার স্বপ্নার লোক!

হঠাৎ এত ম্যালেরিয়া-বিষ সংক্রম কোরলেন
 কোথেকে, বলুন দেখি? বাপু, আমাদের
 চক্ষু স্থির করে দিয়েছিলেন!— একশো ছ’
 ডিগ্রির ওপর অর চড়িয়ে, তোফা আরামে
 বকুনী জুড়ে দিয়েছিলেন। আমি তো পণ্ড’এসে
 অবস্থা দেখে অবাক!”

ক্ষীণভাবে হাসিয়া, পার্শ্বনের সঙ্গে ভাল
 করিয়া কথা কহিবার জন্য পাশ ফিরিতে
 গিয়া, সহসা লীনা চমকিয়া দেখিল, তার হুই
 বাহুতে ‘ইঞ্জেকসনের’ স্কট! বিস্মিত
 হইয়া সে বলিল, “ও, তাই বাখা-বোধ
 হচ্ছিল। পার্শ্ব, আমার অবস্থা কি খুবই
 খারাপ হয়ে গিয়েছিল?”

সজোরে মাথা নাড়িয়া পার্সন বলিলেন, “কিছু না, কিছু না, তবে মাথার গোলমাল একটু বেশী মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল বলে ডাক্তাররা ভয় পেয়েছিলেন, বুঝি-বা ‘মেরিজাইটীশ্ ফেরিঞ্জাইটীশ্’ দাঁড়ায়।”—পার্সন সহসা চুপ করিয়া জানালায় দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “দেখুন, একটা কথা বলে দিই, বন্ধুত্বের খাতিরে আমার এই অহুরোধটি আপনাকে রাখতে হবে।”

ধৈর্য্য-ভার-ক্লান্ত চক্ষু-চ’টি পার্সনের মুখের দিকে স্থাপন করিয়া লীনা বলিল, “কি বন্ধু?”

পার্সন নিজের হাতের আঙুটি-টার দিকে চাখ রাখিয়া মুহূর্ত্তে বলিলেন, আমরা যে-সব আত্মীয়-বন্ধুদের বেশী ভাল বাসি, তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিবাহারই আমাদের কাছে মহাত্মা-জনক, তা খুব জানি। এই ধরুন, আমার কথাই বলি।—আমি আমার মাকে খুব ভাল-বাসি, কিন্তু...বাধা দিয়া লীনা দ্রব্য অধীর ভাবে বলিল, “আমার সম্বন্ধে কি বলতে চান বলুন। তাই, প্রলাপের ঝোঁকে আমি বোধ হয়.....?” লীনার ক্রীণ কণ্ঠস্বর অজ্ঞাত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কথাটা অর্ধপথে থামাইয়া উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল দৃষ্টিতে সে পার্সনের মুখ-পানে চাহিল।

পার্সন জলপটি বদলাইতে বদলাইতে উদাস-ভাবে বলিলেন, “না, না, প্রলাপ অবশ্য মাথা-গরম হওয়ার লক্ষণই। সে প্রলাপের বাজে কথায় আমি কাণ দিতে চাই নে,... ..ও কি? বা! মিঃ পিকক্ যে হঠাৎ!” পার্সন ছুটিয়া জানালায় কাছে গিয়া, বাতিরের ফটকের

দিকে চাহিয়া কি দেখিতে লাগিলেন।

লীনার আপাদ-মস্তক হঠাৎ যেন অপরি-সীম আতঙ্কে আড়ষ্ট-কাঠ হইয়া গেল। উঠিয়া বসিয়া জানালায় দিকে যে চায়, সেটুকু শক্তিও জুটিল না। শুধু নিনিমেষ দৃষ্টিতে পার্সনের দিকে চাহিয়া, গুহ-কম্পিত বিবর্ণ ঠোট-চুট সজোরে দাঁতে চাপিয়া সে আত্মসংবরণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পিবক্? হঠাৎ?—একি অদ্ভুত ব্যাপার!লীনার মাথা ঘামতে লাগিল। পার্সন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিলেন, “আমাকে জানাবার অবকাশ হয় নি, মাপ করুন। পণ্ড মিঃ পিকক্কে আপনার অস্থির খবরটা আমরা টেলিগ্রামে জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম; কাল অবশ্য অপেক্ষাকৃত সুস্থতার খবরও জানিয়েছি। উনি এসে পড়েছেন, মিঃ ডবলস্ সঙ্গে রয়েছেন; ওঁর কাছে আতঙ্কের খবর পেয়েছেন নিশ্চয়ই। আমি এখন বিদায় নিই!—না, না, মিঃ পিকক্কের চা-খাওয়ার বন্দোবস্তটা করে দিয়ে যাই, কি বলুন? বিদায়।”

লীনার অসাড়-নিশ্চীর্ণ ওষ্ঠাধর একবার মুহূর্ত্ত কাঁপিল, কিন্তু কণ্ঠে এতটুকুও শব্দ বাহির হইল না। পার্সন দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

ভয়ে, ক্ষোভে লীনার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল। ইহারা কেন লীনাকে না জানাইয়া তাহার অস্থির খবর পিক্কের কাছে জানাইলেন? এই বে পিকক্ লৌকিকতা রক্ষা করিতে ভদ্রলোকের মত আসিলেন, ইহার ফলে লীনার তাগো কি লাঞ্ছনা জুটিবে, তাহার কোন অনুমান কি ইহারা করিতে পারেন? হার গো, হিতৈষীর দল, তোমাদের হিতৈষিতার অত্যাচারে লীনার কি বিপদ

বাড়াইলে, তাহার কোন খোঁজ যদি রাখিতে!

বন্ধুদের উপর মন যতই তিক্ত হইয়া উঠুক, কিন্তু উপস্থিত বিপদটা যে কেমন করিয়া সামলাইবে, লীনা তাহার কোনই সন্ধান পাইল না। তা ছাড়া, জখন সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিবে, কি আশ্রয়ের ডাকিয়া কষ্টে স্রষ্টে বাহিরে যাইবার উত্তম করিবে, কিংবা যেমন অসাড়-নিজ্জীব ভাবে পড়িয়া আছে, তেমনি নিম্ন হইয়া পড়িয়া থাকিবে, নিজের জন্ত এ-তিমের কোনটা করিবে, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। মহাহুঁড়াবনার উন্টা মাথা গরম হইয়া সমস্ত চিন্তাশক্তিকে ঘুলাইয়া দিল। হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া সর্কাজে কাল ঘাম ছুটিতে লাগিল।

বাহিরে জুতার শব্দ হইল। আশ্রয় হ্রাসের পর্দা সরাইয়া দিল। পিকক্ চোকাঠ ডিলাইতেই, পর্দা টানিয়া দিয়া আশ্রয় সরিয়া গেল।

মাথা হইতে টুপিটা নামাইয়া টেবিলে রাখিয়া, অগ্রসরভাবে অ কুঞ্চিত করিয়া পিকক্ কক্ষ দৃষ্টিতে একবার শব্দের দিকে চাহিলেন। লীনা প্রাণপণে “মোরিয়া” হইয়া, হর্ষল কম্পিত হাতখানা বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া ক্ষুণ্ণ জড়িত স্বরে কি একটা অভ্যর্থনাসূচক শব্দ করিল। পিকক্ সার-উত্তর না দিয়া এতদুত্থানে মুখ কিরাইয়া লইয়া, বিছানা হইতে সব চেয়ে দূরে যে চেয়ারখানা ছিল, সেইটার উপর বসিলেন, এবং মিনিট-পাঁচ কুণ্ডল গুলি হইয়া বসিয়া থাকিয়া, টুপিটা তুলিয়া লইয়া নীরবে প্রহেলনাদাত হইলেন।

লীনার অধীর ব্যাকুল প্রাণটা যেন ঠিকরাইয়া পাজর তালিয়া বাহিরে আসিবার

জন্ত আকুল-মত্ততায় বৃকের ভিতর মাথা ঠোকাঠুক করিতেছিল। সে স্বামীকে উঠিতে দেখিয়া মরণান্তিক চেষ্টায় শুক রুদ্ধ স্বরে বলিল, “একটু দাঁড়াও, একটু!”

তীর কঠিন স্বরে পিকক্ উত্তর দিলেন— “দাঁড়াবার সময় নাই, আদ্যন্ত। পরেই আমার টোণ।”

ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া লীনা বলিল, “এখন যাবে?”

সটান্ চোকাঠের বাহিরে পা বাড়াইয়া পিকক্ উত্তর দিলেন, “হাঁ।”—পরক্ষণেই তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

লীনা স্বর্গে, কি মর্ত্যে, কি পাতালে, কিংবা এ তিন লোকের অতীত কোন সুছলভ শৃঙ্খলোকে ভর দিয়া অবস্থান করিতেছে, সে-টা ঠিক করিয়া বুঝিতে মিনিট দশ কাটিয়া যাইবার পর, দেখিল, সামনের বারেরগার ডব্‌সনের উচ্চ হস্তধ্বনি ও পিকের রুট উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। বৃকের রক্ত যতই হিম হইয়া আসুক, এবং রুগ-হর্ষল মস্তক যতই ক্রান্তি-বিকলতায় ভেঁ। ভেঁ। করিতে থাকুক, কিন্তু ঐ রাগভরা কথাগুলো শুনিবার জন্ত লীনার প্রাণ চহুগুণ আকুল হইয়া উঠিল! হায় ভগবান্, এত লাঞ্ছনাও লীনার অদৃষ্টে লিপিয়াছিল! নিজের অপরিণীম হৃৎকের ভারে নিজে তো পিষিয়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে-ই, তাহার উপর সে ঐ হিতাকাঙ্ক্ষী মিত্রগুলির পর্যন্ত যে কত ক্রোধান্তোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে, সেটা মনে পড়িলে যে লজ্জার ঘুণায় তাহার আশ্র-যাতী হইতে ইচ্ছা করে!—

হ্রাসের পাশে হ্রাস অপেক্ষা করিতেছিল।

লীনার ইচ্ছিতে সে ঘরে ঢুকিয়া, বারেশবার দিকের জানালাটা সাবধানে নিঃশব্দে খুলিয়া দিল। খাটের প্রান্তেই জানালা। লীনা সেই দিকে একটু সরিয়া গিয়া, একটা বালিশে ভর দিয়া উৎকর্ণ হুঁইয়া বাহিরের কথাবাণীগুলি শুনিতে লাগিল।

পার্সন তখন খুব সংযত-দীর-কণ্ঠে কি বলিতেছিলেন। কথাগুলো শোনা গেল না। উত্তরে পিকক্ বেশ একটু চড়া আওয়াজে তীব্র শ্বেষ-ভরে বলিলেন, “পরস্য,—একটি পরস্য উপায় করা, সে যে কি কষ্টের কায, সেটা যাদের পরস্য উপার্জন করতে হয়, তাহারাই জানে! মিঃ ডবলন্ পোশ-খেয়ালে ছবি এঁকে লোক ঠকিয়ে সস্তা দরে পরস্য উপার্জন করেন,—দাসহের চুপে শুনে ওঁর হাসির ভাবনা কি? ফাজিল, নিকশা, অপদার্থের হাসিই তো একমাত্র সফল! ও সব লোক আমি চ’ট চক্ষে পছন্দ করি না।”

ডবলন্ অগ্নান-কোঁতুকে টিপি টিপি হাসিয়া, চেয়ারটা সশব্দে সরাইয়া পিছু হাটিতে হাটিতে বলিলেন, “দোচাই মিঃ পিকক্, আপনার চক্ষুঃশূল-হাসিটা আপনার চোখের সামনে হাস্তে আমি মোটেই রাজী নই। মাপ করুন! আপনার চেয়ারের পাশে আমি আড়াল হয়ে নিরাপদে বসছি, এখন সুস্থির হয়ে কথা বলুন।”

পার্সন নিঃশব্দে কি বলিলেন, স্পষ্ট শোনা গেল না। উত্তরে পিকক্ সজোরে টেবিল চাপড়াইয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, “দেখুন, জীলোক চিরদিনই জীলোক, আর পুরুষ চিরদিনই পুরুষ,—এইটুকু আপনারা ভাল করে মনে রাখিবেন। জীলোক যে পুরুষের সঙ্গে

সমানে টক্কর দিয়ে চলতে যাবে, তা কখনই হতে পারে না।”

পার্সন একটু হাসিয়া বলিলেন, “স্বী-যোকেরা যে কেবল পুরুষের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলবার চেষ্টা করিতে থাকি নিজেই জগতে এসেছে, এ ছাড়া তাদের জীবনে আর কোন উদ্দেশ্যই নাই,—এরকম অদ্ভুত প্রশ্নে আশা করি মাজিষ্ট্রেট-সাহেবের হাতে কিছু নাই? অদ্ভুত:—”

বাধা দিয়া অসংযত-উত্তেজনার সহিত ককণ চীংকারে পিকক্ বলিলেন, “নাই? কি বলেন আপনি? শরীর আমার জলে পড়ে যাচ্ছে ঐ জলে, রাগে আপাদমস্তক বিষিয়ে উঠেছে! স্বীভাতিটার জাতিয়েই দোষ!—এমন লম্বুচেতা বিশ্বাসঘাতী জাতিকে যে আহাশ্বকেরা সম্মানের চোখে দেখে, তা’দের উপর পণ্য আমার স্বর্ণা—দাক্ষণ স্বর্ণা হয়ে গেছে।—”

ডবলন্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বেশ একটু ঝাঝালো বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, “রাগ করবেন না মিঃ পিকক্, পাগ্লা-গারোদ এখান থেকে অনেক দূর, এবং বাড়ীতেই একজন অত্যন্ত চক্ষল রোগী বাস করছেন। আপনার কষ্টমন্দির বিষের ঝাঁঝটা তাঁর স্বাস্থ্য-শাস্তির পক্ষে আদৌ অগ্রকূল নয়। অদ্ভুত: ভদ্রস্বের দোহাই দিয়ে কথাটা স্মরণ করাচ্ছি।”

পিককের আফালন-উত্তেজিত, দান্তিক ঠোঁট-চটখানা সহসা বেন বুসি খাইয়া পের্তো হইয়া গেল। নিজের তত্ত্বের তথ্যাদাটা অভিমান-ভরে অন্তরে বন্ধার দিয়া উঠিল। মনের বিষ মনেই চাপিয়া মানের দ্বারে নিজের

অভয় চীৎকারটা বন্ধ করিয়া তিনি গুম্ হইয়া চা খাইতে লাগিলেন।

ডব্‌সন্‌ ব্যয়েগার এ-দিকে ও-দিকে পারচারী করিতে করিতে, ফুলগাছের টব-জ্বালার শোভা-নিরীক্ষণে মনোযোগী হইয়া মিনিট-দুই নীরব থাকিয়া হাসি হাসি-মুখে যেন নিজ-মনেই বলিলেন—“পুরুষ চিরদিনই পুরুষ, কোন দিন কারুর খাতিরে তারা যে মেয়েমানুষ হয় নি, এ কথাটা গুলিখোর ঔপভাসিকরা ছাড়া আর সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, এবং অকুতোভয়ে, অধীনস্থ-দুর্জলদের উপর বর্ষের দস্তে, দৈত্যশক্তির সর্গাবহারই যে পুরুষের চিরন্তন পৌরুষ-গর্ভের শ্রেষ্ঠম গৌরব,—এ সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্তার মতটা কি তা জানিনে বটে, কিন্তু শুনেছি সকল দেশের বিবাহিত মাতাল এবং পৈতৃত্য বাতিকে উদ্‌গদগ্‌স্তরা এ-বিষয়ে একমত! কিন্তু আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট-বন্ধুর আইন-বিদ্যাও যে এ মতের সমর্থক, তার কোন খবরই আমি জানিভূম্‌ না!”

ঘরের ভিতর, সকলের চোখের আড়ালে বসিয়া যে প্রাণীটি ইহাদের কথাগুলো শুনিতে-ছিল,—ডব্‌সনের কথার ভরে তার প্রাণ উড়িয়া গেল! এক অহঙ্কার-মত্ত দান্তিক সব কতি সব খেলারং সহিতে পারে, কিন্তু দস্তের মাথার এতটুকু আঁচড় লাগিলেই, রাগে সে কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান হারাইয়া ফেলে!—বিশেষতঃ পিকক্‌! মনে মনেই ডব্‌সনের স্পষ্টবাদিতা ও সাহসের সুগুপাত করিতে করিতে লীনা সজােসে কান খাড়া করিয়া বসিল,—এই বুঝি ডব্‌সনের চৌকিপুরুষ উদ্ধার হয়!

কিন্তু পার্সনের কুপায় ডব্‌সনের চৌক-

পুরুষ সে-যাত্রা নির্বিশেষেই পরিজ্ঞাপ পাইলেন কারণ, পার্সনের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাঁহাদের ক্যাম্প হাঁসপাতালের দুইজন কলো-রোগীর অবস্থা সকাল হইতে অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে; সে হতভাগ্য দুইটাকে শেষ দেখা দেখিতে হইলে, অবিলম্বেই যাওয়া চাই। ক্রুদ্ধ পিকক্‌কে ক্রোধ-প্রকাশের অবসরমাত্র না দিয়া পার্সন হঠাৎ ব্যস্তভাবে বিদায় লইলেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া বিদায় লইয়া ডব্‌সন্‌ও পার্সনের সঙ্গে চলিলেন।

লীনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া ঝাটিল; শুইয়া পড়িয়া, ঘীরে হুস্থে মনে মনে হিসাব ঠিক করিতে লাগিল, পিককের নিফল-আক্রোশে উদ্যত ক্রোধ-বজ্রটা এবার কার ঝড়ে ভাসিয়া পড়িবে? লীনার ঘাড়ের নিশ্চয়! কিন্তু লীনা আশ্চর্য্য করিবে কোন্‌ উপলক্ষ্য ধরিয়া?

কিন্তু উপলক্ষ্য ঠাওরাইতে লীনা বেশী সময় পাইল না। দুইমিনিট পরেই বালক-তৃত্যটা পক্ষীর বাহির হইতে ঘরে ঢুকিবার অসুস্থতি চাহিল। লীনা অসুস্থতি দিল। বালক বঃ ঢুকিয়া শুক-ভীত-মুখে বলিল, “মিঃ মরিস্‌ যে চুক্তিপত্র লিখে দিইয়াছেন, সাহেব সেটা চাইছেন,”

লীনা শাস্ত ধৈর্য্যের সহিত উত্তর দিল, “সেটা রেজিষ্ট্রী অফিসে আছে, আমার কাছে নাই

কথাটা বাস্তবিকই সত্য। লীনা সেই রাতে অসুখে পড়ে; দলিলটা-রেজিষ্ট্রী অফিস হইতে তুলিয়া আনাহবার সময় পায় নাই।

‘বঃ’ চলিয়া গেল এবং দুই মিনিট পরেই ফিরিয়া আসিয়া লীনার হাতে একটুকরা

কাগজ দিল। কাগজে লেখা আছে—“ত্রীলোকরা যে কেবলমাত্র পুরুষদের শাসনের ভয়েই সং ও পবিত্র থাকে, তা আমার খুব জানা আছে। হয় মানে মানে দলিল দাও, নয় আমি চাবুকের সম্ভাবহার কর্তে বাধ্য হব।”

রাগে, অপমানে, ঘৃণায় লীনার প্রাণ জলিয়া উঠিল, কিন্তু সেই সঙ্গেই শারীরিক অত্যাচার-পীড়ন-ভয়ে, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল! অসহায়, সম্পূর্ণ অসহায় হতভাগ্য সে! আধমরা দেহ লইয়া মৃত্যুর দুরারে মাথা গলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে,— একটু, শুধু একটু হৃদস্পন্দন-বেগ হ্রাস-বৃদ্ধির অপেক্ষা মাত্র!—তাহা হইলেই নিরুপদ্রবে ইহজীবনের সব দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়! হে ভগবান্! সেটুকুর পরিবর্তে পাশবিক ঃসার ক্রুর অত্যাচারে অপঘাত মৃত্যু.....! কিন্তু থাক্ নিজের মৃত্যু-ভয়! আপাততঃ এই অভাগা দরিদ্র বালককে আগে বিপদের মুখ হইতে বাঁচান যাক্। পরের প্রাণ কেন অনর্থক নষ্ট হয়?—এর হাতে প্রত্যুত্তর পাঠাইলে, এ তো এখনি আগে মরিবে!

ইসারা করিয়া ভৃত্যকে কাছে ডাকিয়া লীনা চুপি চুপি বলিল, “ঐ পিছনের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে হাতার পাঁচিল টপ্কে পালাও।—সাহেব যতক্ষণ বাড়ীতে থাকবেন, ততক্ষণ কুঠিতে ঢুকো না। পালাও শীঘ্র।”

জড়-বুদ্ধি বালক বিস্ময়-ভীত দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, “পালাব? কোথায় পালাব?”

লী। বেথানে খুসী,—যমের বাড়ী! পালাও শীঘ্র। সাহেব চাবুক নিয়ে আসছেন ঐ, দৌড়!”

হেঁলেটা ধব্ ধব্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

পীড়নের ভয়, বড় ভয়ানক জিনিষ! এক লাফে জানালা ডিক্কাইয়া সে দ্রুত অন্তঃস্থান করিল।

লীনার চোখ ছাপাইয়া জল আসিতেছিল! হায় ভগবান্, যদি এমন যুগিত-হীনতার অন্ধেই লীনাকে দাঁড় করাইবে, তবে ভয়ের সাজ পরাইয়া কেন তাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিল? জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত সে পৃথিবীতে এমন কোন অভয়, কোন অধর্ম, কোন অসত্যকে আশ্রয়দান করে নাই, বার প্রতিক্রিয়া-বশে, জ্বরের কাছে, সত্যের কাছে, ধর্মের কাছে সে এতটুকুও দণ্ডিত হইতে পারে। তবু তাকে দণ্ডিত হইতেই হইবে,— এই সম্পূর্ণ অভয় অত্যাচারের কাছে? যে অত্যাচারের কারণ নাই, কৈফিয়ত নাই,—আছে শুধু শারীরিক-শক্তি-মাংসসর্গোর দম্ভ, আর মানুষের হাতে-গড়া সম্পর্ক-বিধানের উগ্র কঠোর প্রভুত্ব-দর্প!.....উৎসর্গ যাক্ মৃত্যু-ভয়! মরিতে একদিন হইবে-ই। অনেক অত্যাচার স্পর্ধাকে নীরবে সহিয়া, সে অত্যাচারীর পাপ-স্পর্ধাকে অনেক প্রশ্রয় দান করিয়াছে, আর নয়! নিজের নিরুপুণ ভয়ভয়ের মান বাঁচাইবার জন্ত, স্বামীর অমানুষিক স্বামিস্ব-দত্তের চরণে প্রতিদিন তিল তিল করিয়া সে নিজের মনুষ্যস্ব-টুকু নিঃশেষে বলিদান দিয়াছে, আজ সেই পাপই সংহার-মুষ্টি ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে নয়?—এবার কোনও তদ্রূপ কোনও ভালমাত্রনী তাকে বাঁচিবার পথ বলিয়া দিতে পারিবে কি?—না, অসম্ভব! মানুষকে বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিতে—শুধু তার মনুষ্যস্বের দাবীটুকু, আর কেউ নয়;— অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে আর কেউ নয়!

বারেণ্ডা হইতে পিকক্ গচ্ছিয়া হাঁকিলেন
“বয়।”

লীনা বিছানার উপর সোকা হইয়া বসিয়া
প্রাণপণ শক্তিতে উত্তর দিল, “নাই সে
অখ্যানে। আমি তা’কে অন্তর পাঠিয়েছি।”

পিকক্ গট্ গট্ শব্দে দ্বারের আসিয়া
উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, “কার হুকুমে সে গেল?”

শ্বির দৃষ্টিতে সেই মর্ষিমান উগ্র-দন্তের
দিকে চাহিয়া লীনা উত্তর দিল—“আমার
হুকুমে। এ বাড়ীর সমস্ত দাস-দাসীরা
আমারই বেতন-ভোগী। তুমি তাদের ওপর
প্রয়োজন-মত আদেশ দানের অধিকারী ছিলে
বটে, কিন্তু অন্তায় অত্যাচার করবার কোন
অধিকার তোমার ছিল না; সেটা আজ সম্পূর্ণ
স্বরেই তোমায় জানাতে বাধ্য হচ্ছি। আর
তুমি চাবুকের ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে
বলপূর্বক দলিল আদায় করতে চাও?
বাস্তবিকই তোমার এতদূর নৈতিক উন্নতি
হয়েছে! এ কি সত্য?”

পিকক্ চোখ পাকাইয়া উচ্চত-ভাবে
বলিলেন, “হাঁ হয়েছে, তার হবে কি? তোমার
তাতে কি?”

লীনার আপাদমস্তকে বিধাক্ত-উত্তেজনার
বিহ্বল-বিলিক্ বহিয়া গেল। কোথা হইতে যে
শক্তি জুটিল, বলা যায় না! তীরবেগে উঠিয়া
দাঁড়াইয়া তীব্র কণ্ঠে লীনা বলিল, “আমার
কি? বটে! তুমি নিজের উদ্ভবের সম্মান
ভুলে গেছ অনেক দিনই, তবু তোমার সম্মান
রক্ষার জন্য, অকাতরে আমি অসহ-অপমান
সহ করে আসছি এতদিন,— সম্পূর্ণ নিঃশব্দে।
কিন্তু আর নয়।—বিবাহটা যে লোহার পিঞ্জর
নয়, আর বিবাহিতা পত্নী যে সত্যিকার

পিঞ্জরবদ্ধ নিকপায় পশু নয়, সে কথা আজ
তোমায় স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেব।—চল পুলিশ
ঠেগেনে, তোমার চাবুকের দৌড় দেখে নিচ্ছি।
স্বামিভের দোহাই দিয়ে, কত ভয়ানক-শরৎ
প্রকাশের ক্ষমতা আছে, তা বুঝে নিচ্ছি আজ
ভাল করেই।”

পিকক্ জীবনে অনেক অবস্থায় পড়িয়াছেন,
এবং অনেক সঙ্কটের মাধ্যম অনেক রকম
অদ্ভুত বুদ্ধি খাটাইয়া চট্ পট্ দায়োদ্ধার
হইয়াছেনও সহজেই! এবং অধিকাংশ
ক্ষেত্রেই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়া,
মনে মনেই নিজেকে বিস্তর বাহবা
দিয়াছেন! কিন্তু আজ তিনি জীবনে প্রথম
চমৎকৃত, এবং বোধ হয় সব চেয়ে বেশী হত-
বুদ্ধি হইলেন, লীনার মুখে পুলিশের নাম
শুনিলেন! পিকক্ অবাক হইয়া হাঁ করিয়া
চাহিয়া রহিলেন! উগ্র-ক্রোধে অপ্রকৃতিস্থ
লীনা, টলিতে টলিতে উঠিয়া জুতাটা পায়ে
দিয়া যখন টুপিটা হাতে লইল, তখন হঠাৎ
পিকক্ তীরের মত ছুটিয়া আসিয়া, চক্ষের
নিম্নে লীনার শীর্ণ হৃকল হাতের মুঠা হইতে
কাগজের টুকরাটা ছিনাইয়া লইয়া নিজের
মুখে পুরিলেন। পর মুহূর্ত্তই সেই বেপথু-
মান হৃকল দেহটা ঘুরাইয়া শূন্যে তুলিয়া
বিছানায় ফেলিয়া, এক এক টানে পায়ে
জুতা দুইটা খুলিয়া টান-মারিয়া ঘরের কোণে
ছুড়িয়া ফেলিয়া, উগ্রকণ্ঠে হাঁকিয়া বলিলেন,
“কে আছিল ওখানে, জলদি আইস্ ব্যাগ
তৈরী করে আন; আর খানিকটা ত্র্যাণ্ডি
মেশানো দাও।”—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কাগজটা
ধাতে চিবাইয়া পিণ্ড পাকাইয়া; তিনি
জানালায় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

দুয়ারের বাহির হইতে বেয়ারা ও আয়ারা
অভিবাদন জানাইয়া আদেশ পালনের জ্ঞ
দেড়িয়া গেল।

আকস্মিক ঝাঁকুনি খাইয়া, অবসন্ন
মুচ্ছাত্তর লীনার বাক্শক্তিটা কবিকের জ্ঞ
সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ভিতরে
অমুভব-শক্তিটা বেশ উগ্র-সচেতন ভাবেই
কাজ করিতেছিল। স্বামীর এই অদ্ভুত
ব্যবহারে সে হাসিবে কি কাঁদিবে, কিছুই
ঠিক করিতে পারিল না, কিন্তু স্পষ্ট অমুভব
করিল,—কে একজন যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া
লীনার দেহের চামড়া ও পেশীর অভ্যন্তরের
প্রত্যেক ছাড়ের ভিতর চিমটি কাটিয়া কটিয়া,
তীব্র-ব্যঙ্গ পরিহাস করিয়া অসহ্য বিদ্রূপাত্মক
দরদ দেখাইতেছে!—

কখন যে ‘আইস্ বাগ’ আসিয়া মাথায়
চড়িল, এবং কেই-যে গলার ভিতর খানিকটা
বিস্বাদ তরল পদার্থ ঢালিয়া, জোর করিয়া
গিলাইল, লীনা কিছুই ভাল টের পাইল না;
যখন প্রকৃতিস্থ হইয়া চোখ মেলিয়া
চাহিল—তখন দেখিল, স্বামী মাথার কাছে
আড় হইয়া শুইয়া ‘আইস্ বাগ’ ধরিয়া
আছেন, বরে তৃতীয় বাক্তি কেহ নাই।

পাছে অবাধ্য চোখ দিয়া একনিঃশব্দ-
শব্দে জল করিয়া পড়ে, সেই ভয়ে লীনা
তাড়াতাড়ি চোখ বুজিল। কেন বলা শক্ত,
কিন্তু নিজের উপর হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া
উঠিতেই তাহার ইচ্ছা হইল!—পাছে আবার
নূতন কিছু অধীরতা প্রকাশ করিয়া ফেলে,
সেই-ভয়ে লীনা প্রাণপণে শক্ত হইয়া, আড়ষ্ট
কাঠের মত পড়িয়া রহিল।

অলক্ষ্য পরে পিকক্ আস্তে আস্তে

ডাকিলেন, “লীনা!”—লীনা চোখ বুজিয়াই
উত্তর দিল—“কেন?”

পিকক্ সোজা হইয়া বসিয়া নিম্নবরে
বলিলেন, “আচ্ছা আমি যদি এখন তোমার
কাছে থাকা চাইতে প্রস্তুত হই, তা হলে তুমি
কি পুষের রাগ-রোষ ভুলে গিয়ে, আমার
বিরুদ্ধাচরণ করতে নিরস্ত হও?”

উত্তপ্ত মস্ত-বাথায় লীনার চোখ দিয়া
উজ্জ্বলিত অশ্রুশ্রোত ছুটিয়া আসিতে চাহিল।
—হায় স্বামী! তোমার পায়ের কাছে নত-
জামু হইয়া, কত দিন কাতর-কণ্ঠে লীনা
তোমার একটা অমুগ্রহ ভিক্ষা চাহিয়াছিল,—
শুধু একটা অমুগ্রহ, দান-প্রার্থনার ভাষায়
ভিক্ষা চাহিয়াছিল,—‘তোমার স্বভাবের দোষ-
গুলি সংশোধন কর’!—কিন্তু মনে আছে কি,
—কত নিদ্র, উক্ত অবজ্ঞার পদাঘাতে তুমি
সেই মঙ্গলপ্রার্থি-ভিক্ষার্থীর হৃদয়টা শুঁড়া
করিয়া দিয়াছিলে!.....আজ তোমার সেই
উগ্র অপকৃতিস্থতা হঠাৎ শাস্ত প্রকৃতিস্থ
হইয়া গেল, কি মগে? পুলিশের নামে!
বাঃ! সগায় যে লীনার মাটিতে মিশিয়া
যাইতে ইচ্ছা হইতেছে! এই সদয়বল লইয়া
তুমি কি না, লীনার উপর অপার—অসীম
আধিপত্য প্রকাশের আদিকারী! বাঃ!—
লীনা কোন উত্তর দিল না।

লীনাকে নির্দীপ্ত নিম্ন দেখিয়া, পিকক্
ক্রমঃ অধীরভাবে বলিলেন, “তোমার মতলব
কি পূলে বল। তোমার তিন হাজার টাকা
আমি ফেরত দিতে রাজি আছি, তোমার
‘দীরে’ জহরৎ-এর গয়নাও আমি ফিরিয়ে
দেব,—যার জন্যে আমার ওপর আজ তোমার
এত আক্রোশ, সে সব আমি বুঝতে পারছি।

—তোমার সব জিনিস ফেরৎ দেব,—এখন বল, আমি যদি ক্ষমা চাই—”

বাধা দিয়া, প্রসারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া, ঈষৎ-তীব্রতা-মাখানো ক্ষৌণকর্থে লীনা বলিল, “যদি ক্ষমা চাই! অর্গার, বিবাহিত জীবনটা কি কতকগুলো নীচ স্বার্থের চুক্তি-স্বত্রে গাঁথা একটা ঘৃণ্য ব্যবসায়ের স্থান? তুমি আমার হীরে জহরৎ—মায় হাত খরচের টাকাগুলো পর্য্যন্ত সরিয়ে ফেলে, আমার বড় জন্মই করতে চেয়েছিলে! সে চেষ্টা বিফল হোল দেখে, আজ দায়ে পড়ে,—সেইগুলোই উৎকোচ দিয়ে,—‘যদি ক্ষমা চাই’, এই স্তোক বাক্যের প্রলোভন বেড়ে, আমার অন্তরের স্বাধীনতাটুকু কিনে নিতে এসেছে?—কিন্তু না, আমার ক্ষমা কর,—আমি তত নিকোঁধ নই।”—

পিকক্ গরজের দায়ে ঠেকিয়া যে ধার-করা শিষ্টতার মুখসটা পরিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তে সেটা খসিয়া পড়িল! গর্জিয়া উঠিয়া, বিছানার উপর সবলে মুঠাঘাত করিয়া বলিলেন, “তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেছে! ছনিষার অন্নবুন্ধি ময়েগুলো যখন বড়াই করে পাঁচালো বুদ্ধি খেলাতে যায়, তখন আমার সর্গশরীর জলে ওঠে! সাবধান বলছি, আমার ওপর বুদ্ধি খাটাতে চেও না। যা জিজ্ঞাসা করছি সোজাশুজি তার জবাব দাও।”

অল্প সময় এই রকম ধমক-ধামক, তুর্জ্জন গর্জন শুনিলেই লীনা ভয়ে থতমত খাইয়া, হতবুদ্ধি নিকন্তর হইয়া পড়িত; কিন্তু আজ পিককের গর্জন নিফল হইল। স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া লীনা বলিল, “তোমার অনেক আধিপত্যই আমাকে বলপূর্ব্বক সহ করিয়েছে,

কিন্তু আমার বুদ্ধি, চিন্তা, মনের ওপর কোন আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছে কি কোন দিন? যাও, তথা কথা বাড়িয়ে, ক্রোধের আগুন মত্তকটা আলিয়ে পুড়িয়ে থাক্ কোরো না।.....তোমার আমার মাঝের সম্পর্কটা যে খরিদার-ঠকানো, মিথ্যা চাতুরীর দোকান-দারী দিয়ে গড়ানয়, এ সত্য যতদিন বিশ্বাস করছি, ততদিন তোমার কার্যোদ্ধারের “যদি” চুক্তিতে বাধা, কোন ক্ষমা চাওয়ার কথা আমার বোলো না।”

পিকক্ গুম্ হইয়া থানিকটা ভাবিয়া ঋষ্টবরে বলিলেন, “তুমি জানো, তোমায় কুকুরের মত দোরে দোরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবার ক্ষমতাটা এখনো আমার হাতের মুঠায় আছে? তুমি সম্মানের সম্পত্তি চুরি করে পরের হাতে তুলে দিয়েছ, এ কথা আজ যদি আমি আইনের সাহায্যে আদালতে প্রমাণ করি, তা হ’লে আজ তোমার পৃথিবীতে দাঁড়াবার স্থান নাই, তা জানো?”

লীনা উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ক্রোধে কান্না আসিতে লাগিল, হায়,—দৈহিক শক্তিটা এমন উনিবার রোগ-পক্ষে ডুবিল যে, শিকলে বাধা বিড়াল-ছানার মত, উপযুপরি জুতোডাক লাপি খাইয়া ‘চিড়ে চ্যাপ্টা’ হইয়া মরিতে হইবে? হে ভগবান্, হে ভগবান্, একবার শক্তি দাও, মুহূর্ত্তের অস্ত শক্তি দাও।

লীনা উঠিতে গিয়া অবসন্নদেহে পড়িয়া গেল। দ্রুত খাস টানিয়া, হতাশ ব্যাকুলভাবে সে ফাল ফাল করিয়া চাহিয়া রহিল দেখিয়া পিককের অবাধে যথেষ্ট বাক্য-স্রোত ঢালাইবার সুবিধাটা বাড়িয়া গেল! তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া

তীর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, “তোমার সেই শাস্তিই ঠিক ! তোমার চরিত্রের জঘন্য কলঙ্ক ঢাকবার জন্য লোকের চোখে অনেক ধূলো দিয়ে বেড়িয়েছি ; ভুল করেছি আমি । দাঁড়াও, এবার তোমার সন্মোক্ষ করছি ।—”

মর্যাদাহতা সিংহী যেন শূলের গোঁচা থাইয়া মরণাশ্তিক ঊদ্ধত্যে গর্জিয়া উঠিল । মাথা তুলিয়া লীনা দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, “কি ? বল আর একবার, ভাল করে বল । আমার চরিত্রের জঘন্য কলঙ্ক ? ঈশ্বরের দোহাই সত্য বল ?”

পথের পাশে নিশ্চিন্ত শায়িত কুকুর হঠাৎ বেত খাইলে যেমন আগে ছুটিয়া গিয়া মোড়ের আড়ালে আশ্রয় লয়, তারপর নিফল-আকোশে প্রাণ গুলিয়া গর্জিয়া ভয় দেথাইতে চায়,— পিকক্ ঠিক তেমনি ভাবে তীরবেগে গরের বাহিরে গিয়া, ভয়ানকের পাশ হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, “তুমি অধঃপাতে গেছ, তোমার মূড়াই মঙ্গল ! তুমি আমার পুলিশে দিতে চাও, এত স্পষ্ট তোমার ? আমার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তুমি টিকবে ?.....তুমি জশচরিত্রা,—তুমি নিজ হাতে সম্মানকে বিস

দিয়ে হত্যা করতে গিয়েছিলে, আমি মুক্তকণ্ঠে আদালতে সে-কথা স্বীকার করবো ।”

লীনার রুখ-বিকল দেহ মন উন্মাদ-মহগার প্রচণ্ড বিদ্রোহাড়াইনে সবেগে কাঁপিয়া উঠিল । স্তম্ভিত, আত্মবিস্মৃত লীনার মুখ হঠাৎ বহুবলে নিদারুণ অভিশাপ-বাক্য পসিমা পড়িল—“ভগবানের শ্রায় দণ্ড বলে যদি সত্য কোন জিনিস থাকে, তবে সে মিথ্যাবাদীর মাথায় ভেঙে পড়ুক !”

গর-মুহুর্তেই লীনা সভয়ে শিহরিয়া উঠিল ! আগুন উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিতে গিয়া মংসা সংজ্ঞাহীন নিজীবের মত বিছানার উপর সে লুটাইয়া পড়িল ! মুহুর্তে সমস্ত পুলিবীটা যেন লীনার মগজের ভিতর ঢুকিয়া প্রলয়-উল্লাসে অটোহাস্য করিয়া প্রবল ভূমিকম্পে তাত্ত্ব নৃত্য জড়িয়া দিল !

পিকক্ নির্দয় বজ্র-কটাক্ষে একবার লীনার দিকে চাহিয়া রুষ্ট-নিরঙ্গভাবে ক্রতপদে চলিয়া গেলেন !

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা গোস্বামায়া ।

মানবের মৃত্যু

বিধাতার পেয়ে আশীর্বাদ
হে মানব ! 'আইলে পরায়,
পদরেণু তাঁহার লইয়ে,
আপনার হৃদয়ে ধরিয়ে—
তাঁহার জ্ঞানের কণিকায় ।

প্রীতিমগ্নে দীক্ষা ল'য়ে তাঁর
বলি' এলে পরশি' চরণ—
"হে বিভূ ! রাখিব তব মান
দিলে যদি বরদেহ দান,
তব মগ্নে নিরোগি' জীবন ।"

কিস্তি একি ? কৃতঘ্ন মানব !
কোথা যায় শপথ তোমার ?
যবে হেরি ভুলি' মস্ত তাঁর
নিরয়ের আন অত্যাচার !

একজন কেঁদে কেঁদে মরে
বিষাদের গাহি ক্ষীণ শ্রব,
পিশাচের অট্টহাস তুলি'
অন্তে তাহা করে দেয় চুর !

নিপীড়িত কাহারও হৃদয়
ফেলে যদি গোপনে নিখাস,
অন্ত জন সে বেদনা ল'য়ে
আড়ম্বরে করে পরিহাস !

অদৃষ্টের তাড়নার ভয়ে
মোনী কেহ নাহি ভুলে মাথা,

গজনার অক্ষুণ্ণ-প্রহারে
অন্তে স্থধী দিতে তাঁরে বাধা !

শক্তিহীন একজনে হেরি'
নিপতিত আপন চরণে,
অন্তে শুধু প্রভুজ জানায়
স্বনিষ্ঠুর পদ-বিদলনে !

দৈবের কুপায় যদি কেহ
নিজগুণে লভে উচ্চতায়,
অন্তজন দহিয়া হৃদয়ে . . .
রত তাঁর অহিত-চিন্তায় !

একের ক্ষমতা হরি' হয় !
অন্তে চায় লভিতে শক্তি,
একজনে করিয়া বন্ধন
অন্তে চায় আপন মুক্তি !

বরজন্ম করিয়া ধারণ
বিধাতার আশীর্বাদ পেয়ে,
এইরূপে সাধি' হীনতায়
প্রীতিমগ্ন তাঁহার ভুলিয়ে,—

হে মানব ! কর বৃথা তুমি
নরহের উচ্চ অভিমান,
বল কেবা মৃত তাঁর চেয়ে
জ্ঞান পেয়ে যে হয় অজ্ঞান !

ঐতব্যভূতি বিস্তারয় ।

সমস্বর সঙ্গীত ।

কল্যাণ মিশ্র—একতারা ।

বালকগণ ।-- জীবন-প্রভাতে তোমার আলোকে
মেলিছু নয়ন-তারা ;

সমস্বরে ।— ধন্য গো আমি ধন্য !

বালিকাগণ ।— জননীর বুকে পাইছু পলকে
স্বাদু দ্রব স্মীর-দারা ।

সমস্বরে ।— ধন্য গো আমি ধন্য !

বালকগণ — পিতার বিপুল আদর সোচ্চাগ
তোমার দয়ার দান ;

সমস্বরে ।— ধন্য গো আমি ধন্য ।

বালিকাগণ ।— ভ্রাতা-ভগিনীর পৃথ অমুরাগ
প্রাবিছে শুষ্ক পরাগ ।

সমস্বরে ।— ধন্য গো আমি ধন্য ।

বালকগণ ।— বিতর' অন্ন চেরিলে খিন্ন,
ভৃগুভরে দেহ জল ;

সমস্বরে ।— ধন্য গো আমি ধন্য !

বালিকাগণ ।— ধরাময় তব চরণ-চিহ্ন,
সুন্দর স্মৃতিতল ।

সমস্বরে ।— ধন্য গো আমি ধন্য ।

বালকগণ । তোমার আলোক তোমার বাতাস
তোমার বারতা কহে ;

সমস্বরে ।— ধন্য গো আমি ধন্য ।

বালিকাগণ ।-- তোমার ধরণী তোমার আকাশ
ঘরে ঘরে স্তম্ভা বহে !

সমস্বরে ।— ধন্য গো আমি ধন্য !

বালকগণ ।— সম্পদে স্নেহে চরম তৃপ্তি
তব নন্দন-চাঁকা ;

সম্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

বালিকাগণ।— বিপদে দুঃখে তোমার দীপ্তি
সৌখ্য মমতা-মাধা।

সম্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

বালিকগণ — ভোগে রোগে শোকে শিররে সতত
জাগ্রত ঋবতারা;

সম্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

বালিকাগণ।— হৃকূল প্রাবিত সাগরের মত
অসীম করুণা-ধারা।

সম্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

বালিকগণ।— মঙ্গল তুমি, উজ্জল তুমি,
বিমল সত্যময়;

সম্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

বালিকাগণ।— সার্থক প্রাণ তব পক্ষ চুমি,
জয় দয়াময় জয়।

সম্বরে।— ধন্য গো আমি ধন্য।

রচনা—“দরবেশ।”

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতীমোহিনী সেন গুপ্তা

বালিকগণ।

II সী সী সী। সী সী সীরা I না না না। ধা ধা ধা।
জী ব ন প্র ভা তে • তো যা র আ লো কে

I পা পা পা। পা না ধা I পা -। -আ। গা -। -।
মে লি হু ন র ন ভা • • রা • •

বালক-বালিকাগণ ।

গা -রা গা। মা মা -১ I গা -১ -রা। না -সা -১।
 ধ ঞ্জ গো আ মি . ঞ্জ . .

বালিকাগণ

. ১ ২' ৩
 । রা গা রা। গা মা মা I গা রা রা। না রা সা
 জ ন নৌ র বু কে পা ই হু পু ল কে

. ১ ২' ৩
 । সসা রা গা। গা ক্ষা ক্ষা I গা -পা -ধা। পা ।
 স্বা হু জ ব ক্ষা র ধা . . রা .

বালক-বালিকাগণ ।

। সা -ধা সা। সা রা -১ I গা -ক্ষা -পা। পা -১ -১ II
 ধ ঞ্জ গো আ মি . . ধ . . ঞ্জ .

বালকগণ ।

I I গা গা গা। পা পা ধা I সঁ সঁ সঁ। সঁ সঁ -১।
 পি তা র বি পু ল আ দ র মো হা গ

. ১ ২' ৩
 । সঁ রা রা। রা রা রা I সঁ -রা -গঁরা। -গা -১ -১
 তো মা র দ রা র দা ন

বালক-বালিকাগণ ।

. ১ ২' ৩
 । গা -রা গা। মা মা -১ I গা -১ -রা। না -সা -১।
 না গো. আ মি ধ . . ঞ্জ . .

বালিকাগণ।

০ ১ ২' ৩
 । গাঃ গঃ পা। গা রী রা । সী রা সী। না ধা -।
 ভা তা ভ গি নী র পু ত অ হু রা গ
 ০ ১ ২' ৩
 । পাঃ -ধঃ না। না -। না । ধা না -স'রা। -সী -। -।
 মা বি ছে শু ম ক প রা গ

বালক-বালিকাগণ।

৩
 । গা -গা পা। ধা ধা -। I পা -ধা -সী। সী -। -। II
 ধ ঞ্জ গো আ মি ০ ধ ০ ০ ঞ্জ

বালকগণ

২ ৩
 I I সী সী সী। সী -। রা I না না না। ধা -। ধা।
 বি ত র' অ ন্ ন হে রি লে খি ন্ ন
 ০ ১ ২' ৩
 । পা পা পা। পা না ধা I পা -কা -গা। -। -। -।
 তৃ ষা তু রে দে হ জ ০ ০ ০ ০ ল

বালক-বালিকাগণ।

০ ১ ২' ৩
 । গা -রা গা। মা মা -। I গা -রা -। না -সা -।
 ধ ঞ্জ গো আ মি ০ না ০ ০

বালিকাগণ।

১ ২ ৩
 । রা গা রা। গা মা মা I গা রা রা। না -রা সা।
 ধ রা ম র ত ব চ র ণ চি ন্ হ
 ০ ১ ২' ৩
 সা -রা গা। গা কা কা I গা -পা -ধা। -পা -। -।
 অ ন্ দ র অ শী ত ০ ০ ০ ০

বালক-বালিকাগণ।

১	২	২	০
। সা -ধা সা। সা রা -১ I	গা -ধা -পা। পা -১ -১ II		
ধ না গো আ মি .	ধ . . . না . .		

বালকগণ।

১	২	২	৩
I I গা গা গা। পা পা -ধা I	সী সী সী। সী সী -১।		
তো মা র আ গো ক	তো মা র বা তা স		
১	২	৩	
। সী রী রী। রী রী রী I	সী -রী -গী। গা -১ -১।		
তো মা র বা র তা	ক . . . হে . .		

বালক-বালিকাগণ।

১	২	২	৩
। গী -রী গী। মা মা -১ I	গা -১ -রী। না -সী -১।		
ধ . . . গো আ মি .	ধ . . . হে . .		

বালিকাগণ।

১	২	২	৩
। গী গী গী। গী রী রী I	সী রী সী। না ধা -১।		
তো মা র ধ র গী	তো মা র আ কা ল		
১	২	৩	
। পা পা ধা। না না নঃ I	ধা -না -সী। সী -১ -১।		
ধ রে ধ রে হু ধা	ব . . . হে . .		

বালক-বালিকাগণ।

১	২	৩	০
। গা -গা পা। ধা ধা -১ I	পা -ধা -সী। সী -১ -১ II		
ধ . . . গো আ মি .	ধ . . . হে . .		

বালকগণ।

১	২	৩	০
I I সী -সী সী। সী সী -রী I	না না না। ধা -১ ধা		
স . . . দে হু ধে .	চ র ম হু প্ তি		
১	২	৩	
। পা পা -১। পাঃ -নঃ ধা I	পা -১ -ধা। গা -১ -১		
ত ব . . . নন দ ন	হা . . . কা . .		

বালক-বালিকাগণ।

১	২	৩
। গা -রা গা।	মা মা -। I	গা -রা -।। না -সা -।।
ধ হ গো আ মি .	ধ . .	জ . .

বালিকাগণ।

১	২	৩
। রা গা রা।	গা -। মা I	মা গা রা। না -রা সা।
বি প দে হ : খে	তো মা র দী প্ তি	
১	২	৩
। সা -রা গা।	গা আ আ I	গা -পা -ধা। পা -। -।।
স উ খা- ম ম তা	মা . .	খা . .

বালক-বালিকাগণ।

১	২	৩
। সা -ধা সা।	সা রা -। I	গা -আ -পা। পা -। -। II
ধ জ গো আ মি .	ধ . .	জ . .

বালকগণ।

১	২	৩
I I গা গা পা।	পা ধা ধা I	সাঁ সাঁ সাঁ। সাঁ সাঁ সাঁ।
তো গে রো গে শো কে	শি র রে স ত ত	
১	২	৩
। সা -রা রা।	রা -। রা I	সাঁ -রা -গাঁ। গাঁ -। -।।
আ এ ত জ . ব	তা . . .	রা . .

বালক-বালিকাগণ।

১	২	৩
। গাঁ -রা গাঁ।	মাঁ মাঁ -। I	গাঁ -রা -।। না -সাঁ -।।
ধ জ গো আ মি .	ধ . .	জ . .

বালিকাগণ।

১	২	৩
। গাঁ গাঁ পাঁ।	গাঁ: -রা: রা I	সাঁ রাঁ সাঁ। না ধা ধা।
হ ক ল মা বি ত	সা গ রে	র ম ত

। পা ধা না। না না না I ধা -না -স'রা। সা -। -।।
 অ গী ম ক কু গা- ধা . . . রা . . .
 বালক-বালিকাগণ ।

। গা -গা পা। ধা ধা -। I পা -ধা -সা। সা ১ -। II
 ধ ঞ্জ গো আ মি . . . ধ . . . ঞ্জ . . .
 বালকগণ ।

I I সা -সা সা। সা সা -রা I না -না না। ধা ধা -।।
 ম জ ল তু মি . . . উ ঞ্জ ল তু মি . . .
 । পা পা পা। না -। ধা I পা -। ঞ্জ। গা -। -।।
 বি ম ল স . . . ত্য ম . . . য . . .
 বালক-বালিকাগণ ।

। গা -রা গা। মা মা -। I গা -রা -। না -সা -।।
 ধ ঞ্জ গো আ মি . . . ধ . . . ঞ্জ . . .
 বালিকাগণ ।

। রা -গা রা। গা -। মা I মা গা রা। না রা সা।
 সা র্গ ক প্রা . . . ল ত ব প দ চ মি
 । সা রা গা। গা ঞ্জা ঞ্জা I গা -পা -ধা। পা -। -।।
 জ য় দ রা ম র জ . . . য . . .

বালক-বালিকাগণ ।

। সা -ধা সা। সা রা -। I গা -ঞা -পা। পা -। -। II II .
 ধ ঞ্জ গো আ মি . . . ধ . . . ঞ্জ . . .

দ্রষ্টব্য :- এই পর্য্যন্ত গাহিরা, গানটি কিম্ব শেখ করিতে হইবে (প্রথম কণির
 “জীবন প্রভাতে” হইতে ধরিয়া, বালক-বালিকাগণের দ্বারা সমস্তের “ধজ পো আমি ধজ”
 পর্য্যন্ত, পুনরাবৃত্তি করিরা) ।

মস্তব্য :—গানটির পংক্তিগুলি ধরিয়াই সুর দিয়া আমি স্বরলিপি করিয়াছি। রচিত স্বরলিপিটির মত অবিকল গাহিলে যে গান শ্রুতিমধুর হইবে না তাহা নহে; কিন্তু বালকগণের দ্বারা সম্বরে গের পংক্তিটির নীচে “ধন্য গো আমি ধন্য” পংক্তিটি গাওয়া পরিত্যাগপূর্বক, যদি একেবারে বালিকাদের দ্বারা গের পংক্তিটির নীচে “ধন্য গো আমি ধন্য” পংক্তিটি গাওয়া যায়, তাহা হইলে মধুরতর হইবে। এই হিসাবে, যদি ঐ পংক্তিটি, “ধন্য গো. মোরা ধন্য” “বলিয়া রচিত থাকিত, তাহা হইলে সঙ্গীত-কলাবিদ্যার দিক্ দিয়া যেন আরও ভাল হইত।

স্বরলিপি-লেখিকা।

জাহাজ-ডুবি।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(১৮)

ঈশ্বন মাস। নব বসন্তের মলয়-সমীর হইবে না, পাঠ্যপুস্তক-স্পর্শ নিষেধ; আজ বৃহ-মন্দ-গতিতে আপন মনে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে; ধনীর প্রাসাদে, দরিত্রের পর্ণ-কুটারে সমভাবে প্রবেশ করিয়া সমান যত্নে সকলের দেহ শীতল করিয়া দিতেছে। পিককুল তরু-শাখায় বসিয়া পঞ্চমে গান ধরিয়াছে। নব-বসন্ত-সমাগমে শুক বৃক্ষরাজি নবীন পল্লবে সুশোভিত হইয়া মনোহর হইয়াছে। শীতের কুষ্টিকাবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রকৃতিরানী বিশ্ববিমোহন রূপ ধারণ করিয়া নরন-মন পরিতৃপ্ত করিতেছেন।

আজ বসন্তের পঞ্চমী। ছেলেদের দল সারদার পারে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সমস্ত দিন মহানন্দে কাটাইয়া সন্ধ্যার আবার আয়তর আরোহণ করিতেছে। গৃহে গৃহে আজ দেবী-পূজার উৎসব। কি আনন্দ! কি উল্লাস! কি উৎসাহ! নব আত্মহুলের ও যবের শীবে দায়ের পদযুগল আবৃত! ছোট ছোট বালক-দিশের উৎসাহও বড় কম নহে। তাহাদের প্রধান উৎসাহ, আজ বিদ্যালয়র বকে, পড়িতে

হইবে না, পাঠ্যপুস্তক-স্পর্শ নিষেধ; আজ ঈশ্বতী-পূজা!

অমরকুমারের বাসা-বাটীর ক্ষুদ্র উঠান-টিতে কতকগুলি বেগ ও ধুইফুলের গাছ ছিল। শুভ্র সুকোমল পুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিতরণ করিতেছিল। শুক্ল পঞ্চমীর স্রোত চন্দ্রশিখি যথাসাধ্য নির্মল আলোক বিতরণ করিতেছিল। গৃহের দাওয়ার একটা মাছর পাতিয়া একটা ছারি-কেন লষ্ঠনের সম্মুখে বসিয়া অমরকুমা-ত্রক-খানা সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। অদূরে একখানি কুশাসনে বসিয়া আগন্তুক ভদ্র-লাকটি সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেছিলেন। কানাই উঠানের এক পার্শ্বে ইটের উনানে চায়ের জল গরম করিতেছিল। আশালতা রান্নাঘরে রুটি সেকিতেছিল। কমলা আশালতার পুত্রটিকে কোলে করিয়া রান্নাঘরের এক পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। সুকুমার শিশু তাহার বালমূলভ আধ আধ ভাষার কমলার সহিত কতকি কথা কহিতেছিল। এখনও তাহার ভাল করিয়া

কথা ফুটে নাই, এখনও সে সকল কথা শিখে নাই। তাহার সেই কল-হাস্ত, তাহার সেই অর্থহীন ভাষা কমলার কানে যেন সুখ-বর্ষণ করিতেছিল। তিনি মাঝে মাঝে তাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া চুষন করিতেছিলেন। শিশু তাহাতে অধিকতর আনন্দিত হইয়া থিলু থিলু করিয়া হাসিয়া উঠিতেছিল।

আগন্তুক ভ্রমলোকটি সন্ধ্যাবন্দনা-সমাপনান্তে অমরকুমারের নিকটে আসিয়া বসিলেন। কানাই হুই পেয়ালা চা তৈয়ারি করিয়া তাঁহাদের দুইজনকে দিয়া গেল; এবং বাকী সমস্ত চায়ের জলটাতে খানিকটা হুই ও চিনি মিশাইয়া এক নিঃশেষে নিজে পান করিয়া ফেলিল। অমরকুমার চা পান করিতে করিতে কাগজখানি পাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ একটা স্তম্ভে দৃষ্ট পড়াতে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। গভীর মনোনিবেশ-সম্বন্ধে পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল।—

“অদ্ভুত কাণ্ড! আশ্চর্য্য ঘটনা!”

“প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে আত্মমগ্নের জমীদার স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোরবাবু নোয়াখালীতে তাঁহার কোনও বন্ধুর আলয়ে সঙ্গীক বেড়াইতে যান। একজন বিখ্যাত ভ্রাতা উপেন্দ্রবাবুর পুত্রের রক্ষকস্বরূপ নিযুক্ত থাকিত। বাবুকের গলায় এক ছড়া বহুমূল্য হীরক-হার ছিল। একজন দস্যু একদিন ভৃত্যকে হত্যা করিয়া হার-সমেত বাবুকের লইয়া পলায়ন করে। পুলিশকর্মচারীগণ বহুচেষ্টা করিয়াও এতাবৎকাল পর্য্যন্ত দস্যু-দিগের কোনও সন্ধান পান নাই। গোয়েন্দা-পুলিশের স্বেচছা ইনস্পেক্টার বাবু বিজন-

কুমার মিত্র তাঁহার অত্যদ্ভুত ক্ষমতা-বলে আজ পঁচিশ বৎসর পূর্বে উক্ত দস্যুদলকে ধৃত করিয়া জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। বিচারে তাঁহাদের যাবজ্জীবন দাপ্তার-বাসের আদেশ হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত দস্যুগণের মধ্যে একজন উপেন্দ্রকিশোর বাবুর পুত্র বলিয়া আত্ম-পরিচয় দান করিয়া দশ-জনের চক্ষে খুলানোক্ষেপপূর্ব্বক সকলের সম্মুখে প্রকাশ্য ভাবে উপেন্দ্রকিশোরবাবুর বাটতে বাস করিয়া তাঁহার সম্পত্তি দখল করিতেছিল। একরূপ অত্যদ্ভুত কাচিনী আর কখনও আমাদের স্মৃতিগোচর হয় নাহ। যাহা হউক, বিজনকুমারবাবু পাপপট্টদগের সকল চক্রান্ত ভদ্র করিয়া যথোপযুক্ত দণ্ডদানে সমর্থ হইয়াছেন, এতদ্ব্যতীত আমরা তগবানের নিকট তাঁহার কল্যাণ কামনা করি। বিজন-বাবু দাপ্তার-জীবন লাভ করিয়া নিম্নত এইরূপ সংসারের মজল-কাণো রত থাকুন, হুঁহুই আমাদের প্রার্থনা।”

ঘটনানা পাঠ করিয়া অমরকুমারের বিষয়ের সামান্য পরিচয় ন। অমরকুমারের ভাব দেখিয়া ভ্রমলোকটি চিত্তাঙ্গা করিলেন, “আজকের কাগজে কোনও নূতন খবর আছে না কি?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ! আশ্চর্য্য ব্যাপার! এত যে দেখুন না!” বলিয়া অমরকুমার কাগজখানি তাঁহার চোখে দিলেন। তিনি পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “জ্যো! আমি এর বিন্দু-বিসর্গও বুঝি নি!”

সবিস্ময়ে অমরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি তাঁকে চিন্তেন না কি?”

তিনি সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া

সংবাদপত্রখানা পুনরীক্ষার পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় কানাই আসিয়া বলিল, “একজন জ্যোতিষী এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।”

আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া অমরকুমার বলিলেন, “রাত্রিকালে জ্যোতিষী?” কানাই বলিল “আজ্ঞে হ্যাঁ! তিনি বলেন, তিনি এইমাত্র কলিকাতা থেকে এসে পৌঁছছেন। তিনি আরও বলে দিলেন যে, তিনি এমন দৈব কাজ করতে জানেন যে তা’তে মানুষের অদৃষ্ট ফিরে যায়, খুব উন্নতি হয়।”

মৃদু হাসিয়া অমরকুমার বলিলেন, “বটে! কিন্তু এখানে ত তাঁর বিশেষ সুবিধা হবে না তা হ’লে! আমার অদৃষ্ট ফেরাবার কোনও দরকার নেই, বল্গে যা তাঁকে।”

এদিকে জ্যোতিষী-ঠাকুর তাঁহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “ম’শায়ের দরকার না থাকতে পারে, আমার বিশেষ দরকার আছে। এই হলো আমাদের জীবিকা। আপনাদের দুয়ার থেকে যদি ছ’পয়সা না নিয়ে যাব, তবে খাব কি করে?”

সহাস্যে অমরকুমার একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, “সন্তাসী ঠাকুর, এই নিন্; এর বেশী দেবার আর আমার ক্ষমতা নেই। আমি গরিব মানুষ, শাস্তি-স্বস্তান করার আমার অর্থ নেই, আবশ্যকতাও নেই। বড় লোকের বাড়ীতে যান, সেখানে বেশ দশটাকা উপার্জন হবে।”

সন্তাসী ঠাকুর টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া টাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে মুখটা কিছু ভার করিয়া বলিলেন, “মোটে একটা টাকা! এতো

আমার গাঁজা আফিম কিনতেই কুলুবে না, পেটে খাব কি?”

অমরকুমার আরও আট আনা পয়সা দিলেন। সন্তাসী ঠাকুর হটিবার পাত্র নহেন; তিনি সে পয়সা গুলিও কুড়াইয়া লইয়া রকের উপরে উঠিয়া মানুষের এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। অমরকুমার মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সন্তাসী-ঠাকুর ভদ্র লোকটির কাছে বসিয়া তাঁহার পাজি পুথি সেইখানে রাখিয়া হাঁকিলেন,—“মহারাজের জয় হোক!”

ভদ্রলোকটি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “এর ভেতর আবার মহারাজ পেলেন কোথায় ঠাকুর?”

ঠাকুর বলিলেন, “আমার গণনা অশ্রান্ত! আপনি ধাম্বিকব্যক্তি, আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করবেন না। আপনি নিশাদলের রাজা স্বর্ধাকুমার নন্?”

ভদ্রলোকটি আর কোনও কথা না বলিয়া নতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। অমরকুমার সবিস্ময়ে চাছিল দেখিলেন, বুঝিলেন, তাঁহার অতিথি ভদ্রলোকটি ছয়বেলী নিশাদলের রাজা স্বর্ধাকুমার বন্হ। রাজার কথা পূর্বে তাঁহার কিছু কিছু শোনা ছিল। আজ নিজের চক্ষের সমুখে রাজার প্রকৃতি ও প্রতিমুষ্টি দেখিয়া তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার মস্তক খেন নিজ হইতে সেই পবিত্র-চরণে লুটাইয়া পড়িতে চাছিল।

কি নন্! কি মহান্ উদার প্রকৃতি! হৃদয়ে আত্মস্মৃতির লেশমাত্র নাই।

সন্তাসী-ঠাকুর বলিতে গেলিলেন, “মহা-

রাজের দর্শন-লালসায় মহারাজের বাটী পর্য্যন্ত গিয়েছিলুম, কিন্তু আমার হ্রদৃষ্টবশতঃ সেখানে মহারাজের সাক্ষাৎকার পাইনি। তারপরে কত ক'রে কত দেশ ঘুরে ঘুরে তবে আজ মহারাজের সাক্ষাৎলাভ করতে সক্ষম হয়েছি। মহারাজের কাছে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি নিতান্ত দরিদ্র, কৃপা করতে হবে।”

মাথা তুলিয়া জ্যোতিষী ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রাজা সূর্য্যকুমার বলিলেন, “দেওয়ানকে জানাইলে আপনার আবশ্যক মত সব পেতেন।”

হাসিয়া জ্যোতিষী ঠাকুর বলিলেন “মহারাজের দেওয়ানের কাছে যা পেয়েছি, তা যথেষ্ট; শেষে গরিবের এই মানব-জীবনটুকুতে পর্য্যন্ত তাঁর লোভ পড়েছিল। রাতা রাত প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম, তাই রক্ষা!”

কুরুভাবে রাজা সূর্য্যকুমার বলিলেন “আমার অসাক্ষাতে আমার কন্সচারারী কি এই রকম করে আমার আদেশ পালন করে থাকে?”

জ্যোতিষী বলিলেন, “না, মহারাজ! ঠিক তা নয়, আমার একটু অপরাধ ছিল।”

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি অপরাধ আপনার।”

জ্যোতিষী বলিলেন, “আমি গণনা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলাম, মহারাজ পুত্রহীন নহেন, মহারাজের পুত্র জীবিত।”

চমকিয়া উঠিয়া রাজা সূর্য্যকুমার বলিলেন, “আপনি কার সন্ধে একথা বলছেন? আমার পুত্র কোথায়?”

ধীর প্রশান্ত ভাবে জ্যোতিষী উত্তর

করিলেন, “আমি মহারাজের সন্ধেই বলছি। মহারাজ যে পুত্রকে মৃত বলে অসুমান করেছেন, সে পুত্র মৃত নহেন, জীবিত।”

হতাশ-ভাবে রাজা সূর্য্যকুমার একটা মর্দ-ভেদী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “হা উন্মাদ! এতদিন পরে তুমি আবার সে নিবোনো আগুন কেন জ্বালাতে এসেছ?”

জ্যোতিষী বলিলেন, “আমি উন্মত্ত নই, মহারাজ! আমি যা বলছি তা বর্ণে বর্ণে সত্য। আপনারা যেমন দৈবক্রমে জাহাজ ডুবি হইতে রক্ষা পেয়েছিলেন, আপনার পুত্রও তেমনি দৈবানুগ্রহে রক্ষা পেয়েছিলেন; তবে নির্যাত-চক্রে পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদ ঘটেছে।”

অধীরভাবে রাজা সূর্য্যকুমার দুই হাতে নিজের বুকটা চাপিয়া ধরিয়া কাতরভাবে বলিলেন, “চলে যাও ঠাকুর! চলে যাও! অনেক কষ্টে তা'র মুখ ভুলেছিলাম, আবার আজ কেন সে-কথা তুলে আমাকে কান্নাতে এলে? আমার অভাগিনী স্ত্রী একথা শুনে শোকে অধীর হয়ে পড়বে। যাও, তুমি শীগ্গির চলে যাও। তোমার কত টাকার দরকার বল, আমি দেওয়ানকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, গেলেই পাবে।”

জ্যোতিষী বলিলেন, “ব্যস্ত হবেন না, মহারাজ! দয়া করে আমার কথাটা শুনুন। বলুন দেখি, আপনার সে পুত্রকে এখন দেখলে চিনতে পারবেন?”

পুত্রের সন্ধে আলোচনা শুনিয়া কমলা এতক্ষণ বাহিরে এক পার্শ্বে অর্দ্ধাবগুষ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর তিনি স্থির হইয়া থাকিতে না পারিয়া জ্যোতিষীর নিকটে

আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ঠাকুর, সত্য কি আমার ছেলে বেঁচে আছে?”

জ্যোতিষী বেশ মিষ্টভাবে বলিলেন, “হ্যাঁ মা! আমি মিথ্যে কথা বলি না। কমলা ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, “কোথায় আছে আমার ছেলে, বলে দাও।”

জ্যোতিষী বলিলেন, “আপনার সে ছেলেকে এখন দেখলে কি চিন্তে পারবেন মা! তা যদি না পারেন, তা হলে আপনার শোকানল আরও জ্বলে উঠবে। আর আমিও তা হলে প্রবঞ্চক জুয়াটোর প্রতিপন্ন হব যে!”

কমলা উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, “আমি মা, আমি তাকে চিন্তে পাপ না? তার সঙ্গে যদি আমার একশো বৎসর ছাড়া ছাড়ি হয়, সে যদি হাজার লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তবু আমি তার মুখখানি দেখবামাত্র চিনে ফেলব। তুমি দয়া করে আমার বলে দাও ঠাকুর, সে আমার কোথায় আছে।”

সামান্য দিয়া জ্যোতিষী বলিলেন, ‘বাস্তব হবেন না মা!’ বল্ছি। আগে আপনি বলুন দেখি, তার সঙ্গে এমন কোনও চিহ্ন আছে কি, যা দেখলে তাকে আপনার পুত্র বলে নিঃসন্দেহ হতে পারবেন?”

“চিহ্ন?” চিণ্ডিত হইয়া কমলা দেবী বলিলেন, “চিহ্ন! কই এমন কোন চিহ্ন তার দেহে ছিল না, যা বলবার মত হতে পারে।”

জ্যোতিষী বলিলেন, “ভেবে দেখুন, ছেলে বেঙ্গার ‘তিনি কোথাও পড়ে টেড়ে যান নি

কি? কোথাও কাটা দাগ কি জড়ুল চিহ্ন, কি আর কিছু?—”

হঠাৎ কমলা একটু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে! আমাদের বাড়ীর সকলে এক দিন যে যার হাতে উষ্ণি দিয়ে নাম লিখি ছিল, তাই দেখে, বাছা আমার তা’র নাম লিখে দেবার জন্যে বায়না ধরে। কিছুতেই যখন তাকে ভুলতে পারলুম না, তখন আমি নিজের হাতে তার পিঠে বড় বড় অক্ষরে তার নামটি লিখে দিলুম; আর ছ’ধারে চৌটো ছোট ফুল এঁকে দিয়ে-ছিলাম।’

জ্যোতিষী ঠাকুর হারিকেনটা হাতে করিয়া তুলিয়া ধরিয়া টপ করিয়া অমর-কুমারের পিঠের জামাটা উঠাইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, “এই দেখুন দেখি মা, আপনার হাতের সেই লেখা কি না?”

কমলা ছুটিয়া আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ—হ্যাঁ, এই সেই লেখা! এই সেই লেখা।” তাহার পর তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অমরের মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ উন্মাদিনীর মত অমর-কুমারকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘অমর! অমর! বাপ আমার!’ আর মুখে কথা সিরল না। রাজা সূর্য্যকুমার বিস্ময়াভিভূত! আশা, তা ও অমরকুমার স্তম্ভিত!

বলা বাহুল্য জ্যোতিষীটি আমাদের বিজন-কুমার বাবু।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচাকরীলা মিত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No 691.

March, 1921

“কন্যাপোষং পালনীয়া শিক্ষণীয়াত্তিষত্তঃ ।”

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত ।

৫৮ বর্ষ ।

৬৯১ সংখ্যা ।

ফাল্গুন, ১৩২৭ । মার্চ, ১৯২১ ।

১২শ কল্প ।

১ম ভাগ ।

দুঃখ-কমল ।

দুঃখ মোরে দিয়েছিলে ?

—সে আজ শতদল !

অশ্রুজলে ধুয়েছিলে ?

—সে আজ মুক্তাকল !

বৈধেছিলে জীবনখানি

বহু যত্ন আরাধা মানি ?—

আজ স্তরে স্তরে ভরিয়ে দিল

হৃদয়-তল !

তোমারি জয় —তোমারি জয়,

হে মহারাজ, তোমারি জয় !

ফুটলো প্রাণে কুস্তমচয়

সুনির্ম্মল !

দুঃখ আজি দণ্ড মানি

পরম স্তবের অর্গ জানি,

সে শতদল বন্ধে টানি’

ছুই চরণহল ॥

ঐনির্ম্মলচন্দ্র বড়াণ ।

লীনার শিক্ষা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

(১৩)

দিন কাহারও সুখ-দুঃখের হাসি-কান্না শুনিবার জন্য পাড়াইয়া থাকে না, লীনার দিনও পাড়াইল না। তবে সে 'সব মাটা মাড়াইয়া' চলিয়া গেল, কি উড়ন্ত পাখীর মত হাওয়ার উপর ভর দিয়া উড়িয়া গেল, সে খবরের বিন্দু বিসর্গও লীনা টের পাইল না। নিজেকে লইয়া সে বড়ই যন্ত্রণাভিভূত হইয়া রহিল।

পিকক লীনার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া, সটান কুঠি ছাড়িয়া চলিয়া যান। তখন তাঁর প্রথম ট্রেনের সময় নিশ্চয়ই বহিয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, পরবর্তী ট্রেন ধরিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন; কারণ তিনি আর কুঠিতে ফিরেন নাই। সমস্ত দিন তাঁর কোন খবরও পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যার পর যখন তেজস্কর ঔষধ ও বল-কারক পথোর সাহায্যে লীনার অবসর-নিষেজ দেহটা একটু চাঙ্গা হইল, এবং মানি-বিবাদ-জর্জর মনটাও একটু সচেতন হইল, তখন পার্সন মিসেস ক্লাউডেন ও বৃদ্ধা মিশনরী যেম মিস নীলকে সঙ্গে করিয়া লীনার সহিত দেখা করিতে কুঠিতে আসিলেন।

নিজের অপরিমিত দুঃখের সঙ্গে একান্ত অসহায়-ভাবে ক্ষুভা-ক্লান্তি করিয়া, ক্লান্তি-বিকল মনটা তখন একটু মাহুয়ের সন্ধ্যা পাইবার জন্যই ছটকট করিতেছিল। বহু-ভিন্নটিকে দেখিয়া লীনা ব্যতি পাইয়া বাটিল। ঘরের

ভিতর বড়ই গরম বোধ হইতেছিল; বাহিরের জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া, একটু খোলা হওয়া পাইবার অভিপ্রায়ে লীনা বলিল, "চলুন, বাইরে গিয়ে বস। যাক। আপনাদের আপত্তি হবে কি?"

সকলে সম্মত হইলেন। চাকরেরা আসিয়া চেয়ার ও আর্ম কেদারা বহিয়া বাহিরে গার সামনে খোলা জায়গায় ঘাসের উপর পাতিয়া দিল। সকলে সেইখানে আসিয়া বসিলেন।

মিস নীলের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। মাথার চুলগুলি সব পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে, দাঁতগুলি সমস্ত পাথর-বাধানো, কিন্তু তাঁর সমুদ্রত স্নানর দেহের পা হইতে মাথা পর্যন্ত সমস্তটুকুতে সজীব-স্বাস্থ্য-লাবণ্য যেন খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। মুখখানি প্রশান্ত হান্তময়, দৃষ্টি এবং কণ্ঠস্বরে করুণা ও কোমলতা যেন করিয়া পড়িতেছে। মিশনের সকলেই তাঁকে বড় ভাল বাসিত; পার্সন ছিলেন তাঁর প্রাণের স্নেহে গঠিতা, অমুগতা ছাত্রী ও আদরের বন্ধু। লোকহিত-ব্রতে জীবনের সমস্ত সময় উৎসর্গ করিয়া, মিশনের কাজেই তিনি আবেশনকাল খাটিতেছেন।

মিসেস ক্লাউডেন একটু 'বেটে-খাট' ধরণের কষ্টপূর্ণা স্নানরী; বয়স সাঁইত্রিশের কাছে পৌছিয়াছে। তিনি সাধারণতঃ বেশ গম্ভীর, তর্ক-হলে কিন্তু রীতিমত অসহিষ্ণু-অধীরপ্রকৃতির মাহুয; কথাবার্তা প্রায় অল্পই বলেন। সুখে

সরুদাই একটা বিবর ওঁধাত্তের ডাব।
ডব্‌স্‌ উ ক্লাউডেনের হাসি-খুসি ও আমোদ-
প্রিয়তার কচিটা ঠিক পরম্পর বিপরীত ছিল।
সময় সময় ছোট ভাইয়ের ছিব্বলামির উপর
তিনি বিলক্ষণ চট্টয়া উঠিতেন, অসকোচে
শাসন-বকুনী যথেষ্টভাবে দিতেন, কিন্তু ভাইয়ের
প্রতি তাঁর মেহের ও অন্ত ছিল না। ভাইটির ও
সংসারে ঐ ভগিনী ছাড়া আর কেহ সখল
ছিল না।

সকলে মিলিয়া আশ-পাশের নানা কথা
লইয়া কিছুক্ষণ জটলা করিলেন। পার্সনের
স্বাভাবিক কৌতুক-প্রিয়তা, মিস নীলের সুমিষ্ট
সদালাপ, এবং মিসেস্‌ ক্লাউডেন্‌ ও লীনার
হাসি-খুসির ভিতর দিয়া বিশ্রামের অবকাশ-
টুকু বেশ মনোরমভাবেই কাটিয়া চলিল।
লীনা সমস্ত দিনের পর, একটু হাসির উপলক্ষ্য
পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া, হাড়া হইয়া আরাম
পাইল।

... কথার কথার পার্সন, লীনার স্বাহ্যের
কথা ভুলিয়া বলিলেন, “আপনার স্বাহ্যাটা কই
এখানকার জল-হাওয়ার সঙ্গে ভাল খাপ
পাচ্ছে না তো! আচ্ছা, দিন-কতকের জন্ত
কোন শীতপ্রধান দেশ দিবে ঘুরে এলে
কেমন হোত?”

পাচটা অজ্ঞ কথার মিশিয়া লীনা নিজের
কথটা কিছুক্ষণের জন্ত ভুলিয়া বেশ একটু
স্বস্তি-বোধ করিতেছিল, পার্সনের কথার
আবার সব মনে পড়িল। একটু ইতস্ততঃ
করিয়া সে কানিয়া বলিল, “যেমনই হোক, আমি
কিন্তু সেই সমস্তই ঠিক করেছি। জরটা হয়ে
যদি আমার এতটা কাবু করে না দিত,
তা হলে আমি এই হপ্তার মেলেই বিলাতে

রওনা হতুম। দেখি, পারি তো আসছে
হপ্তায় রওনা হব।”

মিসেস্‌ ক্লাউডেন লীনার মুখের দিকে
চাহিয়া বলিলেন, “মি: পিকক্‌ কি আপনার
সঙ্গে যাবেন?”

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া, লীনা কীণ-
কণ্ঠে বলিল, “তাঁর সরকারী চাকরী.....।”
ক্লা। আপনার ছেলে?

অজ্ঞ দিকে চোখ ফিরাইয়া লীনা খুব
উদাসভাবে উত্তর দিল, “এইখানেই থাক্বে।”

পার্সন এতক্ষণ চুপ করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে
লীনার মুখভাব-পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন;
এই সময়ে হঠাৎ একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া
বিচলিত ভাবে সরিয়া বসিয়া বলিলেন—“নীল,
ভগবদ-বিষয়ক কিছু গান ককুন না, বেশ
সুন্দর জোৎস্না উঠেছে।”

মিসেস্‌ ক্লাউডেন কিরিয়া পার্সনের দিকে
চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন, “জোৎস্নার আলোয়
গান গাইবার ভারটা বৃদ্ধা নীলের ওপর পড়া
উচিত নয়।” অনবরত্বাদের ওপরই পড়া
উচিত।

লীনা হাসিমুখে বলিল, “আমার দুর্বল
হৃদয় গানের সুরের চাড় মোটেই সহ
করতে পারবে না, মিসেস্‌ ক্লাউডেন,—সেটা
আপনি অবশ্যই জানেন।”

পার্সন হাই ভুলিয়া আনন্দ ভাঙ্গিয়া
সবিনয় হাতে বলিলেন, “অতএব পার্সনের
ওপরই পড়া উচিত! কেমন? কিন্তু কাল
সারা-রাতিটা আমার হাঁসপাতালে কাগজে
হয়েছে, ঘুমে আমার চোখ-আলা করছে,
গলাটাও খর রয়েছে। সুতরাং আপনিও
যে ক্ষমার পাত্রী, সেটা নিশ্চয়ই আপনি

ভুলে যান নি, মিসেস ক্লাউডেন !”

নীল সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাস'নের পিঠ চাপড়াইয়া সহাস্তে বলিলেন, “ধন্তবাদ, কথাটা আমি কিছু নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছিলুম, পাস'ন ! চল, আজ তোমার শীত ঘুমাতে দিই গে। লীনা ! আজকের মত বিদায় ! গাল-গল্পের কোটা-বাড়ীটা আজ এই পর্যন্তই থাক্, আপনি এখন ছ'-এক হপ্তা এখানে আছেন, আশা করি ?”

“সম্ভব।”—বলিয়া লীনা উঠিয়া সকলের সহিত করমর্দন করিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, “আপনাদের মত মেহশীল বন্ধুদের ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে বড়ই হৃদ্যাগোর বিষয়।”

মিস্ নীল ও মিসেস্ ক্লাউডেন স্ব সৌজন্যে হৃৎস্পর্শক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া লীনার স্বাস্থ্যের মঙ্গল কামনা করিলেন এবং এই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র পৃথিবীর মধ্যে আবার তাঁহাদের পুনর্নির্দনের আশা যে খুবই সম্ভব, সেটুকু উৎসাহের সহিত জানাইলেন। পাস'ন কিছু বলিলেন না, শুধু বিমর্ষ-গভীর দৃষ্টিতে লীনার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন

মিস্ নীল ও মিসেস্ ক্লাউডেন বিদায় লইয়া পথে নামিলেন। পাস'ন সরসেহে লীনার হাত ধরিয়া করুণা-শীতলকণ্ঠে বলিলেন, “বিদায় বন্ধু, এ-জগতে সকলের ওপর সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর বলে যিনি একজন আছেন, তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা অহরহঃ নানা আকারে আমাদের ওপর কাব করছে, তাঁর করুণার ওপর বিশ্বাস রাখুন, জীবনে সুখী হবেন।”

লীনা চমকিয়া উঠিল; হঠাৎ মনে হইল পাস'ন এই কথাটাই তাহাকে তিনাইবার জন্তই বোধ হয় বৃদ্ধা নীলকে তখন ভগবৎ-

সম্বন্ধীয় গান গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। লীনার আর্ন্ত বেদনাতুর মনকে একটু সাধনা দিবার জন্তই শুধু পাস'নের একান্ত আগ্রহ!—ক্ষুদ্র বিবাদের হাসি হাসিয়া লীনা বলিল “সুখ ! পাস'ন, পৃথিবীতে কোনও মানুষ কি কখনও প্রকৃত সুখলাভ কর্তে পেরেছে ? এ পৃথিবী অনন্তদুঃখময়,—এখানে সুখ বলে কিছু নাই। আছে একটা প্রকাণ্ড জুরাচুরি-ভরা মিথ্যার,—যেটাকে সুখ বলা হয়, সেই সুখের—কণিক ছলনামাত্র।”

লীনার হাত চাপিয়া ধরিয়া পাস'ন সজোরে বলিলেন, “ভুল বন্ধু, ভুল ! আমার optimist বলতে চান, বসুন,—কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার, আমি নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অভিজ্ঞ থেকে বলছি, ভাগ্য-বলে একটা জিনিস আছে সত্য, এবং সে আমাদের অজ্ঞাতসারেই, আমাদের জন্ত কতকটা সুখ-দুঃখ গড়ে দিবে থাকে, তাও খুব সত্য,—কিন্তু এটা ঠিক জানবেন এ সীমিত জগতে সকলের যেমন সীমা আছে, ভাগ্যশক্তির ও তেমনি একটা সীমা আছে। আমরা আমাদের নিজস্ব সুখদুঃখ-গুলি সমুদয় যদি নিশ্চেষ্টে ভগবানের পায়ে উৎসর্গ করে, অবহেলা-ভরে ভাগ্যটাকে কর্তৃত্বের আসন থেকে টেনে নামাই, তা হলে ভাগ্যের প্রপিতামহেরও সাধ্য নাই, আমাদের মাথার ওপর বসে প্রভুত্বের দাপটে অত্যাচার করে কষ্ট দেয় ! লীনা, মেহের বন্ধু আমার, সাময়িক দুঃখের চোখরাঙ্গানি দেখে অবসন্ন হয়ে পড়বেন না, ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর স্থাপন করুন ! ভয় কি ? এ-জগতে চরিত্রের বাড়ি শুভ বল নাই, সত্যজ্ঞানের বাড়ি শুভ বৃদ্ধি নাই, আত্মচেষ্টার বাড়ি বখা

হিতকারী বন্ধু নাই,—আর আশ্বজয়ের বাড়ী
মহৎ শান্তি নাই, এটা ঠিক মনে রাখবেন।
আর মনে রাখবেন, ভগবান্ বলে একজন
আছেনই।”

পার্সনের কণ্ঠে যে গভীর সহঃস্বত্বপূর্ণ
স্বদৃঢ় আশ্বাসের বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিল,
সে বাণী লীনার হৃদয়কে বড় গভীরভাবেই
স্পর্শ করিল। সবলে পার্সনের হইহাত
মুঠাইয়া ধরিয়া লীনা কম্পিতকণ্ঠে বলিল,
“ধন্যবাদ! নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা নিয়ে
বন্ধুদের বেদনা দিতে বড় ভয় পাই, বড় বেশী
দুঃখ বোধ হয়। কিন্তু আর পারছি নে, মন
বড় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। আপনি দয়া
করে মাঝে মাঝে এসে আমার এম্মিভাবে
সংপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন। কাল
সন্ধ্যার অবকাশে আপনার দেখা পাব আশা
করি?”

পার্সন একটু ভাবিয়া বলিলেন, “হী,
সমস্তদিনে একটুও কাল সময় পাব না,
অনেক কাৰ আছে। বিদায়!”

পার্সন চলেয়া গেলেন। অরার সাহায্যে
লীনা শয়নকক্ষে গেল। লীনার কাণের
ভিতর পার্সনের সেই শেষ কথা-কয়টা
ক্রমাগতই দৃঢ় আশ্বাসের সুরে ধ্বনিত হইতে
লাগিল,—“এজন্যে চরিত্রের বাড়ী শুভ বল
নাই, সত্যজ্ঞানের বাড়ী শুভ বুদ্ধি নাই, আশ্ব-
চেষ্টার বাড়ী বথার্থ হিতকারী বন্ধু নাই, আর
আশ্বজয়ের বাড়ী মহৎ শান্তি নাই।”

সত্যই কি তাই?..... হে পরবেশ্বর,
শক্তি দাও, শক্তি দাও! যে শক্তিবলে পার্সন
ইহাকে ক্রমসত্য বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে,
সেই শক্তিটুকু লীনার হৃদয় প্রাণের ভিতর

সঞ্চারিত করিয়া দাও! লীনাকে শিখাও,
শিখাও ভগবান্,—এই হৃদয়-বরণাময় হৃৎকের
আগুনে দহন করিয়াই শিখাইয়া দাও,—
তোমার কোন্ শুভ উদ্দেশ্য এত অশান্তি-
হৃৎকের মাঝে লীনার হৃদয় প্রজ্জ্বল রাখিয়াছে!
তোমার সে শুভ উদ্দেশ্য সত্যই কি কোন দিন
লীনার জীবনের মাঝে সিদ্ধ ও সফল হইবে?—
সে শুভ দিন কতদূরে, ভগবান্, কত দূরে?

(১৪)

পরদিন সন্ধ্যার সময় পার্সন একলাই
লীনার কুঠীতে আসিলেন। ছায়াবের কাছে
অগ্রসর হইয়া লীনা অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।
পার্সন সম্বোধিত কথা-বাণী কহিতে কহিতে
চাহিয়া দেখিলেন, লীনার মুখ আজ বেশ শ্রুতি-
প্রসূর।—মনে মনে অত্যন্ত খুসি হইয়া পার্সন
গান-বাজনার প্রস্তাব করিলেন। লীন
উৎসাহের সহিত সম্মতি দিল। পার্সন পিয়ো-
নোর কাছে বসিয়া গান গাহিতে লাগিলেন।
পার্সনের প্রশিক্ষিত কণ্ঠের সুমিষ্ট সতেজ
সঙ্গীতস্বর লীনার কাণে বড় মধুর লাগিল; মৃদু
চিত্তে সে গান শুনিতে লাগিল।

গান-বাজনা চলিতেছে, এমন সময় বালক-
ভৃত্য আসিয়া ছায়াবের নিকট চাইতে প্রবেশের
অনুমতি চাহিয়া জানাইল, “একটা তায়
আসিয়াছে।”

লীনা বিস্মিত-দৃষ্টিতে বালকের দিকে
চাহিল। কাল সকালবেলা সেই যে লীনার
হৃদয়ে জানালা টপ্কাইয়া সে অনুদান করিয়া-
ছিল, তারপর আর চাকরটার দর্শন পাওয়া
যায় নাই। আজ এতক্ষণে সশরীরে আবির্ভূত
হইল। লীনা মনে মনে পূর্বেই ঠিক করিয়া
রাখিয়াছিল, চাকরটির দেখা পাইলে, তায়

স্পর্ধা-ধৃষ্টতা-সংশোধনের একটু ব্যবস্থা করিয়া দিবে। কিন্তু পার্সনের সামনেই প্রথম সাক্ষাৎ ৩৭য়ার কামেই মনের ভাবটা মনেই চাপিয়া রাখিয়া, ধীরে ধীরে সে বলিল “আবার তার ? নিরে এল, ঠিকানা বদলে দিই।”

রসিদ ও খাম আনিয়া ভূতা লীনার হাতে দিল। পার্সন বাচনা বন্ধ করিয়া লীনার মুখ-পানে চাহিয়া বলিলেন, “মি: পিককের বৃক্ষ ? আকিস সম্বন্ধীয় ?”

খামের ঠিকানার দিকে না চাহিয়াই, লীনা দোয়াতে কলম ডুবাইতে ডুবাইতে বলিল, “সে আর বলতে ? সকালে ছুঁখানা এসেছিল, redirect করে দিয়েছি, আবার এই !—”

কথাটা বলিতে বলিতেই লীনা খামের ঠিকানা ও নম্বরের দিকে চাহিতে গিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া গেল ! না—না, এষে লীনারই নাম !.....কে ‘তার’ করিলেন তবে ? মি: মরিস ? না হইলে আর কে ?

চট্ করিয়া রসিদে সহি দিয়া লীনা খাম ছিড়িয়া কাগজ বাহির করিল। আলোয় কুঁকিয়া এক নিঃশ্বাসে টেলিগ্রাম পাঠ করিল,— “শীঘ্র আপনি আসুন, মি: পিকক্ এখানে নাই। শিশু মার্সি ডিপথিরিয়া-রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, অবস্থা বিপজ্জনক।

শেফার্ড। (ডাক্তার)”

অকস্মাৎ ভীষণ-শব্দে সমস্ত আকাশটা যেন ভাঙিয়া লীনার মাথায় পড়িল ! ঘণিত দেহে পাশের চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িয়া গুচ্ছ-বিকৃত কণ্ঠে সে বলিল “পার্সন ওটা পড়ে দেখুন, ওর মানেটা কি ? বলুন, আমায়।”

পার্সন ত্রস্তে উঠিয়া কাগজখানার উপর কুঁকিয়া পড়িলেন। দশ সেকেন্ডের

মধ্যে উপর্যুপরি পাঁচবার অক্ষর-করটার উপর চোখ বুলাইয়া, ত্র কুঞ্চিত করিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, “ডাক্তার শেফার্ড লোকটি কেমন ? মি: ক্লাউডেনের ইয়াকিবাজ বন্ধুর মত নয় ত ?”

অগাধ জলে পড়িয়া ভুবিলার মুখে মাধ্ব ব্যাকুলতার আবেগে তৃণ ধরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চায়। লীনা আকুল উৎকর্ষার স্বরে বলিয়া উঠিল, “তাই কি ! তা হবে, পার্সন ! কিন্তু শেফার্ড কি.....?” লীনা হতাশ ভাবে খামিগ।

সন্ধিগত্বরে পার্সন বলিলেন, “মি: পিকক্ সেখানে নাই, এইটুকুতেই অবিশ্বাস ঠেকছে যে ! তিনি তো কালই এখান থেকে চলে গেছেন ! তা হলে তিনি গেলেন কোথা ?”

বালক ভূতাটি টেলিগ্রাফ-পিওনকে রসিদ দিয়া আসিয়া, চুপ করিয়া এতক্ষণ টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়াছিল ; একটা সাংঘাতিক সংবাদ লইয়া যে সতয়ে আলোচনা চলিতেছে, সেটা সে বৃষ্টিতে পারিতেছিল। পিককের নাম শুনিয়া হঠাৎ সে চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, “সাহেব তো এখানেই আছেন, সেই ফিরিজি-যেমের কুঠিতে !”

মানস-পথেই পার্সন গজিয়া উঠিলেন “চুপ্-পাজি,—বেরিয়ে বা এখান থেকে।”

বালক সতয়ে চলিয়া গেল। লীনা ভূতোর কথাটার কাণ দেয় নাই ; সে চলিয়া যাইবার পর পার্সনের মুখ-পানে চাহিয়া গুচ্ছকণ্ঠে বলিল “কি বলো, ও ?”

পার্সন টেলিগ্রামটার দিকে পুনশ্চ কুঁকিয়া পড়িয়া পরম ভাজীল্যের সহিত উত্তর দিলেন, “কে জানে, কি ওর মাথামুণ্ড খবর !—”

ভারপর টেলিগ্রামটার দিকে চোখ রাখিয়া
কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, “শেফার্ড কি
আপনাদের পারিবারিক চিকিৎসক?”

লী। “হাঁ। খুব বিখ্যাত বন্ধু আমাদের, তিনি।”

পার্সন চেয়ারে বসিয়া, পায়ের উপর পা
তুলিয়া ক্র-কৃষ্ণিত করিয়া গম্ভীরমুখে ভাবিতে
লাগিলেন। লীনা হই হাতে মুখ ঢাকিয়া
নীরবে বসিয়া রহিল। গৃহ নিস্তব্ধ।

খানিকটা পরে পার্সন সজোরে নিঃশ্বাস
ফেলিয়া ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙাইয়া ধীর
কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন—“লীনা!”

লীনা চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।
পার্সন স্নেহময় স্বরে বলিলেন, “ভগবান করুন
মার্সি ভালই থাক। কিন্তু দেখুন, আপনি
যদি নিজেকে গিয়ে তাকে একবার দেখে
আসতে চান, তা হলে বলুন; আমি আপনাকে
সঙ্গে করে নিয়ে সেখানে যেতে রাজী আছি।
যাবেন?”

হুর্কহ জড়দেহটার বাগন-ভার ছিড়িয়া
সেখানে এই মুহূর্তে ছুটিয়া বাইবার জন্তই যে
প্রাণটা খড়্ খড়্ করিতেছে!

হার পার্সন, তুমি আবার লীনার কোন
মতামতের অপেক্ষা কর?—বেদনা-ক্রান্ত দৃষ্টি
তুলিয়া কাতরকণ্ঠে লীনা বলিল, “আপনি
অনুগ্রহ করে একবার যেতে পারবেন কি
পার্সন? আপনার কোন ক্ষতি হবে না
তো?—বিশনের কারণে?” লীনার কণ্ঠস্বর
ব্যাকুল আগ্রহ-বেদনাভারে ক্রান্ত কাপিতে
লাগিল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া পার্সন বলিলেন, “কিছু
না!—মাসুকের কাছে কর্তব্য কর্তব্যের জন্তই!
মাসুকের সাহায্যে লাগতে পাওয়া, আমাদের

পক্ষে ভগবানের আলীকাদ পাওয়ার পূণ্য!
আত্মাভিমানের অন্ধ হয়ে আমরা যখন দৃশ্য
অনুগ্রহ-ভরে অসমর্থকে সাহায্য করতে দাঁড়াই,
তখনই আমরা সব চেয়ে বড় মুখ, সব চেয়ে
বড় আত্ম প্রবঞ্চক! যাক সে কথা। কাল সকাল
সাড়ে-ছটার একটা ট্রেন আছে, সাড়ে সাতটার
একটা আছে, সেই ট্রেনের একটাতেই রওনা
হব। এখন টেনে চলে, শেফার্ডকে একটা
টেলিগ্রাম করে আসি।”

সেই মহামুভবা করুণাময়ী নারীর
মুখ-পানে চাহিয়া লীনার হৃৎ চক্ৰ অপরিমিত
সামান্য-ভরা বেদনার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল।
অসাড় রসনার একটাও শব্দ সরিল না, নীরবে
হাত বাড়াইয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া, ম্লান
ভাবে চেয়ারের পিঠে সে এলাইয়া পড়িল।
লীনার শরীরের সমস্ত শক্তি যেন চুষকাছুষ্ট
হইয়া কোন উন্নীক্ষা শূন্যদেশে লটায় চলিয়া
গিয়াছিল।

পার্সন বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সেই
বালক ভূতটি তয়্যরের পাশে ম্লানমুখে জড়
সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পকেট হটতে
কিছু নগদ-দক্ষিণা বাতির করিয়া ছেলেটির
হাতে দিয়া পার্সন সতাসা-মুখে তার কাঁদ
চাপড়াইয়া বলিলেন, “বড়ো-খোকাটি আমার!
একটা আলো নিয়ে চল তো একবার আমার
সঙ্গে।” “আজ কাল পথে বড় সাপের ভয়
হয়েছে।”

মিষ্ট কথা ও সারবান নগদ বিদ্যায় মহা
পরিতুষ্ট হইয়া বালক পার্সনের মুখ-পানে
চাহিয়া সাগ্রহে বলিল, “সাপ তো? উঃ
ভয়ানক! চাঁদনী রাত হলেও কুঠির রাস্তায়
ঢের সাপ থাকতে পারে! চলুন, আলো নিয়ে

বাচ্চি। আলো থাকলে সাপই হোক, ভূতই হোক, কেউ-কিছু বলবে না।”

বালকের হৃদয় বুদ্ধির দোড় দেখিয়া পার্সন হাসিলেন। অন্ধকার রাত্রে নিৰ্জন প্রান্তরের ভিতর দিয়া একলা হাঁটিতে যে পার্সনের যথেষ্ট সাহস আছে, আজ হঠাৎ সেই পার্সন সাপের ভয়ে কাতর হইয়া পড়িয়াছেনই বটে। মনে মনেই হাসিয়া বলিলেন, “পথের সাপের বিষদন্তকে ভয় করি না বৎস, কিন্তু তোমার রসনার ভিতর যে বিযাক্ত-সত্য লুকায়িত আছে, তাহা আজ মরণাশ্রিতা লীনার প্রাণ-শাস্তী! সেই বিষকে আজ এখন মন্ত্রবলে সংরুদ্ধ করিতে হইবে। চল, আগে তোমার কুঠির বাহিরে লইয়া যাই।—”

বালক আলো আনিল। পথে নামিয়া পার্সন বলিলেন, “ষ্টেশনে চল।”

বালক সভয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “ষ্টেশনে? আপনার কুঠিতে নয়? মাপ করুন মেমসাহেব, তাহলে আমি যেতে পারব না। আমার ‘জান’ বাবে।”

পার্সন নিকটে আসিয়া নিরন্তরে বলিলেন, “কেন?”

বালক অধিকতর ভীত হইয়া চুপি চুপি বলিল, “পিক্ সাহেব যে এই সহরেই আছেন। সেই ফিরিঙ্গী মেমের কুঠিতে!—সেই ষ্টেশনের ওপারে লাল-বাংলায় যে মেম সাহেব থাকেন, তাঁর কুঠিতে সন্ধ্যা বেলায়ও আমি সাহেবকে দেখেছি। আমার পথে দেখলেই সাহেব খুন কর্ণেন, দোহাই মেম-সাহেব!”

পার্সন বালকের হাতের কজাটা চাপিয়া ধরিয়া গেটের দিকে টানিয়া লইয়া বাইতে

বাইতে বলিলেন, “চুপ করো, এখানে কোন কথা নয়। বাইরে চলো, সব শুদ্ধি। কোন ভয় নাই তোমার। আমি তোমার অন্ত দায়ী রইলুম।”

গেটের আড়ালে আসিয়া পার্সন যখন বালকের হাত ছাড়িয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন প্রথমেই সে হাউ মাউ করিয়া খুব এক চোট কাঁদিয়া লইল। তারপর পার্সনের মিষ্ট ধমকে ঠাণ্ডা হইয়া একে একে কাল হইতে আজ পর্যন্ত তার ভাগ্যে যা যা ঘটিয়াছে, সব বর্ণনা করিয়া ফেলিল। পার্সন শুনিলেন—কাল সকালে লীনার তাড়ার জামালা উপকাইয়া পলাইয়া, বরাবর লাইন পাশ হইয়া সে মাসীর বাড়ী যায়। ঘণ্টা-দুই পরে, সাহেব চলিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া সে আন্তে আন্তে আবার ফিরে। পথে, সেই লাল-বাংলার ফিরিঙ্গি মেমসাহেবের কুঠিতে সে ঢোকে; সেখানে তার মাসভূতো ভাই বাবুজির কায করে। বাবুজি-খানার পাশে দাঁড়াইয়া সে ভাইয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে, এমন সময় দেখে, মিঃ পিক্ হন হন করিয়া আসিয়া কুঠিতে ঢুকিলেন। ভয়ে সে পুনশ্চ মাসীর বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। পিক্ কাল হইতে সেখানে আছেন। ভাইয়ের কাছে সে খবর লইয়া জানিয়াছে, উক্ত মেম-সাহেবটি বিলাতী গণিক। পিক্ প্রায়ই মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া গান-বাজনা আমোদ-প্রমোদ করেন। সন্ধ্যার সময় ভাইয়ের কাছে সে খবর পাইয়াছে যে, পিক্ আজ মদ খাইয়া অত্যন্ত বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছেন। তাই সে সাহসে ভয় করিয়া লীনার কাছে, অজ্ঞপতিতর কৈফিয়ত জানাইতে আজ রাত্রে আসিয়াছিল।

পার্সন হির-দৃষ্টিতে ছেলেরটির মুখ-পানে চাহিয়া সমস্ত কথাগুলি ওনিরা লইয়া,—খুব ঘোরে বলিলেন, “তুমি ঠিক চিনেছ? তিনি যি: পিকক্?”

বালক দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল, “জাপনি চলুন, আমি এখুনি মেম-সাহেবের কুঠিতে তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছি।”

পার্সন চুপ করিয়া রহিলেন।—পিকক্ তো নির্লজ্জ ইতরামির চূড়ান্ত প্রমাণ দেখাইতেছেন, সকল তাতেই! কিন্তু পার্সন তো ইতরের মুখস পরিয়া, তাঁহার সৃণ্য পশ্চদ দেখিবার জন্য ছুটিতে পারেন না। তা যদি সম্ভব হইত, তবে আজ কেন,—গত বায়ে পিকক্ আসিয়া যখন ঐ কিরিকি-মেমের কুঠিতে গোপনে বান, তখন মিস্ নীলের সঙ্গে ঐ পথ দিয়া আসিতে আসিতে দিন-চপুয়ের আলোর পার্সন নিজে স্বচক্ষেই পিকক্কে ঐ কুঠির জানালার দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াও কি, সে কথা নীরব সৃণায় নিজের অন্তরের মধ্যেই নিঃশব্দে পরিপাক করেন? অন্ধ-বিধানী লীনার স্বামী-সোভাগ্য-গর্ভকে পার্সন মেমের চক্ষে দেখেন, সে বেচারার চরুণতা তিনি কমা করিয়া চলেন,—নচেৎ এই পোক-বেয় দস্ত-অভিমানী, স্থলিত কাপুরুষটাকে পার্সন কি উচিত শিক্ষা দিতে পারিতেন না? কিন্তু হুং হর,—লীনা-বেচারার যে আঘাত পাইবে! স্বামীর এ অধঃপতন-সংবাদ লীনা কি সহ্য করিতে পারিবে?

পার্সনের পারের নোথ হইতে বাধার চুল পর্যন্ত দাক্ষণ-সৃণাতরা উত্তেজনার বিছাৎ খেলিয়া গেল! এই জেরীর হৃৎ অপসার্যবের পোক-দর্পই সব চেয়ে ঢকা হুরে পৃথিবীর

বাকারে প্রতিধ্বনিত হয় বটে। তাপো ইহাদের গলার জোরটা আছে, তাই হকারের চোটে—নিজেদের মন ও চরিত্রের সর্বনাশ-কর নীচতা, চরুণতা ইহারা বেবাগুন উড়াইয়া দিয়া পৃথিবীর সমস্ত নারীজাতির দিকে সৃণাতরা অবজার দৃষ্টিতে চাহিয়া, অপূর্ণ পোক-দস্ত-বলে, পরম আত্মপ্রদান অতুভব করিতে পারে! পৃথিবীর সত্যকার-পোক-প্রতিষ্ঠিত পুরুষেরাও ইহাদের মহিমাময় বিচা-দৃষ্টিতে, হের,—অবজের! ঐ যে নির্দোষ হতভাগিনীর দল, এই সব পায়ণ্ডের নিছক পশু-বৃত্তি-গঠিত মোহের খোরাক জুটাইতে মোহিনী সাজিয়া নরকে নাহিল, নিজেদের জল'ভ নারী-সন্মান-রত মাথা হইতে ছিড়িয়া, পাপের আগুনে আহুতি দিল,—উহাদের কৃতির পরিমাণ না থতাইয়া, পৃথিবীর সরল-বুদ্ধি সাধু-সজ্জনেরা তাহাদিগকেই সকল অপরাধের মূল হির করিয়া, যত পারেন অভিশাপ বর্ষণ করুন, কিন্তু পার্সনের প্রাণ সে অভিশাপ-উৎসবে যোগ দিতে পারিবেল না। কারণ, পার্সনের বুদ্ধি অতটা সরল মোটেই নয়, এবং পার্সন যে আদৌ সাধু-সজ্জন নন, সেটা তো অকপট-চিত্তে সকলের সামনেই তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন!..... পার্সনের দেহ-বল, মনোবল ও চরিত্র-বলকে সৃষ্টিকর্তা আর যে উপাদানেই গঠন করিয়া থাকুন,—যে দিয়া যে গড়েন নাই, সেটার অনেক অগ্নি-পরীক্ষার তিতর দিয়া, অকাতরে পারাপার হইয়া পার্সন স্তম্ভিত প্রমাণ পাইয়াছেন! সেইজন্য তপস্বানের উপর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর স্থাপন করিয়া, নিজের প্রাণশক্তির স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট অক্ষত উজ্জল

রাখিয়া পৃথিবীর অনেক-শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে বিধাবীন-চিত্তে অবোধে মিশিয়াছেন, এবং সাধুজন-নিষিতা ঐ গণিকা-শ্রেণীর নারীদের প্রাণের সত্য কাহিনী শুনিবার জন্য, প্রাণভরা কোহুল-আগ্রহে কান পাতিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। পাস'নকে সত্য জানিতে হইয়াছে, বড় ভীষণ ভয়—বড় নিদারুণ বাধা পাইতে হইয়াছে,—সে-সকল হতভাগ্য প্রাণের শোচনীয় করুণ-কাহিনী শুনিয়া!

থাক সে চিন্তা। এখন কর্তব্য সকলের আগে! পাস'ন, মুগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “দেখ, আমার কাছে যা বলে, তা বেশ করেছ। কিন্তু দাবধান, একখার বিদ্যুৎবিদগও যদি মিসেস পিককের কাণে যায়, তা হলে আমার সেই শিকারি-কুকুর সায়েস্তা করবার ‘হাটিং’ চাবুকটা দেখেছ তো?—সেটার ভয় রেখে।”

বালক শিহরিয়া উঠিয়া সভয়ে বলিল, “দোহাই মেম-সাহেব,—আমার মারবেন না। আমি আমার মেম-সাহেবকে বুঝিয়ে দেব, যে ডবলন-সাহেব তাঁর ভগিনীর কুঠিতে আছেন, সেই কথাই আমি বলেছিলুম। সাহেবের কথা বলি নি।”

বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া পাস'ন প্রীত হইলেন। হাসি চাপিয়া গভীর-মুখে বলিলেন, “জংলী, মিথ্যাবাদি! তোমার আমি বিশ্বাস করি না। আজ রাতে তুমি আর মেম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পাবে না, আমার কুঠিতে চাকরদের কাছে থাকবে চল। আপাততঃ টেনশনে একবার এস।”

বালক কাঁপিতে কাঁপিতে চলিল। নিজের জিহ্বা আঁচরণে পাস'ন মনে মনে একটু দুর

হইলেন, কিন্তু এই জড়বুদ্ধি বালককে ভয়ের শাসন ভিন্ন বশীভূত করা যাইবে না, সেই যে মহা মুগ্ধ!

টেনশনে গিয়া টেলিগ্রাম করিয়া পাস'ন শীঘ্রই ফিরিলেন। নিজের তিনি কুঠিতে গিয়া রাজের আহার সারিয়া, বালককে খাওয়াইয়া, গোটাকতক মিষ্ট কথার মন্ত্র পড়িয়া, বুঝাইয়া সুঝাইয়া, সঙ্গে করিয়া লইয়া, আবার লীনার কুঠিতে আসিলেন। চাকরদের জিন্মায় করদ-থাকিবার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, রুওজ-চিত্তে মহা-আড়ম্বরে সে পুনঃ পুনঃ শপথ করিতে লাগিল, লীনা'কে সে কিছু বলিবে না, এক বর্ণও বলিবে না।

পাস'ন, লীনার কুঠিতে আসিয়া দেখিলেন চারিদিক নিস্তক নিস্তক। ছায়ার কাছে আয়া অপেক্ষা করিতেছিল; পাস'নকে দেখিয়া শঙ্কিত মান মুখে অভিবাदन করিয়া সে জানাইল, লীনা শয়নকক্ষে গিয়াছেন। আয়ারা অনেক চেষ্টায় একটু দুধ খাওয়াইয়াছিল, কিন্তু লীনার পাকস্থলীতে সেটুকুও স্থল হয় নাই, উঠিয়া গিয়াছেন। বিছানায় পড়িয়া লীনা বড় ছটফট করিতেছেন।

সংবাদ দিয়া পাস'ন শয়ন-কক্ষে ঢুকিলেন। লীনা স্তম্ভিত-বুগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া, বড় ব্যাকুল কাতর ভাবে পাস'নের দিকে চাহিয়া রহিল! কিছু জিজ্ঞাসা করিতেই বোধ হয় তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না। পাস'ন একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া শয্যা-শিররে বসিয়া, সংবত-বয়ে বলিলেন, “টেলিগ্রাম করে এসেছি, কাল সকাল ছুটির মধ্যেই আমরা সত্য-মিথ্যা যাই হোক, একটা সঠিক খবর পাবে।”

লীনার চোখের পাশ বহিরা হই কোঁটা
জল গড়াইয়া পড়িল। বেদনার্ত্ত দৃষ্টি তুলিয়া
সে রুদ্ধস্বরে বলিল, “বড় কষ্ট, পাস’ন, বড় কষ্ট!
মাতৃ-বাখার মত এমন মহাযন্ত্রণাময় পীড়ন
আর কিছুতে নাই!.....উঃ কি কষ্ট, পাস’ন,
সন্তানের মত মহাশাণ্ডিঘাতা শত্রু পৃথিবীতে
কেউ নাই, কেউ নাই।”

পাস’ন নিঃশ্বাস ফেলিয়া চূপ করিয়া
রহিলেন, কোন সাধনার ভাষা তাঁহার মুখে
যোগাইল না।

লীনা কাতরভাবে এ পাশ ও-পাশ করিতে
করিতে সহসা সবেগে গা ঝাড়া দিয়া শয্যার
উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, “এ কি

অসহ্য পীড়ন! পাস’ন, আমি পাগল হয়ে যাব
না তো? আমার সংজ্ঞাটা শেষ পর্যন্ত ঠিক
থাকবে তো?”

লীনাকে ধরিয়া সহজে শয্যার উপর
শোয়াইয়া দিয়া পাস’ন শান্তস্বরে বলিলেন,
“নিজে, নিজেকে সংযত করে তুলুন, মনকে
অত উতলা বাকুল করলে আপনি মারসিকে
দেখতে যাবেন, কোন্ শক্তিতে? যুগ্মোদ,
যুগ্মবার চেটা করুন, প্রবল শরীরটাকে বিশ্রাম
দেন, শান্ত হোন।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

জিজ্ঞাসা।

ধানেত্রী—কাশ্মিরী-খেমটা।

আজি	গন্ধ কাটার	আনে পবনে!
আমার	হিরার কথা বেরিয়ে পড়ে	ছন্দে বরণে!
	নীড়ের পাখী রাণ্ডতে নারি,	
	নীল গগনে দেয় সে পাড়ি	
	কাটার সন্ধানে!	
আজি	কল্প যে মোর হারিয়ে ফেলি	
	কোন্ সে স্বপনে!	
ওগো	আজি গন্ধ কাটার	
	আনে পবনে!!	

রচনা—অচিন পাখী।

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্ত।

আম্বারী।

II { ক্রা পা -দা। পা -ক্রা গা I আ ক্রা -দা। না -সা সা।
 আ জি . গ ন্ " কা হা . র আ . নে
 .
 গা পা -সী। দক্রা -গক্রা -সা I দা ক্রা -পা। পা দা -দা।
 প ব . নে . . .) আ মা র্ হি রা র্
 .
 না -সী সী। না ক্রা না I দা -ক্রা পা। ক্রা -পা পা I
 ক . থা বে রি য়ে প . ড়ে ছ ন্ দে
 .
 না সী -দা। ক্রদপা -ক্রগা -ক্রসা I I
 ব র . পে . . .

অন্তরা

II { ক্রা দা -দা। পা না -সী I ক্রা -দা সী। না -ক্রা সী I
 নী ড়ে র্ পা থী . . রা থ্ তে না রি
 .
 ক্রা -দা সী। ক্রা গা -দা I ক্রা -দা সী। না -সী সী I
 নী ল গ নে . দে র্ সে পা ড়ি
 .
 I ক্রা দা -পা। না -সী ক্রা I না -সী -দা। সী -না সী I
 কা হা র্ স ন্ থা নে . . আ . জি }
 .
 { না ক্রা -দা। না সনা -সী I না সী না। দা -না দা I
 ক্র দ র্ বে মো . ন হা রি য়ে ফে লি
 .
 পা -দা পা। ক্রা দা -দা I পা -দা -দা। ক্রদা -নদা -পা } I
 কো ন্ সে ব প . নে
 .
 I নসী না ক্রা। সী -না দা I ক্রা পা -দা। গা -দা ক্রা I
 ওপো আ জি গ ন্ থ কা হা র্ আ . নে

I পা দা না। পদা -দগা -দসা II II
প ব . নে. . . .

তান ।

১ম :—

I দপা দদা নদা। পদা গদা নদা ।
আ. আ. আ. জি. ই. ই.

২য় :—

I দনস'খা গদা'সনা খ'স'নদা। পদদপা দগদগা খগদগা ।
আ... আ... আ... জি... ই... ই...

উল্লিখিত দুইটি তান লগায় পর প্রারম্ভের স্বরলিপি অমুযায়ী, পুনরায় “আজি” কথাটি গের।

লেখিকা—

জীবনসঙ্গিনী

(গল্প)

সেদিন বৈকালে বেড়াইতে গিয়া যখন দীঘির ধারে বসিয়াছিলাম, তখন প্রকৃতির নিত্যক সৌন্দর্য দর্শনে মনটা কেমন মুগ্ধ হইয়া গেল। কতকাল সহরে চাকুরি করার পর, পরীক্ষার এই অকৃত্রিম শোভাতে চিত্ত বিতোর হইয়া উঠিল। এমন সাধের জন্ম-ভূমিতে কেমন করিয়া আমার শৈশব কাটিয়াছিল, ক্রমশঃ তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। নিসর্গসুন্দরীর সে নিভৃতনিকুঞ্জে বসিয়া আমার স্বভাবগত হৃৎচিন্তাতে নিজেকে মগ্ন করিয়া দিতে বড় ভাল লাগিল; তাই অল্প কোন দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল আমার সুদূর অতীতের উপরে যে কতশত মলিন চিত্র পড়িয়াছিল বীরে বীরে তাহাকে সরাইয়া দিতে লাগিলাম, আর

প্রাপ্তবয়স্ক সেই পুরান কাচিনী আন্দোলন করিতে লাগিলাম।

এতক্ষণ বেশ সুস্থচিত্তে ভাবিয়া বাইতেছিলাম। বাটের যে দিক্টার আমি বসিয়াছিলাম, তখনও কেহ সে দিকে আসেনাই; তাহাতে আমার সুবিধাই হইয়াছিল। হঠাৎ কতকগুলি মুহূর্ত্তস্বর আসিয়া কানে পৌছিল। ফিরিয়া দেখিলাম, কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে খেলা করিতে করিতে সেইদিকে আসিতেছে। তাহাদের বোঁড়া বোঁড়া খেলা, প্রাণখোলা হাসি,—আগে আখো কথা,—দেখিয়া শুনিয়া আমার এত গভীর চিন্তা নিমেষ মধ্যে কোথায় উড়িয়া গেল।

তাহাদের সেই সরল ক্রীড়াকৌতুক

দেখিতে দেখিতে সহসা একটা নম্রপ্রকৃতি বালিকার উপর দৃষ্টি পড়িয়া গেল। সকলের মধ্যে তাহাকেই যেন বেশী সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। মেয়েটা তত সুখী না হইলেও, আমি যেন চোক ফিরাইতে পারিলাম না,—পারিলেও ইচ্ছা হইল না। তাহার প্রস্তুত-কমল-সদৃশ বিশাল ঝাঁপিডটি,—তাহার সলজ্জ-চকস দৃষ্টি,—তাহার ক্ষীণ-শীর্ণ-দেহ,—আমারই পূর্বজীবনের ছায়া বলিয়া মনে হইল;—মনে হইল এমনই শ্রামবর্ণে এমনই রূপ-লাবণ্য পূর্ণে যেন কোথাও দেখিয়াছি। একবার ভাবিলাম, কাছে বাইরা তাহার আলাপ পরিচয় লই; আবার ভাবিলাম, কেন এ নিরর্থক আকুলতা? ছেলেমানুষেরা আপন মনে খেলা করিতেছে; আমি গেলেই হয়ত তাহারা সঙ্কোচ বোধ করিবে, হয়ত ভয় পাইয়া খেলা থালা বন্ধ করিয়া দিবে। আমি গিয়া তাহাদের অমোদ প্রমোদের মধ্যে কেন বিবাদ আনিব?—ইচ্ছা হইলেও ভরসা হইল না; শিশুর অকপট ঝিলাসকে বিনা প্রয়োজনে, নৃশংসভাবে বাধা দিতে যেন মন উঠিল না।

কিন্তু কি কারণে হৃদয় এমন উদ্বেল হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; মাত্র একটা শিশু-কন্যার স্নিগ্ধ কান্তি দর্শনে হৃদয়ের সমস্ত রক্তি উদ্ভূত হইয়া কেন সেইদিকে ছুটিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। একবার বুঝিবার চেষ্টা করিলাম;—এই অস্পষ্ট বাকুলতাকে

বিশ্লেষণ করিবার জন্য অন্তরাঙ্গার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু সে অতল বারিধিতেলে ক্ষুদ্র জলকণার সন্ধান পাইলাম না। শুধু এইটুকু বুঝিলাম, যেন কোথাও দেখিয়াছি।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বালক বালিকারা যে বাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল; আমিও এটা সেটা ভাবিয়া একটু পরেই উঠিয়া পড়িলাম। বাড়ী আসিবার সময় মনটা যেন কেমন ভারী ভারী ঠেকিল। বোধ হইতেছিল, যেন মনের মধ্যে কিছু একটা অপরিষ্কৃত রহিয়া গেল, যেন একটা প্রশ্ন উঠিয়াছিল, তাহার সমাধান হইল না।

* * * *

মধ্যরাত্রে যখন অর্দ্ধ পৃথিবী নীরবতার সমচ্ছন্ন,—স্থির অন্ধ্রক জীব সুস্থিমগ্ন,—তখন কেথা হইতে একখানি প্রীতিভরা মুখ চক্কর সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল। কোমল-হাস্য-দীপ্ত সে মুখখানি ক্রমে ক্রমে যেন একেবারে আমারই মুখের উপর আসিয়া পড়িল। অকস্মাৎ গুমঘোরে কাহার মুহূর্ত্ত কর-স্পর্শ অনুভব করিলাম; সর্বাঙ্গ দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া গেল। কলকর্থে যেন কে কর্ণকূহরে কহিয়া গেল, “ওগো! বছরকাল পরে তোমার কাছে এসেছিলাম; তুমিত কই ধরা দিলে না।”

শ্রীকমল কুমার সান্যাল

ডাকটিকিটের ভাষা

পশ্চাত্তা-দেশবাসী পত্র-প্রেরক ডাকটিকিটের দ্বারা পত্রাধিকারীকে নিজের গোপনীয় কথাটা জানাইতে পারেন। পত্র-প্রেরক যদি খামের উপর টিকেট বারমদিকের মধ্যভাগে মারেন, তবে “আমার ভালবাসা গ্রহণ কর” বুঝাইবে ; টিকিট যদি বারমদিকে উর্দ্ধভাগের কোণে উল্টা করিয়া লাগান হয়, তবে “আমি তোমাকে ভালবাসি” বুঝাইবে। দক্ষিণ দিকের কোণে কোণাকুলি ভাবে টিকিট বসান “চূষন পাঠা-ইলামের চিহ্ন। খামের মধ্যভাগের বাম-দিকে টিকিট লাগান “তোমার দর্শনাগার

উৎসুক” বুঝায় ; মধ্যভাগের দক্ষিণ দিকে হইলে, “শীঘ্র পত্র দিও” বুঝাইবে। খামের নিম্নে বামদিকের কোণে উল্টা টিকিট লাগাইলে, “তোমার মঙ্গল কামনা করি” বা “তুমি স্নেহে থাক বুঝায়।” নিম্নে মধ্যভাগে হইলে “পিতা মাতা এ-বিবাহে অসম্মত বুঝায়।” নিম্নে বাম-দিকের কোণে সোজা টিকিট হইলে “আমি তোমার পরিচয় চাই” ইহাই প্রকাশ করে। নিম্নে দক্ষিণ দিকে থাকিলে “তুমি বড় নিষ্ঠুর” বুঝাইবে। (Boston Globe.)

ঐশ্বর্যমা সিংহ ।

পারের ডাক

আসিবে রে যে-দিন পারের ডাক,
যেতে হ'বে সব ছাড়ি ;
(৩ই) তাজি সবাকারে সে পারের তরে,
সকল কর কড়ি !
যেতে চ'বে রে কোন্ সুদূর দেশে,
নাহি-ক-আমার জানা !

তবুও তো ওরে যেতে হ'বে তোরে,
ভনিবে না কারো মানা !
(৩ মন) তবে কেন মিছে মারা-মোহ পিচে
রাখিস্ নিজেরে ধরি' ?
চিড়িয়া সকল মোহের শিকল,
চল রে তাঁচারে ধরি ॥

মুক্তি

হৃৎকের লাগি অশ্রু যেমন

বেদনা করে হাস।

পালীকে তেমনি দেয় গো মুক্তি

প্রেমের পরকাশ ॥

শান্তি প্রভা দাস ।

জাহাজ-ডুবি।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(১২)

দৈবযোগে সেই সময় রাধাগোবিন্দবাবুও সীতাকুণ্ডে অমরের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কথার কথার সমস্ত কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। উপেক্ষিকিশোর-বাবুর স্ত্রী নবচর্গা এবং কমলাদেবী দুই বমজ সহোদরা। যে দিন দৈব-দুর্ঘটনা-বশতঃ জাহাজ-ডুবি হয়, সে-দিন দুই ভগ্নীই এক জাহাজে ছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে কেহ কাহারও কথা জ্ঞাত ছিলেন না। আর নব-চর্গার অবস্থা তখন তো একেবারে উন্মাদের! তাহার পর জাহাজ যখন জলমগ্ন হয়, তখন আরোহি-সকলেও জল মগ্ন হইল। কিন্তু সুযোগ্য কাপ্তেন সাহেবের ঐকান্তির চেষ্টায় এবং লাম্পেন-ওয়ার্লানের যত্নে কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই, সকলেরই জীবনরক্ষা হইয়াছিল। সেই সময়ে নিয়তি-চক্রে আবর্তনে কমলাদেবীর পুত্র নবচর্গার সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে সকল কথা আর এখানে উল্লেখ করা নিম্নয়োজন।—অমর কুমার এতদিনে জানিতে পারিলেন, তাঁহার পাল্লিঙ্গী মাতা পর নছেন, তাঁহার আপন মাসী এবং কেন যে নবচর্গা ও কমলাদেবীতে আকৃতিগত এত সৌন্দর্য, তাহার কারণও বুঝিতে পারিলেন। এতদিনে প্রবীণ রাধাগোবিন্দবাবুর অন্তর হইতেও একটা দারুণ সন্দেহ অপসৃত হইয়া গেল। কারণ, এ অমরে এবং সে অমরে তিনি কোনও পার্থক্য দেখিতে পাইতেন না, সেজন্য এ-সমস্ত ব্যাপার

তাঁহার নিকটে যেন একমন একটা প্রাণেলিকা বলিয়া অনুমিত হইত। এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, বমজ-সহোদরার পুত্রস্বয় ঠিক নিজ নিজ মাতার প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কাজে কাজেই উভয় ভ্রাতার প্রতিমূর্ত্তিও ঠিক একরূপ বলিয়া মনে হইত। বড় পুথোই মিলনের রজনী অতিবাহিত হইল।

রাধাগোবিন্দবাবু বিজনকুমারের সহিত নীলিমার বিবাহের দিন স্থির করিয়া সকলকে আজিমগঞ্জে লইয়া যাইবার জন্ত সবিনয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এ স্নাদর নিমন্ত্রণ কেহই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। কিন্তু রাজা স্বর্ধাকুমার এ বিবাহের দিন কিছু পিছাইয়া দিলেন; কারণ, তিনি দেবমন্দিরে ও দীন দুঃখীকে ধন বিতরণ করিয়া তাঁহার হারানিধি পুত্রের কল্যাণ-কামনা করিবেন বলিয়া, দেওয়ানকে সত্বর টাকা লইয়া আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। অগত্যা সকলেই সেই কয়দিন সীতাকুণ্ডেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অমর কুমারের ক্ষুদ্র বাসাবাটীট লোক সমাগম এবং আনন্দ-হাস্ত-রোলে মুগ্ধিত হইয়া উঠিল। বিজনকুমার ও নীলিমা উভয়েরই ভাব লক্ষ্য করিয়া রাধাগোবিন্দবাবুর বুঝিতে বাকি ছিল না যে, তাঁহার পরম্পর পরম্পরের অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছেন। সেইজন্যই তাহাদের এ বিবাহ দিয়া তাহা-দিগকে সুদৃঢ় মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া

উত্তরকে স্থবী করিবার জন্য তিনি এ বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বিজন-কুমার ইহাতে আশাতিরিক্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনিও কয়দিন আসর জম্কাইয়া অক্লান্ত অক্লান্ত ডিটেক্টিভ-কাহিনী গল্প করিয়া নিজেকে ও অপরকে ক্ষুধি, কোতুক ও আনন্দ দান করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘকাল পুত্র-বিচ্ছেদের পরে একেবারে পুত্র-পুত্রবধূ এবং পৌত্র লাভ করিয়া রাজা-রানীর অন্তরে যে কি সুখের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনাভীত। রাজার আদেশমত বথাসময়ে তাঁহার দেওয়ান টাকা লইয়া সীতাকুণ্ডে আসিয়া পৌঁছিলেন। রাজা পুত্রের মঙ্গল-কামনার বাগধন্য হোম-পূজা, শান্তি-স্বস্তরন প্রভৃতি মাকুলিক অন্তঃতানে বিস্তর অর্থব্যয় করিলেন, দীনদরিদ্রগণকে অকাতরে অর্থদান করিলেন; তাহার পর তিনি দেওয়ানকে নিভূতে ডাকিয়া বলিলেন, “বড় শুভক্ষণে সীতা-কুণ্ডে এসেছিলাম। এইখানে আমার বহুদিনের হারান রত পেয়েছি। আমার এ আশঙ্কের দিনে দেওয়ান, তুমি ক্ষর হয়ে না। তোমার ছেলেকে পোষ্য পুত্র মেব বলেছিলাম। আমি তার প্রতি একেবারে অধিচার করব না। আমার জীবন্যারির এক তৃতীয়াংশ তাকে দান করব। আর বতদিন আমি জীবিত থাকব, ততদিন তাঁর তরণ-পোষণ এবং শিক্ষার ব্যয় আমি বহন করব। আমার পুত্রের মতই সে আমার কাছে থাকবে।”

বিস্মিতভাবে দেওয়ান উত্তর করিলেন, “মহারাজের আশঙ্কে আমিও আনন্দিত, ক্ষর হব কেন? মহারাজ যে এতদিন পরে

নিরুদ্ভিষ্ট পুত্রকে প্রাপ্ত হয়েছেন, এ বড়ই সুখের বিষয়!”

দেওয়ানের সহিত পারীচয়্য করিয়া দিবার জন্য মহারাজ অমরকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, “অমর! বাবা, ইনি দেওয়ান তোমার, বর-ভেট, এঁকে প্রণাম কর!” এবং অমর কুমারের একটা হাত ধরিয়া দেওয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “দেওয়ান! এই আমার হারানিধি!”

সহসা যদি আকাশটা নামিয়া দেওয়ানের চরণতলে পতিত হইত, তাহা হইলেও দেওয়ান, বোধ হয়, এতটা বিস্মিত হইতেন না। তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে রাজা স্থা-কুমারের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন— “অমর আপনাদি ছেলে?”

প্রশান্তভাবে রাজা বলিলেন, “হ্যাঁ! কেন? তুমি অমরকে আগে হাতে চিনতে না কি?”

নতমস্তকে মাটির দিকে চাতিয়া ধীরে ধীরে দেওয়ান উত্তর করিলেন, “অমর, আমার জামাই।”

মানন্দে রাজা বলিলেন, “অ্যাঁ, অমর তোমার জামাই? আমার মা-লক্ষ্মী তা হলে তোমার মেয়ে! তুমি আমার বেচাই! এস ভাই, এ আশঙ্কের দিনে তোমাকে প্রাপ্ত-ভরে আলিঙ্গন করি!”

রাজা হান-কাল-পাত্র সমস্ত বিস্মৃত হইয়া বিমুগ্ধচিত্তে দেওয়ানকে বন্ধে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাহার চকুধর হইতে অশ্রু করিতে লাগিল। অমরকুমার পিতা এবং বত্তরের চরণে প্রণত হইয়া সূচ হাতের সহিত বলিলেন, “আমার ভুলে সন্দেহ হয়ে

শুভ্র-মহাশয় আমার সঙ্গে সকল সখ্য পরিভাগ করেছিলেন।”

অবনীবাবু - কথাটা অমরকুমারের অন্তরে কাটার মত ফুটিয়াছিল, তাই আজ ভায়-অভায় বিবেচনা না করিয়া কথাটা টপ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন। অবনীবাবু অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া নম্রভাবে বলিলেন, “অমর-আমাকে কমা কর! আমি তোমার বেতন-ভোগী ভৃত্য! তোমার পিতার অরে আমার দেহ পুটে হচ্ছে!”

শুভ্রের এইরূপ বিনয়-বাক্যে অপ্রতিভ হইয়া অমরকুমার বলিলেন, “আপনি গুরুজন, আমন কথা বলবেন না! দোষ আপনার নয়! দোষ আমার অদৃষ্টের! এতদিন গ্রহ-বৈশাখ্যে আমি আমার জীবন-কাহিনী জানিতে পারি নি। না বুঝে পূর্বকথা উল্লেখ করে আপনার মনে কষ্ট দিয়েছি। আপনিই আমাকে কমা করুন।”

আশাপতা আসিয়া পিতৃচরণে প্রণাম করিল। অবনীবাবু লজ্জার ক্তার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিলেন না।

মির্জিষ্ট দিনে রাধাগোবিন্দবাবু সকলকে সঙ্গে করিয়া আজিম-গজের জন্ত রওনা হইলেন। রাজা সূর্য্যকুমার, দেওয়ান অবনীবাবু, সকলেই নীলিমার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাধাগোবিন্দবাবু ঘেঁহে আজ বেন ঘোবনের বল করিয়া পাইলেন। পুলকিত অন্তরে গোত্রীর বিবাহের উত্তোগ করিতে লাগিলেন।

এ-দিকে অমরকুমারের আগমন-সংবাদ পাইয়া আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী, প্রজাসাধারণ, সকলেই বড় প্রীতি হইল। সকলেরই অন্তর

আজ বেন পুলক-প্রবাহে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে লাগিল। কি প্রকারে অমরকুমারের অভ্যর্থনা করিবে সকলে মিলিয়া তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহারা ষ্টেং হইতে অমরকুমারের বাটী পর্য্যন্ত সমস্ত রাসপথ পুষ্পমালা ও আলোক-মালায় সুসজ্জিত করিল। নগর-তোরণ-দ্বারে নববত মুহু মধুরসুরে আগমনী গাহিতে লাগিল। সকলেই তাহার স্ব স্ব গৃহদ্বারে কদমীবৃক্ষ, মঙ্গল-বট ও আম্রশাখা প্রভৃতি মাজলিক দ্রব্য স্থাপন করিল। সন্ধ্যার পর যখন অমর কুমার ট্রেন হইতে অবতরণ করিলেন, তখন তিনি দেখিলেন বহুসংখ্যক লোক, তাঁহাকে দেখিবার জন্ত ট্রেনে সমবেত। তাঁহাকে দেখিবার জন্ত পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া সকলে জনতারুদ্ধি করিয়া তুলিল, এবং তাঁহাকে দেখিয়া সকলে উল্লাসে অধঃধনি করিয়া উঠিল।

অমর কুমার তাহাদের আরও প্রফুল্ল করিবার জন্ত তাহাদের সঙ্গে পদব্রজেই গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অজ্ঞাত সকলে ঘোড়ার গাড়িতে উঠিল। অমরকুমার যখন সমভিব্যাহারী লোকদিগের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ করিতে করিতে পথতিবাহন করিতেছিলেন, তখন পথিপার্শ্ব হই ধারের বাটীর বাতায়ন-পথ হইতে মহিলাগণ তাঁহার মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ পথে দাঁড়াইয়া হস্তির লুট দিল। উলঙ্গ বালকের দল সন্দেশ ও বাতাসা কুড়াইয়া মহানন্দে তরুণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাসপথ লোকারণ্য! দরিদ্র অধিবাসিগণ বলাবলি করিতে লাগিল, “ওরে এতদিনে আমাদের পনি কাটিলো। গরিবের

মা-বাপ অমরকুমারবাবু ফিরে আসছেন, আর আমাদের কোনও ভাবনা নেই।” অমর কুমারের প্রতি জনসাধারণের এতাদৃশ প্রগাঢ় শ্রদ্ধাদর্শনে অবনীবাবু যেন কেমন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। অমর কুমার বাস্তবিক মনে মনে বড় প্রীত হইলেন। উভারা যে তাঁহার চিরপচিত, তাঁহার কৈশোর যৌবনের কত স্মৃতি যে এই আশ্রম-গঞ্জের সচিত বিজড়িত! এখানকার অদিবাসিবর্গ যে তাঁহার আপনার ভন হইতেও প্রিয়! বাটীতে উপস্থিত হইয়া অমরকুমার সর্বাগ্রে মহামায়াস সচিত সাক্ষ্যকার করিবার জন্ত রাধাগোবিন্দবাবুর বাটীতে গমন করিলেন; মহামায়াস পদধূলি লইয়া স্বাযোগ্য বস্ত্রের সচিত বপাযোগ্য সজ্জাধন করিলেন। নীলিমা তাঁহার স্নেহময় কাকীবাবু আসিয়াছেন দেখিয়া তখনি তাঁহার স্নেহময়ী কাকীমা এবং তাহার নতন ভাইটিকে দেখিবার জন্ত তাঁহার সচিত চলিয়া আসিল। উপদ্ব্যপরি প্রশ্ন এবং নিজের কাহিনী-সকল -- কিম্বদে দ্বারা তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছিল, কোন ঘরে কেমন অন্তর রাখা ছিলবিজন, বাবু কেমন করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইত্যাদি সবিস্তার-রূপে বিবৃত করিতে আরম্ভ করিল। অমরকুমারকে ফিরিয়া পাইয়া সকলেই পুলকিত মহাধ্ববন্ত।

আশালতা বাটীতে প্রবেশ করিয়াই, কানাইকে লইয়া ঝাঁটা হাতে করিয়া ঘর পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত হইলেন। তাহাদের অল্পপরিচিত সমস্ত কক্ষগুলি হস্তপ্রীত অবস্থায় পরিয়াছিল। অন্যের প্রকোষ্ঠগুলি আদৌ ব্যবহার হইত না। যে সমস্ত কক্ষগুলি আশালতা নিজের হাতে অভিনিপুণভাবে সজ্জিত

করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সমস্ত কক্ষ বহুভাবে ঝুল, মাকড়সার জাল এবং পারাঘাতের বিষ্ঠার পুণ হইয়া গিয়াছিল। কক্ষস্থ আসবাবপত্রগুলি ধুধিরানিতে মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। আশালতা সেই সমস্ত আড়িয়া মুছিয়া ধুইয়া স্বাফ্রানে রাখিতে লাগিল। কানাই আপন মনে গজ গজ করিয়া বকিতে বকিতে, বালাত করিয়া কল আনিয়া গুহুল ধোত করিতে লাগিল, এবং বদমায়েসদিগকে গালি দিতে লাগিল। আশালতা সহান্তে বলিল, “ওরে কানাই, মুখটা একটু থামা, হাত একটু জোরে চালা। কতকগুলো ঘর পরিষ্কার করে যে শিগগির শিগগির; নইলে এসব ঘণে ভুতে পারা যাবে না। বাকি তখন কাল সব পরিষ্কার করা যাবে।

নীলিমা বলিল, “আজ্ঞা কানাই, তুমি মিথ্যা কেন বক্চো বাপু? তারা তো আর তোমার এসমস্ত গাল আশ্রামান থেকে শুনে পাচ্ছে না! তোমারই মুখ বাণা হচ্ছে?”

উদ্ধতভাবে কানাই উত্তর করিল, “এই দেখুন না, দিদিমণি! শালারা বাড়ীতে ঘরে মজা উড়িয়ে গেল, আর ঘরগুলো পর্যন্ত একটু পরিষ্কার রাখতে পারে নি! শুদ্ধ হইতে বিজনকুমার মুঠাতে বলিয়া উঠিলেন, “সে দোষ তাদের নয় কানাই, সে দোষ আমার! তারা তো বাবুলোক! তারা কি আর নিজের হাতে ঘর পরিষ্কার করতে পারে? আমিই তোমার কাজটা নিয়েছিলাম, আমারই উচিত ছিল ঘরগুলো পরিষ্কার করে রাখা। তাহের খানসামাগিরি করেছি বটে, কিন্তু ঝাঁটা ধুতে শিখি নি! কানাই পূর্ববৎসরে বলিল “কেন তাদের কি আর অস্ত্র কি-চাকর ছিল না?”

বিজনকুমারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া নীলিমা

একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। তাহার মুখ খান্না লাল হইয়া উঠিল, যেন মেহের সমস্ত রক্তটা তাহার মুখের উপর ভরষাট বাধিয়া একসঙ্গে জমা হইয়াছিল। বুকের ভিতর কেমন একটা স্পন্দনানুভূতি হইতে লাগিল। তাহার পর সে একেবারে সে-স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইল। মৃত হাসিয়া বিজনকুমারবাবু বলিলেন, “কি নীলিমা, আমাকে দেখে অত ছুটেপালাচ্ছ কেন? আমি বাঘ না ভালুক? নীলিমা তখন সেদেশেও ছিল না।

মুখকোঁড়া কানাই তখন বলিয়া উঠিল, “তা বাবু উচিত কথা বলতে কি। আপনারা টিকটিকি পুলিশের লোক, বাঘ-ভালুকেরও বাড়া। বাঘভালুকের ভয় বনে গেলে, আর আপনারা ঘরের ভেতর থেকে মানুষের গাড় ধরে নিয়ে যান।”

বলা বাহুল্য, কানাইয়ের তাই বলাইকল্পী লোকটা আমাদের বিজনকুমার। তিনি দম্ভ-দিগের দাসত্ব করিয়া তাহাদের নিকটে থাকিয়া তাহাদের অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছিলেন।

অমর কুমার পুনর্বার আসিয়াছেন, ওনিয়া তাঁহার পুরাতন দাস দাসী সকলে একে একে আনিয়া উপস্থিত হইল। অমর কুমারও কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া, সকলকেই তাহাদের নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত করিলেন। মৃত ভগ্নী ও ভগ্নীপুত্রকে শ্রমণ করিয়া কমলা দেবী ছই বিন্দু অঙ্গপাত করিলেন; বলিলেন, “দিদির ছেলের ভাতের সময় একবার আমি এখানে এসেছিলাম, তখন আমার অমর হয় নি। তখন এ বাড়ী লোকে লোকারণ্য! আমাকে দেখে উপেনবাবুর কি আনন্দ! আহা, আজ ছেলেটা যদি থাকত।”

নির্দিষ্ট দিনে বেশ সমারোহের সহিত বিজনকুমার ও নীলিমার বিবাহ হইয়া গেল। এইবিবাহে উৎসবের কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই। বালী-বালনা, নাচ-তামসা, মিষ্টান্ন-বিতরণ, সমস্তই যথানিয়মে সম্পাদিত হইয়াছিল। রাজা সূর্য্যকুমার বিজনকুমারকে একখানা বার্ষিক ছই-সহস্র টাকা আয়ের তালুক, এবং নীলিমাকে প্রায় দশ সহস্র টাকার অলঙ্কার যৌতুক প্রদান করিলেন। এ বিপৎসমুল ভাকরী পরিত্যাগ করিবার জন্ত বিজনকুমারকে সকলেই অমরোদ্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু গোয়েন্দাগিরি করিয়া প্রকৃত দোষীকে দণ্ড এবং নির্দোষীকে মুক্তি দেওয়াই তাঁহার আনন্দ। এবং এই স্মারাহুযোদিত কার্যে পুলিশের কলঙ্ক-কালন করাও তাঁহার উদ্দেশ্য। এইজন্ত তিনি চাকরী পরিত্যাগ করিলেন না।

বিবাহের-কর দিন গোপমালাে অতি বাহিত হইয়া গেল। তাহার পর রাজা সূর্য্য-কুমার পুত্র, পুত্রবধূ এবং পৌত্রকে লইয়া বেশে বাইবার জন্ত বাগ্ন হইলেন। বহু দিবস পরে কমলভূমি দর্শনের জন্ত অমরকুমারের মনও অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার সেই গত জীবনের কাহিনী, শৈশব-সহচর-দিগের কথা মাতার নিকটে গুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। গুনিতে গুনিতে তাহা যেন এক স্বপ্ন-রাজ্যের ঘটনা বলিয়া তাঁহার মনে হইত। সেই সমস্ত অতীত দিনের কথা গুনিতে গুনিতে যেন একটা ছায়ার মত তাঁহার সেই বাল্যের স্মৃতি আগ্রিত হইয়া উঠিত। আর অভাগিনী মাতা, সেই পঁচিশ বৎসরের পরে তাঁহার বকের হারানিধি পাইয়া বুক হইতে আর নামাইতে চাহিতেন না। কিন্তু

এ হর্ষের মধ্যেও অমরকুমারের হৃদয়ের এক প্রান্তে একটা বিবাদের রেখা পড়িয়াছিল;— সব হইল, কিন্তু উপেক্ষিকশোরবাবুর পুত্রকে পাওয়া গেল না। তাঁহাকে পাওয়া গেলেই পূর্ণানন্দ হইত। তাঁহাকে কেহ হত্যা করে নাই, তবে তিনি কোথায়? তিনি এক একবার ভাবিতে লাগিলেন, চঃখ-দৈত্যের মধ্যে পড়িয়া মৃত্যুও কি সম্ভব নয়? বোধ হয়, তাঁহার মৃত্যু ঘটনা থাকিবে, নচেৎ এত করিবার তাঁহার কোনো সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না কেন? কিন্তু বিজনকুমার বলিয়াছিলেন, কে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিল, উপেক্ষিকশোরবাবুর পুত্র জীবিত, এবং তিনি কোথায় আছেন, তাহাও সে ব্যক্তি জানে, অথচ সংবাদ দিতে প্রস্তুত নয়। সে কি তবে মিথ্যা বলিয়াছিল? মিথ্যাকথা বলার তাহার লাভই বা কি? সেই ব্যক্তিই না-কি শেষে কি-না বিজনকুমার ও নীলিমার মুক্তির উপায় করিয়া দিয়াছিল! তাহাকে ত তাহা হইলেও শত্রু বলা যায় না! অথচ তাঁহার সংবাদ না বলিবার কারণ কি? অমরকুমার তাহা কিছুই হির স্বপ্নিতে পারিলেন না। তিনি একদিকে জন্ম-ভূমির দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, অন্য দিকে সেইরূপ উপেক্ষিকশোরবাবুর পুত্রের জন্তও উদ্ভিগ্ন হইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে একদিন তিনি সংবাদ পাইলেন, তিন কোশ দূরবর্তী তাঁহার অধীন হাবিপুর-গ্রামে অভ্যন্তর বিশৃঙ্খলার প্রাহুর্ভাব হইয়াছে। তৎপাকার অধিবাসিবর্গ অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক এবং নিরশ্রমের শ্রমজীবী। তাহাদের এইরূপ বিপদের কথা শুনিয়া অমরকুমারের প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। তিনি

রাধাগোবিন্দবাবু, বিজনকুমার এবং আরও একজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ঐযথ-পথা, অর্থ ও চাইজন বিজ্ঞ চিকিৎসক-সহ তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্ত ছুটিলেন।

গ্রামে উপস্থিত হইয়া গ্রামের চন্দনা দেখিয়া অমরকুমারের চক্ষে জল আসিল। ভবিষ্যদ-দ্রষ্টাদিগের প্রবল অভ্যাচারে গ্রাম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে! কাহারও পেটে ভাত নাই, কাহারও বা পরিধানে কাপড় নাই, কাহারও বা গোয়াল শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ হাল-গরু বেচিয়া জমীদারের খাজনা দিয়াছে, বীজ-খাত খাইয়া কেলিয়াছে। গোলা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। পুনর্বার চাষ-আবাদ করিবার কোনও উপায় নাই। অর্থ নাই যে, আবার এ-সমস্ত রক্ষা করিবে! তাহার উপর এই কাল-রোগের প্রাহুর্ভাব! যে পীড়া কাত হইতেছে, সেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে। গ্রামে নদী নাই; নীচি পুকুরিণী যাহা ছিল, সংস্কারভাবে লৈবালে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোথাও বা সন্ধ্যার ভাবে শুক কোন পুকুরিণীতে হাঁটু-প্রমাণ জল, তাহাও কদমাক! তাহাট লোকে পান করিতেছে! দেখিয়া অমরকুমারের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। জমীদার প্রজার অর্থে সুখ-লাজলো কালান্তিপাত করিবেন, অথচ প্রজাদের সুবিধা-অসুবিধা বা জীবন ও বাহ্যের দিকে আদৌ লক্ষ্য করিবেন না। বাল্যলার এমন স্বার্থপর জমীদারদিগের জন্তই আজ পরীবাগিণের এমন চন্দনা। গ্রামের কি কি সংস্কার করা প্রয়োজন, অমরকুমার তাহার একটা তালিকা করিয়া লইলেন, এক তথ্য একটা দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি ক্ষুদ্র পটী-

খানির গৃহে গৃহে ফিরিয়া বাহার যে অভাব, তাহা পূরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অন্তরমুগ্ধ দর্শন করিয়া দরিদ্র অধিবাসি-গণের প্রাণে যেন কেমন একটা শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হইল, কৃতজ্ঞতার তাহাদের হৃদয় ভরিয়া গেল। স্বপ্নের অরকট, পীড়িতের কাতর চিৎকার, শোকার্তের হাহাকার, মুমূর্ষুর আর্তনাদ, দেখিয়া দেখিয়া অমরকুমারের মনঃ প্রাণ বিষাদে ভরিয়া গেল। সে করুণ মর্মভেদী হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শন করা যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। অমরকুমার ইহার যথার্থকি প্রতিবিধান করিয়া, “কাল আসব” বলিয়া তাহাদের আশ্বাস দিয়া অপরাহ্নে গৃহ-ত্যাগে ফিরিলেন। আসিবার সময় পথের পার্শ্বে একখানি কুটীরে যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষের পলক পড়িল না। সেই কুটিরের অধিকারী তাহার স্বীয় সংকার করিয়া আসিয়া নিজে পীড়াক্রান্ত হইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার জ্ঞাতি বন্ধু-বর্গ পলায়ন করিয়াছে। একটা পীচবৎসরের উলকশিশু রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছে, আর একটি ভয়ঙ্কর রোগীর নিকটে বসিয়া হাতের ছায় তাহার গুস্ত্রাবর রত রহিয়াছেন। সেই নীচজাতীয় ব্যক্তির মলিন শয্যার উপরে বসিয়া তিনি নির্বিকারচিত্তে স্বহস্তে তাহার বলমূত্র পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন এবং শিশুকে মিষ্টবাক্যে সানস্নান করিতেছেন; নিজের উত্তরীয়খানি ছিন্ন করিয়া রোগীর দেহে ঘুড়াইয়া দিতেছেন, এবং পরিধের বসনের অর্ধাংশ ছিন্ন করিয়া বিছাইয়া তদুপরি তাহাকে খোঁচাইয়া দিয়াছেন। দরিদ্রের গৃহে ক্ষয়া অথবা বয়স বেশী কিছুই ছিল না।

তিনি তাঁহার কাগড়খানি বিছাইয়া তাহার উপর কচি কদলীপত্র পাতিয়া অয়েলকুণ্ডের কাজ করিয়া গইলেন। তাহার উপর তাহাকে শয়ন করাইয়া দিয়া যথাসম্ভব সে সমস্ত পরিষ্কার রাখিতে লাগিলেন। নিকটে একটা মৃৎপাত্রে জল, কিছু হোমিওপ্যাথি ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া ছিলেন, আবশ্যক মত তাহাও ব্যবহার করিতে ছিলেন। তিনি নির্ভর নির্বিকার অবিচলিত ভাবে, এই দারুণ অনাথ হতভাগ্যে সংক্রামক রোগীর সেবার রত। তাঁহার আকৃতি অতিসুন্দর, চক্ষুর উজ্জল ও আরত; লগাট ও বন্ধ প্রশস্ত; বেশ কৃষ্ণ কৃষ্ণিত মস্তকের উপর স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া বিধাতার অপূর্ণ নিদ্রাণকৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। অমরকুমার মুগ্ধচিত্তে অনিমেবদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন—“কে এই মহাপুরুষ! কে এমন নির্ভর নির্বিকারচিত্তে রোগীর কাছে থাকিয়া সেবা করিতেছেন? এত দয়া এত করুণা কাহার প্রাণে? ইনি কি বিধাতার বরলাভ করিয়া আসিয়াছেন?”

বিজনকুমার তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, “আপনিই সে-রাজ্যে জানালায় গরাদে ভেঙ্গে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন নয়?”

রাধাগোবিন্দবাবু সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, “কি আশ্চর্য! ঠিক আমার মতন দেখতে যে! বিজনকুমার তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া—“এই সেই! এঁকেই আমি পথে দেখেছিলাম, ইনিই আমাকে সেই রাজ্যে দস্যুর হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন।”

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথা-বার্তা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর

এ বিষয়ে ক্রক্ষেপও করিলেন না তিনি নীরবে তাঁহার আরও কার্য করিয়া বাইতে লাগিলেন। হঠাৎ একবার তিনি উকে চাহিয়া দেখিলেন, চালের নীচে বাঁশের আড়ার উপর একখানা খেজুর পাতার অর্ধ নিশ্চিত চোটাই রছিয়াছে। হতভাগা গৃহী সেখান নিষ্কাশন করিতে করিতে অসম্পূর্ণ রাখিয়াছে; রাখিয়া পীড়িত হইয়াছে। উপস্থিত দেখানি শব্দায় পাতিবার জন্ম, উঠিয়া সেখানা পাড়িয়া লইলেন। ইতাবসরে বিজনকুমার তাঁহার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “দেখুন, এর দুই পায়েই ছটা করে আঙ্গুল! কিন্তু হঠাৎ দেখলে বোঝবার জো নেই। কি স্নন্দর মানান সই!”

অমরকুমার বলিলেন, “তা হলে আপনিই আমার দাধা? বলুন, বলুন, আর আমাকে ধাঁধায় ফেলে রাখবেন না!”

কিছুমাত্র আশ্চর্যান্বিত বা বিচলিত না হইয়া তিনি বলিলেন, “চুপ! দেখছ না, লোকটি স্তম্ভ হইয়াছে, ঘুম এসেছে? ঘুম ভেঙ্গে যাবে যে!”

অমর কুমার বলিলেন, “আমি এর কাছে থাকবার জন্যে লোক বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, আপনি চলে আসুন!”

হস্তোত্তোলন করিয়া দীরে দীরে তিনি

বলিলেন, বাস্তব হইলোনা “অমর! বাস্তব হইলোনা!” সে কি মিষ্ট সম্ভাষণ! যেন চিরপরিচিত মেহমত ভ্রাতার ভ্রাতৃ মধুর সম্ভাষণ! পুঙ্কে অমর-কুমারের দেহ ভরিয়া উঠিল। ভাইকি জিনিষ! জগতে ভ্রাতার মত আর কিছু প্রিয় আছে বলিয়া অমরকুমারের মনে হইল না। দুই ভ্রাতার মিলিয়া সংসারধারা-নিকাশ করিবার একটা মধুর করনা সেই মুহুর্তে অমরকুমারের হৃদয় যুড়িয়া বসিল। তখন সকলেই প্রকৃতিতে পারিলেন, হিনট উপেক্ষ-কিশোরবাবুর পুত্র। রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, “তাঁ এ যে উপেক্ষাকিশোরবাবুর ছেলে সে বিষয় আর কোনও ভুল নেই! চোঁচরা দেপেই বোকা যাচ্ছে! আর দেখুন কি আশ্চর্য! যমজ-ভগ্নীর ছেলে হটকে একসঙ্গে দাঁড় করালে ঠিক যমজ বলে মনে হয়! ঠিক এক রকম দেখতে!”

সে-রাগিণী সকলের সেই কুটীরেই অভি-বাধিত হইল। উপেক্ষাবাবুর গুলের ঐক-প্রকৃ যত্নে পীড়িত লোকটি স্তম্ভ হইয়া উঠিল। ভ্রাতার রক্ষা এবং ঔষধ-পথোর উত্তম ব্যবস্থা করিয়া সকলে গৃহে সমাগত হইলেন।

(কমলঃ)

শ্রীচারণলালা মিত্র।

উষা।

পূর্ব-সাগর-তীরে,
নীল অশ্বর প্রতিবিম্বিত
বাহার স্নানী নীরে,
হেম বরণা পদ্ম-আননা
দাঁড়ায়েছে উষা স্থির-দোবনা!-

স্বপ্নবরণ চিকুরজাণ
এলায়ে পড়েছে!—রক্তিম ভাল!-
অবগাহে বালা সলিলে নাহি
দিবা-জড়িতা, জ্যোতিষ রাণী।

তামসা নিশার নিবিড় তিমির
সবে গেছে দূরে সরিয়া—
বিবল আবেশে চলিছে উর্ধ্ব
কলধির বুক ভরিয়া,
তাম্র-বরণ গগনের কোলে
অনুট ভাষা ওঠে চলছেপে,
শিশু ঢেউগুলি পড়িতেছে ঢলে
তরল পুলকে গলিয়া !—
উৎকল আঁখি তখনো জগৎ
মেলে মি প্রভাত-কালে—

দীপ্তহস্ত হ'ল প্রসারিত
নির্ঝল নতোভালে !
সমুদ্রে অশ্রু করি আরোহণ
বাহিরি আসিল তরুণ অরুণ,
চেরিল একটি কহল হিরণ
বিমল-সাগর জলে ।

কল্পিত উষা চমকি উঠিল
শঙ্কা-জড়িত প্রাণে ;
বন্ধুর মৃত স্পন্দন-স্বনি
বাঞ্ছিত সমীর-তানে !
নিপিল বিশ্ব রঞ্জিত করি
লজ্জার রাগ ফুটিল শিহরি ;
ভাষার আঁখি তুলিয়া কিশোরী
চাটিল গগন পানে ।

নিম্ন ভাহার খাস-সোরভ
পুষ্প লইল নুটে !—
কমল শকটে ঘুরিল চক্ৰ
উদয় গিরির তটে ।
দীর ভাজে বালা নেহারি তপসে,
মুখর নুপুর বাজিল চরণে ;
চেহ-কিকিনী-গুচ্ছ-গামে
এক মাতিয়া ওঠে !

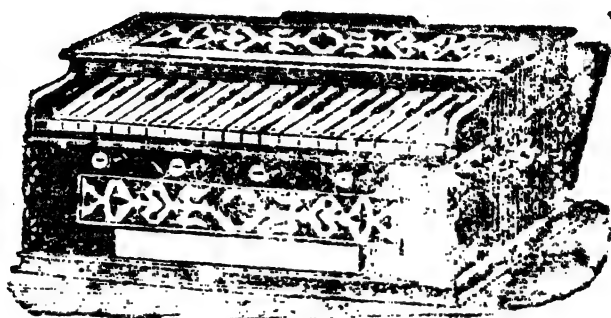
হৃদয়ল সিক্ত নিচোল উপরি
মৃণাল-কোষল ভুজ-বল্লরী,—
কম-তম্বু তাগে বাহু-উরঙ্গে,
সুখমা-লহরী খেলিল অঙ্গে,
আলোক-লতার মত !—
অধরজাল সঞ্চারি জাগে
এতচরণে স্তুতিতকেশে
নীলাকাশে উষা আপনা লুকাল,
বসন হইতে ঝরিয়া পড়িল
শিশির-বিন্দু শত ।

আদিম প্রভাতে সিন্ধুর কূলে
মলিমর-মালা-লবিত-গলে
প্রথমে যেদিন উদিল কুমারী,
ভাহুর মুগ্ধ নেত্র-উপরি
ভাসিল স্বপ্ন-ছায়া !
অধরের নব পল্লব-চাঁটি
কলস-কণ্ঠ-সম ক্ষীণ কটা
পরশ-লালসে ব্যাকুল তপন !
অমরীর তরে অমর-বেদন
পূর্ণ করিল হিয়া !

তার পর গেল কতদিন চলি—
রথ-বর্ষরে তুলি মেঘ-গুলি
ছুটেছে তপন মিলন-পাগল,
সরে গেছে উষা ভীত চঞ্চল—
আলোহার মত চরণ !—
বৃগ-বৃগান্ত গিয়াছে চলিয়া
চির আকাঙ্ক্ষা ফুরে ধরিয়া
খুঁজিছে সখিতা চির-বাহিত !—
বিশ্ব-গগনে চির অন্ধিত
সে পিপাসিত অতুসরণ ।

শরৎ ঘোষে হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা।



বাংলা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, ইচ্ছাধীন কোনও ভূমিতে চর না।
নূর নামিয়া যাওয়া, 'সি' 'সি' করা, 'সি' 'সি' করা প্রভৃতি কাণাম শব্দ ঘোষের
হারমোনিয়মকে ধরে না বলিতে হয়। এই সকল ভণ্ডা ভুলই শব্দ ঘোষের হারমোনিয়মের
এত আদর ও কাটতি।

Oct. Single Reed, 4 stops Rs. 20 & 25
" Double " 5 " " 35-40 & 45
Other Varieties— from " 50 to 300

হারমোনিয়ম-শিলা Rs. 1 & 2
আলিবাগাব গানের যন্ত্রলিপি— 1-8

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, বেবুর্ট, পিন প্রভৃতি আমদানি বিক্রয় করি।

শরৎ ঘোষ প্রিন্ট কোং, বনং ডালহাউসি স্টোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA.

এমতা হান্দরা দেয়া প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরইন্ড্রা—(উপন্যাস)—১৮; নির্মাল্য—(গল্প-
গ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমা বাঁধাই—১১০; কেতকী
—(গল্পগ্রন্থ)—সিক্ত বাঁধাই—১৮; স্পর্শমণি—
(উপন্যাস) দ্বিতীয় সংস্করণ—২৮

প্রাপ্তিস্থান—কুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১নং, কর্ণওয়ালিস স্ট্রট, কলিকাতা।

গ্রাহক গ্রাহিকা মণের প্রতি ।

প্রেরণ অনিয়মিতা ও নানাবিধ অদৃষ্টপূর্ব প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত পত্রিকা প্রকাশে বার-
পর-নাই বিলম্ব ঘটিল, তজ্জন্য আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি ও ত্রুটি স্বীকার করিতেছি ।
এরূপ বিলম্ব ঘটিতে পুনরায় না ঘটে, তজ্জন্য আমরা যথোচিত মনো-ব্যবস্থা করিয়াছি ও
করিতেছি । আমাদের প্রদত্ত বিশ্বাস, অঙ্গপরি, গ্রাহকবর্গের নিকট যথাসময়ে পত্রিকা
পৌঁছিতে বিশেষ চেষ্টা নাই । গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অদৃষ্টপূর্বক ত্রুটিবাদের স্ব স্ব দেহটা মনে
প্রেরণ করিয়া আশী রূপের কাব্যে সহায়তা করিলে কৃতার্থ হইবে ।

কাব্যাদ্যক্ষ ।

বিজ্ঞাপনের হার ।

- ১। এক কলামের দৈর্ঘ্য পৃষ্ঠা ... মাসিক
 - ২। এক কলামের দৈর্ঘ্য পৃষ্ঠা ...
 - ৩। বিজ্ঞাপনের এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য এক পৃষ্ঠা ...
পূর্ণ পৃষ্ঠা
 - ৪। মলাটি বা মলাটের সমুদায় পৃষ্ঠা ... পূর্ণ পৃষ্ঠা
- প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার সমুদায় পৃষ্ঠা
বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয় ।

কাব্যাদ্যক্ষ ।

সাহান

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত কৃত পুস্তক । বিবিধাঙ্গলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমল মধুরাঙ্গী
স্বরূপ । ভাষা ভাষা আনন্দপ্রায় । কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর । মূল্য চারি আনা মাত্র ।
সুখমায়মুখিতি থাকিবে না । কলিকাতার কাটের থেংলাই পরিদর্শিত হইয়াছিল । বাস্তবের অনুমোদন
উপকার হই ই লাভ হয় ।

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী । কেশবধাম, কেশবদুর্গ সিটি ।

বিজ্ঞাপন ।

প্রবীণ সুলেখক শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ বোস মহাশয়ের সেই প্রসিদ্ধ “জীৱন-সংগ্রহ-
মোক্ষ” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে । পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা ইহা অনেক পরিমাণে
বর্ধিত হইয়াছে এবং বহুতর উপদেশপূর্ণ আশ্বাস ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ সমাবেশ দ্বারা
ইহাকে অধিকতর উপপাঠ্য করা হইয়াছে । ৩৮ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী
ও ২৫২ রণন্যায়দর্শন মন্দিরের দের, ভবানীপুত্র, কলিকাতা, দ্বারা পাওয়া যাইবে ।

৫৮ বর্ষ

বামাঝোঝিনী

মাসিক-পত্রিকা

৩ সমালোচনী।

দুর্গার মহাশ্বে উদ্দেশ্যে দত্ত বি-এ কল্লিক প্রবর্তিত।
চৈত্র ১৩২৭—এপ্রেল, ১৯২১।

সূচী

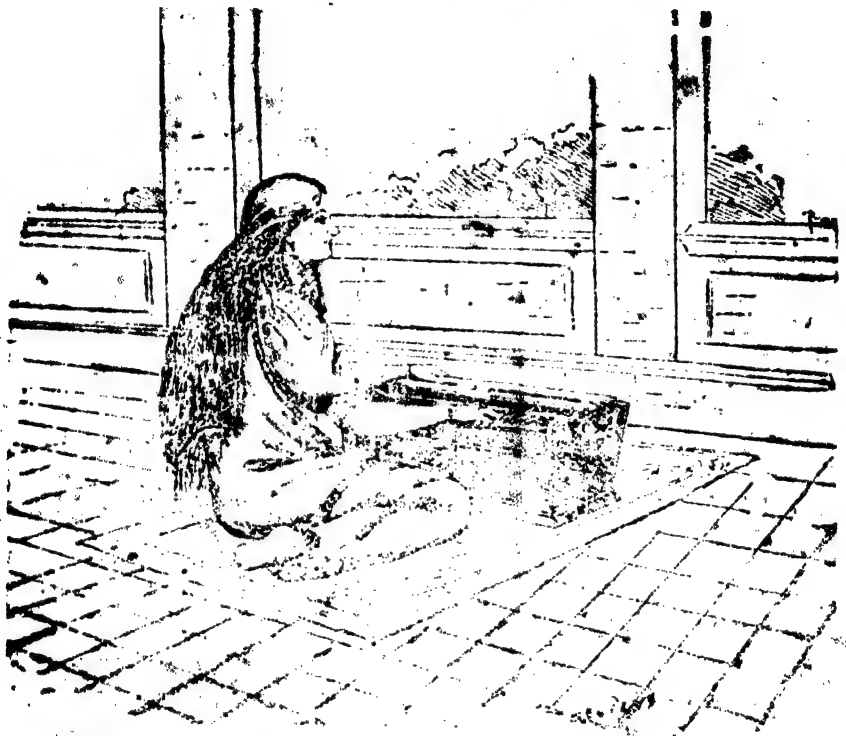
১। ভজ্ঞন (বরালপিসহ) শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল	৩২২
২। শ্রীকৃষ্ণাটোর স্মৃতিশ্রী	৩৩০
৩। লিপ (কবিতা) শ্রীযুক্ত অশ্বপেদ্রনাথ চৌধুরী	৩৩৭
৪। লীনার শিকা (উপহাস) শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, ধরবরী	৩৩৭
৫। জ্ঞানক বাতি এল (গান) শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল	৩৪৪
৬। শিকা (গল্প) শ্রীযুক্ত—	৩৪৮
৭। জাহাজ-ডুবি (উপহাস) শ্রীমতী চাকুণীলা মিত্র	৩৪৮
৮। ডাক্তার জ্ঞান বাসিন্দার ঘোষ	৩৪৭
৯। সংবাদ	৩৪৭
১০। বর্ষ বিদায়	৩৪৮
১১। ১৩২৭ সনের বর্ষান্তরিক সূচী	

৫০ নং কল্যাণী বোয়ালী, কলকাতা প্রেসে শ্রী অম্বাচরণ সেন কর্তৃক মুদ্রিত।
শ্রীযুক্ত অম্বাচরণ সেন কর্তৃক ওই নং এডীটরগার্মিন্সেন হটেল প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫/-, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৫/-
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ১/- (চারি কান্দা) কম।

ডোয়াকিনের হারমোনিয়ম।

বাজারে জিনিষের মত নয়।



বাস্তব হারমোনিয়ম—

১ সেট পিউ মূল্য ২০, ও ২৪ টাকা।

২ সেট পিউ মূল্য ৩০, ৪০, ৪৫, ৫০ হইতে ১৫০ টাকা পর্যন্ত

কোন্ডিং অরগেন—মূল্য ৩০, ৪৫, ৭০, ৭৫ ও ১০০ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫, ১০, ১৫ ও ২৫ হইতে ৩০০ টাকা পর্যন্ত

সেতার—মূল্য ১০, ১৫, ২০, ২৫ ও ৩০ টাকা।

সেরাজ—মূল্য ১২, ১৫, ১৮, ২০ ও ২৫ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল বকম বাস্তবের তালিকা পাঠান হুগ

ডোয়াকিন এণ্ড সন,

৯১ নং ডালহাউসি কোয়ার্টার, ব্রাহ্মবীথী, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No 692:

April, 1921.

“কল্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিষ্ণুতঃ ।”

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত ।

৫৮ বর্ষ ।
৬৯২ সংখ্যা

চৈত্র, ১৩২৭ । এপ্রেল, ১৯২১ ।

১২শ কল্প ।
১ম ভাগ ।

ভজন ।

রাগ ভৈরব—তেতাপা ।

ভোরের আলোর সাথে আমি
গাব তোমার গান,
ভোরের পাখীর সাথে আমি
তুলবো বীণায় তান ।

ভোরের ফুলের সাথে আমি
গাপবো মালা জদয়-স্বামী,
আঁখি-ঝরা শিশির সজল
করবো মালা দান ।

ভোরের বেলা আকাশ-পানে
ডাকবো তোমায় কাতর প্রাণে ;
বাতাস দিবে খবর এনে,
বলবে তোমার নাম ॥

কথা ও সুরলিপি—শ্রীযুক্ত নিম্মলচন্দ্র বড়াল ।

II	গা	গা	-গা	-গা	১	আ	-১	সা	-সা	২	না	সা	-১	-১	৩	দা	-১	গা	-১	I		
	ভো	রে	•	র		আ	•	লো	র		সা	পে	•	•		আ		মি				
I	সা	স	মা	-১	১	১	পা	-১	মা	-১	২	গা	-১	আ	-১	গম	পা	মগ	মা	-১	-মা	I
	গা	ব	•	•	•		তো	•	মার	•		গা	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
I	মা	ম	দা	-১	দা		দা	-১	দা	-১		পা	পা	দা	-১	৩	পা	১	মা	১	I	
	খো	রে	•	•	•		পা	•	খীর	•		সা	খে	•	•		আ	•	মি	•		

I	পা ^০ -গা দা -১	পা ^১ -১ মা -১	গা ^২ -১ ঙা -১	গমপা -মগমা -১ -মা II
	তু ল্ বো •	বো • গায় •	তা • • •	••• ••• • ন্
II	মা ^০ -দা -১ দা	না ^১ -১ সী -১	ঙী ^২ সী ১ ১	না -১ .সী -১ I
	ভো• রে র্	ফু • লেব্ •	সা পে • •	আ • মি •
I	ঙী ^০ -১ -১ ঙী	ঙী ^১ -১ সী -১	না ^২ সী -১ -সী	স'গা দা -১ পা I
	গাধ্ •• বো	মা • লা •	হু দয় • •	স্বা • • মী
I	পা ^০ .পা দা -১	পা ^১ মা গা -১	মা ^২ দা -১ -১	না -১ সী -১ I
	অ'ধি • •	ঝ রা • •	শি শির্ • •	স • জল্ •
I	পা ^০ -১ গা দা	পা ^১ -১ মা -১	গা ^২ -১ ঙা -১	-গমপা -মগমা -১ মা II
	ক • ব্ বো	মা • লা •	দা • • •	••• ••• • ন্
I	মদা ^০ দা -১ -দা	না ^১ -১ সী -১	ঙী ^২ সী -১ -সী	না -১ সী -১ I
	ভো• রে • র	বে • লা •	আ বা • শ্	পা • নে •
I	ঙী ^০ -১ -১ ঙী	ঙী ^১ -১ সী -১	না ^২ সী -১ -সী	স'গা দা -১ পা I
	ডাক্ •• বো	ভো • মায় •	কা ত • ব্	প্রা • • গে
I	পা ^০ দা -১ -দা	পা ^১ -১ মা -গা	মা ^২ দা -১ দা	না -১ সী -১ I
	বা তা • স্	দি • বে •	খ ব • ব্	এ • নে •
I	পা ^০ -১ গা দা	পা ^১ -১ মা -১	গা ^২ -১ ঙা -১	গমপা- মগমা -১ মা II
	ব • ল্ বে	ভো • মার্ •	না • • •	••• ••• • ম্

গ্রীক-নাট্যের অভিনয় ।

গ্রীকের ধর্মে এবং গ্রীকের জীবনে কেবল অভিব্যক্তি বলিয়া কানিত ; পৃথিবীর সর্বত্রই সৌন্দর্যের উপাসনা, কেবল মানবের সে এক দিব্যশৃঙ্খলার সমন্বয় দেখিত । আবাহন । বিশ্বকে গ্রীসবাসী অসীম স্তম্ভেরের প্রকৃতিকে সে মাহুৎসবইতে পৃথক্ বলিয়া ডাখিত ।

না; প্রকৃতির অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়া প্রকৃতিকে আপনায় করিয়া লইত। নদী ও পর্বত, মেঘ ও নক্ষত্র—সকলের মধ্যেই সে নিজের অস্তিত্ব প্রতিফলিত দেখিত। নিজ-জগতের অঁকুট কাহিনী দিয়া নিসর্গ-সুন্দরীকে সে এক অপক্লপ শোভার বিভূষিত করিত। গ্রীসের অধিবাসী মিশরের নিরর্থক পোস্তলিক-তার উর্কে উঠিয়াছিল; তাহারা মানুষের জীবন, মানুষের ক্ষমতা এবং মানুষের সৌকুম্যাকেই পূজা করিত। মানুষকে তাহারা কেবলমাত্র পাশববৃত্তির সমষ্টি বলিয়া জানিত না; মানুষী শোভার মধ্যে কোন ব্যাগ্রলালসার চিহ্ন দেখিত না; সৌন্দর্যের মধ্যে যে ম্লিখ কমনীয়তা আছে, যে ভেঙ্কোময়, দাপ্তরময়, অজ্ঞেয়, অকণিত, রহস্যময় মাধুর্য্য আছে, তাহাই তাহারা প্রাণ তরিত্তা উপভোগ করিত, তাহাই তাহারা দিবসরাত্র আরাধনা করিত; বাহ্যের কুহকিনী শক্তিকে অতিক্রম করিয়া তাহার অন্তনিহিত দেবতাকে পূজা করিত। সীমার মধ্যে তাহারা সীমাকে দেখিত না; সীমার পার্থিকে লঙ্ঘন করিয়া এক অনন্ত সুন্দরের সন্ধান লইত; প্রস্তরনির্মিত দেবমূর্তিকে শুধু প্রাণহীন জড়পদার্থ বলিত না; তাহার মধ্যে এক চিরস্থায়ী সত্যের অমুভব করিত। দেবরাজ জিউসের (Jeus) মূর্তি সেই অসীমের মূর্তি; সূর্য্যদেব অ্যাপোলোর (Apollo) মূর্তি সেই অসীমের মূর্তি; সুরাদেবতা ডায়োনিসসের (Dionysus) মূর্তি সেই অসীমের মূর্তি। সকলেই তাহাদের কাছে এক অনন্তের ছায়া। জীবনে মরণে তাহারা সেই ছায়ারই অনুসরণ করিত। কাব্য কিম্বা গিমে তাহারা কেবল সেই অজ্ঞাত

সত্যকেই অন্বেষণ করিত। তাই গ্রীকের নাট্য ও গ্রীকের শিল্প এইরা সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ আজ এত গৌরবান্বিত। তাই প্রাচীন গ্রীকের নাম শুনিলে, স্বতঃই জন্ম স্পন্দিত হয়; তাই গ্রীকনাট্যের কথা শুনিলে প্রাণের ভিতর কি এক সূপ্ত আকাজকা জাগিয়া উঠে।

২। প্রাচীন গ্রীকদের মত ধর্ম্মপ্রাণ জাতি, বোধ হয়, বর্ত্তমান সভ্যজগতে মিলিবে না। বিশেষতঃ, তাহাদের নাট্যের সহিত তাহাদের ধর্ম্মের যে কি নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল, তাহা আধুনিক জড়বাদীর পক্ষে কল্পনা করাই শূন্য। গ্রীকনাট্যের উৎপত্তিও দেবজ্ঞান, নিবৃত্তিও দেবজ্ঞান। দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্তই তাহারা নাটকের সৃষ্টি করিয়াছিল; দেবতার প্রীতিবিধানের জন্তই তাহারা অভিনয় করিত। ডায়োনিসসের পূজাকে অবলম্বন করিয়াই নাটকের আবির্ভাব হইয়াছিল; ডায়োনিসসের পূজাকে অবলম্বন করিয়াই সে বাচিয়া ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ গ্রীক অভিনয়কে ধর্ম্ম চর্চাতে মূরে নিঃক্ষেপ করে নাই; অভিনয়কে ধর্ম্মের নূতন-মুষ্টিমাত্র বলিয়া জানিত। তাই গ্রীকের নাট্যশালায় কখন ধর্ম্মকোলাহল চাইত না; তাই নাট্যশালায় ভিতরে কেহ বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত করিলে, তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইত।

৩। ধর্ম্মের সহিত নাট্যের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া, অভিনয়ের যাবতীয় বন্দোবস্ত শাসন-কর্ত্তৃপক্ষকে করিতে হইত। প্রজার সক্ষাঙ্গীন মঙ্গল যদি শাসনের উদ্দেশ্য হয়, তবে একাধারে বাচা, ধর্ম্ম, কাব্য এবং কলা, এই তিনটাকেই সরল করিয়া লোকচক্ষুর সমক্ষে উপস্থাপিত করে, সে-সময়ে যে শাসনকর্ত্তার

পক্ষে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সেইজন্য অভিনয়-প্রদর্শন কিংবা নাটক-নির্দাচন-সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত দেশের কর্তৃপক্ষকে করিতে হইত। কিন্তু অভিনয়ের জন্ত যাহা কিছু ব্যয়ের আবশ্যক হইত, তাহা সরকার নিজে বহন করিত না; গ্রীকদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত ধনী এবং সম্ভ্রান্ত, তাহাদেরই একজন স্বেচ্ছায় সে-ভার বহন করিতেন। ইচ্ছা করিয়া গ্রীকেরা কেন যে এরূপ অর্থব্যয় করিতে চাহিত, তাহা আমাদের নিকট বিষয়কর বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু কাব্য ও কলাকে তাহারা অর্থ হইতেও উচ্চ আসন দিতে জানিত। সুতরাং এরূপ পদ্ধতিতে অর্থব্যয় করিবার জন্ত তাহারা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত।

৪। যখন অভিনয়ের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া যাইত, তখন নিয়মিত দিনে এবং নিয়মিত সময়ে ডায়োনিসসের শোভাযাত্রা বাহির হইত। পরদিন সুরাদেবের সম্মুখে নানারূপ নৃত্যগীত চলিত; পরে তিন চারি দিন, বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাটকের অভিনয় হইত। যখনই গ্রীসে ডায়োনিসসের পূজা হইত, তখনই এইভাবে নাট্যাঙ্গি চলিত। এই উৎসব সচরাচর গ্রীসের প্রধাননগরী এথেন্সেই হইত; তবে কখন কখন অগ্গাথ নগরীতে ও গ্রামাঞ্চলে, ঐ সকল নাটকেরই পুনরভিনয় হইত।

৫। সারাবৎসরের মধ্যে এথেন্সে কেবল তিনবার নাট্যাঙ্গি হইত। তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্য- এবং সমারোহ-হিসাবে সিটি ডায়োনিসিয়াই (City Dionysia) শীর্ষস্থান

অধিকার করিয়াছিল, তাহার পরেই লেনিয়া (Lenaea)। লেনিয়াতে যেমন মিলনান্ত নাটকের প্রাধান্য ছিল, সিটি ডায়োনিসিয়ায় তেমনি বিয়োগান্ত-নাটকের প্রাধান্য ছিল। উভয় প্রকার নাটকেই, অবশ্য, ডায়োনিসসের স্তোত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু পূর্বে হইতেই তাহাদের মধ্যে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা কোন কালেই লুপ্ত হইবার নহে। মিলনান্ত-নাটকে কেবল আত্মাদের চিত্র, বিয়োগান্ত নাটকে বিষাদের চিত্র। বিয়োগান্ত-নাটকের পর মিলনান্তনাটক, যেন শীতের পর বসন্তের সমাগন। তাই লেনিয়ার হাসি-তামসা বসন্তের অপেক্ষা শীতেরই ভাল লাগিত; এবং সেইজন্যই সিটি ডায়োনিসিয়ার বিরাত, গান্ধাধার উৎসব বসন্তকালেই আরও প্রীতিকর বোধ হইত।

৬। যদিও মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটক একই সুরাদেবের একই স্তোত্র হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল, তথাপি উভয়ের উন্নতি অবনতির জন্ত দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতি দায়ী। গ্রীকেরা সাধারণতঃ যে তিনটি জাতিতে বিভক্ত, তাহার মধ্যে অ্যোনিয়ন (যবন, Ionian) জাতিই সমধিক কলামুরাগী ছিল, এবং তাহাদের দ্বারাই শোকান্ত নাটোর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রহসন কিংবা মিলনান্ত-নাটকের উন্নতি ডোরিয়ানদের (Dorian) হস্তেই হইয়াছিল, এবং তাহারা ই প্রথমে হাস্যকর স্তোত্রের মধ্যে কথোপকথনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

৭। যখন নাটকের আদৌ সৃষ্টি হয় নাই, যখন নাটকের পরিবর্তে কেবল নৃত্যগীতের উৎসব হইত, তখন বিয়োগান্ত নাটকের নীম

ছিল ছাগসঙ্গীত, আর মিলনাস্ত-নাটকের নাম ছিল গ্রাম্য সঙ্গীত। উভয় সঙ্গীতেরই বিষয় এক; উভয় সঙ্গীতেই দেবচরিত্র বর্ণিত হইত। এই উভয় সঙ্গীতের পূর্বে দেবমূর্তির সম্মুখে ছাগবলি হইত; উভয় সঙ্গীতেরই গায়ক প্রধান, ডায়োনিসসের অনুচর, কিংবা স্বয়ং ডায়োনিসস সাজিয়া, অস্ত্রাস্ত্র গায়কদের সহিত সুরাদেবের কার্যকলাপ-সম্বন্ধে কথাবাত্তা করিতেন। কিন্তু ছাগসঙ্গীতে দেবতার এক অনিন্দ্যশূন্য গভীর চিত্র অঙ্কিত হইত; গ্রাম্য সঙ্গীতে সুরাদেবকে একজন প্রফুল্লচিত্ত রসিকপুরুষের মত চিত্রিত করা হইত। ছাগসঙ্গীতের পরিণতি বিষাদ-গাভীঘো; গ্রাম্যসঙ্গীতের পরিণতি হাস্য-কৌতুক।

৮। লেনিয়ায় উৎসবে কেবল হাসি তামসা, মিটি ডায়োনিসস্‌র উৎসবে শোক-মালিন্য। লেনিয়ায় উৎসব মাঘের দ্বাদশ ণাতে; মিটি ডায়োনিসস্‌র উৎসব মধুস্কতুর মধুমাसे। লেনিয়ায় উৎসব দেখিতে বিদেশ হইতে কেহই আসিত না, একা এথেন্সবাসী নারবে সে উৎসবকাণ্ড সমাধা করিত। সেইজন্য রসিক কবি এরিস্টোফেনিস্ একবার বলিয়াছিলেন, “এখন আমি যত হচ্ছি এথেন্সকে গুলি দিতে পারি; তাহাতে বিদেশী থাকের কাছে এথেন্সের নিন্দা পড়িবে না,—আমাদের অস্ত্রাস্ত্র জাতির কাছে এথেন্সের সম্মান কমিয়া যাইবে না।” ণাতের পর যখন সমুদ্রের ঢুফান মন্দীভূত হইত, মলয়ানিগের শিথ্ব হিম্মোনে ঝারিধির ক্ষুচিহ্ন নম্র ও শান্তভাবে দারণ করিত, তখন মিটি ডায়োনিসস্‌র বিপুল আয়োজন দেখিবার জন্য সমুদ্রবেষ্টিত গ্রীসের দূরদূরান্তরভাগ হইতে অসংখ্য লোক আসিয়া

জনকোলাহলে এথেন্সকে পূর্ণ করিয়া ফেলিত। তখন করদ-রাজা হইতে রাজদূতগণ কর দিতে আসিত, তখন বিদেশ হইতে রাজদূতেরা তাহাদের রাজকীয় কার্য্য করিতে আসিত। কয়েক দিনের জন্য এথেন্স কি এক অশুভপূর্ণ গরিমায় ভারীয়া উঠিত। গ্রীসের অপর সকল গ্রাম, নগর প্রায় শূন্য পড়িয়া রাহিয়াছে; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অভিনয় দেখিবার জন্য এক এথেন্সের পানে ছুটিয়া চালায়াছে। সারা গ্রীস্ নিস্তন্ধ নিব্বন্ম! সকলেই উৎসবে গিয়াছে! যাহারা ভাঙা বাশতঃ প্রস্থে বাক্য হইয়াছে, তাহারা বিষমভাবে কষ্টটা দিন কাটাওয়া দিচ্ছে! গ্রীসেব ওদানীন্তন অবস্থার কথা মনে কাঁপলে রবাক্স নাথের কয়েকটা ছত্র স্বতঃই মনে পড়িয়া যায় :—

‘বয় এখনও হয় নাহি শেষ,

এসেছে চৈত্র সংখ্যা!

বাতাস হয়েছে উত্তলা আকুল,

পথ-ওকশাথে দরেছে মুকুল,

রাজার কাননে ফুটেছে বকুল,

পাকল, রজনীগন্ধা!

অভিভূত হতে আসিছে পবনে

বাণীর মদির মল্ল।

জনহীন পুরা, পূর্ববাসী সবে

গেছে মদুবনে তুল উৎসবে,

শূন্য নগরী নিরাশ নারবে

চাসিছে পূর্ণচন্দ্র!’

৯। নাটক যখন সঙ্গীতের আকারে প্রকাশিত ছিল, তখন নাটক দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগ, সুরাদেবের স্তোত্র; আর একভাগ—এবং সে অতি সামান্য—দেবচরিত্র-সম্বন্ধে গায়কবৃন্দের মধ্যে কথোপকথন।

কথোপকথন হইতে নাটকের উৎপত্তি এবং স্তোত্র হইতে কোরাসের (chorus) উৎপত্তি। কোরাস বলিতে এখন আমরা যাঁহা বুদ্ধি, গ্রীক-নাটোর কোরাস্ সেরূপ ছিল না। আধুনিক নাটকে যেমন দুইটি অঙ্কের মধ্যে একাতান-বাদন হয়, অথবা অভিনয়ের মধ্যে নৃত্যগীত হয়, গ্রীক কোরাস্ বলিতে সেইরূপ একসঙ্গে নৃত্যগীত এবং বঙ্গীবাদন বুঝায়। কোরাস্ গায়কের কার্য যেন দর্শকের কার্য। তাহার সহিত প্রকৃত অভিনয়ের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না; তবে গায়কবৃন্দের সহিত অভিনেতার কথোপকথন চলিতে পারিত, এবং তাহারা রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিত। সাধারণতঃ তাহারা অভিনয়ের প্রথম হইতেই সভাস্থলে উপস্থিত থাকিত, এবং আসিবার সময় গান করিতে করিতে আসিত; কিন্তু কখন কখন অভিনয়ের মধ্যে, কোন গান না করিয়াও আসিত। মাইসিনিরাজ যোগামেমেনের ছহিতা ইলেক্ট্রা যখন তাহার মাতার অসম্মতবাহারে দুঃখিত হইয়া আর্ন্তনাদ করিতেছিলেন, তখন ইলেক্ট্রার সখীবৃন্দ কোন গান না করিয়াই আবির্ভূত হইয়াছিল।

১০। গায়কবৃন্দ যেন দর্শকমণ্ডলীর প্রতিনিধি, এইভাবে কথা বলিত ও গান করিত। দর্শকের হৃদয় যেমন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দুঃখে বিগলিত হয়, গায়কবৃন্দও তেমনি তাহার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিত এবং সেইভাবে কথা বলিত। দর্শক যেমন কোমনাটকীয় উপাখ্যানের গূঢ়ার্থ বুঝিতে গেলে তাহার সাধারণ বুদ্ধিতে যাঁহা বুঝে তাহাই বুদ্ধিত, গায়কবৃন্দও তেমনি সাধারণ মনুষ্যোচিত মতামত প্রকাশ করিয়া ঘটনাবলীর বাস্তবতা-

বাতকে আরও সরল করিয়া দিত। তাহা হইতেই উপাখ্যান-সম্বন্ধে দর্শকের মনে যে ধারণা জন্মিত, তাহা আরও পরিষ্কৃত এবং বদ্ধমূল হইয়া যাইত। আধুনিক বিলাতী অভিনয়ে যেমন গাঢ় করুণ রসের পূরে নিরর্থক হাস্যরসের অবতারণা করা হয়, গ্রীকদের সূক্ষ্মবোধের নিকটে তাহা কেমন অপ্রীতিকর লাগিত। যে গভীর মুচ্ছনায় তাহাদের প্রাণ বাকুল হইয়া উঠিত, তাহাতেই তাহারা একেবারে মত্ত থাকিতে চাহিত। তাই তাহাদের বিচলিত হৃদয়কে গীতিকবিতার মধুর আত্মকাহিনীময় ভাবের দ্বারা শান্ত করিতে তাহারা ভালবাসিত।

১১। গায়কবৃন্দ যে স্থলে আসিয়া দাঁড়াইত, সে স্থলটা দেখিতে বৃত্তাকার। তাহার তিন দিকে দর্শকমণ্ডলীর বসিবার স্থান, একদিকে রঙ্গমঞ্চ। বিখ্যাত পৌরাণিক (classical) অভিনয়-প্রণেতা স্ত্রু উইলিয়াম শ্মিথ্ বলেন, “সম্ভবতঃ রোমান আক্রমণের পূর্বে গ্রীসে কোন রঙ্গমঞ্চ ছিল না।” কিন্তু আধুনিক অনুসন্ধানের দ্বারা যাঁহা প্রমাণ হইয়াছে, তাহাতে এক্ষণে মত নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অধ্যাপক হে (Haigh) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, একাইল-সের সময়ে কাণ্টিনিয়ও রঙ্গমঞ্চ ব্যবহৃত হইত। সে রঙ্গমঞ্চের উপরে কোন আবরণ ছিল না, এবং কয়েকখানি মাত্র দৃশ্যপট ছিল। প্রোতুবর্গের বসিবার স্থান-সকল পরস্পর এত নিকটে সংলগ্ন থাকিত, তাহাতে অতি অল্পপরিমাণ স্থানের ভিতরে বহুলোক বসিতে পারিত এবং একটু স্থানও অনর্থক পড়িয়া থাকিত না। ন্যায়ালয়ের উপরে কোম

আবরণ ছিল না বলিয়াই এইরূপ ঘন সম্মিলন সম্ভব হইত। সম্প্রতি গনিয়া দেখা গিয়াছে, না-কি এথেন্সের নাট্যশালায় প্রায় সমুদয় সহস্র (১৭০০০) লোক ধরিতে পারিত। এসিডরস এবং মেগালোপলিসের নাট্যশালাতেও প্রায় অত জন লোক ধরিত।

১২। এই বিশাল জনসংখ্যার প্রত্যেকেই কেমন করিয়া গায়ক ও অভিনেতার কথা শুনিতে পাইত, তাহা আমাদের নিকট বড় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গ্রীকরা এ-সম্বন্ধে খুব যত্নবান ছিল। যে সকল গায়ক ও অভিনেতার কর্তব্য কিছুমাত্র তুর্দল ছিল, তাহাদিগকে তাহারা অভিনয় করিতে দিত না। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের নাট্যশালা কোন পর্ব্বতের পাদমূলে স্থাপন করিত, এবং পর্ব্বতগাত্রে শ্রোতৃবর্গের বসিবার স্থান নির্মাণ করিয়া দিত। তৃতীয়তঃ রঙ্গমঞ্চ কাঙ্কিন্মিত হওয়ায় শব্দপ্রসারের আরও সুবিধা হইত। মহাহুতব রয়ালেম্বাণ্ডার যখন বস্টলোনের (bronze) দ্বারা একটি রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তখন অপর-লোকেরা তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, তাহাতে শ্রবণবিষয়ে বিশেষ দোষ ঘটবে। কেহ কেহ বলেন যে দর্শকদিগের বসিবার স্থানে এক একটি কুলুঙ্গী করিয়া তাহাতে শব্দকলস রাখিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু আত্মকাল এই মত তত সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।

১৩। গ্রীক রঙ্গমঞ্চের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার বড় বিসদৃশ রকমের ছিল। আধুনিক রঙ্গমঞ্চের মত উহা এত প্রশস্ত ছিল না; হুতরাং আধুনিক অভিনয়ের মত উহাতে এত প্রকার দৃষ্টকোণ দেখান সম্ভব হইত না। কেবল

রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতের পাঁচিলে একখানি দৃষ্ট-পট আঁকা থাকিত; তাহাই এখনকার যনিকার কাগজ কবিত। যখন গুর গুর করে কটি অভিনয় পড়ণ করা হইত, তখন যাহাতে পটোকে পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে একজন একখানি চিত্র আঁকিত থাকিত। কিন্তু ক্রিকে একখানি দৃষ্টপট কয়েকখানি নাটকের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব, তাহা আমাদের পক্ষে সহসা বুঝিতে পারা য়কর। প্রকৃতপক্ষে ইহার কারণ ছিল এই যে, গ্রীক কবি সাধারণতঃ একটি মূল ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া একসঙ্গে তিন চারিখানি নাটক লিখিতেন, এবং যদিও এষ্ট প্রথা দিন দিন লোপ পাইতেছিল, তথাপি গ্রীকদের কয়েকখানি নাটক একত্র তুলনা করিলে সহজেই তাহাদের ভিতর একটি মূলসত্য ধরিতে পারা যায়। গ্রীকদের “ওরেস্টিয়া” (Orestia) কথা মনে করিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। “ওরেস্টিয়া” তিন ভাগে বিভক্ত;—“রাগা-মেঘন” Agamemnon) যুদ্ধপ্রত্যাগত বীরের পত্নীকঙ্ক মৃৎসংহত্যা; “ক্লফরি”তে (Chephori) পুত্রের দ্বারা পতিবাহিনীর উপর প্রতিশোধ; “ইউমিনাইডিস” মাতৃ-হত্যার অত্মশোচনা। ওর্কিস, এমনও অনেক নাটক ছিল, যাহা ভিন্ন ভিন্ন কবির রচিত হইলেও, একটি মূলসত্যকে অবলম্বন করিয়া লিখিত হইত।

১৪। গ্রীক অভিনয়ে দৃষ্ট ও যেমন অল্প ছিল, নট-নটীর সংখ্যাও তেমন অল্প ছিল। গ্রীকনাটকে সচরাচর একসঙ্গে তিনজনের অধিক অভিনেতার আবির্ভাব হইত না। তাহাতে অভিনয় কখন কখন বড় অপ্রাকৃত হইয়া পড়িত।

ইউরাইপিডিসের “ওরেস্টিসে” যখন রাক-প্রসাধের উপর ওরেস্টিস্ হার্মিরোনিকে * মারিয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছিল আর ওরেস্টিসের বন্ধু পাইলেডিস্ তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তখন হার্মিরোনির পিতা মেনেলিওসের করুণ ক্রন্দনেও পাইলেডিস্ উত্তর দেয় নাই; তখন পাইলেডিসের হইয়া ওরেস্টিস্ উত্তর দিয়াছিল। পাইলেডিসের এই নির্কাণ্ড-তাৎ নিতান্তই বিসদৃশ, নিতান্ত অস্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি ইহাতে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, আধুনিক অভিনয়ের মত কোন বিশিষ্ট কথোপকথনের অবসর না থাকায়, নাটকীয় অর্থ অতীব সরল হইয়া যাইত; এবং দর্শকের কাণ্ড একজনের দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার, অভিনয়ের আবেগপূর্ণ গতি কখন মল্লীভূত হইতে পারিত না। সে-জন্ত দর্শকের পক্ষে সঙ্গীত কিংবা কথোপকথনের মধ্য অনুধাবন করা খুব সহজ হইয়া পড়িত। দ্বিতীয়তঃ তিনজন মাত্র সুনিপুণ ও সুকণ্ঠ অভিনেতা অতি অল্প আয়াসেই পাওয়া যাইতে পারিত বলিয়া, অভিনয় প্রায়ই সর্বোৎকৃষ্ট

* যে মোহিনী রমণীর সৌন্দর্য্য-অনলে সর্বত্র ট্রান্সের ভরে পরিণত হইয়াছিল, সেই লোকললারূপী স্পার্টারগি হেলেনের একমাত্র কন্যা রূপবতী হার্মিরোনি। তাহার পিতা মেনেলিওস্ মাইসিনিরাজপুত্র ওরেস্টিসের সহিত তাহার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করেন। ওরেস্টিসের পিতা মেনেলিওসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তাহার দাতা হেলেনের সহোদরা ভ্রাতী। কিন্তু তথাপি এ-সঙ্কল্প এখনে ব্যর্থ হইয়াছিল। টরের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া মেনেলিওস্ এনিড্রীকীর হ্যাকলিসের পুত্র পাইলেডিসের সহিত হার্মিরোনির বিবাহ দিলেন। তখন যুদ্ধ ওরেস্টিস্ নিরপ্টলেবস্কে হত্যা করিয়া ই মোভলা হার্মিরোনিকে পত্নীরূপে লাভ করিলেন।

হইত; এখনকার মত নাট্যের সফলতা পৌণ-চরিত্রের অভিনয়ের উপর নির্ভর করিত না।

১৫। কিন্তু কেবল এই তিনটি মুখ্য অভিনেতা ব্যতীত, প্রায়ই দু’একটি অতিরিক্ত অভিনেতার প্রয়োজন হইত। অবশ্য তাহারা কয়েকটি কথা বলিয়াই নিষ্কৃতি পাইত, অথবা হয়ত মোটেই তাহাদের কিছু বলিতে হইত না। কারণ, যখন প্রধান নটের পূর্ক হইতে অভিনয়ে ব্যাপ্ত থাকিত, কিংবা বালক-বালিকা-বেশে অভিনয় করার আবশ্যক হইত, তখনই একরূপ নির্কাণ্ড বা অল্পভূমিক অভিনেতার অবির্ভাব হইত। ইউরাইপিডিস্ কিংবা সফক্লিসের “ইলেক্ট্রা” পাইলেডিস্-চরিত্র একবারে মূক; “ইডিপস্ কলোনিসেস”র একটা দৃশ্যে থিব্‌স্‌রাজ ইডিপস্-কন্যা ইস্মিনি নিঃশব্দ;—কারণ, এতরূপ যে নট ঐ চরিত্রের অভিনয় করিয়া আসিতেছিল, সে এখন অল্পরূপ অভিনয়ে ব্যস্ত ছিল। “ওরেস্টিসে”র শেষ দৃশ্রে আধুনিক নাটকের মত বাবতীয় চরিত্রের সমাবেশ আছে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে ইলেক্ট্রা, পাইলেডিস্, হেলেন এবং হার্মিরোনি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। এইরূপ মূক অভিনেতা নিয়োগের সুবর্ণ সুযোগ আসিত, যখন সম্ভান এবং মাতাপিতার মধ্যে কারুণ্যপূর্ণ দৃশ্রের অবতারণা হইত।

ইউরাইপিডিসের “মিডিয়া” (Medea) উহার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। মিডিয়া তাহার স্বামীর অস্ত্র জাতিকুলমান বিসর্জন করিয়াছে, স্বামীর উদ্দেশ্যসিদ্ধি এবং পৌরব বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, আপনার ভাইকে হত্যা করিয়া স্বামীর প্রাণ বাঁচাইয়াছে, কিন্তু সেই স্বামী জেসন্ (Jason) আজ পরীক্ষা

একান্ত অমুরোধ অবজ্ঞা করিয়া, তাহার নিঃস্বার্থ উত্তেজিত হৃদয় আশ্রয় হইয়া গিয়াছে; যুগ ও পতি-প্রেমকে তুচ্ছ করিয়া, রূপের কুহকে ভুলিয়া বিহবলচিত্তে সে কত অমুরোচনা প্রকাশ অপার রমণীকে বিবাহ করিতে চলিয়াছে। করিতেছে। এমন অধুর মনুষ্যসঙ্গী দৃষ্টে যদি ক্রোধে হুঃখে মিডিয়া তাহার অকৃতজ্ঞ, অপ্রেমিক স্বামীর শেষ চিহ্ন দুইটিকে বিনষ্ট করিতে চাহিত মক বালাক চারিদেব আবির্ভাব না হইত। তাহা হইলে সে দৃষ্ট যে একবারে বিকলাঙ্গ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। কিংবা তাহার শিশুপুত্র-হত্যা থাকিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

লিপি

আপনা কৃষিতে নাতি সময়

আপনে এমন চাড়ায়েছি :

চিন্তা-বিহারী মধু-মলয়

দীর্ঘ-নিশ্বাসে তাড়ায়োছি !

না আসে কবিতা উষার সাথে

কিংবা মধুর চন্দ্র-রাতে,

হেলিয়া তাহার জকুটিপাতে

নীরস গগনে দাড়ায়েছি !

প্রভাত চর্চতে দিনের শেষ

খাটিব কখনো বলিব না—

‘এস রে কাব্য-সুখনিমেহ !’

প্রেমতে মরম ছলিব না !

জীবন শুধু ত আশুন, বাগে—

কেবলি শোণিত-আছাত মাগে !

ঢালিব রক্ত বতটা লাগে !

‘আপনি আশুন বাড়ায়েছি !

ঐত্থেচ্ছনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

লীনার শিক্ষা

(পুনঃপ্রকাশিতের পর)

(১৫)

রাজি সাড়ে বারোটা পর্যান্ত অনেক রকমে চেষ্টা করিয়া কিছুতে লীনাকে ঘুম পাড়াইতে না পরিয়া পার্সন শেষে মাদক-বটিক-ঔষধ-প্রয়োগে লীনাকে নিদ্রিত করিলেন। তারপর আত্মাদের সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিয়া ঘরে

ঘরে বাহিরে আসিয়া, তিনি নিজের কুঠিতে ফিরিলেন।

প্রার্থনা সারিয়া, শয়ন করিয়া পার্সন লীনার কথাটী ভাবিতে লাগিলেন। লীনার সেই বহুলা-কাতর, স্তম্ভিত শব্দ দৃষ্টি ও অনাড়

নিজের সুখের চেতনাটা যত বার পার্সনের মনে পড়িতে লাগিল, পার্সন তত ব্যস্তই সন্নিবেশে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেন। এ কি সবই ভাগ্যের খেলা?.....সবই ভগবানের ইচ্ছা?.....হইতে পারে! শক্তিশালী দাস্তিদের উদ্দেশ্য-উচ্ছল চর্তুদ্বির অত্যাচার,—বাহা অপর সাধারণ মানুষের বিবেকে তীব্র-অধাত দান করে, ব্রাহ্মবুদ্ধিকে প্রতিকার-সুখের উগ্র-ভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে,—বাচাতে মানুষ দৃষ্ট-অন্তরকে ভ্রাতার শাসনে শৃঙ্খলিত, সংযত করিয়া, একের স্বৈচ্ছাচার স্পর্ধা ধর্ম করিয়া দেশের মঙ্গল-সাধনে সচেষ্ট হইয়া ওঠে,—মানুষের সেই জীবন্ত বুদ্ধি, জাগ্রৎ বিবেককে ভগবানের ইচ্ছার দোহাট দিয়া ঘুম পড়ানি মস্ত্রে ঘুম পড়াইয়া নিশ্চিন্ত সুস্থই হওয়া যাক!—‘সবই ভাগ্যের খেলা!’—এবং তার উপর আর একটু পরিষ্কার সাফ-ইয়ের রসনা লাগাইয়া দেওয়া গোক, যে, ‘মানুষের জন্ম-মৃত্যুর উপর যেমন মানুষের কোন হাত নাই, তেমনি জীবন্ত মানুষের জীবনে, স্বৈচ্ছার সজ্ঞানে অসুস্থিত কোন সংকল্প মঙ্গলকাব, সুচিন্তা, কচিন্তা, সুবাকা কুবাকা,—কাকুর উপরই মানুষের কোন নীতিধর্ম-মূলক ইচ্ছাশক্তির কোন প্রভাব চলে না, সবই পৃথিবীতে ‘ভাগ্যবশে’ চলিতেছে!... এমন কি পিকক-নামক মানুষটির একান্ত কথক ও নিতান্ত প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, শিশু-পুত্র যখন মায়ের বুকে ছাড়া হইয়া, মেহ-বিকলা মার প্রাণকে পীড়িত করে,—তার পর প্রাণসঙ্কট রোগে যুগ্ম অবস্থার,—শিশুস্বাস্থ্যের ক্ষতি পরিচালক চর্ভাগ্য অসহায়ের মত বলিতে বসে,—আর দূরের ব্যবধানে আটক থাকিয়া

তার ক্রম-চর্তুল মা যখন সেই খবর পাইয়া সাংঘাতিক যন্ত্রণার জীবন্ত হইয়া পড়ে, তখন পিকক সে চঃখের ঝড়ট এড়াইয়া গণিকালয়ে স্ত্রী ও স্তম্ভরী লইয়া স্বর্ণগ্রন্থ-ভোগটা যে অবশ্যে করিতে পারেন,—সেটাও ‘ভাগ্য বশে’ প্রাপ্ত সৌভাগ্য-যোগ ছাড়া আর কি হইতে পারে? স্ত্রীর ভাগ্যে নাই, কাষেই সে স্বর্ণগ্রন্থ। ভোগের অধিকারে বঞ্চিতা, আর পুত্রের ভাগ্যে নাই, কাষেই সে পিতার কাছে স্নেহও পাইল না, মায়ের স্নেহ পাইলে কি হয়, ভোগ করিবার সুযোগ ঘটিল না!—এর জন্য পিকক দারী নয়, দারী ঐ চর্ভাগ্যদের চর্ভাগ্য! পিককের কু-ইচ্ছার আধিপত্য বলিয়াই, উচ্ছলতা, অসংযম, অবিবেচনা, অত্যাচার বলিয়া কোন অভিযোগ উহার মাঝে টিকিতে পারে না,—প্রমাণ ‘ভাগ্য!’

পার্সনের আসন্ন তন্ত্রাটা হঠাৎ ধুক-ছাড়া। তীরের মত সবেগে শাকা খাইয়া ছুটিয়া পলাইল! উত্তেজিতভাবে পার্সন উঠিয়া বসিলেন,—সবই ভাগ্য? মিথ্যাকথা!—সম্পূর্ণ মিথ্যা! মানুষ চঃখ পায়, ভাগ্যের দোষে নয়, নিজের মূর্থতার দোষে! সাধারণ জুরাচার পরকে ঠকার, কিন্তু অন্ধ অদৃষ্টবাদী হল নিজকে ঠকাইয়া, নিজের সর্বনাশ করে! লীনা যদি এতটা ভালমানুষী দেখাইবার লোভ না রাখিত, তবে কখনই পিককের এতটা বদমাইসি করিবার সাহস হইত না! অত্যাচারীর কখনো হলের অভাব হয় না, সে ভো সর্বজন-বিদিত সত্য! কিন্তু হতভাগ্য অত্যাচার-পীড়িতের দল, বতই নিরীহ মেঘের মত মাথা হেঁট করিয়া সবিনয়ে স্রবৃষ্টির দোহাই দিয়া, বতই চোখের তল খরচ ককক,

কি ফল পাইবে তারা? ঐ যেমন ফুল পাইতেছে হতভাগিনী লীনাটা! —

আকস্মিক ভ্রাতাহত উচ্চ মস্তিষ্কের মধ্যে তেজস্বী চিন্তাশ্রোত বিদ্রোহেণে ছুটিতে আরম্ভ করিল! পার্সন সজোরে মাথা বাড়া দিয়া প্রবল মন্মথবেগ সংবত করিলেন। না, আজ রাজে মাথা গরম করিয়া ঘুম নষ্ট করিলে, কাল নিশ্চয় শরীর-মন লইয়া হরগু খাটুনার থাকি সামুলানো যাইবে না। পিককের উপর যতই রাগ করা যাক, লীনার তাতে কোন সাহায্যই হইবে না, সেটা মনে রাখা চাই অবশ্যই।

মশারী খুলিয়া পার্সন বাহিরে আসিয়া ঘাড় ও কপাল ধুইয়া ফেলিলেন। ব্রাকেটের উপর হইতে এলার্মিং ঘড়ি পাড়িয়া ভোরে সাড়ে চারটার ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্ত দম লাগাইয়া দিয়া, তাহা শয্যা-শিরেরে রাখিয়া দিলেন। তারপর শান্তভাবে ঘরের মেঝেতে বার-কতক পারচারি করিয়া, মাথাটা ঠাণ্ডা করিয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং শীঘ্রই ঘুমাইলেন।

ঘড়ির শব্দে ঠিক সাড়ে চারটার ঘুম ভাঙ্গিয়া শয্যাভাগ করিয়া পার্সন তাড়াতাড়ি কাজে লাগিলেন। আধ-ঘণ্টার মধ্যে প্রান্তরাশ সমাপ্ত করিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক করিয়া নিজের দুই-চারিদিন অমুপস্থিতির জন্ত, বাহাকে বাহা বলিতে হইবে, দ্রুত-হস্তে তাহা লিখিয়া রাখিয়া, চাকরকে ডাকিয়া বখোপসূক্ত উপদেশ দিয়া পার্সন বাহির হইলেন।

তখনও জোরের আলো তাল করিয়া কোটোনাই, কাছাকাছি কোন বাড়ীর লোকজন কেহই জাগে নাই। শীতের আবহাওয়া তোহেজ ঠাণ্ডা হাওয়া ধীরে ধীরে বহিতেছিল ;

মাছে গাছে পাখীগুলি সেই-সেই গুহ-ঘোঁষে চাঞ্চিয়া ডানা কাড়া দিয়া গান ধরিতে শুরু করিয়াছে। পার্সন চারিদিকে চাঞ্চিয়া চলিতে চলিতে তাবিলেন, এই ক্ষণের প্রভাত আজ লীনার জন্ত কি দিনই বহিয়া যানিবে, কে জানে!

হাতার ফটকের জাবি মালীটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ফটক তখনও ডেজানো ছিল। পার্সন নিশ্চয়ে ফটক টানিয়া একটু ফাক করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথম-মেহ টেলিগ্রাফ-আফসে গিয়া সংবাদ লইতে হইবে, যদি কোন টেলিগ্রাম আসিয়া থাকে। যদি এতটুকুও সুসংবাদ পাওয়া যায়, তবে লীনাকে সাহস দিবার একটা পথ হয় যে!

ফটকের পালে দেয়ালের গারে একটা খোজে বা পা তুলিয়া, হাঁটুর উপর কুণ্ডলীরের ভর রাখিয়া, সামনে বুকের দু'ভাতে মাথা ধরিয়া একটা লোক শুক-নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। ফটক খুলিয়া পার্সন বাহির হইলেন, শব্দটা তার কানে পৌছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু সে জ্ঞপ্তি করিল না; ঠিক যেমন আড়ষ্ট-নিবৃত্ত ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল।

এত ভাবে গমনরতা পার্সনের দৃষ্টি লোকটার উপর পড়িতেই তাত্ক্ষণিক তিনি পমকিয়া দাঁড়াইলেন! অজ্ঞাতেই তাহার কণ্ঠ হইতে দারুণ বিষম-ভরা সংশয়ের প্রশ্ন খনিজ হইয়া উঠিল,—“মিঃ পিকক্ না কি?”

লোকটা চমকিয়া মাথা তুলিয়া চাহিল।— পার্সন দেখিলেন, শুধু পোষাক-পরিচ্ছদে মাত্র নয়, মুখের পঠন এবং রঙে এ সারুয্যটাও পিককের মতই বটে! কিন্তু না—না, সেই

উক্ত দাস্তিক পিককের গর্জ-আলা-তরা উগ্র-দৃষ্টি এ চোখে তো নাই! এ মুখের ভাব.....? না এ কখনই নয়! এ মুখ যে পৃথিবীর কোন ভীত-বয়না-নিশীড়িত, একান্ত হতাশ মুহমান মহা-হতভাগ্যের মুখ! এ তো পিকক্ নয়!.....এই মর্শাস্তিক বেদনা-বাধিত বিবাদ করণ-দৃষ্টি!—ভুল ভুল! এ লোক কখনই পিকক্ হইতে পারেন না! এ ব্যক্তি যে-ই হউক, কিন্তু এ যে মাজুকের একান্তই দয়ার পাত্র!

বিশ্ব-বিচলিত পার্সনকে চমৎকৃত করিয়া লোকটা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া টুপি খুলিল। লজ্জায় নিঃশ্বাস টানিয়া ভয়-বিকল-কণ্ঠে সে বলিল, “মিস্ পার্সন, আপনি! হাঁ মাডাম, আমি আপনাদের পরিচিত পিকক্ই বটে! মাপ করবেন, আপনার পুরো নামটি, পার্সনস্-ই বোধ হচ্ছে, নয়?”

হাঁ তাই বটে! সংক্ষেপে ‘পার্সন’ বলিয়া ডাকা হইলেও পুরা নামটা তাঁহার ‘পার্সন’স্ই বটে! কিন্তু এ কি ভুল! পার্সন যে কিছুতেই তাঁহার পাইতেছেন না, যে, বাস্তবিকই এই লোকটা পিকক্। যে-ই লীনার স্বামী পিকক্! পার্সন অবাক্ হইয়া সেই উল্লাস বিহীন মুষ্টিটার পানে চাহিয়া রহিলেন,—সত্যি ইনি পিকক্ তো?

পিকক্ ফণিকের জন্ত নীরব রহিলেন; তারপর নিজের জিজ্ঞাস্ত প্রশ্নটার কথা ভুলিয়া দিয়া, দূর নিঃশব্দের পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া নিঃশব্দেই বলিলেন, “পৃথিবীতে একশ্রেণীর কাণ্ডজানহীন মূর্খ আছে, যারা কোন অতি-বড় এরোজনের অজুরোধে,—কোন নীতির কাছে, সত্যের কাছে এতটুকুও মাথা-

নোয়াইতে চায় না, কিন্তু তাদের একদিন সম্মুখেই বাড় ভেঙ্গে পড়তে হয়,—এই পৃথিবীর মূল্যের উপরেই জমড়ি ধরে লুটিয়ে পড়তে হয়, যেদিন ভগবানের হাত থেকে স্ত্রায়দণ্ড এসে সোজা তাদের মাথায় পড়ে!—

পিকক্ চোখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া মুহূর্তের জন্ত চুপ করিয়া কি ভাবিলেন; তারপর বয়নাভকণ্ঠে ঈষৎ বেগের সহিত বলিলেন, “আছে, আছে! ভগবানের স্মরণ বিচার বলে একটা জিনিস এ পৃথিবীতে আছেই! বড় বড় হৃদান্ত ক্ষমতাশীল অত্যাচারীই হোক—সে মণ্ডের কাছে কান্নার পরিচাল নাই!”

পার্সন ভীতকণ্ঠে ডাকিলেন, “মিস্ পিকক্—সুপ্রভাত!”

“সুপ্রভাত!”—বলিয়া পিকক্ অন্তমনস্ক ও বিকলভাবে পার্সনের হাতটা ছুইয়া, আবার পিছু হটিয়া দাঁড়াইলেন। পার্সন মুহূর্তের বলিলেন, “কুঠিতে চলুন, রাস্তায় আর কেন?”

অতিশয় সংযত-কঠিন স্বরই পিকক্ উত্তর দিলেন, “কুঠিতে? না, মাপ করুন। লীনার সামনে—আর নয়!”

পার্সন এতকালের পর এইবার নিজের অকস্মাৎ বিপর্যস্ত বুদ্ধিতাকে সংযত—স্থির করিবার প্রযোগ পাইলেন। পিককের মুখের দিকে চাহিয়া শাস্ত্রস্বরে বলিলেন, “আপনি এখন কোথা থেকে আসছেন? কখনহান থেকে?” প্রশ্নটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই পার্সনের দৃষ্টিতে ভীত-বয়না অলক্ষ্যে ফুটিয়া উঠিল!

সবেগে মাথা নাড়িয়া পিকক্ কঠিন-কণ্ঠে উত্তর দিলেন, “না, মোটেই না! লীনাকে অনেক রকমে কীদিয়েছি, অনেক জব

কল্পনার বুদ্ধি খাটিয়েছি, ভরসার অঙ্কুত অঙ্কুত বুদ্ধি নিয়ে, মনুষ্য-নাশকর, বৃণাহ-উপারে তার ওপর নিষ্ফল আক্রোশ প্রকাশ করতে চেয়েছি! কি ভয়ানক বক্সর হিংসাই তার উপর জেগেছিল, পার্সনস! তাকে ঠিকিয়ে, বঞ্চিত করবার জেতে' বেপ্তার :— দূর হোক সে জঘন্য নারকীয় কাহিনী! আর বলতে পারছি নে। নিজের চারিত্র্য-বিবৃতি, মনুষ্যত্ব,—সব, সমস্ত,—সমূলে, দীর্ঘায় মূল্যে বেচে খেয়েছি!—আজ ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়ে, নিজের সমস্ত আচরণগুলোর হিসাব-নিকাশ করছি। উঃ! কি বৃণাময় জীবন আমার! পার্সনস,—অকপটে মুক্তকণ্ঠে বলছি,—আজ এই মুহূর্তে, নিজেকে গুলী করে মারতে পারলে, আমি বড় শান্তি পেতুম!”

পার্সন অসহিষ্ণুভাবে ক্রুদ্ধিত করিলেন; যথাসাধ্য কঠোর সংবত রাখিয়া বলিলেন, “কি পাগলের মত বকছেন আপনি? যত শোক, যত দুঃখ, যত কষ্ট আনুক,—অপরাধ কাপুরুষ ছাড়া কেউ নিজেকে গুলী করে মেরে,—কতবাক্যে,—মনুষ্য-জীবনের কঠবাক্যে নীকী দিতে চান না!”

বাধা দিয়া পিকক্ সত্যোরে বলিলেন, “ওই কথাটা, শুধু ওই কথাটা এখন প্রাণপণ চেষ্টায় মনে রেখে, এই প্রকাশ্য প্রলোভনটা প্রত্যা-বলে দাবিয়ে রেখেছি! কাল বৈকালে মাতৃ-বিয়োগের স্মরণ্যাস পেয়েছি। মনটা বড় বিপড়ে গিয়েছিল,—বোতল বোতল পার করে, নিজের সবস্ত সংজ্ঞাটা নেবার আধারে চুবিরে দিয়ে খালিকটা বেশ ছিলাম। তারপর আজ মহা স্মরণ্যাস!—আমর পুত্রবিয়োগ হয়েছে। এই নু নি আপনার টেলিগ্রামের উত্তর।—

আমিই ওটা সহ করে নিয়েছি।—বান, লীনার বৃকে মৃত্যুশেল মেরে চতুর্ভাগিনীর সকল জালা শেষ করে দেন। ভাগ্যবান, মহাপুরুষ আমি;—ভগতে নিজের সুখ অধিকারেই ব্যস্ত আছি,—আমার আজ কাঁপতে বসাসারবে না! এ-ব্যাপারে ক্লে-প্রকাশের অধিকারটুকু পশ্চাত্ত আমার নাই! মারাসর শান্তিলাভা মুকাবে ছিলাম,—অক্ দশে শুধু শাসনের মুকবিরানাই করেছিল একবারও ভাবি নি,—ভুলেও ভাবি নি, সে হঠাৎ এমন করে আমার কাছে ধুলো দিয়ে চলে যাবে!—চোখে ধুলো...!

পিকক্ হঠাৎ চূপ করিলেন। পার্সন টেলিগ্রাম চাতে করিয়া নিশ্চলক-দৃষ্টিতে চাটিয়া রহিলেন। ডাক্তার শেকার্ড জানাইতেছেন রাজি সাড়ে বারটার সময় পিকক্ মৃত্যু চেষ্টাচ্ছে।”

পার্সনকে চম্কাইয়া দিয়া, পিকক্ সহসা দাঁতে দাঁত পিষিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, “এই আমার ঠিক বিচার হয়েছে! কে বলে, ‘ভগবান্ নাহ’ পার্সনস? আনুক সে, আজ আমার বরণ্য-উন্মাদ জংপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখুক,—চির দিনের নাস্তিক দাগাবাজ, পরতানী-বুদ্ধির গোলাস, এই পত্ন-জদরটার মাঝে আজ ভগবানের হাতের চিহ্ন কি অলস্ত প্রত্যক্ষ হয়ে দেবে পেড়ে, দেখে যাক। না, না পার্সনস, আমি স্কুল বলতে এসেছি; না,—লীনাকে বাঁচাবার চেষ্টা আর নয়! সে বেচারাকে মরে গিয়ে শান্তি পেতে দেওয়াই এবার ঠিক। সেই প্রার্থনাট ককন। লীনা অনেক ক্লে-পেয়েছে, এবার মরে সুখী হোক। বিদায়! ‘নারাসির মৃতদেহটা এখনো

আছে। এই সাড়ে ছ'টর ট্রেনেই চলুন।
লীলাকে বলবেন সব।”

শিক্ প্রহাসোদ্ভূত হইলেন। পার্সন
বাধা বিধা কল্পিতভাবে বলিলেন, “দাঁড়ান
দাঁড়ান,—এ খবর লীলাকে আমরা কি করে
বোঝ? —পরক্ষণেই নিজের অজান্তেই
পার্সন সুদের মত বলিয়া ফেলিলেন, “এ
অবস্থার তাকে শান্ত করা, সে কর্তব্য যে
আপনার।”

“আমার!”—শিক্কের ললাটের শিরা
শুল্ল উৎকটবেগে ক্ষাত হইয়া উঠিল।
উদ্ভ্রান্তদৃষ্টিতে চাহিয়া, তার কণ্ঠে উত্তর
দিলেন, “মগজের ভেতর মাগুন অণে উঠল যে!
কিছুই আমার পাগল করে দিতে চান?—
আমি চিরদিন দৃষ্ট অবজ্ঞার, পৃথিবীর সকল
মাজুকে কুপার পাত্র ঠাউরে চলেছি, আজ
সেই পৃথিবীর চেহারা আমার কাছে আশ্চর্য্য
রকমে বদলে গেছে।—আজ আমি আপনাদের
কাছে, জগতের প্রত্যেকের কাছে কৃপা-ভিক্ষা
চাইছি, কাতর প্রাণে অহুঃ-ভিক্ষা চাইছি,—
আমার অনন্ত নরকবাসের অভিযাপ দিতে
চান, হেন,—কিন্তু লীনার সামনে আমার মূখ
দেখাতে বলবেন না। আমি তাকে হাজার
রকমে বন্ধনা করেও তৃপ্ত হতে পারি নি; শেষে
জ্বর একমাত্র পুত্রকেও—। প্রাণ ফেটে যাচ্ছে,
পার্সনস্, হত্যার পাণ্ডার কাছে বলে, বলুন
দেখি। কি নিজে আজ নিজেকে সাধনা দিই?
উঃ জগদানু—আমার সমস্ত কিছু অবলম্বন
আজ ছেড়ে চূর্ণাশ্ব করে দিলে! একি কঠোর
কণ্ড?”—শিক্ হেঁট হইয়া হৃৎকোষে সজোরে
কলাপ-রসিতে লাগিলেন।

হতবুদ্ধি পার্সন নিজেকে সমস্ত করিয়া

ধীরে ধীরে বলিলেন, “ছেলের অহুঃের খবর
পেয়েই লীনা ভেঙ্গে পড়েছে, এ-খবর তাকে
এখন কিছুতেই আমরা দিতে পারব না,—
দিলে তাকে বাঁচাতে পারব না। আপনি
বতই বলুন,—কিন্তু ঠিক জানবেন,—এ দাঙ্গা
শোক লীলাকে সহ্য করিয়ে, তারি সব হুঃখ
ভুলিয়ে দিয়ে, বাঁচিয়ে তোলবার ক্ষমতা যদি
কাকুর থাকে,—তবে সে আপনার ঐশ্বর্য্য,
সংঘম, আর ঐ একান্ত বাধিত-স্নেহের; যে
স্নেহ আজ লীনার অস্ত্রে ব্যাকুল হয়ে,
—তাকে পুত্রশোকের হুঃখ থেকে পরিত্রাণ
দেবার ক্ষেত্রে, তার মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনো করতে
চায়!—স্বঃ শিক্,—এপৃথিবীতে আমাদের
ভূণের কীর্তিটা বত বৃহৎ-ই হোক, কিন্তু তার
প্রারম্ভের পথও একটা আছে;—সে পথ
ভগবানের প্রদত্ত-আশীর্বাদে মহিমোজ্জ্বল।

শিক্ কপালের হাত সরাইয়া বিহ্বল-
দৃষ্টিতে একবার পার্সনের দিকে চাহিলেন,
তারপর দান-কণ্ঠে বলিলেন, “জীবনে কাকুর
কাছে কখনো আশীর্বাদ-ভিক্ষা করি নি,—
ভগবানের উদ্দেশেও নয়! কিন্তু আজ
আপনার কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে
ইচ্ছা হচ্ছে।—এই পথের ধূলার নতজাহু
হয়ে আপনার কাছে ওই আশীর্বাদ ভিক্ষা
করে নেবার ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি কি আমার
মৃত্যু কমা করবেন?”

পার্সন চমৎকৃত হইয়া শিক্কের বেদনাকট-
করণ চোখ-চুটির পানে চাহিয়া রহিলেন।
মৃত্যু, মৃত্যু!—কে বলে তুমি শুধুই জীবন
অবলম্বন! তুল, তুল! বহু—বহুদিন
সঞ্চিত, বহা-মৃত্যুর বুক প্রলয় ঘটাইতে
তোমার চেয়ে প্রচণ্ড কিপ্রকারিতা কাকুর

আজ্ঞে! শোক, তুমি স্বর্গীয়-তাব-দ্যোতক
স্বাধীন! তোমার জন্ম হোক!

পার্সন ভুলিয়া গেলেন,—ঘণ্টা-কতক
আগে এই মানুষটার গোটা-কতক নিঃস্ব-
স্বভা-বাক্ত কীর্তীর নীরব সমালোচনা করিতে
গিয়া, তিনি ঐ মানুষটার সমস্ত মনুষ্যত্বের
উপর কতদূর তীব্র ঘৃণা-ক্রোধে অধীর ও উত্তপ্ত
হইয়া উঠিয়াছিলেন! মানুষের স্বভাবের মধ্যে
যে-সকল অসংযম, কু-অভ্যাস একান্তই
অপ্রার্থনীয়,—সেগুলো মানুষ নিজের মনুষ্য-
বলে অবহেলায় পদনলিত করিয়া চলুক,—
ইহা লক্ষ্য বার, কোটা বার প্রার্থনীয় হউক,
কিন্তু তাই বলিয়া মানুষের কোন একটা
দুর্কল্যতাকেই শুধু বৃহৎ করিয়া দেখা, এবং
সেইটাই তাহার সমস্ত মনুষ্যত্বের বখাসকণ্ঠ
ভাবিয়া, তাহাকে বিচার করিতে বাওয়া,—
সেও কত বড় এক-চোখো বিচার!—কতখানি
জঘন্য নৃশংসতা!

নিজের নিকোখোচিত অবিচার-স্বাভা-
বিদ্যাবেগে পার্সনের মনের উপর দিয়া বহিষা
গেল, সঙ্গে সঙ্গে পার্সনের স্বাতিপটে, কে যেন
জগত অক্ষরে হৃদয়-দশী মহাজনের মহত্তম
উক্তি দাগিয়া দিল,—“To hate a man is
to betray humanity”—একটি মানুষকে
ঘৃণা করার,—সমস্ত মনুষ্যজাতির প্রতি বিশ্বাস-
হাতকত,—বিত্রোহিতা—প্রকাশ করা হয়।
হারের, ঘৃণা-দৃষ্ট উক মজিক!—পরের
দুর্কল্যতা-বিচারের সমস্ত যদি সে-নীতিটা স্মরণ
রাখিতাম!

শিক্ দীনকণ্ঠে আশীর্বাদ চাছিলেন,
পার্সনের অমৃতপুত্র, নিজের দৈন্তের বাধায়
সদ্ব্যচিং হইয়া উঠিল! পার্সনের কণ্ঠ তেম

করিয়া কান্নার রোল ছুটিয়া আসিতে চাহিল!
পার্সন দ্বিধা ভুলিয়া, শিক্কেব চইহাত ধরিয়া
বেদনাক্রক কণ্ঠে বলিলেন, “না; আমার ও-কথা
বলে আমার অমৃত্যুপ বাড়াবেন না।—আমা-
দের সকল তাই সকল ভগিনীর অন্তরের অন্তঃ-
স্থলে যিনি অকর্মামি রূপে বাস করছেন, তাঁর
কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন। যে মানুষ
মঙ্গলের পথে চলার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়,
তিনিই সে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়! আমরা
তার কাছেই আশীর্বাদ পাব।”

“আঃ, ধন্যবাদ! আজ এ-সময় আমার
এমন কথা শোনাতে পারে, এমন একটি
বন্ধু আমার ছিল না!—বড় কৃতজ্ঞ হইব,
ম্যাডাম! ভেতরটার কি যে হাজিল, কল্পে
পারি নে, কিন্তু এখন শান্তিবোধ করছি,
অনেক শান্তি! ধন্যবাদ আপনাকে, বিদায়।”

পা। বিদায়। কায় শেষ করেছে কিংবদন্তি।

পি। ফিরব্। আমার পিতাও মৃত্যু-মথায়।

দশ বৎসরের পর আজ আমার স্মরণ করেছেন,
‘শেষ-দেখা’ করবার জন্য। জীবনে অনেক
কর্তব্য অকতলা করেছি, কিন্তু এ কর্তব্য
জন্মের শিও আর নাই। তাঁর আদেশ পালন
করতে লীনার কাছে আসব।

পার্সন চিরন্তনমুখে কণেক নীরব থাকিয়া
বলিলেন, “তা হলে, সেখানে পৌঁছেই টেলি-
গ্রাম করুন যে, মার্সিস স্তব্ধ হয়েচে, লীনার বাবার
পরিচয় নাই। আপনি মার্সিসকে সঙ্গে করে
দীর্ঘই এখানে আসছেন।”

পি—“আবার প্রবকনা! তারই সঙ্গে!
মার্সিসের সঙ্গে!”

পার্সন দীর্ঘকণ্ঠে উত্তর দিলেন, “না হলে,
আমরা লীনাকে বাচাব কি করে? সে যে

উৎকর্ষার পেয়েই মারা যাবে!—”

ব্রহ্মপার হাসি হাসিয়া পিকক বলিলেন,
“তাই কর্ব, পার্সনস্, আমার এই কক্ষ
উজ্জ্বল, নির্মল, স্বার্থপর সৃষ্টিটার পানে চেয়ে
দেখুন, এর কোন খানে কোথাও এতটুকু
দয়া, মার্য, মেহ-মমতার চিহ্ন খুঁজে পাবেন
না! আমি তাকে চিরদিন অকাতরে হৃৎ
ধেবার জন্তেই তার স্বামিধের অধিকার গ্রহণ
করেছি,—পাষণ আমি! এ হৃৎও তাকে
অকাতরে দেব, কি সৌভাগ্য আমার!”—

পিকক অলিত-চরণে অগ্রসর হইলেন।
পার্সন দেয়ালে ভর দিয়া অনেককণ চুপ
করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিলেন, তারপর বুঝা
নোলের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্ত ধীরে

ভাঁহার উদ্দেশে কুঠিতে চলিলেন। ভাঁহার
হৃই চক্ষু কল্পনা-ভরা ব্যথার অশ্রুতে টল্ টল্
করিতেছিল,—অন্তরের অন্তঃস্থলে একান্ত
আগ্রহময় প্রার্থনার স্বর বাক্ত হইয়া উঠিতে-
ছিল,—“ফিরাও, ফিরাও ভগবান্, জগতের
সকল হতভাগাকে এমনি করিয়া আঘাত দিয়া
সচেতন করিয়া,—সংপথে ফিরাও! তোমার
হাতের আঘাত, সে যে কত বড় মঙ্গলের
মহিমার অলঙ্কৃত, প্রত্যেক মানবাত্মা তাহা
প্রত্যক্ষ চেতনায় ধ্রুব-সত্য অনুভব করিয়া
যথার্থ ‘মাহুয’ হইয়া উঠুক! বিশ্ব-চরাচর ধন্য
হইয়া থাকুক!”—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

“আনন্দ রাত্তি এল”

(মিশ্র বারোয়াঁ-ঠুংরী)

আজি আনন্দ রাত্তি এল

গেয়ে বাঁরে ঘন!

আজি কোথা হৃৎ-শোক দূরে মিলাইল

প্রেমে গানে ছদ্মি যেন হল নিমগন!

আজি মানস-নিকুঞ্জে পিককুল গাতে

ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল ছদ্মি উপবন!

আজি আনন্দ রাতে পাব প্রাণনাথে

কানে কানে ক’রে গেল মুহু সঙ্গীরণ!

তাই আনন্দ-আকুল কদর ব্যাকুল

এতদিনে হ’ল বুঝি সকল-সাধন ॥

ঐনির্মলচন্দ্র বড়ায়।

শিক্ষা।

ঘরের সংখ্যা যখন লোক-সংখ্যা অপেক্ষা অনেকটা বেশী হইয়া পড়ে, তখন বাড়ীর সেই অবস্থাকে আমরা 'হাঁ হাঁ' করা বলি। চাঁদপুরের রায়-বাড়ীর অনেক বৎসর হইতে এইরূপ 'হাঁ হাঁ' অবস্থা। বাড়ীটা আমার প্রপিতামহের সম্পত্তি;— উত্তরাধিকারি-সূত্রে পুরুবাহুক্রমে আমরা হুখে ও দুঃখে ভোগ-দখল করিতেছি। সে-কালে নাকি সবই বৃহৎ ছিল। আমাদের বাড়ীটাও সেই পদব্যাচ। ইট-কাঠ-দুয়ার-জানালা-গঠিত সেই বিপুল উন্নয়ন আমাদের সংসারের ৫১৬ জন লোকদ্বারা কিছুতেই পূর্ণ হইত না।

বাড়ীর ৫১৬ জন লোকের হিসাব দিতেছি। বাবা, মা, আমার তিন বোন আর আমি স্বয়ং। বৎসরের আট মাস কলিকাতার কাটিত বলিয়া আমি 'বাড়ীর অধিবাসী' আখ্যাতের স্পর্ধা করিতে পারি না। যে বুড়ী কি আমাদের মানুষ করিয়াছিল, সে বাড়ীতেই থাকিত, তবে বিশেষ কাজকর্ম করিতে পারিত না। বিবাহিত বোন-দুইটির মধ্যে অন্ততঃ একজন বৎসরে ছ'মাস চাঁদপুরে থাকিত। কাকাবাবু বাড়ীর ছেলে হইয়াও প্রবাসী; কচিং কখন বাড়ীতে আসিতেন;— দুই চারি দিন থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। হুতরাং, মোটের উপর বাড়ীর অধিবাসিগণের নিম্নতম সংখ্যা পাঁচ এবং উর্দ্ধতম সংখ্যা ছয়।

আমার পূর্ণজান হওয়ার পর এই কর্তৃক বৎসরের মধ্যে বাড়ীর এই 'হাঁ হাঁ' অবস্থা তিন-বার ক্ষয় দূর হইয়াছে। আমার দুই বোনের বিবাহ-উৎসবে ভাত্রমাসের পঞ্চম মত রায়-

বাড়ীর প্রতিকক্ষ দুইবার ভরিয়া উঠিয়াছিল। আর আমার মেজ বোনের বিবাহের আগে কাকাবাবুর ছেলে অর্থাৎ আমার বড়দা'র বিবাহে একবার তাহার শূভতা পূর্ণ হইয়াছিল। তার পর কয়েক বৎসর সব চূপ্ চাপ্।

সে-বৎসর আমার ছোট বোনের বিবাহ হইয়া গেল। এক পক্ষের জন্ত বাড়ীটা আবার সরগরম হইয়া উঠিল। কাকাবাবু ডাক্তার; তিনি আসিতে পারেন নাই। স-বোধি দাদা, সন্ধ্যা, বুড়ীমা, আমার তিন মামা, মাসীমা প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছিলেন। দিন-কয়টা কোলাহলের মধ্যে বেশ কাটিতেছিল।

এবার বোধির ভাবটা বেশ নুতন। মেজ বোনের বিবাহের সময় যখন আসিয়া-ছিলেন, তখন আমার সহিত কথা করিতেন না। তখনকার সংবত-রসনা, অবগুষ্ঠিতা, সঙ্কুচিত্তা বালিকা-বুর্জি এবার হাত-মুখরা, কোতুকচকলা রমণীতে পরিবর্তিত। কাকাবাবুর বাসার যে প্রেমোদ-উৎস রুদ্ধ ছিল সেবার তাহার পাম্বাণ চাপ পুলিয়া গিয়াছিল। পরিহাস-রসিকতা শতধারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রসিকতার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রসিকতা আর বাক্যে অবসান হইত না; এই হুগ্ধাণ্ডার দিনে বেশ ভূষাকেও আক্রমণ করিল। প্রথমে বড় ভগ্নীপতির দুই প্রহর বসন লালরঙে রঞ্জিত হইয়া গেল। তারপর দিন হইতে মেজ ভগ্নীপতির সাধের আঁকির পাঞ্জাবী-দুইটি ধরের গোলা জলে চির কর্কর হইয়া থাকিল।

কর সেই অব্যাহিত করুণায় প্রসাদ-কলিকা-
লাভে বঞ্চিত হই নাই। বোধি রত্তের দাতা-
কর্ণ ও বিশ্বকর্ষারূপে নূতন নূতন রঙ সৃজনে
ও বর্ণনে নিরতা। আমরা ভীত, সন্ত্রস্ত।
বাটীহ সরলে সহানুভূতিশূন্য, নির্জিকার ও
অকুণ্ঠিতচিত্তে আমাদের চরিত্রাদর্শনে ব্যাপ্ত।
ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল।

বে-দিন সকালে আমার মস্তকের কেশের
বন পাক্তোরার রসে সিক্ত হইল, সেই দিনই
হৃদয়ে বরষাজীর দল আমার ভাবী ভয়গতিক
যেরিয়া চাঁদপুরে পদার্পণ করিলেন। কাজ
ফেলিয়া দেখিতে গেলাম। কামিজের ইস্র-
ধর বর্ণ তখনও শুকায় নাই। নিবারণ (বর)
আমার বহুরূপী বেশের প্রতি চাহিয়া কি
ভাবিতেছিল কে জানে? কিন্তু তাহার কোমল
মুখস্থ দেখিয়া আমার বোধ হয় মায়ার সঞ্চার
হইল;—ভাবিলাম এই নিরীহ বেচারীর উপর
আজ সন্ধ্যার পর কত উত্তট রকমের অত্যাচার
হইবে। অন্যরে প্রবেশ করিয়া দেখি, বোধি
বাটনা শেব করিয়া এক বাটি হলুদগোলা
জল লইয়া দণ্ডায়মান। বলা বাহুল্য, সে জল
আমাদের জন্ত।

মনে হৃদুড়ির উদয় হইল;—মনে হইল,
বউদিকে একটু জল করিয়া দিই। নিকটে
একটা বইয়ের হাঁড়ি দেখিলাম। তাড়াতাড়ি
সেটা বোধির মাথার ঢালিয়া দিয়া দ্রুতপদে
ঘে-স্থান ত্যাগ করিলাম।

কিরিয়া আসিয়া বুঝিলাম, একটা গোল-
যোগের সূত্রপাত হইয়াছে। মা'র ঘরে ভিড়!
চুকিয়া দেখি বোধি ঘরের উপর শুইয়া
আছেন, মা তেলের মত একটা কি তাঁহার চোখে
ঢালিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'দন্তি ছেলে,

অত বয়স হ'ল, একটু বুদ্ধিও কি হ'ল না।'
মেজ-বোন বলিল, 'দাদা, তুমি বোধির মাথায়
কি বলে চূণ ঢেলে দিলে?' আমি ত অবাক।
পাশে দেখিলাম খুঁড়িমা! তাঁর স্বভাবতঃ গম্ভীর
মুখ আরও গম্ভীর হইয়াছে। তাঁর একমাত্র
ছেলে, সাধ করে বিবাহ দিয়াছেন,— কাণা বৌ
লইয়া কি করিয়া ঘর করিবেন? বোধ হয়,
এই সব কথা তিনি ভাবিতেছিলেন। আমি
কোন কথা না বলিয়া বাহিরে দাদার কাছে
গিয়া সব কথা জানাইলাম। তিনিও ডাক্তার।
তাঁকে বলিলাম, 'আপনি বা হয় একটা 'ওষু-
দিন'। তিনি মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন,
'ওষু চূণ দিয়েছিল, আর কিছু দিস্ নেই ত?'
আমি কহিলাম, 'আর কি দিব?—মাতেল দিয়া
দিতেছেন।' দাদা বলিলেন, 'তেল নয়, পি,
এম, বাপুটার কালী গোছের একটা কিছু।'
আমি চূণ করিয়া থাকিলাম। তারপর হৃৎকেন্দ্রে
ঘরের দিকে গেলাম। সকলেই চলিয়া গেল;
আমি ঘরে ঢুকিলাম না, বাহিরে এক পাশে
দাঁড়াইয়া থাকিলাম। দাদা নিশ্চয় ভাবিয়া-
ছিলেন, আমিও চলিয়া গিয়াছি। তিনি
ভিতরে গিয়া বলিলেন, 'কি ব্যাপার! বাঃ, এ
বে একেবারে পদ্মপলাশলোচন!' বোধি কি
বলিলেন শুনিতে পাইলাম না। আর দাঁড়াইয়া
থাকি বিধের নয় ভাবিয়া চলিয়া আসিলাম।

বিবাহে আমার উৎসাহ মাটি হইয়া গেলেও
শুভকার্য্য নির্জিয়ে সম্পন্ন হইল। নিবারণের
উপর বিশেষ কিছু করা হয় নাই। কউদি
অল্পপস্থিত; স্ত্রত্যং নেত্রী-বিহীন-সেনার স্তায়
রায়কস্তা ও রায়বধূদল অনেকটা বিশৃঙ্খল হইয়া
পড়িয়াছিল। কারণ, অল্প পরিমাণে লজ্জার
প্রাবল্য, ভাষাধিক ভদ্রোৎসাহ, সর্বোপরি

কোন অদৃশ্য শাস্তির অমূলক আশঙ্কা।—অন্ততঃ আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল।

বউদির সঙ্গে দেখা না করিয়াই কলিকাতার চলিয়া আসিলাম। বাড়ী হইতে পত্র পাইলাম, তাঁর চোখের কোন অনিষ্ট হয় নাই। যখন ছুটিতে বাড়ী গেলাম, ভাবিয়াছিলাম যে, এবার পাশের বৎসর, পড়াশুনা বেশ হইবে। কিন্তু একদিন বাবার মুখে শুনিলাম, আমার খুড়তুত বোন তরুর বিবাহ; সকলকে লইয়া যাইবার জন্য কাকাবাবু পত্র দিয়াছেন। এবার বিবাহ চাঁদপুরের বাড়ীতে হইবে না। কিন্তু কাকাবাবুর বাসার যাইবে কে? বাবার শরীর খারাপ, তিনি নিজে যাইতে পারিবেন না। বড় বোনের থোকা হইয়াছে, মা'র যাওয়া হইবে না।

বিবাহের ভোজ খাইতে আমি আমার ছোট বোনকে লইয়া সেখানে গেলাম, আর রঙ খাওয়াইতে গোটা-কতক বেশী করিয়া কাপড়-জামা লইলাম। মনে ভাবিলাম, বউদির যখন চোখ সারিয়াছে, রঙের পালা পুরা দমে আরম্ভ হইবে। বউদির সঙ্গে প্রথমে কথা কহিতে লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু কথা আগে তিনিই কহিলেন। বাক্যবাণ সঙ্গে সঙ্গে চলিল, তবে রঙের কোন হান্ধামা ভোগ করিতে হইল না। উত্তরের মধ্যে তাঁহার পদ্ম-পলাশলোচনের কথাটা একবার উল্লেখ করিতেই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, 'তুমি তখন কোথায় ছিলে?' তার পর তাঁহাকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট করিয়া কার্যে যোগদান করিলাম।

শকা দূর হইলেও একেবারে নিঃশঙ্ক হইতে পারিলাম না। বউদি'র রঙের ভাগ্য

না রাখিলেও একটা কিছু না করিয়া যে নিকৃতি দিযেন, এপ্রবোধ মনকে দিতে সাহস হইল না। তাঁহার সহিত কথোপকথনের সময় একবার যখন রসগোল্লা এবং রসগোল্লার রসের পার্থক্য ও আপেক্ষিক উপকারিতার বিষয়ে প্রশ্ন উঠিল, অমনি আমি সত্যের বুঝাইয়া ও প্রমাণ করিয়া দিলাম যে মস্তকে রসপ্রদান অপেক্ষা উদরে রসগোল্লা নিঃক্ষেপ অধিকতর বাঞ্ছনীয় এবং মস্তকের জন্য সুবাসিত তৈলই অধিকতর উপকারী। তার পর একদিন বৌদি জিজ্ঞাসা করিলেন, লজ্জাবাটা, চণের প্রলেপ ও লেবুর রস মিশ্রিত সরিষার তৈল, এই তিনটির ভিতর কোনটি উৎকৃষ্ট। চক্ৰোত্তরের জন্য যে কেনটাই হিতকর নহে, এই কথা সাধ্য মত বুঝাইতে প্রয়াস পাইলাম; কিন্তু বৌদির বৃহৎ হস্ত দেখিয়া বোধ হইল, সফলকাম হই নাই। বৌদি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি উষ্ম-আকুল-চিত্তে কাকাবাবুর সহিত বাজারে চলিলাম।

অকস্মাৎ কোন কালেই মাথা ছিল না। বাজারে আমার হিসাবে ব্যাপ্তির পরিচয় পাইয়া কাকাবাবু বলিলেন, 'যা তুই এগুলো নিয়ে বাড়ী যা; সকাল সকাল খেয়ে নিস; আমি সব কিনে বাসার যাব।' বাসার আসিয়া দেখি বৌদি সত্য সত্যই লজ্জা বাটিতেছেন। তিনি বয়স্ক উচ্চারণ করিলেও তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করিলাম। দাদা কতকগুলি জিনিষ আনিতে আবার ভিতরে পাঠাইলেন। চলিয়া আসিবার সময় পিছন হইতে একটি কোমল হস্ত চক্ষে কি একটা প্রলেপ লাগাইয়া দিল। জিনিষপত্র ফেলিয়া ছোট একটা আর্দ্রনাভ ছাড়িয়া চোখ

রগড়াইতে আরম্ভ করিলাম। দাদা বাহিরেই ছিলেন; তিনি ছুটিয়া আসিলেন। নিকটে বাহারা ছিল, তাহারাও আসিল। বউদি তখন অদৃশ্য; কারণ, পূর্বেই কি একটা পতনের শব্দ শুনিয়াছিলাম। দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কি হইয়াছে?’ আমি উৎকট ভঙ্গী করিয়া বলিলাম, লক্ষাবাটা—মরে গেলাম! দাদা বলিলেন, ‘দূর, তোর কপালে ত দেখছি’ উৎসর্গের সর লেগে রয়েছে! আর তুই কি গোলাব অপেরা গন্ধ পাচ্ছিস্ না?’ চাতিয়া দেখিলাম, দালানে যথেষ্ট লোক-সমাগম’ দূরে থও বিথও শেখ ফসৌল্লার গোলাপের নির্গামের শিশি, আর আমার ডই হাতে খেতবর্ণ

সরকণিকা। আশুতির নিঃশ্বাসে চতুর্দিকের হাস্তরব কানে প্রবেশ করিল না।

যথাকালে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। শুনিলাম যে, শীত্ৰই রায়-বাড়ীর হাঁ হাঁ অক্কা আর একবার দূরীভূত হইবে—পরীক্ষার পর খোকার ভাত আর তাহার মাতুলের বিবাহ। সে-বৎসর কি বিবাহ আমাদের বংশে দশমিকের পোনঃপুনিক নিয়ম অনুসারে চলিয়াছিল? যাহা হউক, এত কষ্টের পর যে শুভদৃষ্টি-পদার্থটা বৃত্তিতে পারিব, তাহা কখন ভাবি নাই। বড় ভাগ্য যে বৌদি চোখে সত্য সত্যই লক্ষটা দেন নাই।

শ্রী—

জাহাজ-ডুবি।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর।)

উপেক্ষাকিশোরবাবুর পুত্র তাঁহার নিকৃদ্দেশ কালের কাহিনী বলিতে লাগিলেন। আশ্মীর, বন্ধু এবং পৌরবর্গ মিলিত হইয়া নিতান্ত কৌতূহলাবিষ্টচিত্তে সে কাহিনী শুনিবার জন্য তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, “সকলের হরত ছেলেবেলাকার কথা সব মনে থাকে না। কিন্তু আমার খুব ছোট বেলাকার কথা পর্য্যন্ত সমস্ত মনে পড়ে! আমার বয়স যখন পাঁচ কি ছয়, শব্দের যখন আমাকে কোলে নিয়ে এই গঙ্গার ধারে বেড়াতে, তখনকার কথা পর্য্যন্ত আমার সব মনে আছে। তারপর নোয়াখালিতে যাওয়ার কথা, সে ত স্পষ্টই মনে রয়েছে। শব্দের সঙ্গে রোজই

বেড়াতে যেতুম, রোজ নতুন নতুন বায়গা দেখে বেড়াতুম। একদিন এমনি বেড়াতে বেড়াতে সহর ছাড়িয়ে মাঠে গিয়ে পড়ি। তখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এমন সময় হঠাৎ ছ’জন লোক আমাদের কাছে এসে, একজন শব্দের সঙ্গে কথা কইতে লাগল, আর একজন আমার হার খুলে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। শব্দের তখন তার পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে লোকটার উপর এসে পড়লো। আর একজন আমাকে কোলে নিয়ে ছুটে পাশাতে লাগলো। আর শব্দের সঙ্গে যে কথা কইছিল, সে তাড়া তাড়ি পকেট থেকে রিভলভার বের করে

শব্দরূপে শুধি করলে। শব্দ রক্ষাক্ষমত্বেই
স্রীটিতে লুটিয়ে পড়লো। দূর থেকে তা দেখেই
আমি ভয়ে মুচ্ছা গেলুম। পরে যে কি হল
তা আর আমি বলতে পারি না। দস্যুরা
যে আমাকে কেমন করে কোথায় নিয়ে এল,
সে-সব কিছুই আমি জানতে পারলুম না।
বখন আমার জ্ঞান হ'ল, তখন চেয়ে দেখলুম,
একটা ডালা ঢালা-ঘরে ছেড়া চেটাইয়ের
উপরে আমি পড়ে রয়েছি; দরজার কাছে
বসে দস্যুরা তামাক খাচ্ছে। আমাকে বার
নিয়ে এসেছিল, তারা ছাড়া আরও দু'তিন জন
ছিল। আমি কঁদে উঠতেই তাদের একজন
একখানা দা হাতে করে উঠে এসে চোখ
রাগিয়ে বলে, “চূপ কবে থাক। নইলে এই
দা দিয়ে এক কোপে কেটে ফেলব। আর
যদি চূপ করে থাকিস, তা হলে তোর বাপের
কাছে দিয়ে আসব।”

বাবার কাছে দিয়ে আসবে শুনে কিছু
আশঙ্ক হলুম; ভয়ে চূপ করে রইলুম। চক্ষু
মুছে জিজ্ঞাসা করলুম, “কখন আমাকে বাবার
কাছে নিয়ে যাবে?” উত্তরে সে বলে “রবি-
বার।” রবিবারের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম।
মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতুম ‘কবে রবিবার
হবে?’ তারা বলত, ‘এখনো দেরী আছে।’
হায়! তখন জানতুম না যে, সে রবিবার আর
আমার জীবনে হবে না! তাদের শ্রোতবাক্যে
রবিবারে বাবা-মার কাছে যেতে পাব মনে
করে, সেই আশার পথ চেয়ে থাকতুম। কেন
বলতে পারি না, তারা আমার গলার হার খুলে
নিয়েই নিশ্চিন্ত হলো, খুন করলে না!
ভগবানের দরায়ই হোক, আর পরমায়ুর
জোরেই বলুন, আমি দস্যুদের হাত থেকে বেঁচে

গেলুম। তারা কখনও এক জায়গায় থাকত না;
দু'দিন এখানে, দু'দিন ওখানে, এই রকম-রকম
স্থানে ঘুরে বেড়াতো। সেখানে তাদের আরও
লোকজন সব থাকতো। আবার কোথাও বা
কেউই থাকত না। তারা দু'জনেই কেবল
আমাকে নিয়ে থাকত। ক্রমশঃ আমি বড়
হয়ে উঠলুম, তাদের সার-সরমাস খাটতুম,
তামাক সাধতুম, ভাত রাধতেও শিখলুম।
একটু কোন কাজের ক্রটি হলে তারা আমাকে
মারত, গালাগালি দিত। কখন কখন তারা
আমাকে, একলা রেখেই কোথায় চলে যেত।
মাঝে মাঝে টাকা, সোণা-রূপার গহনা নিয়ে
এসে আমার সামনেই ভাগ বাটরা করে নিত।
বুঝতে পারতুম, এ-সব তাদের মহাজনির টাকা।
ক্রমে জানিরুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর আমার
এমন ঘণা-বিদ্বেষ জন্মাতে লাগল যে, আমি
তাদের সঙ্গে একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছা হ'ত না।
বখন একা থাকতুম তখন মনে হতো, এইবার
পালিয়ে বাবার কাছে যাই; কিন্তু আমার
তখনকার বহুসে পথ চিনে বাড়ী আসা সাধ্য-
শীত। বাড়ীঘর, বাপ-মা, সব কথাই মনে
আছে, কিন্তু রাস্তা জানি না; তাতে আমাকে
যে কত দেশদেশান্তরের ব্যবধান রয়েছে,
সেটুকু বোঝবার সামর্থ্যও তখন হয় নি। তখন
আমার বরস, বোধ হয়, বছর মশেক হবে।
দস্যুরা একদিন আমাকে একা রেখে কোথায়
গিয়েছে। মাঝে মাঝে তারা এই রকম যেত।
বখন আমি একা থাকতুম, তখন একা একা
বসে গান করতুম। গান যে কোথায় শিখে-
ছিলুম, সে-কথা ঠিক বলতে পারি না। বোধ
হয়, তিথারি বৈকুণ্ঠের কাছে হ'বে। কিন্তু
গান গাইতে গাইতে নিজের ডঃখটাকে মনে

একটু হাল্কা বলে মনে হ'ত। বেশ লাগত, তাই গাইতুম। একদিন এইরকম একা বাটার দরজার কাছে বসে গান গাইলাম। বাড়ীটা খুব সরু গলির ভিতর। একটা বড় পাথরের বাড়ী। আগে জানতুম না, পরে শুনলুম সে আরগাটা কাশী। দস্যদের সঙ্গে কত বারগা বেড়িয়েছি, কিন্তু কোন বারগারই নাম জানতুম না, তত বুদ্ধি তখন হয়নি। বাই হোক, সেদিনে আমার জীবনের কি শুভ মুহূর্ত আসল তা বলতে পারি না। সে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ মহিমা—আমার চিরস্মরণীয় দিন। সে-দিনের কথা মনে হলে এখন পর্যন্ত আমি ঈশ্বরের অপার করুণার প্রত্যক্ষ পরিচয় দেখতে পাই। আমি দরজার কাছে বসে গান করছি—কি গান তা মনে নেই, তবে বোধহয়, খুব মনোমগ্ন, খুব করুণ, খুব দুঃখব্যঞ্জকই হ'বে। আর আমি তখন ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষের মুখে এমন গান শুনে, দয়া কিংবা বিশ্বাসের উদ্রেক হয়েছিল কি না জানিনা, বাই হোক, আমার এই গান শুনে একটা সাধু মহাপুরুষ আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সাধু বলতে আপনারা হয় তো মনে করবেন, মাথার এক-মাথা জটা, বাথছাল-পরা, চিমটে-হাতে মোটা-কম্বলধারী একজন গাঁজাখোর সরাসী। কিন্তু তা না। ইনি সে ধরনের সাধু'ন'। ইনি একজন প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ! পরে ঐর পরিচয় জানতে পেরেছিলাম। ইনি কলকাতার কোনও বিখ্যাত বড়লোকের ছেলে। জন-সমাজে ঐর নাম বিশেষ পরিচিত। ইনি হিন্দুধর্মের অধোগতি দেখে এই ধর্মের পুনরুদ্ধার করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হ'ন। ইনি বেব উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। এর ছবরের মূল মন্ত্র প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা।

বাহ বেশ ভূষার ঐর কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না;—খুব সাধারণ, নিতান্ত সাধা-সিধে; যথার্থই রাজবি তিনি। এত বিবয়ের ভিতর থেকেও নিজে বিয়র ভোগ করতেন না। সকল বিষয়ে লিপ্ত থেকেও তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন। তাঁর যে রকম চরিত্র নিজের চক্ষের সামনে দেখেছি, তা বড় আশ্চর্য! এ-যুগে সে রকম প্রকৃতির মানুষ নেহাৎ বিরল। তিনি আমার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের পকেট হতে একটা টাকা বার করে অতিস্নেহমাখা সুরে বলেন, “বালক! পরশা নেবে?” আমার মলিন ছিন্নবেশ দেখে, বোধ হয়, তিনি আমাকে ভিখারিদের ছেলে মনে করেছিলেন। আমার কিন্তু তাঁর একথা শুনে অভিমানে চখে জল এল,—আমি কি ভিকিরি! আমি যে বড় লোকের ছেলে, সে অহঙ্কারটুকু আমার সেই বাল্য হৃদয়টাকেও তখন পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় ঘিরে রেখেছিল। অশ্রু আমার সেই বাল্য-কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিল। আমি কোন কথা কইতে পারলুম না, ষাড় নেড়ে জানালুম—না। আমার চখে জল দেখে তাঁর দয়ার্জ হৃদয় যেন গলে গেল; তিনি আরও কোমল মিষ্টস্বরে তাঁর ডান হাতখানি আমার মাথার উপর রেখে বলেন, “নেবে না? কাঁদছ কেন তুমি? তোমার কে আছে?” আমি তাঁর প্রথম হুঁই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শেষ প্রশ্নের উত্তর দিলুম, “এখানে আমার কেউ নেই, চোরে আমাকে চুরি করে এনেছে।”

আমার কথা শুনে তিনি চমকে উঠলেন; বলেন, “চোরে তোমাকে চুরি করে এনেছে? তোমার গায়ে বুঝি খুব গহনা ছিল?” আমি ষাড় নেড়ে জানালুম, ‘হাঁ’। তিনি কিছুক্ষণ

চুপ করে থেকে বলেন, “তোমার বাবার নাম কি?” আমি বলুম ‘উপেন বাবু।’

‘সাত বছর বয়সে পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলুম, কাজেই ভালরূপে পিতৃপিতামহের পরিচয় দেবার উপযুক্ত নাম তখন শিখিতে পারি নি। তিনি আমার কথা শুনে হেসে বলেন, “ভাল নাম কি?” আমি ভাবিলাম ভালনাম? ভালনাম আর কি তাতো জানি না। বাবার ত ঐ একটাই নাম। উপেনবাবু বলেই ত সবাই তাঁকে ডাকে।

‘তিনি একটু চিন্তি হইয়া বলেন, “তোমার নাম?” আমি বললাম—শ্রীঅমর কুমার বসু। নিজেই নামটি কথা ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই মা শিখিয়েছিলেন, কাজেই সেটি বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার বাড়ী কোথায়?” আমি তাড়াতাড়ি বলুম—গঙ্গার ধারে। তখন আমার বোম্বার শক্তি ছিল না যে, আমার কথা শুনে তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। তখন মনে হয়েছিল আমি সব কথাই তাঁকে বলেছি, আমার সমস্ত পরিচয়ই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, তিনি একটু ভেবে আমাকে বলেন, “তুমি আমার সঙ্গে যাবে বোকা?”

সে কথা শুনে তখন আমার মনে যে কি আনন্দ হ’ল, তা প্রকাশ করে বলতে পারি না। তাঁর সেই দিব্যকান্তিময় শান্তোজ্জ্বল সৌম্য প্রভিমুষ্টি দেখামাত্র আমার সে কিশোরহৃদয়ে যেন কেমন গাঢ় ভক্তির দাগ বসে গিয়েছিল। তাঁকে যেন আমার কত আপনায় ভর বলে মনে হতে লাগল। আমি তাঁর কথা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর একটা হাত ধরে

আগ্রহভরে বলে উঠলাম, “বাব বাব। আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন?” তিনি খুব মেহমান্বয়ে ছইহাতে আমার হাত দুটি ধরে বলেন ‘বাব।’

আমার আর কালবিলম্ব সইল না। ‘আমি প্রাণপণে তাঁর হাতখানি চেপে ধরে বলুম, “চলুন, চলুন, শীগ্গির চলুন, নইলে এখনি তারা এসে প’ড়বে।” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কোথায় গেছে?”

‘আমি বলুম—“তা জানি না। মাঝে মাঝে তারা আমাকে একলা ফেলে রেখে যায়, আমাকে কিছু বলে যায় না। তারা এনে আর আমাকে যেতে দেবে না। শীগ্গির এখান থেকে আমার নিয়ে পাগিয়ে চলুন। আমাকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, “আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া আর তাদের সাধ্য নেই।” আমি তাঁর সে কথায় আস্থা স্থাপন করতে না পেরে ভয়ে ভয়ে বলুম, “আপনি জানেন না তাদের; তারা সব পারে। শব্দকে শুন করে শব্দের কাছ থেকে আমাকে নিয়ে এসেছিল।”

‘তিনি আবার চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, “তাই নাকি?” তবে তো তাদের দেখতে গেলে খুব ভালই হয়, পুলিশে ধরিয়ে দিই।” তিনি আমার হাত ধরে আমার যে বাড়ীটাতে থাকতুম, সেই বাড়ীর ভিতর ঢুকে বাড়ীখানা বেশ করে দেখে নিয়ে আমার হাত ধরে নিয়ে চলে গেলেন।

‘কলীতে তাঁর একটা বাড়ী ছিল। বাড়ীখানা খুব বড়, কিন্তু লোকজন বেশী ছিল না; হুঁচর জন চাকর-বাকর মাত্র! বাছ আড়ম্বর তিনি মোটেই ভাল বাসিতেন না।

তিনি আমাকে যে কত বন্ধ করতে লাগিলেন, সে কথা বলিতে পারি না ; ঠিক নিজের ছেলের মতন করে রাখলেন। সেইদিন থেকেই আমার জন্মে একজন ভাল পণ্ডিত নিযুক্ত করে দিলেন, আমি তাঁর কাছে লেখা-পড়া শিখিতে লাগলুম। তিনি যখন পণ্ডিতদের সঙ্গে বসে শাস্ত্র-চর্চা করতেন, তার কিছু বুঝতে না পারলেও আমার তা শুনতে বড় মিষ্ট লাগতো ; একমনে বসে বসে শুনতুম। আমার আগ্রহ দেখে তিনি বড় সন্তুষ্ট হতেন। আমাকে বন্ধ করে সরল সরল কথাগুলি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। ছেলেবেলা থেকে তাঁর কাছে সেই সব কথা শুনে শুনে আমার মন যেন কেমন এক নূতনভাবে তৈরি হতে লাগল। পুলিশের হাজামার পড়লে তাঁর আধ্যাত্মিক কাজে বিঘ্ন ঘটবে বলে তিনি আর পুলিশে দল্লাতের কথা কিছু জানালেন না ; কিন্তু বাবার ঠিকানা জানবার জন্মে, বাবাকে আমার খবর দেবার জন্মে অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কোন ফলই হোল না। তিন বৎসর পরে তিনি তাঁর কাশীর বাড়ী থেকে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে চলে এলেন ; আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ; এসে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আমি দিনের বেলায় স্কুলে ইংরেজী আর সন্ধ্যার পরে পণ্ডিতের কাছে বাড়ীতে সংস্কৃত পড়তে লাগলুম। কত দিন এমি করে কেটে গেল। তিনি বাবার কোনও সন্ধান করে উঠতে পারলেন না। আমার তাঁদের জন্মে মনের সে রকম ব্যাকুলতা ক্রমশঃ কেটে যেতে লাগল। তাঁর মধুর উপদেশে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে আমি যেন একটা নূতন জীবন লাভ করতে লাগলুম।

মনের হৃৎকণ্ট বিবাহ-মলিনতা দিন দিন কোথায় চলে যেতে লাগল। তখন সমস্ত জগৎ-সংসারটাকেই আপনার বলে মনে হতে লাগল। আমার ক্ষুদ্র চলে গিয়ে নিজেকে বিশাল বিশ্বের মাঝে বিলিয়ে দেবার চেষ্টা প্রস্তুত হতে লাগলুম। দিন-রাত্রি পূর্ণামঙ্গ ভোগ করতে লাগলুম। আহা! সে কি স্বপ্ন! কি আনন্দ! ভগবানের প্রতিচ্ছবি! যেন কানে স্পষ্টরূপে শুনতে পেতুম। তিনি যে ঘরে বসে পণ্ডিতদের সঙ্গে দীক্ষা-নিরূপণের বিচার করতেন, সেই ঘরের ভিত্তিগায়ে একখানি ছবিত্তে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—

“হইলে হে ব্রহ্ম-দর্শন

শাস্ত্র অমৃতমুখে পূর্ণ এ জীবন।”

ওই দেখ রিপুগণ করে পলায়ন—

কোথা ক্ষুদ্র, কোথা শোক?—অনন্ত জীবন!”

আমি সেই চিত্রখানি দেখে আর শ্লোকটি পড়ে যেন নবজীবন লাভ করতুম। আমার দেহে নূতন শক্তির স্রষ্টা হল। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সভাসমিতি নিমন্ত্রণ প্রভৃতি যেখানে বা হতো, তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। সর্বজ্ঞই ব্রহ্ম-তত্ত্বের কথা, ধর্ম-প্রসঙ্গের কথা ভিন্ন বাজে কথা কোথাও হতো না। তাঁর পুণ্যময় সহবাসে আমার হৃদয়ের আত্মকল্পিততা কোথায় লীন হয়ে গেল। বিশ্বময় সেই একমেবাবিভীত্য দেখতে লাগলাম। আহা! জানি না কোন শুভ বৃহর্ষে, কি পুণ্যকালে সেই মহাত্মার দর্শন পেয়েছিলুম! যতদিন গুরুদেব জীবিত ছিলেন, তাঁর আশ্রয়েই ছিলুম। তারপর তিনি যখন দেহত্যাগ করলেন, তখন সেই মহাত্ম্যতব গুরুদেবের আশ্রম ছেড়ে নিজেকে

বিশ্বনাথের কাজে নিয়োজিত করবার জন্মে অনন্ত সংসারের যাত্রী হয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

যে-দিন নিজের ছেলেকে ফিরে পেয়েছিলেন, সে-দিন কমলাদেবীর মনে যে-রকম আনন্দ হয়েছিল, আজ ভগ্নীর ছেলেকে পেয়ে তার চেয়ে যে কম আনন্দ তাঁর হয়েছিল, তা মনে হয় না। তিনি আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, “ভগবানের মনে যা ছিল, তা হয়েছে; এখন যদি তিনি দয়া করেছেন, তা হলে—”

বাধা দিয়া উপেক্ষাব্যবস্থার পুত্র বলিলেন, “মাসীমা! ভগবানের দয়া আমি প্রতিদিন অনুভব করছি। তাঁর দয়াতেই বেঁচে রয়েছি, কোন দিনই তাঁর দয়ার অভাব মনে করি নি তা!”

কমলা দেবী বলিলেন, “সে যাই হোক, বাবা, এইবার তুমি বিয়ে করে সংসারী হও। আমরা দেখে সুখী হই।”

অমরের মুখে যেন একটা গাঢ় বিষাদের ছায়াপাত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মুহূর্তে হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, “আবার বিয়ে মাসীমা! না এ হতেই পারে না!”

তাঁর কণার ভাবার্থ ঠিক অবগত হইতে না পারিয়া সন্দ্বিগ্ধচিত্তে রাখাগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন বাবা, এ হতে পারে না? আমাদের সকলেরই ইচ্ছে তুমি বিয়ে করে সংসারী হয়ে তোমার বাপের ভিটে বাজার কর। অমর তো তার বাপের সঙ্গে চলো।”

উপেক্ষাব্যবস্থার পুত্র বলিলেন, “বিয়ে তো করেছিলুম ভেঁটা ম’শাই!”

রা। করে ছিলে? মা তবে কোথায়?

উ-পু। আমার মহাপ্রভব গুরুদেব তাঁর নিজের ভাই-ভ্রাতার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে সেও আমাকে মুক্তি দিয়ে চলে গেছে। বিবাহ করতে আর আমার ইচ্ছে নেই। সংসারে বাধা থাকতেও আর আমার ইচ্ছে নেই। বিষয়ভোগ করবার উপযুক্ত পাত্র অমর, আমি অমরকে সঙ্গাশ্রম করণে আশীর্বাদ করছি, অমর তার মেস-ম’শায়ের বিষয় এবং আমার মেস-ম’শায়ের বিষয়—তাই বিষয়ের মালিক হয়ে সুখে তার কন্যা পালন করুক।

অমরকুমার এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন; এবার মিনতির সুরে বলিলেন, “না দাদা, এত বোকা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন না। আপনার বোকা আপনি নিয়ে আমাকে হাঙ্গা করে দিন।”

সঙ্গেহে তিনি অমরকুমারের পিঠে হাত বুলাটিয়া বলিলেন, “অমর! চিরদিন ফকির করেই এসেছি, ফকির করতেই জানি; বিষয়-রক্ষা করতে হয় কি করে, তা তো জানি না, ভাই! প্রজা-পালন করবার উপযুক্ত পাত্র তুমি!”

অমরকুমার বলিলেন, “আমি যে নিজের চিন্তাতেই মগ্ন, দাদা! ত’জায়গার ভার চালাব কেমন করে? নিজের স্বার্থ নিয়েই আমি ব্যস্ত।”

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, “অমর! তুমি স্বার্থপর? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন বাঙ্গালার সকল জমীদার তোমার মতনই স্বার্থপর হন। তা’হলে এ দরিদ্র বঙ্গবাসীর ওখ-দৈত অনেক-পরিমাণে লঘু হবে।

অমর আশ্ব-প্রশংসা শুনিয়া লজ্জিত

হইলেন; ঝাড় নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “বড়র ভায় আমি ছোট হয়ে বইতে পার। কেন, দাণা? আপনার পায়ে পড়ি, আপনার ভায় আপনি নিন।”

সঙ্গেহে তিনি বলিলেন, “অমর! আমি অনেক সোভাগ্যে শেকল কেটে অনন্ত আকাশে উড়তে দেখিছি, বড় সুখের আশ্বাদ পেয়েছি, আমাকে এ-ভাবে বঞ্চিত করিস্ নি ভাই! আর আমাকে টেনে এনে শেকল পরিয়ে দিস্ নি! মাপ কর ভাই! এই ক্ষেত্রেই ত আমি তোদের সঙ্গে দেখা করতুম্ না। জানি, আমি দেখা দিলে তোরা আর আমাকে ছেড়ে দিবি না! কিন্তু এ বাচ্চুনি আমার যে কত কষ্ট হবে, তোরা তা বুঝতে পারছিস্ না।”

পুনর্বার বিবাহ করিয়া গৃহবাসী হইবার জন্য তাঁহাকে সকলেই অমরোদ্ধ উপরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুতেই সন্মত হইলেন না। শেষে তিনি এই পর্যন্ত বলিলেন, “যদি কখনও কিছুই অভাব হয়, তা হলে অমরকে জানাব।”

এমন সময় ‘অমরকুমারের’ শিশু-পুত্রটি টলিতে টলিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সঙ্গেহে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কোলে বসাইয়া বলিলেন, “আমার বিষয়-সম্পত্তি সর্বস্ব এই শিশুকে দান করলুম। তোমার ছেলেটির নাম কি, অমর?”

অমর উত্তর করিবার পূর্বেই শিশু তাহার আধ আধ ভাষায় বলিল, “শ্রী অদিত কুমার বসু (অজিত কুমার বসু)।” সকলে হাসিয়া উঠিলেন। অমর শিশুকে বক্ষে তুলিয়া গিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, “তুমি তোমার বাপের মতন হতে পারবে ত বাবা?”

শিশু সানন্দে ঝাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল, “হ্যাঁ, আমি বাবাল মত খুব বল হব।”

তিনি বলিলেন, “আশীর্বাদ করি, তুমি যেন তোমার বাপের মতন সকলপ্রকারেই বড় হতে পার।”

(সমাপ্ত)

প্রীতানুশীলা মিত্র।

ডাক্তার স্ত্রীর রাসবিহারী ঘোষ

বিশ্ববিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে বঙ্গের এক উজ্জল রবি, ভারতের গৌরব ডাক্তার স্ত্রীর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় গত ১৫ই ফাল্গুন রবিবার রাত্রি ১০টার সময় তাঁহার আলিপুরস্থ বাসভবনে তাঁহার নখর দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর বর্ধমান-জেলার অন্তর্গত ভোড়কাণা-নামক এক ক্ষুদ্র

গ্রামে স্ত্রীর রাসবিহারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা অগবন্ধু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। স্ত্রীর রাসবিহারী অতিশয় অল্প-বয়সেই মাতৃহীন হন। তাঁহার গর্ভধারিণীর নাম পদ্মাবতী। রাসবিহারীর বাল্য-শিক্ষা বঙ্কমান ও বাঁকুড়া জিলা-স্কুলেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন

এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী বোর্ডে হইতে এক-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় বিত্তবিদ্যান অধিকার করেন; তৎপরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। উহার পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আর কেহ ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বি, এন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি সুবর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'অনার্স-ইন-ল'-নামক অতি দ্রুত আইন-পরীক্ষায় তিনি সঙ্গোপনে উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৫ ও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে শ্রী রাসবিহারী 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক'রূপে ভারতীয় বন্ধু-বাবু-সম্বন্ধে যে গভীর গবেষণাপূর্ণ ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন, তাহাতে ব্যবস্থা-শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বক্তৃতাগুলি "Law of Mortgages in British India"-নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে উহা বিশেষজ্ঞগণ-কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হস্তান্তর-বিষয়ক আইন-প্রণয়ন-কালে ভারত-বর্ষের তদানীন্তন ব্যবস্থাসচিব ডাক্তার হুইটলি টোক্স শ্রী রাসবিহারীর গ্রন্থের ভূমী প্রশংসা করেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্রী রাসবিহারী সর্বপ্রথম কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এন পরীক্ষক এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি "ডক্টর অব ল"—এই গৌরবান্বিত উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডি-

কেটের সদস্য নিৰ্বাচিত হন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন ও ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত সভার কার্য করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিৰ্বাচিত হন। ১৮৯১ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি সকলেরই প্রভা আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি এই সময়ের মধ্যে অনেকগুলি ব্যবস্থা পরিবর্তন করাইয়াছিলেন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনে ও একারবন্দী পরিবারের বাসগৃহের আংশ-বিক্রয় সম্বন্ধে একটা নূতন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের 'বজেট' প্রসঙ্গে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রী রাসবিহারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকল্টি অব ল'র সভাপতি নিৰ্বাচিত হন এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত পদ অধিকার করিয়াছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার প্রশংসনীয় পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেন্ট রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়কে সি, আই, ই উপাধি প্রদান করেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে শ্রী রাসবিহারী পুনরায় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিৰ্বাচিত হন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানী কার্যবিধি আইন পুনর্গঠনে রাসবিহারী গবর্ণমেন্টকে বিশেষ সাহায্য করেন। এই কার্যে সাহায্যের জন্য ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে সি, এস, আই উপাধিতে ভূষিত করেন।

মহাত্মা রাসবিহারী অক্সফোর্ড-প্রেমিক ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্জন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপাধি-বিতরণ-সভায় এসিয়াবাসীর অসন্তোষ-প্রবণতার নিন্দা করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিবাদ করিয়া স্ত্রীর রাসবিহারী যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়। দেশভক্ত রাসবিহারী তাঁহার আত্মজীবন উপাধি অর্থ দেশের উন্নতি কল্পে ও নানা হিতকর কার্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজে পঞ্চাশ হাজার টাকা, তারকনাথ পালিতের শিল্প বিদ্যালয়ে, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, দেশলাইয়ের কারখানায় এবং, অস্ত্রান্ত দেশহিতকর অমুঠানেও প্রভূত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে একুশ লক্ষ টাকা দান করিয়া তিনি বঙ্গের শিক্ষার ইতিহাসে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই দানের পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর অব ফিলজফি নামক সম্মানজনক উপাধিতে বিভূষিত করেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট ইহাকে “নাইট উপাধি প্রদান করেন।

‘স্ত্রীর রাসবিহারীর মাতৃভক্তিও প্রগাঢ় ছিল। তিনি জননী পদ্মাবতীর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে মেদিনীপুরে একটা শ্মশান-ঘাট নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেন ও এতদ্দেশীয় মহিলাগণের মধ্যে যিনি বি,এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিযেন, তাঁহাকে ‘পদ্মাবতী মেডেল’ নামে একটা মেডেল প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

জগদ্বান রাসবিহারীর অতিপ্রিয় ছিল। জীবিতাবস্থায় তিনি যথেষ্ট একটা বিদ্যালয় ও একটা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে দেড় লক্ষ টাকা এবং, তাহার বিস্তৃত পুস্তকালয়ের আইন-পুস্তক ব্যতীত সমুদায় পুস্তকগুলি এই বিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন। নিজ-গ্রামে শিবের মন্দির রক্ষা ও পূজার জন্য তিনি পঞ্চাশ সহস্র টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে কৃষিবিজ্ঞান বিস্তারের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা এবং শুনা বাইতেছে যে জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় আট লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। এইরূপে রাসবিহারী তাহার আত্মজীবন উপাধি অর্থের দ্বারা দেশমাতার সেবার লব্ধতা করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার দানের কথা শ্রবণ করিয়া দেশবাসীর হৃদয় হইতে স্বতঃই ধন্যবাদের বাণী উচ্চারিত হইতেছে এবং সকলেই বলিতেছেন ‘দাতা চিরং জীবতু’।

স্ত্রীর রাসবিহারী ঘোষ ছইবার দার-পরিগ্রহ করেন। প্রথমে সাধু শিবচন্দ্র দেবের দৌহিত্রী ৬ অমর বাণ মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন। উভয় পত্নীই নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

স্ত্রীর রাসবিহারী ইউরোপের নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও তিনি দেশীয় আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই।

বঙ্গমাতার ক্রোড়ের যে স্থান এই সন্তান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আবার কে পূর্ণ করিবে জানি না! জগদীশ্বর এই প্রতিভা-শালী, বশবী, যদেশভক্ত সন্তানের আত্মাকে শান্তি বিধান করুন ও তাঁহার উপযুক্ত স্থানে তাঁহাকে রক্ষা করুন।

সংবাদ।

১। কটকের কুমারী জি, ডি, হাজরা আইনের শেষ পরীক্ষায় এবৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিহার ও উড়িষ্যার মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম বি. এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

২। লর্ড রেডিং ২রা এপ্রেল ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। লর্ড রেডিং বোম্বাই চট্টো দিল্লী ও দেহরাডুন এবং দেহরাডুন চট্টো পাজাব পরিদর্শনাধুর সমলার গমন করিবেন।

৩। ২রা এপ্রেল প্রাতে ভারতের নতুন বড়লাট লর্ড রেডিং সপত্নীক বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে নামিয়া ভারতের পুরাতন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের নিকট হইতে ভারতের সর্গপ্রধান শাসনকর্তা এবং সম্রাট প্রতিনিধির কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বোম্বাইবন্দরে পদার্পণ করিয়াই তিনি ভারত-বাসীকে উদ্দেশ্য করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন “স্ববিচার সম্বন্ধে যে বৃত্তান্তের সন্ধান আছে, আমার কলকাল-মধ্যে কখনও সে সন্ধান নষ্ট হইবে না।”

৪। ভারতের বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাটের নিকট হইতে তাঁহার উচ্চতর পদবী লাভ হইয়াছে। লর্ড চেমসফোর্ড এত দিন “বারন” ছিলেন, এবার “বার্ট কাউন্ট”-পদবী লাভ করিলেন।

৫। সমলার সিভিল সার্জিন মেজর এক, এ, এক বারনার্ডো সি, বি, ই, সি, আই, ই, এম, ডি, এক, আর, সি, এস, আই, এম, এস কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পিলিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

বর্ষবিদায়।

আজ পুরাতন বর্ষের বিদায়ের দিনে ইহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি করিয়া ও হিসাব করিয়া দেখিলাম, আজ যে বৎসর চলিয়া যাইতেছে, তাহার অঙ্গ কেবলই চাঞ্চল্য, বিপ্লব ও বেদনায় ভরা! এই বর্ষে ভারত কত ক্ষতি, কত অশান্তি ভোগ করিয়াছে! কত কৃতবিদ্য সুযোগ্য সন্তানকে ভারতমাতা হারাইয়াছেন! এই পুরাতন বর্ষের অঙ্কেই নব্য-ভারত-সম্পাদক ত্রিসূক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, তার রাসবিচারী ঘোষ, ত্রিসূক্ত সুরেশচন্দ্র সমাচপতি, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সর্গাধিকারী,

রায় ললিনাক্ষ বসু বাচস্পতি, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনন্ত শর্ম্মার শয়ন করিয়াছেন। ইহাদের হান আর কি কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে? পুরাতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে কি ভারতের সকল অশান্তির আগুন নির্মূলাভ হইবে! বর্ষ, তোমার অঙ্কে অনেক শ্রমণীয় ও ঐতিহাসিক ঘটনা অঙ্কিত হইয়া রহিল। এই সকল চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া আজ তুমি বিদায় লও। আমাদের বংশধরগণ অতীতের এই পৃষ্ঠা পুলিয়া আবার তোমাকে একদিন স্মরণ করিবে। আজ আমরা তোমাকে সেই আশায় অর্পণ করিয়া বিদায় দিই।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

১২শ কল্প—১ম ভাগ।

১৩২৭ সনের বর্ণনাত্মক সূচীপত্র।

আকাঙ্ক্ষা (কবিতা)	ঐযুক্ত ভবভূতি বিশ্বাস	১৮৬
আধমরী (গান ও স্বরলিপি)	{ ঐযুক্ত নিম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল ঐমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	১৬৬
আনন্দ রাতি এল (গান)	ঐযুক্ত নিম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল,	৩৪৪
আশে (কবিতা)	ঐযুক্ত হুশেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৮৫
উষা (কবিতা)	ঐমতী নানকুমারী বসু	৫
উষা (কবিতা)	ঐযুক্ত—	৬২৭
একখানি পত্র	ঐমতী—	১২৪
কাঞ্চী-পথে	ঐমতী বিভূবালা মিত্র	১৯, ৪৬
কে জানে (কবিতা)	ঐযুক্ত নিম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল	৬৫
কণমান (কবিতা)	ঐযুক্ত হুশেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৩৬
গান	ঐযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১২৩
গান	ঐযুক্ত নিম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল ৭১, ১৬১, ১৯৩	
গানের স্বরলিপি	ঐযুক্ত নিম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল	১৯৪
গানের স্বরলিপি	ঐমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৩৪, ৭২, ১৪৮
গৃহকার (কবিতা)	ঐযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	২৩২
গ্রীক-মাতের অভিনয়	ঐযুক্ত—	৩৩০
চিত্তের চির-নবীনতা (কবিতা)	ঐযুক্ত নিম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল	২৮১
হপলী	ঐযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, বি-এল	৯, ৫০, ৬৬, ১০৭, ১৩০
জাহাঙ্গ-ভূবি (উপভাস)	ঐমতী চাক্ষুশীলা মিত্র	২৫, ৩৭, ৭৩, ১১৬, ১৩৬, ১৭৭, ২০২, ২৩৯, ২৫৮, ৩০০, ৩২০, ৩৪৮
জিকানা (গান ও স্বরলিপি)	অচিন পাখী ও ঐমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৩১৫
জীবন-রাগিনী	ঐমতী মণিকা রায় চৌধুরী বি-এ	২২২
জীবন-সঙ্গিনী (গল্প)	ঐযুক্ত কমলকুমার সন্ন্যাল	৩১৭
জীবনের রঙ	ঐযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ	৫৮
জান, তাকি, ও কর্মের মানচিত্র	ঐমতী বসন্তকুমারী বসু	৫

কুচন গীতি (স্বরলিপি সহ)	{	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১১৪
		ও	
		শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	
ডাকটিকিটের ভাষা		শ্রীমতী সুসমা সিং	৬১৯
ডাক্তার স্তার রাসবিহারী ঘোষ		শ্রীমতী —	৩৫৪
তোমার হাসি (কবিতা)		শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল	২২৫
দণ্ডবৎ (গান ও স্বরলিপি)	{	শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ	২৩৬
		ও	
		শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	
দম্পতি (কবিতা)		শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২২২
দ্রুত-কমল (কবিতা)		শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল	৩০৫
ধনি (কবিতা)		শ্রীযুক্ত অরুণনাথ চট্টোপাধ্যায়	১১৬
নদী-সৈকতে (কবিতা)		শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল	১৫৯
নব বর্ষের গান (স্বরলিপি সহ)	{	শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য	৩
		ও	
		শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	
নব বর্ষের প্রার্থনা (কবিতা)		শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল	৩২
নবোজা (কবিতা)		শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৪৬
নাড় গোপাল (কবিতা)		শ্রীমতী শূশীলা সুলতী মিত্র	২১৬
নিমন্ত্রণ (কবিতা)		শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ,	২৫৭
নিবেদন (কবিতা)		শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৬৩
নিবেদন (কবিতা)		শ্রীমতী ননীবালা দেবী	১৭৮
পথিক (কবিতা)		শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য	১০৬
পারের ডাক (কবিতা)		শ্রীমতী শান্তিপ্রেভা দাস	৩১৯
পুস্তক-সমালোচনা—			
(ক) উজ্জলতা		অধ্যাপক ডাক্তার অরুণনাথ দাসগুপ্ত	
		এম্-এ, পি. এচ্., ডি, ১২৬, ১৫৬, ১৯০	
(খ) সাত-নদী			১৮৮
প্রণাম (কবিতা)		শ্রীমতী চারুলতা দেবী	২২৪
প্রসূতি ও সন্তান মঙ্গল			৫৫
প্রাণের দায়া (কবিতা)		শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল	১
প্রার্থনা (কবিতা)		শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১৭৭
প্রেম (কবিতা)		শ্রীমতী চারুলতা দেবী	২৫০
প্রেমময়ী (কবিতা)		শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিশ্বাস	৪৯

ভজন (বরলিপি সহ)	শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্	৩২৯
জন্ম-সংশোধন		১৬০
জা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০
মানবের মৃত্যু (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিহারদ্ব	২২২
মিলন কণ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৬৯
মুক্তি (কবিতা)	শ্রীমতী শান্তিপ্রভা দাস	৩১৯
মুখ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী	৫৫
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল		৬৩
লিপি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৩৭
লীনার শিক্ষা (উপভাস)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী	২২, ৯৮, ১৫১, ১৬৮, ১৯৬, ২২৯, ২৭৩, ২৮২, ৩০৬, ৩৩৭
লোকমাত্র তিলক-মহারাজ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	১৫৭
বড়র বিপদ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	২২৪
বরবার (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিহারদ্ব	১৫৭
বর্ষাবিহার	শ্রীমতী—উ	৩৫৭
বর্ষা (কবিতা)	শ্রীমতী অমিয়া চৌধুরী	৫৭
বিশিষ্ট সংবাদ		৬০, ২৫৫
বিশ্ব-জাগরণ	শ্রীমতী মণিকা রাই চৌধুরী, বি এ,	১২৫
শিক্ষা (গল্প)	শ্রীযুক্ত—	৬৪৫
গুটিবায়ু	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিহারদ্ব	৯০
শৈশব-স্মৃতি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্	১২৯
শ্রামা কি শ্রাম ? (কবিতা)	শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র	৮৬
সংক্ষিপ্ত নূতন পত্রিকা		২
সংবাদ		২২৩, ৩৫৭
ফল দান (কবিতা)	দরবেশ	৯৭
দমস্কাস সঙ্গীত (বরলিপি সহ)	{ শ্রীযুক্ত দরবেশ ও শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	২২৩
সমাজে নারীর কাজ	শ্রীমতী নিতাইনী দেবী	১৮৬
সাময়িক প্রসঙ্গ		২৫, ১২৭
সাময়িক সংবাদ		১৫৯
সে-দিনের পাখা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৪
শ্রীশিক্ষা ও শ্রীস্বাধীনতা	শ্রীমতী উ, প্র, দ	২৬৯
স্বর্ণের ঠিকানা (কবিতা)	স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত	৬২
হিন্দুর তীর্থনিচর	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	৮৭, ১৬২, ২১৭, ২৫১

